বাংলা একাঙ্ক নাট্য সংগ্রহ



সাহিত্য অকাদেমি

সাহিত্য অকাদেমি

প্রথম প্রকাশ ১৯৬০

সাহিত্য অকাদেমি
রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজশাহ রোড, নতুন দিল্লী ১১০ ০০১
বিক্রয় কেন্দ্র: স্বাতী, মন্দির মার্গ, নতুন দিল্লী ১১০ ০০১
জীবনতারা ভবন, ২৩এ/৪৪ একস্, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫৩
৩০৪-৩০৫ গুণ ভবন, আন্না সলাই, তেয়নামপেট, মাদ্রাজ ৬০০ ০১৮
১৭২ মুম্বাই মারাঠী গ্রন্থ সংগ্রহালয় মার্গ, দাদার, বোম্বাই ৪০০ ০১৪
এডিএ, রঙ্গমন্দির, ১০৯ জে. সি. রোড, বাঙ্গালোর ৫৬০ ০০২

মুদ্রক: সেবা মুদ্রণ
৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

সূচিপত্র



রথের রশি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথমা

এবার কী হল, ভাই!
উঠেছি কোন্ ভোরে, তখন কাক ডাকে নি।
কঙ্কালিতলার দিঘিতে দুটো ডুব দিয়েই
ছুটে এলুম রথ দেখতে, বেলা হয়ে গেল;
রথের নেই দেখা। চাকার নেই শব্দ।

চারি দিকে সব যেন থম্‌থমে হয়ে আছে,
ছম্‌ছম্‌ করছে গা।

তৃতীয়া

দোকানি-পসারিরা চুপচাপ বসে,
কেনাবেচা বন্ধ। রাস্তার ধারে ধারে
লোক জটলা করে তাকিয়ে আছে
কখন আসবে রথ। যেন আশা ছেড়ে দিয়েছে।

প্রথমা

দেশের লোকের প্রথম যাত্রার দিন আজ;
বেরবেন ব্রাহ্মণঠাকুর শিষ্য নিয়ে—
বেরবেন রাজা, পিছনে চলবে সৈন্যসামন্ত—
পণ্ডিতমশায় বেরবেন, ছাত্ররা চলবে পুঁথিপত্র হাতে,
কোলের ছেলে নিয়ে মেয়েরা বেরুবে,
ছেলেদের হবে প্রথম শুভযাত্রা—
কিন্তু কেন সব গেল হঠাৎ থেমে!

ঐ দেখ্, পুরুতঠাকুর বিড়্ বিড়্ করছে ওখানে।
মহাকালের পাণ্ডা ব'সে মাথায় হাত দিয়ে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী

সর্বনাশ এল।
বাধবে যুদ্ধ, জ্বলবে আগুন, লাগবে মারী,
ধরণী হবে বন্ধ্যা, জল যাবে শুকিয়ে।

প্রথমা

এ কী অকল্যাণের কথা ঠাকুর!
উৎসবে এসেছি মহাকালের মন্দিরে—
আজ রথযাত্রার দিন।

সন্ন্যাসী

দেখতে পাচ্ছ না—আজ ধনীর আছে ধন,
তার মূল্য গেছে ফাঁক হয়ে গজভুক্ত কপিত্থের মতো।
ভরা ফসলের খেতে বাসা করেছে উপবাস।
যক্ষরাজ স্বয়ং তার ভাণ্ডারে বসেছে প্রায়োপবেশনে।
দেখতে পাচ্ছ না—ভাণ্ড আজ শতছিদ্র,
তাঁর প্রসাদধারা শুষে নিচ্ছে মরুভূমিতে—
ফলছে না কোনো ফল!

তৃতীয়া

হাঁ ঠাকুর, তাই তো দেখি।

সন্ন্যাসী

তোমরা কেবলই করেছ ঋণ,
কিছুই কর নি শোধ,
দেউলে করে দিয়েছ যুগের বিত্ত।
তাই নড়ে না আজ আর রথ—
ঐ-যে, পথের বুক জুড়ে পড়ে আছে তার অসাড় দড়িটা।

প্রথমা

তাই তো, বাপ্ রে, গা শিউরে ওঠে—
এ-যে অজগর সাপ, খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে আর নড়ে না।

সন্ন্যাসী

ঐ তো রথের দড়ি, যত চলে না ততই জড়ায়।
যখন চলে, দেয় মুক্তি।

দ্বিতীয়া

বুঝেছি আমাদের পুজো নেবেন ব'লে
হত্যে দিয়ে পড়ে আছেন দড়ি-দেবতা।
পুজো পেলেই হবেন তুষ্ট।

দ্বিতীয়া

ও ভাই, পুজো তো আনি নি। ভুল হয়েছে।

তৃতীয়া

পুজোর কথা তো ছিল না—
ভেবেছিলেম রথের মেলায় কেবল বেচব কিনব,
বাজি দেখব জাদুকরের,
আর দেখব বাঁদর-নাচ।

চল্-না শিগগির, এখনো সময় আছে,
আনিগে পুজো।

[সকলের প্রস্থান

নাগরিকদের প্রবেশ

প্রথম নাগরিক

দেখ্ দেখ্ রে, রথের দড়িটা কেমন করে পড়ে আছে।
যুগযুগান্তরের দড়ি, দেশদেশান্তরের হাত পড়েছে ঐ দড়িতে,
আজ অনড় হয়ে মাটি কামড়ে আছে
সর্বাঙ্গ কালো করে।

দ্বিতীয় নাগরিক

ভয় লাগছে রে। সরে দাঁড়া, সরে দাঁড়া।
মনে হচ্ছে ওটা এখনই ধরবে ফণা, মারবে ছোবল।

তৃতীয় নাগরিক

একটু একটু নড়ছে যেন রে! আঁকুবাঁকু করছে বুঝি।

প্রথম নাগরিক

বলিস্ নে অমন কথা। মুখে আনতে নেই।
ও যদি আপনি নড়ে তা হলে কি আর রক্ষে আছে।

তৃতীয় নাগরিক

তা হলে ওর নাড়া খেয়ে সংসারের সব জোড়গুলো
বিজোড় হয়ে পড়বে। আমরা যদি না চালাই—
ও যদি আপনি চলে, তা হলে পড়ব যে চাকার তলায়।

প্রথম নাগরিক

ঐ দেখ্‌ ভাই, পুরুতের গেছে মুখ শুকিয়ে,
কোণে বসে বসে পড়ছে মন্তর।

দ্বিতীয় নাগরিক

সেদিন নেই রে
যেদিন পুরুতের মন্তর-পড়া হাতের টানে চলত রথ।
ওরা ছিল কালের প্রথম বাহন।

তৃতীয় নাগরিক

তবু আজ ভোরবেলা দেখি ঠাকুর লেগেছেন টান দিতে—
কিন্তু একেবারেই উল্টো দিকে, পিছনের পথে।

প্রথম নাগরিক

সেটাই তো ঠিক পথ, পবিত্র পথ, আদি পথ।
সেই পথ থেকে দূরে এসেই তো কালের মাথার ঠিক থাকছে না।

দ্বিতীয় নাগরিক

মস্ত পণ্ডিত হয়ে উঠলি দেখি! এত কথা শিখলি কোথা।

প্রথম নাগরিক

ঐ পণ্ডিতেরই কাছে। তাঁরা বলেন—
মহাকালের নিজের নাড়ীর টান পিছনের দিকে,
পাঁচজনের দড়ির টানে অগত্যা চলেন সামনে।
নইলে তিনি পিছু হটতে হটতে একেবারে পৌঁছতেন।
অনাদি কালের অতল গহ্বরে।

তৃতীয় নাগরিক

ঐ রশিটার দিকে চাইতে ভয় করে।
ওটা যেন যুগান্তের নাড়ী—
সান্নিপাতিক জ্বরে আজ দব্ দব্ করছে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী

সর্বনাশ এল।
গুরুগুরু শব্দ মাটির নীচে।
ভূমিকম্পের জন্ম হচ্ছে।

রথের রশি

গুহার মধ্য থেকে আগুন লক্‌লক্ মেলছে রসনা।
পূর্বে পশ্চিমে আকাশ হয়েছে রক্তবর্ণ।
প্রলয়দীপ্তির আংটি পরেছে দিক্‌চক্রবাল।

[প্রস্থান

প্রথম নাগরিক

দেশে পুণ্যাত্মা কেউ নেই কি আজ।
ধরুক-না এসে দড়িটা।

দ্বিতীয় নাগরিক

এক-একটি পুণ্যাত্মাকে খুঁজে বের করতেই
এক-এক যুগ যায় বয়ে—
ততক্ষণ পাপাত্মাদের হবে কী দশা।

তৃতীয় নাগরিক

পাপাত্মাদের কী হবে তা নিয়ে ভগবানের মাথাব্যথা নেই।

দ্বিতীয় নাগরিক

সে কী কথা। সংসার তো পাপাত্মাদের নিয়েই।
তারা না থাকলে তো লোকনাথের রাজত্ব উজাড়।
পুণ্যাত্মা কালেভদ্রে দৈবাৎ আসে,
আমাদের ঠেলায় দৌড় মারে বনে জঙ্গলে গুহায়।

প্রথম নাগরিক

দড়িটার রঙ যেন এল নীল হয়ে।
সামলে কথা কোস।

মেয়েদের প্রবেশ

প্রথমা

বাজা ভাই, শাঁখ বাজা—
রথ না চললে কিছুই চলবে না।
চড়বে না হাঁড়ি, বুলবুলিতে খেয়ে যাবে ধান।
এরই মধ্যে আমার মেজো ছেলের গেছে চাকরি,
তার বউটা শুষছে জ্বরে। কপালে কী আছে জানি নে।

প্রথম নাগরিক

মেয়েমানুষ, তোমরা এখানে কী করতে।
কালের রথযাত্রায় কোনো হাত নেই তোমাদের।
কুটনো কোটোগে ঘরে।

দ্বিতীয়া

কেন, পুজো দিতে তো পারি।
আমরা না থাকলে পুরুতের পেট হত না এত মোটা।
গড় করি তোমায়, দড়ি-নারায়ণ! প্রসন্ন হও।
এনেছি তোমার ভোগ। ওলো, ঢাল্ ঢাল্ ঘি,
ঢাল্ দুধ, গঙ্গাজলের ঘটি কোথায়,

ঢেলে দে-না জল। পঞ্চগব্য রাখ্ ঐখানে,
জ্বালা পঞ্চপ্রদীপ। বাবা দড়ি-নারায়ণ
এই আমার মানত রইল, তুমি যখন নড়বে
মাথা মুড়িয়ে চুল দেব ফেলে।

তৃতীয়া

এক মাস ছেড়ে দেব ভাত, খাব শুধু রুটি।
বলো-না ভাই, সবাই মিলে—জয় দড়ি-নারায়ণের জয়!

প্রথম নাগরিক

কোথাকার মূর্খ তোরা—
দে মহাকালনাথের জয়ধ্বনি।

প্রথমা

কোথায় তোমাদের মহাকালনাথ। দেখি নে তো চক্ষে।
দড়ি-প্রভুকে দেখছি প্রত্যক্ষ—
হনুমান-প্রভুর লঙ্কা-পোড়ানো লেজখানার মতো—
কী মোটা, কী কালো, আহা দেখে চক্ষু সার্থক হল।
মরণকালে ঐ দড়ি-ধোয়া জল ছিটিয়ে দিয়ো আমার মাথায়।

দ্বিতীয়া

গালিয়ে নেব আমার হার, আমার বাজুবন্দ,
দড়ির ডগা দেব সোনা-বাঁধিয়ে।

তৃতীয়া

আহা, কী সুন্দর রূপ গো!

প্রথমা

যেন যমুনা নদীর ধারা।

দ্বিতীয়া

যেন নাগকন্যার বেণী।

তৃতীয়া

যেন গণেশঠাকুরের শুঁড় চলেছে লম্বা হয়ে,
দেখে জল আসে চোখে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

প্রথমা

দড়ি-ঠাকুরের পুজো এনেছি, ঠাকুর।
কিন্তু পুরুত যে নড়েন না, মন্তর পড়বে কে।

সন্ন্যাসী

কী হবে মন্তরে।
কালের পথ হয়েছে দুর্গম।
কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, কোথাও গভীর গর্ত।
করতে হবে সব সমান, তবে ঘুচবে বিপদ।

তৃতীয়া

বাবা, সাতজন্মে শুনিনি এমন কথা।
চিরদিনই তো উঁচুর মান রেখেছে নিচু মাথা হেঁট করে।
উঁচু-নিচুর সাঁকোর উপর দিয়েই তো রথ চলে।

সন্ন্যাসী

দিনে দিনে গর্তগুলোর হাঁ উঠছে বেড়ে।
হয়েছে বাড়াবাড়ি, সাঁকো আর টিঁকছে না।
ভেঙে পড়ল ব'লে।

[প্রস্থান

প্রথমা

চল্‌ ভাই, তবে পুজো দিইগে রাস্তা-ঠাকুরকে।
আর গর্ত-প্রভুকেও তো সিন্নি দিয়ে করতে হবে খুশি,
কী জানি ওঁরা শাপ দেন যদি। একটি-আধটি তো নন,
আছেন দু-হাত পাঁচ-হাত অন্তর।
নমো নমো দড়ি-ভগবান, রাগ কোরো না ঠাকুর,
ঘরে আছে ছেলেপুলে।

[মেয়েদের প্রস্থান

সৈন্যদলের প্রবেশ

প্রথম সৈনিক

ওরে বাস্‌ রে! দড়িটা পড়ে আছে পথের মাঝখানে—
যেন একজটা ডাকিনীর জটা।

দ্বিতীয় সৈনিক

মাথা দিল হেঁট করে।
স্বয়ং রাজা লাগালেন হাত, আমরাও ছিলুম পিছনে।
একটু ক্যাঁচকোঁচও করলে না চাকাটা!

তৃতীয় সৈনিক

ও যে আমাদের কাজ নয়, তাই।
ক্ষত্রিয় আমরা, শূদ্র নই, নই গোরু।
চিরদিন আমরা চড়েই এসেছি রথে।
চিরদিন রথ টানে ঐ ওরা—যাদের নাম করতে নেই।

প্রথম নাগরিক

শোনো ভাই, আমার কথা।
কালের অপমান করেছি আমরা, তাই ঘটেছে এ-সব অনাসৃষ্টি।

তৃতীয় সৈনিক

এ মানুষটা আবার বলে কী।

প্রথম নাগরিক

ত্রেতাযুগে শূদ্র নিতে গেল ব্রাহ্মণের মান—
চাইলে তপস্যা করতে, এত বড়ো আস্পর্ধা—
সেদিনও আকাল লাগল দেশে, অচল হল রথ।
দয়াময় রামচন্দ্রের হাতে কাটা গেল তার মাথা,
তবে তো হল আপদ শান্তি।

দ্বিতীয় নাগরিক

সেই শূদ্ররা শাস্ত্র পড়ছেন আজকাল,
হাত থেকে কাড়তে গেলে বলেন, আমরা কি মানুষ নই।

তৃতীয় নাগরিক

মানুষ নই! বটে! কতই শুনব কালে কালে।
কোন্‌দিন বলবে, ঢুকব দেবালয়ে।
বলবে, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের সঙ্গে নাইব এক ঘাটে।

প্রথম নাগরিক

এর পরেও রথ যে চলছে না, সে আমাদের প্রতি দয়া করে।
চললে চাকার তলায় গুঁড়িয়ে যেত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

প্রথম সৈনিক

আজ শূদ্র পড়ে শাস্ত্র,
কাল লাঙল ধরবে ব্রাহ্মণ। সর্বনাশ!

দ্বিতীয় সৈনিক

চল্-না ওদের পাড়ায় প্রমাণ করে আসি—
ওরাই মানুষ না আমরা।

দ্বিতীয় নাগরিক

এদিকে আবার কোন্ বুদ্ধিমান বলেছে রাজাকে—
কলিযুগে না চলে শাস্ত্র, না চলে শস্ত্র,
চলে কেবল স্বর্ণচক্র। তিনি ডাক দিয়েছেন শেঠজিকে।

প্রথম সৈনিক

রথ যদি চলে বেনের টানে
তবে গলায় অস্ত্র বেঁধে জলে দেব ডুব।

দ্বিতীয় সৈনিক

দাদা, রাগ কর মিছে, সময় হয়েছে বাঁকা।
এ যুগে পুষ্পধনুর ছিলেটাও
বেনের টানেই দেয় মিঠে সুরে টংকার।
তার তীরগুলোর ফলা বেনের ঘরে শানিয়ে না আনলে
ঠিক জায়গায় বাজে না বুকে।

তৃতীয় সৈনিক

তা সত্যি। এ কালের রাজত্বে রাজা থাকেন সামনে,
পিছনে থাকে বেনে। যাকে বলে অর্ধ-বেনে-রাজেশ্বর মূর্তি।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

প্রথম সৈনিক

এই-যে সন্ন্যাসী, রথ চলে না কেন আমাদের হাতে।

সন্ন্যাসী

তোমরা দড়িটাকে করেছ জর্জর।
যেখানে যত তীর ছুঁড়েছ, বিঁধেছে ওর গায়ে।
ভিতরে ভিতরে ফাঁক হয়ে গেছে, আলগা হয়েছে বাঁধনের জোর।
তোমরা কেবল ওর ক্ষত বাড়িয়েই চলবে,
বলের মাতলামিতে দুর্বল করবে কালকে।
সরে যাও, সরে যাও ওর পথ থেকে।

[প্রস্থান

ধনপতির অনুচরবর্গের প্রবেশ

প্রথম ধনিক

এটা কী গো, এখনি হুঁচট খেয়ে পড়েছিলুম।

দ্বিতীয় ধনিক

ওটাই তো রথের দড়ি।

চতুর্থ ধনিক

বীভৎস হয়ে উঠেছে, যেন বাসুকি মরে উঠল ফুলে।

প্রথম সৈনিক

কে এরা সব।

দ্বিতীয় সৈনিক

আংটির হীরে থেকে আলোর উচ্চিংড়েগুলো
লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে চোখে।

প্রথম নাগরিক

ধনপতি শেঠির দল এরা।

প্রথম ধনিক

আমাদের শেঠজিকে ডেকেছেন রাজা।
সবাই আশা করছে, তাঁর হাতেই চলবে রথ।

দ্বিতীয় সৈনিক

সবাই বলতে বোঝায় কাকে বাপু?
আর তারা আশাই বা করে কিসের।

দ্বিতীয় ধনিক

তারা জানে, আজকাল চলছে যা-কিছু
সব ধনপতির হাতেই চলছে।

প্রথম সৈনিক

সত্যি নাকি! এখনই দেখিয়ে দিতে পারি,
তলোয়ার চলে আমাদেরই হাতে।

তৃতীয় ধনিক

তোমাদের হাতখানাকে চালাচ্ছে কে।

প্রথম সৈনিক

চুপ, দুর্বিনীত!

দ্বিতীয় ধনিক

চুপ করব আমরা বটে!

আজ আমাদেরই আওয়াজ ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে
জলে স্থলে আকাশে।

প্রথম সৈনিক

মনে ভাবছ, আমাদের শতঘ্নী ভুলেছে তার বজ্রনাদ!

দ্বিতীয় ধনিক

ভুললে চলবে কেন। তাকে যে আমাদেরই হুকুম
ঘোষণা করতে হয় এক হাট থেকে আরেক হাটে
সমুদ্রের ঘাটে ঘাটে।

প্রথম নাগরিক

ওদের সঙ্গে পারবে না তর্কে।

প্রথম সৈনিক

কী বল, পারব না!
সব চেয়ে বড়ো তর্কটা ঝন্‌ঝন্‌ করছে খাপের মধ্যে।

প্রথম নাগরিক

তোমাদের তলোয়ারগুলোর কোনোটা খায় ওদের নিমক,
কোনোটা খেয়ে বসেছে ওদের ঘুষ।

প্রথম ধনিক

শুনলেম, নর্মদাতীরের বাবাজিকে আনা হয়েছিল।
দড়িতে হাত লাগাবার জন্যে। জান খবর?

দ্বিতীয় ধনিক

জানি বৈকি।

রাজার চর পৌঁছল গুহায়,
তখন প্রভু আছেন চিৎ হয়ে বুকে দুই পা আটকে।
তূরী ভেরী দামামা জগঝম্পের চোটে ধ্যান যদিবা ভাঙল,
পা-দুখানা তখন আড়ষ্ট কাঠ!

নাগরিক

শ্রীচরণের দোষ কী, দাদা!
পঁয়ষট্টি বছরের মধ্যে একবারও নাম করেনি চলাফেরার।
বাবাজি বললেন কী।

দ্বিতীয় ধনিক

কথা কওয়ার বালাই নেই।
জিবটার চাঞ্চল্যের রাগ ক'রে গোড়াতেই সেটা ফেলেছেন কেটে।

ধনিক

তার পরে?

দ্বিতীয় ধনিক

তার পরে দশ জোয়ানে মিলে আনলে তাঁকে রথতলায়।
দড়িতে যেমনি তাঁর হাত পড়া,
রথের চাকা বসে যেতে লাগল মাটির নীচে।

ধনিক

নিজের মনটা যেমন ডুবিয়েছেন
রথটাকেও তেমনি তলিয়ে দেবার চেষ্টা।

দ্বিতীয় ধনিক

একদিন উপবাসেই মানুষের পা চায় না চলতে—
পঁয়ষট্টি বছরের উপবাসের ভার পড়ল চাকার পরে।

মন্ত্রী ও ধনপতির প্রবেশ

ধনপতি

ডাক পড়ল কেন, মন্ত্রীমশায়?

মন্ত্রী

অনর্থপাত হলেই সর্বাগ্রে তোমাকে স্মরণ করি।

ধনপতি

অর্থপাতে যার প্রতিকার, আমার দ্বারা তাই সম্ভব।

মন্ত্রী

মহাকালের রথ চলছে না।

ধনপতি

এ পর্যন্ত আমরা কেবল চাকায় তেল দিয়েছি,
রশিতে টান দিইনি।

মন্ত্রী

অন্য সব শক্তি আজ অর্থহীন,
তোমাদের অর্থবান হাতের পরীক্ষা হোক।

ধনপতি

চেষ্টা করা যাক।
দৈবক্রমে চেষ্টা যদি সফল হয়, অপরাধ নিয়ো না তবে

দলের লোকের প্রতি

বলো সিদ্ধিরস্তু!

সকলে

সিদ্ধিরস্তু!

ধনপতি

লাগো তবে ভাগ্যবানেরা। টান দেও।

ধনিক

রশি তুলতেই পারিনে। বিষম ভারী!

ধনপতি

এসো কোষাধ্যক্ষ, ধরো তুমি কষে।
বলো সিদ্ধিরস্তু। টানো, সিদ্ধিরস্তু!
টানো, সিদ্ধিরস্তু!

দ্বিতীয় ধনিক

মন্ত্রীমশায়, রশিটা যেন আরো আড়ষ্ট হয়ে উঠল,
আর আমাদের হাতে হল যেন পক্ষাঘাত!

সকলে

দুয়ো দুয়ো!

সৈনিক

যাক, আমাদের মানরক্ষা হল।

পুরোহিত

আমাদের ধর্মরক্ষা হল।

সৈনিক

যদি থাকত সেকাল, আজ তোমার মাথা যেত কাটা

ধনপতি

ঐ সোজা কাজটাই জান তোমরা।
মাথা খাটাতে পার না, কাটতেই পার মাথা।
মন্ত্রীমশায়, ভাবছ কী।

মন্ত্রী

ভাবছি, সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল—
এখন উপায় কী।

ধনপতি

এবার উপায় বের করবেন স্বয়ং মহাকাল।
তাঁর নিজের ডাক যেখানে পৌঁছবে
সেখান থেকে বাহন আসবে ছুটে।
আজ যারা চোখে পড়ে না
কাল তারা দেখা দেবে সব চেয়ে বেশি।
ওহে খাতাঞ্চি, এইবেলা সামলাওগে খাতাপত্র—
কোষাধ্যক্ষ, সিন্ধুকগুলো বন্ধ করো শক্ত তালায়।

[ধনপতি ও তার দলের প্রস্থান

মেয়েদের প্রবেশ

প্রথমা

হাঁ গা, রথ চলল না এখনো, দেশসুদ্ধ রইল উপোস করে।

কলিকালে ভক্তি নেই যে।

মন্ত্রী

তোমাদের ভক্তির অভাব কী বাছা,
দেখি-না তার জোর কত।

প্রথমা

নমো নমো,
নমো নমো বাবা দড়ি-ঠাকুর, অন্ত পাইনে তোমার দয়ার।
নমো নমো।

দ্বিতীয়া

তিনকড়ির মা বললে, সতেরো বছরের ব্রাহ্মণের মেয়ে—
ঠিক দুক্ষুর বেলা, বোম ভোলানাথ ব'লে
তালপুকুরে—ঘাটের থেকে তিন হাতের মধ্যে—
একডুবে তিন গোছা পাট-শিয়ালা তুলে
ভিজে চুল দিয়ে বেঁধে দড়ি-প্রভুর কাছে পোড়ালে
প্রভুর টনক নড়বে। জোগাড় করেছি অনেক যত্নে,
সময়ও হয়েছে পোড়াবার।
আগে দড়ি-বাবার গায়ে সিঁদুর চন্দন লাগা।
ভয় কিসের, ভক্তবৎসল তিনি—
মনে মনে শ্রীগুরুর নাম করে গায়ে হাত ঠেকালে
অপরাধ নেবেন না তিনি।

প্রথমা

তুই দে-না ভাই চন্দন লাগিয়ে, আমাকে বলিস কেন।
আমার দেওরপো পেটরোগা,
কী জানি কিসের থেকে কী হয়।

তৃতীয়া

ঐ তো ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে।
কিন্তু জাগলেন না তো!
দয়াময়!
জয় প্রভু, জয় দড়ি-দয়াল প্রভু, মুখ তুলে চাও।
তোমাকে দেব পরিয়ে পঁয়তাল্লিশ ভরির সোনার আংটি—
গড়াতে দিয়েছি বেণী স্যাকরার কাছে।

দ্বিতীয়া

তিন বছর থাকব দাসী হয়ে, ভোগ দেব তিন বেলা।
ওলো বিনি, পাখাটা এনেছিস তো বাতাস কর-না—
দেখছিস্ নে রোদ্দুরে তেতে উঠেছে ওঁর মেঘবরন গা!
ঘটি করে গঙ্গাজলটা ঢেলে দে।
ঐখানকার কাদাটা দে তো ভাই আমার কপালে মাখিয়ে।
ওই তো আমাদের খেঁদি এনেছে খিচুড়ি-ভোগ।
বেলা হয়ে গেল, আহা কত কষ্ট পেলেন প্রভু।
জয় দড়ীশ্বর, জয় মহাদড়ীশ্বর, জয় দেবদেবড়ীশ্বর,
গড় কর তোমায়, টলুক তোমার মন।
মাথা কুটছি তোমার পায়ে, টলুক তোমার মন।
পাখা কর লো; পাখা কর, জোরে জোরে।

প্রথমা

কী হবে গো, কী হবে আমাদের—
দয়া হল না যে! আমার তিন ছেলে বিদেশে,
তারা ভালোয় ভালোয় ফিরলে হয়।

চরের প্রবেশ

মন্ত্রী

বাছারা, এখানে তোমাদের কাজ হল—
এখন ঘরে গিয়ে জপতপ ব্রতনিয়ম করোগে।

আমাদের কাজ আমরা করি।

প্রথমা

যাচ্ছি, কিন্তু দেখো মন্ত্রীবাবা,
ঐ ধোঁয়াটা যেন শেষ পর্যন্ত থাকে—
আর ঐ বিজ্ঞপ্তিপত্রটা যেন পড়ে না যায়।

[মেয়েদের প্রস্থান

চর

মন্ত্রীমশায়, গোল বেধেছে শূদ্রপাড়ায়।

মন্ত্রী

কী হল।

চর

দলে দলে ওরা আসছে ছুটে, বলছে, রথ চালাব আমরা।

সকলে

বলে কী! রশি ছুঁতেই পাবে না।

চর

ঠেকাবে কে তাদের। মারতে মারতে মারতে তলোয়ার যাবে ক্ষয়ে।
মন্ত্রীমশায়, বসে পড়লে যে!

মন্ত্রী

দল বেঁধে আসছে বলে ভয় করি নে—
ভয় হচ্ছে পারবে ওরা।

সৈনিক

বল কী মন্ত্রীমহারাজ, শিলা জলে ভাসবে ?

মন্ত্রী

নীচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়,
বরাবর যা প্রচ্ছন্ন তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তর।

সৈনিক

আদেশ করুন কী করতে হবে, ভয় করি নে আমরা।

মন্ত্রী

ভয় করতেই হবে, তলোয়ারের বেড়া তুলে বন্যা
ঠেকানো যায় না।

চর

এখন কী আদেশ বলুন।

মন্ত্রী

বাধা দিয়ো না ওদের।
বাধা পেলে শক্তি নিজেকে নিজে চিনতে পারে—
চিনতে পারলেই আর ঠেকানো যায় না।

চর

ঐ-যে এসে পড়েছে ওরা।

মন্ত্রী

কিছু কোরো না তোমরা, থাকো স্থির হয়ে।

শূদ্রদলের প্রবেশ

দলপতি

আমরা এলেম বাবার রথ চালাতে।

মন্ত্রী

তোমরাই তো বাবার রথ চালিয়ে আসছ চিরদিন।

দলপতি

এতদিন আমরা পড়তেম রথের চাকার তলায়,
দ'লে গিয়ে ধুলোয় যেতুম চ্যাপটা হয়ে।
এবার সেই বলি তো নিল না বাবা!

মন্ত্রী

ভাই তো দেখলেম।
সকাল থেকে চাকার সামনে ধুলোয় করলে লুটোপুটি—
ভয়ে উপরে তাকালে না, পাছে ঠাকুরের দিকে চোখ পড়ে—
তবু তো চাকার মধ্যে একটুও দেখা গেল না ক্ষুধার লক্ষণ!

পুরোহিত

একেই বলে অগ্নিমান্দ্য,
তেজ ক্ষয় হলেই ঘটে এই দশা।

দলপতি

এবার তিনি ডাক দিয়েছেন তাঁর রশি ধরতে।

পুরোহিত

রশি ধরতে! ভারি বুদ্ধি তোমাদের! জানলে কী করে।

দলপতি

কেমন করে জানা গেল সে তো কেউ জানে না।
ভোরবেলায় উঠেই সবাই বললে সবাইকে,
ডাক দিয়েছেন বাবা। কথাটা ছড়িয়ে গেল পাড়ার পাড়ায়,
পেরিয়ে গেল মাঠ, পেরিয়ে গেল নদী,
পাহাড় ডিঙিয়ে গেল খবর—
ডাক দিয়েছেন বাবা।

সৈনিক

রক্ত দেবার জন্যে।

দলপতি

না, টান দেবার জন্যে।

পুরোহিত

বরাবর সংসার যারা চালায়, রথের রশি তাদেরই হাতে।

দলপতি

সংসার কি তোমরাই চালাও ঠাকুর!

পুরোহিত

স্পর্ধা দেখো একবার! কথার জবাব দিতে শিখেছে—
লাগল ব'লে ব্রহ্মশাপ।

দলপতি

মন্ত্রীমশায়, তোমরাই কি চালাও সংসার।

মন্ত্রী

সে কী কথা সংসার বলতে তো তোমরাই।
নিজগুণেই চল, তাই রক্ষে।
চালাক লোকে বলে আমরাই চালাচ্ছি।
আমরা মান রাখি লোক ভুলিয়ে।

দলপতি

আমরাই তো জোগাই অন্ন, তাই তোমরা বাঁচ;
আমরাই বুনি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জারক্ষা।

সৈনিক

সর্বনাশ! এতদিন মাথা হেঁট করে বলে এসেছে ওরা—
তোমরাই আমাদের অন্নবস্ত্রের মালিক।
আজ ধরেছে উল্টো বুলি, এতো সহ্য হয় না।

মন্ত্রী

সৈনিকের প্রতি

চুপ করো!
সর্দার, মহাকালের বাহন তোমরাই,
তোমরা নারায়ণের গরুড়।
এখন তোমাদের কাজ সাধন করে যাও তোমরা।
তার পরে আসবে আমাদের কাজের পালা।

দলপতি

আয় রে ভাই, লাগাই টান, মরি আর বাঁচি।

মন্ত্রী

কিন্তু বাবা, সাবধানে রাস্তা বাঁচিয়ে চোলো।

বরাবর যে-রাস্তায় রথ চলেছে, যেয়ো সেই রাস্তা ধরে।
পোড়ো না যেন একেবারে আমাদের ঘাড়ের উপর।

দলপতি

কখনো বড়ো রাস্তায় চলতে পাইনি, তাই রাস্তা চিনি নে।
রথে আছেন যিনি তিনিই সামলাবেন।
আয় ভাই, দেখছিস রথচূড়ায় কেতনটা উঠছে দুলে।
বাবার ইশারা। ভয় নেই আর, ভয় নেই।
ঐ চেয়ে দেখ্ রে ভাই,
মরা নদীতে যেমন বান আসে
দড়ির মধ্যে তেমনি প্রাণ এসে পৌঁচেছে।

পুরোহিত

ছুঁলো, ছুঁলো দেখছি, ছুঁলো শেষে, রশি ছুঁলো পাষণ্ডেরা!

মেয়েদের ছুটিয়া প্রবেশ

সকলে

ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, দোহাই বাবা—
ও গদাধর, ও বনমালী, এমন মহাপাপ কোরো না।
পৃথিবী যাবে যে রসাতলে!
আমাদের স্বামী ভাই বোন ছেলে
কাউকে পারব না বাঁচাতে।
চল রে চল দেখলেও পাপ আছে।

[প্রস্থান

পুরোহিত

চোখ বোজো, চোখ বোজো তোমরা।
ভস্ম হয়ে যাবে ক্রুদ্ধ মহাকালের মূর্তি দেখলে।

সৈনিক

একি, একি, চাকার শব্দ নাকি—
না আকাশটা উঠল আর্তনাদ করে?

পুরোহিত

হতেই পারে না—কিছুতেই হতে পারে না—
কোনো শাস্ত্রেই লেখে না।

নাগরিক

নড়েছে রে, নড়েছে ঐ তো চলেছে!

সৈনিক

কী ধুলোই উড়ল—পৃথিবী নিশ্বাস ছাড়ছে।
অন্যায়, ঘোর অন্যায়! রথ শেষে চলল যে—
পাপ, মহাপাপ!

শূদ্রদল

জয় জয়, মহাকালনাথের জয়!

পুরোহিত

তাই তো, এও দেখতে হল চোখে!

সৈনিক

ঠাকুর, তুমিই হুকুম করো, ঠেকাব রথ-চলা।
বৃদ্ধ হয়েছেন মহাকাল, তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ হল—
দেখলেম সেটা স্বচক্ষে।

পুরোহিত

সাহস হয় না হুকুম করতে।
অবশেষে জাত খোয়াতেই বাবার যদি খেয়াল গেল
এবারকার মতো চুপ করে থাকো, রঞ্জুলাল।
আসছে বারে ওঁকে হবেই প্রায়শ্চিত্ত করতে।
হবেই, হবেই, হবেই।
ওঁর দেহ শোধন করতে গঙ্গা যাবে শুকিয়ে।

সৈনিক

গঙ্গার দরকার হবে না।
ঘড়ার ঢাকনার মতো শূদ্রগুলোর মাথা দেব উড়িয়ে,
ঢালব ওদের রক্ত।

নাগরিক

মন্ত্রীমশায়, যাও কোথায়।

মন্ত্রী

যাব ওদের সঙ্গে রশি ধরতে।

সৈনিক

ছি ছি, ওদের হাতে হাত মেলাবে তুমি!

মন্ত্রী

ওরাই যে আজ পেয়েছে কালের প্রসাদ।
স্পষ্টই গেল দেখা, এ মায়া নয়, নয় স্বপ্ন।
এবার থেকে মান রাখতে হবে ওদেরই সঙ্গে সমান হয়ে।

সৈনিক

তাই বলে ওদেরই একসারে রশি ধরা!
ঠেকাবই আমরা, রথ চলুক আর নাই চলুক।

মন্ত্রী

এবার দেখছি চাকার তলায় পড়বার পালা তোমাদেরই।

সৈনিক

সেও ভালো। অনেককাল চণ্ডালের রক্ত শুষে
চাকা আছে অশুচি,
এবার পাবে শুদ্ধ রক্ত। স্বাদ বদল করুক।

পুরোহিত

কী হল মন্ত্রী, এ কোন শনিগ্রহের ভেলকি?
রথটা যে এরই মধ্যে নেমে পড়েছে রাজপথে।
পৃথিবী তবু তো নেমে গেল না রসাতলে!
মাতাল রথ কোথায় পড়ে কোন পল্লীর ঘাড়ে, কে জানে।

সৈনিক

ঐ দেখো, ধনপতির দল আর্তনাদ করে ডাকছে আমাদের।
রথটা একেবারে সোজা চলেছে ভাণ্ডারের মুখে।
যাই ওদের রক্ষা করতে।

মন্ত্রী

নিজেদের রক্ষার কথা ভাবো।
দেখছ না, ঝুঁকেছে তোমাদের অস্ত্রশালার দিকে।

সৈনিক

উপায়?

মন্ত্রী

ওদের সঙ্গে মিলে ধরো-সে রশি।
বাঁচবার দিকে ফিরিয়ে আনো রথটাকে—
দো-মনা করবার সময় নেই।

[প্রস্থান

সৈনিক

কী করবে ঠাকুর, তুমি কী করবে।

পুরোহিত

বীরগণ, তোমরা কী করবে বলো আগে।

সৈনিক

কী করতে হবে বলো-না ভাইসকল!
সবাই যে একেবারে চুপ করে গেছ!
রশি ধরব, না লড়াই করব?
ঠাকুর, তুমি কী করবে বলোই-না।

পুরোহিত

কী জানি, রশি ধরব, না শাস্ত্র আওড়াব?

সৈনিক

গেল, গেল সব। রথের এমন হাঁক শুনিনি কোনো পুরুষে।

দ্বিতীয় সৈনিক

চেয়ে দেখ-না, ওরাই কি টানছে রথ
না রথটা আপনিই চলেছে ওদের *ঠেলে* নিয়ে!

তৃতীয় সৈনিক

এতকাল রথটা চলত যেন স্বপ্নে—
আমরা দিতেম টান আর পিছে পিছে আসত
দড়িবাঁধা গোরুর মতো।
আজ চলেছে জেগে উঠে। বাপ রে, কী তেজ।
মানছে না আমাদের বাপদাদার পথ—
একটা কাঁচা পথে ছুটেছে বুনো মহিষের মতো।
পিঠের উপরে চড়ে বসেছে যম।

দ্বিতীয় সৈনিক

ঐ-যে আসছে কবি, ওকে জিজ্ঞাসা করি ব্যাপারটা কী।

পুরোহিত

পাগলের মতো কথা বলছ তোমরা।
আমরাই বুঝলেম না মানে, বুঝবে কবি ?
ওরা তো বানিয়ে বানিয়ে বলে কথা—শাস্ত্র জানে কী।

কবির প্রবেশ

দ্বিতীয় সৈনিক

এ কী উল্টো-পাল্টা ব্যাপার কবি !
পুরুতের হাতে চলল না রথ, রাজার হাতে না—
মানে বুঝলে কিছু ?

কবি

ওদের মাথা ছিল অত্যন্ত উঁচু,
মহাকালের রথের চূড়ার দিকেই ছিল দৃষ্টি—
নীচের দিকে নামল না চোখ,
রথের দড়িটাকেই করলে তুচ্ছ।
মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাঁধে যে-বাঁধন তাকে ওরা মানে নি।

রাগী বাঁধন আজ উন্মত্ত হয়ে লেজ আছড়াচ্ছে—
দেবে ওদের হাড় গুঁড়িয়ে।

পুরোহিত

তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান—
ওরাই কি দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে।

কবি

পারবে না হয়তো।
একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই
দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে—
জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের।
তখন এঁরাই হবেন বলরামের চেলা—
হলধরের মাতলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।

পুরোহিত

তখন যদি রথ আর-একবার অচল হয়
বোধ করি তোমার মতো কবিরই ডাক পড়বে—
তিনি ফুঁ দিয়ে ঘোরাবেন চাকা।

কবি

নিতান্ত ঠাট্টা নয়, পুরুতঠাকুর!
রথযাত্রায় কবির ডাক পড়েছে বারে বারে।
কাজের লোকের ভিড় ঠেলে পারেনি সে পৌঁছতে।

পুরোহিত

রথ তারা চালাবে কিসের জোরে। বুঝিয়ে বলো।

কবি

গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে।

আমরা মানি ছন্দ, জানি একঝোঁকা হলেই তাল কাটে।
মরে মানুষ সেই অসুন্দরের হাতে
চাল-চলন যার একপাশে বাঁকা ;
কুম্ভকর্ণের মতো গড়ন যার বেমানান,
যার ভোজন কুৎসিত,
যার ওজন অপরিমিত।
আমরা মানি সুন্দরকে। তোমরা মান কঠোরকে—
অস্ত্রের কঠোরকে, শাস্ত্রের কঠোরকে।
বাইরে ঠেলা-মারার উপর বিশ্বাস,
অন্তরের তালমানের উপর নয়।

সৈনিক

তুমি তো লম্বা উপদেশ দিয়ে চললে,
ওদিকে যে লাগল আগুন।

কবি

যুগাবসানে লাগেই তো আগুন।
যা ছাই হবার তাই ছাই হয়,
যা টিঁকে যায় তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নবযুগের।

সৈনিক

তুমি কী করবে, কবি!

কবি

আমি তাল রেখে রেখে গান গাব।

সৈনিক

কী হবে তার ফল।

কবি

যারা টানছে রথ তারা পা ফেলবে তালে তালে।

পা যখন হয় বেতালা
তখন খুদে খুদে খালখন্দগুলো মারমূর্তি ধরে।
মাতালের কাছে রাজপথও হয়ে ওঠে বন্ধুর।

মেয়েদের প্রবেশ

প্রথমা

এ হল কী ঠাকুর!
তোমরা এতদিন আমাদের কী শিখিয়েছিলে।
দেবতা মানলে না পুজো, ভক্তি হল মিছে।
মানলে কিনা শুদ্দুরের টান, মেলেচ্ছের ছোঁওয়া!
ছি ছি, কী ঘেন্না।

কবি

পুজো তোমরা দিলে কোথায়।

দ্বিতীয়া

এই তো এইখানেই।
ঘি ঢেলেছি, দুধ ঢেলেছি, ঢেলেছি গঙ্গাজল—
রাস্তা এখনো কাদা হয়ে আছে।
পাতায় ফুলে ওখানটা গেছে পিছল হয়ে।

কবি

পুজো পড়েছে ধুলোয়, ভক্তি করেছ মাটি।
রথের দড়ি কি পড়ে থাকে বাইরে।
সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা; দেহে দেহে প্রাণে প্রাণে।
সেইখানে জমেছে অপরাধ, বাঁধন হয়েছে দুর্বল।

তৃতীয়া

আর ওরা—যাদের নাম করতে নেই?

কবি

ওদের দিকেই ঠাকুর পাশ ফিরলেন—
নইলে ছন্দ মেলে না। একদিকটা উঁচু হয়েছিল অতিশয় বেশি,
ঠাকুর নীচে দাঁড়ালেন ছোটোর দিকে,
সেইখান থেকে মারলেন টান, বড়োটাকে দিলেন কাত করে।
সমান করে নিলেন তাঁর আসনটা।

প্রথমা

তার পরে হবে কী।

কবি

তার পরে কোন্-এক যুগে কোন্-একদিন
আসবে উল্টোরথের পালা।
তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া।
এইবেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন—
রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলো না;
রাস্তাটাকে ভক্তিরসে দিয়ো না কাদা করে—
আজকের মতো বলো সবাই মিলে—
যারা এতদিন মরেছিল তারা উঠুক বেঁচে,
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে
তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী

জয়, মহাকালনাথের জয়!

চৌর্যানন্দ

তুলসী লাহিড়ী

চরিত্রলিপি

হরিভাবিনী
উগ্রকণ্ঠ
বাণীকণ্ঠ
গৃহিণী
১ম যুবক
২য় যুবক
চোর

[গভীর রাত। নিজের ঘরে একটা চৌকির উপর উগ্রকণ্ঠবাবু মগ্ন। নাসিকা গর্জনের সঙ্গে বাইরে কয়েকটা কুকুরের একটানা ঘেউ ঘেউ ডাকে, বেশ একটা সুর ও ছন্দের সামঞ্জস্য হয়েছে। তাঁর স্ত্রী হরিভাবিনী ঘুম ভেঙে যাওয়ায় উঠে, ঘরের আলো নিভে গেছে দেখে, সভয়ে স্বামীকে ধাক্কা দিয়ে]

হরি। ওগো ওঠ ত।

[নাকের ডাক বন্ধ হল। ঘুম জড়ানো কণ্ঠে উগ্রকণ্ঠ]

উগ্র। আঃ! ঠ্যাল ক্যান্?

হরি। বাত্তি নিভা গেছে গো।

উগ্র। ত্যাল ভর্‌তে ভুইল্যা গ্যাছ—বাতি নিব্‌ব না?

হরি। না গো। বোধ হয় ঘরে চোর ঢোকছে।

উগ্র [বিরক্ত]। চোর ঢোকছে না ইসে ঢোকছে। চুপ কইরা ঘুমাও। ত্যক্ত কইরো না।

[পাশ ফিরে শুল]

হরি। আমার গলার মালায় টান দিচিছল। চ্যাতন হইতেই ধুপ ধুপ কইরা সইরা গেল। আমি ঘুইরা ব্যারানের পায়ের শব্দ শুনছি।

উগ্র। কি কও তার ঠিক নাই। এইটা কি বুরিগঙ্গার পার? যে মানুষ হাওয়া খাইতে ঘুইরা ব্যারাইব।

হরি। আমার মালায় টান দিছিল যে।

উগ্র। দুত্তরি না ঘণ্টা! স্বপন দ্যাখছ—বোঝলা তুমি স্বপন দ্যাখছ। 'দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দ।' হরিনাম কর। হরির নাম কর।

হরি। আমার আন্ধারে বর ভয় করে গো।

উগ্র [বিরক্ত]। ভয়! যুয়ান মর্দটা ঘরে শুইয়া, তবু ভয়! তোমাগো মত মাইয়ারাই এ দ্যাশের সর্বনাশ করছে। জুজুর ভয়ে বাঙালির কপাল পোরছে। মাতৃদোষে রাবণ রাইক্ষস, তা কি জান? ভয় করে ত বাত্তি জ্বাল না কিয়ের লাইগা।

[হরিভাবিনী স্বামীর তাড়নায় ব্যথিত হয়ে উঠে বাতি জ্বালতে জ্বালতে বলতে লাগল]

হরি। আইচ্ছা। যা মন লয় তাই কও। ঘরে চোর ঢুইকা ফর্‌ফরাইয়া ঘোরে—গলার মালা ধইরা টানে—তুমি সোয়ামী, তোমারে কইলাম—আর তুমি কও মাতৃদোষে রাবণ রাইক্ষস! কও—কওনের অধিকার পাইছ কও। মাইয়া মানুষের কপালের দোষ ত। কাপর চোপর বাসন পত্তর যা আছে সব লইয়া যাউক। আমার কি? বাত্তি ত জ্বালছি, এইটা লইয়া ঘরের কোণা কাঞ্চি একটু দ্যাখবা?

উগ্র [অত্যন্ত রেগে চিৎকার করে উঠল]। বক্তৃতা বন্ধ কর ত! কি বিপদরে মশয়! এ দ্যাশে রাইতে ঘরে শুইয়াও ত শান্তি নাই। হক্কালে উইঠা কাগজে বক্তৃতা পর—কাজে যাইয়া উপরিওয়ালাগো বক্তৃতা শোন—ব্যারাইতে যাইয়া—পার্কে পার্কে, রাস্তার মোরে মোরে, চায়ের দোকানে যেখানে যাও হেখানেই বক্তৃতা। বারিতে বাপ মায়ের বক্তৃতা—রাইতে শুইয়া পরিবারের বক্তৃতা। এ জীবন তিক্ত হইয়া

গেল। দ্যাখ! চুপ কইরা শোও ত। আবার যদি ব্যাজর ব্যাজর কর, তা হইলে উইঠ্যা হাইট্যা ম্যালা করুম। একেবারে নিমাই সন্ন্যাস। চিরকালের লাইগা দ্যাশ ত্যাগ।

হরি। ওঃ! কি আমার নিমাই চৈতন্য রে! উইঠা কোণা কাঞ্চি দ্যাখ।

উগ্র। আমি পারুম না। দ্যাখতে হয় নিজে দ্যাখ গিয়া।

[কয়েক মুহূর্ত স্বামীর দিকে কটমটিয়ে চেয়ে থেকে, যেই লণ্ঠন নিয়ে হরিভাবিনী ঘরের যে কোণায় আলমারি আছে সেই দিকে অগ্রসর হল, অমনি আলমারির আড়াল থেকে চোরটি একটি সুটকেশ হাতে ভেজান দরজা খুলে বাইরে গেল। হরিভাবিনী চমকে এক লাফে স্বামীর কাছে ফিরে এসে উচ্চকণ্ঠে চেঁচিয়ে]

হরি। ঐ দ্যাখ চোর। আমার সুটকেশ লইয়া গেল। মা-মা বাবারে লইয়া আউগান—ঘরে ঢোকছে।

[বাহির নেপথ্যে স্ত্রী-পুরুষের মিলিত কণ্ঠে উত্তর এল—'ভয় নাই—বৌমা—ভয় নাই—দাও দেখি লাঠিটা'। ঘরে উগ্রকণ্ঠ উঠে তক্তপোষ থেকে নেমে হরিভাবিনীকে জড়িয়ে ধরে চেঁচাতে লাগল]

উগ্র। আঃ! আমারে ছাইড়া দ্যাও না ক্যান। হালা চোরেরে আমি খুন করুম—কাইট্যা ফ্যালামু—ছার ছার।

হরি। আমি ত তোমারে ধরি নাই।

উগ্র। পাঁঠা বলির পাঁঠার মত পাছরাইয়া ধরছ—আবার কও ধরি নাই—ছার ছার—রাম দাও দিয়া চোর হালারে আমি ছ্যাদন করুম—ছার—

হরি। তুমিই ত আমারে জরাইয়া ধরছ দেখি—আবার কও ছার—ছার!

[উগ্রকণ্ঠের পিতা বাণীকণ্ঠ খড়ম পায়ে খটখট করতে করতে—লাঠি ঠুকতে ঠুকতে ঘরে এল, সঙ্গে লণ্ঠন নিয়ে গৃহিণীও এল]

বাণী। কি হইছে উগ্রকণ্ঠ? চিৎকার করস কিয়ের লাইগা?

উগ্র [বিনীত]। আইজ্ঞা এক ব্যাটা চোর ঘরে ঢুইগা?

বাণী। চোর! চোর ঘরে ঢোকে ক্যান?

গৃহিণী। চোর চুরি করতে ঢোকে কিয়ের লাইগা ঢোকব।

বাণী [ধমকে]। থাম! যা বোঝনা, তা লইয়া কথা কইও না। তুমি যেমুন মা—পোলাও তোমার তেমনি হইব ত?

গৃহিণী [বিরক্ত হয়ে ঝাঁকি দিয়ে]। আহা! ঘরে চোর ঢোকছে আর পোলার মা আর পোলার দোষ হইল বুঝি।

বাণী। হইল। নিশ্চয় হইল। বোঝলা—চোরে ট্যার পাইছে যে পোলা তোমার সজাগ না—আর আত্মরক্ষায় অক্ষম। কই আমার ঘরে ত চোর ঢোকে নাই কখনও। ঢোকছে? ক দেখি পোরা কপাইলা।

উগ্র [সবিনয়ে]। আইজ্ঞা না, শুনিও নাই কখনও।

বাণী। ক দেখি ক্যান চোর ঢোকে নাই?

গৃহিণী। আহা! ঘরে তোমার কি আছে? কি আশায় চোর আইব?

বাণী। আবার বোকার মত কথা কও! জান? চোরে জানে যে বাণীকণ্ঠ সিকদারের

ঘরে ঢোকন, আর সাইক্ষাৎ শমনের ঘরে ঢোকন, একই কথা। সারা জীবন দাপটে কাটাইছি মর্দের মত। কোনো হালায়ও কইতে পারেনা যে বাণীকণ্ঠ কোনো দিন ডয়ের ধার ধারছে। মাস্টারি করছি, দাপটে স্কুলের ছাত্ররা কাপছে। রাস্তা দিয়া হাইটা গেছি গেন্দের গুণ্ডা বদমাইস কাপছে। বারি আইলে তর গর্ভধারিণী কাপছে। সকলে কইত বাণীকণ্ঠ সিংহরাশি পুরুষ। আমার পোলা তুই—তুই হইছস শিবা। না আছে বীর্য, না আছে গর্জন। হইব না? মাটির দোষ ত।

[উগ্রকণ্ঠের মা আপত্তি জানাতে সুর চড়িয়ে বলল]

গৃহিণী। দ্যাখ! মাটির দোষ কইও না। বীজের দোষ।

বাণী। কি!

গৃহিণী। কি আবার! তোমারে চেনতে আর বাকি নাই। খালি বাক্যবীর। কও দেখি পোলা আমার কি দোষ করছে?

বাণী। আবার কয় কি দোষ করছে! গর্দভে খালি চিৎকার করছে। চোর ঘরে ঢোকছে তারে ধইরা কাইট্যা ফালায় নাই ক্যান? কাপুরুষ বীর্যহীন জরদগব।

উগ্র। আইজ্ঞা আমি ভাবলাম—

বাণী। কি ভাবলি হেই কথা জিগাই নাই। চোর ধরলি না ক্যান হেই কথা জিগাই।

উগ্র। বাবা! আপনার পায়ে পরি—আপনে মিছা রাগ কইরেন না। দ্যাখেন—চোর ধরলে চোরের চাইয়া বিপদের ভয় আমাগোই বেশি।

বাণী। কি!

উগ্র। আপনে ত জানেন—আইজকালকার চোরগ লগে কত রকম অস্ত্র শস্ত্র থাকে—বোমা পিস্তল—ছোরা চাকু—আমাগো মত সাধারণ লোকের ত কোনো অস্ত্র নাই।

বাণী। ক্যান রাম দাও?

উগ্র। হেও ত আপনার ঘরে।

গৃহিণী। বোঝলা গো। হেই সব চিন্তা কইরা বৌমায় আমার কণ্ঠরে ধইরা রাখছে। লক্ষ্মী বৌ আমার—সোনা ত—ধন ত।

হরি। না মা। আমি তারে মোটেও ধরি নাই। হেই আমারে নি জাপটাইয়া ধইরা, ছাইরা দ্যাও বইলা চেচাইছে।

বাণী। উঃ! কি কাপুরুষ রে মশয়! দূর—দূর—দূর হইয়া যা আমার সম্মুখ থাইকা। তুই আমার পুত্র না তুই—আমার ইসে।

উগ্র। আপনে অন্যায় রাগ করতেছেন কিন্তু।

বাণী। অন্যায় রাগ?

উগ্র। অন্যায়ই ত। অন্য উপায় নাই তাই কৌশল কইরা চোর তারাইছি।

বাণী। দ্যাখ—দ্যাখ পোলার মা—হারামজাদা কি নির্লজ্জ! আবার কয় কৌশল কইরা তারাইছে!

উগ্র। কৌশল করা ছারা উপায় কি? চোর ধরতে গেলে বিপদ—ধরলে বিপদ।

বাণী। এই বলদে কয় কি! কিসের বিপদ?

উগ্র। এক নম্বর, চাকু খাইয়া জখম হওনের ডয়। দুই নম্বর, ধইরা থানায় দিলে

পুলিসের জ্যারা আর তদন্তের দাপটে প্রাণান্ত। তিন নম্বর মামলার সময় হয়রানি। আপনে বুইঝা দ্যাখেন।

[বাণীকণ্ঠ চুপ করে আছে দেখে গৃহিণী ব্যঙ্গ করে বলল]

গৃহিণী। কি গো? বাক্য বন্ধ হইল ক্যান? এখন আর মাটির দোষ কইবা না?

বাণী। নিশ্চয়ই কমু। মাটিরই দোষ। এই পোরা কপাইলা—বিধির বারণ ভয়ে অন্যায়েরে আস্কারা দিছে—চোরেরে প্রশ্রয় দিছে।

উগ্র। আইজ্ঞা ভয়ে না। বিচার বুদ্ধি আছে তাই কৌশল কইরা আত্মরক্ষা করছি।

বাণী। আবার কয় বিচার বুদ্ধি!

উগ্র। দ্যাশ কাল পাত্র বিবেচনা কইরা জ্ঞানীরা মাইনষেরে চলতে কন। তারাই কইয়া গেছেন 'যস্মিন দ্যাশে যদাচার, কাছা খুইলা নদী পার'।

বাণী। আরে! নদী! নদী আইল কইখনে।

উগ্র। দ্যাখেন না সর্বসাধারণ আমরা বিপদের নদীতে পইরা হাবু ডুবু খাইতেছি। সার্বজনীন প্রবঞ্চক আর চোরেরা নানা কায়দায় নাও পাইয়া, বাহার দিয়া দিকে দিকে ছল্লিবল্লি কইরা ঘোরে। সাধারণ লোকের কাছা খোলন ছারা পার হওনের উপায় কি?

বাণী। হঃ বর চালাক হইছস তরা না? চোরেরে বুঝি জ্যালে দ্যাওন যায় না?

উগ্র। আইনের চক্ষে তারা নিরপরাধ। সাক্ষী প্রমাণ দিয়া নিঃসন্দেহ ভাবে তারে অপরাধী সাব্যস্ত করন লাগব। যদি না পারি হয়রানি প্যারাসিনি এসব ত আমাগোই হইব। চোরের কি কচু হইব।

বাণী। ক্যান? এ দ্যাশে চোরের জ্যাল হয় না?

উগ্র। হয়। কালে ভদ্রে হয়। কিন্তু হইলেই বা চোরের কি ঘন্টা? আইজ কাল জ্যালে কত সুবন্দোবস্ত তাগো লাইগা। এ রাইজ্যে শতকরা নব্বই জনের চাইয়া চোর-বদমায়েস-খুনী-ডাকাইত জ্যালে সুখে থাকে।

বাণী। কি!!

উগ্র। বিনা ভারায় পাকাবারিতে তাগো সুখে বাস—তারপর ভুরি ভোজনের পরেও, চা সিগ্রেট মায় হাতখরচা, তাগো মন চাঙ্গা করনের জন্য, ভাল ভাল শিল্পী লইয়া নাচগান শোনানোর বন্দোবস্ত হইছে। তার উপর ধর্ম কর্মের জন্য ছুটিও মঞ্জুর হইল। তারা ধর্মের নামে ছুটি লইয়া বাহার দিয়া ফুর্তি কইরা দোস্ত গ লগে ঘুইরা আবার জ্যালে ফিরা যাইব। খালাস হইলে বর বর লোকের সমাজে দাপটে ঘুইরা বেরাইব বোঝলেন?

বাণী। কি বুঝুম? অনাচারের জন্য চোরগ প্রশ্রয় দিয়া আমাগো চোর হইয়া থাকন লাগব নাকি?

উগ্র। তা ছারা উপায় নাই। যস্মিন দ্যাশে যদাচার।

বাণী। থাম কুষ্মাণ্ড! বোঝলা পোলার মা আমি স্বীকার গেলাম—মাটির দোষ না বীজেরই দোষ। কিন্তু বাঘের বাচ্চা মেকুর হয় কেমন কইরা, হেইটা বুঝি না।

গৃহিণী। মেকুর হইল ত কি হইল। তোমাগো মত দাপায় না। ওরা কত কৌশল শিখছে।

বাণী। অতি চালাকের যা হয় অগ তাই হইব। এই আমি কইয়া গেলাম। বীজের দোষ!

[বাইরে দূরে একটা কলরব শোনা গেল। পল্লীরক্ষীর দল চোর ধরেছে। সুটকেসে নাম লেখা দেখে এই বাড়ির মাল বুঝতে পেরে চোরকে টেনে হিচড়ে আনতে আনতে চেঁচাতে লাগল। 'উগ্রদা চোর ধরেছি—বামাল শুদ্ধু।']

বাণী। এইখান আন দেখি হালারে।

[চোরকে নিয়ে ২/৩ জন যুবক ঘরে ঢুকল]

১ম যুবক। ব্যাটা ঘাপটি মেরে গাছের ছায়ায় দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ছিল। ব্যস ঘপ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। সুটকেসে নাম লেখা দেখে হিড়হিড় করে টেনে আনলুম।

চোর। হাত ছাড়ুন মশাই। লাগছে।

বাণী। হালা চোর আবার চোপা করস। তরে পিটাইয়া শ্যাষ করুম।

চোর। খবরদার! নিজের হাতে আইন নেবার কোনো অধিকার নেই জানেন?

উগ্র। ঐ শোনেন বাবা। চোরেও আইন দ্যাখায়।

২য় যুবক। আইন দেখাচ্ছি দেখুন না।

[হাত মুচড়ে দিতেই চোর চেঁচিয়ে উঠল]

চোর। উঃ! হাত মোচড়াবেন না। মাইরি লাগছে।

বাণী। লাগবই ত। তরে মনের সুখে পিটাইয়া শ্যাষে পুলিসে দিমু।

চোর। মারলে ভাল হবে না বলছি। একটা কথা আগে শুনুন।

বাণী। চোরের কথা আবার শোনে কে?

চোর। নিত্য কত বড় বড় চোরের বড় বড় কথা শুনছেন ত। সত্যি আপনাদের ভালর জন্যই বলছি। শুনুন।

১ম যুবক। জ্যাঠামশাই—কি বলে শোনাই যাক না।

২য় যুবক। ধরেছি যখন পালাতে ত আর পারবে না।

চোর। পালাতে চাইলে অমন চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকতুম বুঝি? পালাতে আমি চাই না মশাই।

উগ্র। পলাইতে চাইলে পলাইতে দিলাম আর কি? হালা চোর—

[ঘুঁষি মারল]

চোর। মারছেন? বিপদে পড়বেন বলছি।

উগ্র। কি বিপদ? কিসের বিপদ? বিপদ দ্যাখায় হালা—

চোর। দেখুন মারধর করে পুলিসে দিলে আমি পাল্টা চার্জ করব।

উগ্র। কি চার্জ করবিরে হালা?

চোর। সে কথা বলব কেন? চোরেদের অত বোকা ভাবেন কেন?

উগ্র। তর চালাকির শ্যাষ করুম। লাঠিটা দ্যান ত বাবা।

[উগ্রকণ্ঠ লাঠি নিতেই, চোর দু'পা পিছিয়ে গিয়ে]

চোর। কি বাঙালে গোঁ দেখছেন। নিজেদের সর্বনাশ করেও শিক্ষা হল না।

বাণী। থাম উগ্রকণ্ঠ। এই চোর দেখি জ্ঞানের কথা কয়।

চোর। জ্ঞানেন? জ্ঞানী বিজ্ঞানী সব এখন আমাদের দলে—বিজ্ঞানীরা জাল ভ্যাজাল ছড়াচ্ছে আর জ্ঞানীরা বুলি আর বুকনির ভ্যাজাল চালাচ্ছে

১ম যুবক ও ২য় যুবক। ব্যাটা বলছে মন্দ নয়।

চোর। আমি মশাই ভাল কথাই বলছি শুনুন। ঘরের এস্টেট পত্তর যা দেখছি—আর সুটকেসে শাড়ি কাপড়ের যা ছিরি, তাতে অবস্থা যে বিশেষ ভাল নয় তা ত বোঝা গেল।

বাণী। আগে বুঝতে পারস নাই বুঝি?

চোর। মাইরি পারিনি মশাই। মুজুরী পোষাবে না জানলে কে এত ঝামেলা করে। আজকাল আমাদের অনেকেরই ভুল হচ্ছে। গিলটিতে বাজার ছেয়ে গেছে। সে দিন সিল্কি পাঞ্জাবির বহর দেখে পাকিটে হাত দিয়ে দেখি আধ পোড়া সিগ্রেট আর দুটো ফুটো পসা।

১ম। সত্যি খালি foreign policy-র আড়ম্বর। ঘরে চুটরি পড়লে রাম রাম।

উগ্র। এইটা আবার কি কথা।

১ম। নেংটি ইঁদুর চাল থেকে খাবার আশায় লাফিয়ে পড়ে হাঁড়ি ঠন ঠন দেখে—রাম রাম করে আবার একলাফে চালে উঠে গেল।

[সকলে হেসে উঠল]

চোর। যা বলেছেন। তাই বলছি মিছে থানা পুলিশ করে—কেন ঝামেলা বাড়াবেন। অবস্থায় কুলোবে না।

বাণী। তাই বইলা চোরেরে আস্কারা দিতে হইব নাকি?

চোর। দিতে হবে বৈকি। জেনে শুনে বুঝে সুঝেও হরদম দিচ্ছেন ত। দেখুন বুড়ো কত্তা—আমাদের পার্টি আছে, দল আছে। আইন ফাঁকি দিয়ে পেকে ঝানু হয়েছে এমন সব জাদরেল ভুঁড়েল উকিল লাগাব। তারা সাক্ষীর কাঠগড়ায় তুলে জেরার চোটে আপনার বাপের নাম ভুলিয়ে দেবে। তাছাড়া আমলা পেশকার আরদালি চাপরাসি সরকারী লোকদের পাওনা আমরা যা দেব তা দিতে পারবেন? তদ্বিরের হ্যাপা সামলাতে খোরাকির টাকা কটি ফুটকড়াই হয়ে যাবে। ঐ মা লক্ষ্মীর গলার মালাটি, যেটি হাত দিয়ে নিতে পারিনি—শেষ পর্যন্ত ঐটি বেচতে হবে।

উগ্র। হয় হইব। তরে ত শিক্ষা দিমু। আমার পরিবারের মালা দরকার হয় আমি বেচুম।

হরি [শাশুড়ীকে]। দ্যাখেন ত। আমার বাপের বারির দেওয়া মালা হে ব্যাচতে চায়।

গৃহিণী [ধমক দিয়ে]। তুমি চুপ করত বৌমা।

হরি [গলা চড়িয়ে]। ক্যান? চুপ করুম ক্যান? ভাইয়ে এই মালা দিছে। এই সংসারে দাসী বাঁদীর মত পাচ বৎসর খাইটাও ত কিছু পাই নাই।

উগ্র [গর্জন করে]। আঃ! চুপ করলা।
হরি। হঁ! অসারের তর্জন গর্জন সার। ভাইয়ে কত কষ্ট কইরা উপরি ঘুষ লইয়া হেই টাকায় এই মালা আমারে দিছে। এ মালা আমি কিছুতে বেচুম না। মা আপনে বাবারে কন।
বাণী। আর কইতে হইব না। আমি হক্কল শুনছি।
চোর। ব্যস তবে আর কি! দেখছেন ত বুড়ো কত্তা আমরা সবাই এক নাগরদোলায় দুলছি।
উগ্র। হঃ তরে ভাল মতে দোলামু। তরে থানায় নিয়া পুলিসের জিম্মায় দিয়া শ্যাষে যা হয় হইব। চলত ভাই ব্যাটারে লইয়া যাই।
বাণী। এই উগ্রকণ্ঠ। দ্যাখ তুই আর থানায় না গেলি। যারা চোর ধরছে তারাই থানায় দিয়া আসুক।
চোর। নিয়ে চলুক না থানায়। সেখানে বলব যে বৌমনি ঐ সুটকেস নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি দেখে ফেলতেই ওটা ফেলে দিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়লেন। এই বাবুরা ঐখানে দাঁড়িয়ে ছেল। নিজেদের দোষ ঢাকতে আমায় ধরে চোর চোর বলে চ্যাঁচাতে সুরু করে।
উগ্র। ব্যাটা মিথ্যাবাদী, তরে মাইরা ফ্যালামু।
বাণী। থাম। দাপাইস না।
উগ্র। ক্যান? ব্যাটা এত বড় মিথ্যা কথা কয়।
১ম। জলজ্যান্ত সিঁধ কাটা রয়েছে।
চোর। ওটা আমায় ফাঁসাতে আপনারা কেটেছেন মশাই।
১ম। কি! চল ব্যাটা থানায় চল।
২য়। দাঁড়া। আমাদের ও সব হাঙ্গামায় জড়িয়ে কাজ নেই ভাই। রাত জেগে পাড়া পাহারা দিচ্ছি তাতেই বৌ সন্দেহ করছে। এ সব কথা কানে গেলে জ্বান কয়লা করে দেবে। ঘরের ছেলে ঘরে যাই বাবা। অত ঝামেলায় কে যাবে। চল—
১ম। যা ব্যাটা বেঁচে গেলি।
চোর। বাঁচলেন ত আপনারা। জেল ত আমাদের ঘর বাড়ি। জেল হয় জয়হিন্দ বলে ঢুকে পড়ব।
২য়। চল চল বাড়ি যাই। ব্যাটা কে রে?
[যুবকরা চলে গেল]
চোর। তাহলে আমিও আসি মশাই, নমস্কার।
উগ্র। দাড়া ব্যাটা শয়তান।
বাণী [বাধা দিয়ে]। থাম। যত হাঙ্গামা। সাধ কইরা আমাগো মধ্যে যাওন দিয়া কাম কি? খুব হইল, অখন বারি যাও।
চোর। নমস্কার। ধন্যবাদ।
[চোর হাসি মুখে চলে গেল]

বাণী। যুগটা কি পরছে বোঝলানি পোলার মা।

উগ্র। আমি ত আগেই কইছিলাম।

বাণী। হঃ! কারো দোষ নাই, এটা যুগের দোষ। বোঝলা গো।

গৃহিণী। বুইঝা আর করুম কি? তুমিইত মাটির দোষ বীজের দোষ কইয়া দাপাও। চল—ঘরে চল।

বাণী। চল। কিন্তু করুন কি?

উগ্র। যস্মিন দ্যাশে যদাচার কাছা খুইলা—

বাণী। থাম। বোঝলা গিন্নী ঘোর দুশ্চিন্তার কথা। ভালমানুষের বাচনের উপায় কি?

উগ্র। কৌশল।

বাণী। পোরা কপাইলা বলদ, ভগ চাইয়া চোর যারা তাগো কৌশল যে অনেক বেশি, হেইটা নি বোঝস। দেখলি না আমাগো কলা দ্যাখাইয়া চইলা গেল। মনে হয় একটা উপায় আছে।

গৃহিণী। কি উপায় গো?

বাণী। ঐ চোরেগো দলে ভিরা যাওন। চল দেখি সেই ঘরে যাইয়া শুইয়া শুইয়া হেই চিন্তা করি।

গৃহিণী। এইটা ভালই ভাবছ। চল ঘরে চল—

[বাণীকণ্ঠ ও গৃহিণী তাদের ঘরে গেল। উগ্রকণ্ঠ সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। হরিভাবিনী তার কাছে এসে মোলায়েম সুরে]

হরি। তুমিও তাই কর গো।

উগ্র। কি?

হরি। বাবা কইয়া গেলেন শুনলা না। তুমিও চোরের দলে ভিরা পর। দুই একখানা সোনাদানা গায়ে উঠব।

উগ্র। ভিরা পর বললেই হইল না? ভিরুম ক্যামন কইরা।

হরি। তুমি ত কত কৌশল জান। চল শুইয়া শুইয়া হেই চিন্তা কর। আমি তোমার চরণ স্যাবা কইরা দিমু। চল হরির নাম কইরা শুইবা চল।

উগ্র। হঃ। চৌর্যানন্দে হরি বল, হরি।

হরি [হাসি মুখে]। হরি বল হরি।

[উগ্রকণ্ঠের হাত ধরে বিছানার দিকে নিয়ে চলল]

বিদ্যুৎপর্ণা

মন্মথ রায়

চরিত্রলিপি

ইন্দ্রজিৎ	পুরোহিত পুত্র
বিদ্যুপর্ণা	পুরেহিতের বালিকা কন্যা
পুরোহিত	
রাজা	

[দৃশ্যঃ নাটমন্দির। দেবদাসীগণের সন্ধ্যারতির নৃত্যগীত। নৃত্যগীত শেষ হইয়া আসিতেছে, ধীরে ধীরে তাহাদের সম্মুখে দুই পার্শ্ব হইতে দুইখানি কৃষ্ণ যবনিকা পড়িয়া তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিতে যাইবে, এমন সময়, দ্বিতলের অলিন্দ হইতে মন্দির-পুরোহিতের উত্তরাধিকারী প্রিয়তম শিষ্য ইন্দ্রজিৎ সোপান-পথে ছুটিয়া নিম্নে আসিয়া সেই যবনিকা দুইখানি দুই হাতে ধরিয়া, বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন রাখিয়া, আবেগপূর্ণ-কণ্ঠে ডাকিলেন 'বিদ্যুৎপর্ণা! বিদ্যুৎপর্ণা!']—

ইন্দ্রজিৎ। বিদ্যুৎপর্ণা! বিদ্যুৎপর্ণা!

বিদ্যুৎপর্ণা। [অন্তরাল হইতেই]। না!...না!...না!

ইন্দ্রজিৎ। একটি কথা! একরত্তি একটি কথা! দাঁড়াও...শোন...

বিদ্যুৎপর্ণা। হয় না! হয় না!...এখন নয়, এখন নয়!

ইন্দ্রজিৎ। কখন? কখন?

বিদ্যুৎপর্ণা। ইঁদুর যখন সাপ ধরবে তখন! [অট্টহাস্য] হাঃ হাঃ হাঃ

[পূর্বোক্ত সোপান-পথে পুরোহিত ত্বরিৎ-পদে নামিয়া আসিয়া ইন্দ্রজিৎ-হস্তধৃত যবনিকাপ্রান্ত-দ্বয় মুক্ত করিয়া দিয়া ইন্দ্রজিৎকে মুখোমুখি দাঁড় করাইলেন]

পুরোহিত। ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিৎ। (অপরাধীর মতো চমকিয়া উঠিয়া, পরে সংযতভাবে মাথা নিচু করিয়া)। পিতা!

পুরোহিত। এই বার বার তিনবার আমার উপদেশ—আমার আদেশ—তুমি লঙ্ঘন করলে!...করলে কি না বল!

[ইন্দ্রজিৎ নতমুখে নীরব রহিলেন]

পুরোহিত। আমার আদেশ ছিল তুমি পাতাল-গুহায় নির্জনে একমনে তিনমাস যোগাভ্যাস করবে। কিন্তু, তার প্রথম তিন দিনেই তুমি তিনবার তোমার আসন ত্যাগ করে ছুটে এসেছ ঐ কালনাগিনীর পাশে!

[ইন্দ্রজিৎ নতমুখে নীরবই রহিলেন]

পুরোহিত। আমার আদেশ লঙ্ঘন করলে তার শাস্তি কি জান?

[ইন্দ্রজিৎ তথাপি নীরব রহিলেন]

পুরোহিত। নীরব কেন? উত্তর দাও! আমার আদেশ লঙ্ঘন করলে তার শাস্তি কি?

ইন্দ্রজিৎ। প্রাণদণ্ড।

পুরোহিত। আমি কিভাবে সে প্রাণদণ্ড প্রয়োগ করে থাকি?

ইন্দ্রজিৎ। ক্ষুধিত সর্পের দংশনে অপরাধীর মৃত্যু-ব্যবস্থা হয়।

পুরোহিত। এখন?

ইন্দ্রজিৎ। আমার আপত্তি নেই।আমি প্রস্তুত তবে...

পুরোহিত। তবে?

ইন্দ্রজিৎ। তবে মৃত্যুর পূর্বে একটি প্রার্থনা!

পুরোহিত। বল!

ইন্দ্রজিৎ। বিদ্যুৎপর্ণাকে...

পুরোহিত। বল—

ইন্দ্রজিৎ। আমার একটি চুম্বন, শুধু একটি চুম্বন নিবেদন করে যাব!

পুরোহিত। বটে!

ইন্দ্রজিৎ। হাঁ। মরতে যখন বসেছি, তখন ভয় নেই, লজ্জা নেই! হাঁ...একটি চুম্বন, শুধু একটি চুম্বন!...একরত্তি একটি চুম্বন!

পুরোহিত। ওরে নির্লজ্জ! আমি না তোর পিতা! তবু তোর এত অসংযম!

[ইন্দ্রজিৎ নীরব রহিলেন]

পুরোহিত। ওরে অবোধ! বিদ্যুৎপর্ণা কে জানিস?

ইন্দ্রজিৎ। হয়ত জানি হয়ত জানিনে! নিমেষের দেখা... তাই দেখি! কে...জানতে চাও নে! শুধু চাই ঐ আলোর একটি ঝলক! কত সহস্র জনের রঙীন কামনা, রঙীন কল্পনায় ঐ রূপ ঐ মূর্তি গড়ে উঠেছে ...আমার একটি চুম্বনে, একরত্তি একটি চুম্বনে...ঐমূর্তি, ঐ রূপ,আরো এক তিল সুন্দর হবে...আমি তাই চাই, আমি তাই চাই...

পুরোহিত। ওরে উন্মাদ! ও মানুষ নয় ও কালনাগিনী।...হাঁ কালনাগিনী। ...জানিস?...এক বৃদ্ধ বেদে ওকে কোলে করে তিনটি সাপের চুপড়ি নিয়ে অনাহারে মুমূর্ষু অবস্থায় আমাদের মন্দিরে এসে উপস্থিত—সে আজ দশ বৎসরের কথা। আমি আশ্রয় দিয়ে খাদ্য দিলুম। শুনলুম বেদেনী সাপ ধরতে গিয়ে সাপের কামড়ে মারা গেছে, রেখে গেছে ঐ শিশুকন্যা। মেয়েটি মায়ের মতো সাপের হাতে মারা না যায় এই ভয়ে বেদে এক রকম পাগল হয়ে গেছে। মেয়েকে দুধ খেতে দিলুম, বেদে সে দুধ সাপ দিয়ে খাওয়ালে। মেয়েকে কি খাওয়লে জানো?

ইন্দ্রজিৎ। কি?

পুরোহিত। বিষ। একতিল পরিমাণ বিষ। আমি অবাক! সে বললে 'ওকে সাপের বিষে তিল তিল করে খাইয়ে মানুষ করেছি। সাপের বিষ আর ওর মরণ নেই!'—ও হচ্ছে সেই বিদ্যুৎপর্ণা। তার পর বেদেও কিছুদিন পর মারা গেল। কি এক খেয়ালে কালনাগিনীকে আমিও ওর পিতার মতোই বিষ দিয়ে মানুষ করে তুলেছি,...কিন্তু... আজ বুঝছি...আজ কেন? প্রতিদিন প্রতিরাত্রে প্রতিমুহূর্তে বুঝছি...আমি আমার আশ্রমে নিজ হাতে ঐ বিষ-বৃক্ষ রোপন করেছি... ওর ঐ নিষিদ্ধ ফল আমার স্বর্গকে নরক করেছে...আজ শয়তান শুধু তোমাদেরই স্কন্ধে ভর করে না ...ও-হো-হো...আমি কি করেছি! [কপালে করাঘাত করিয়া নতমুখে ভাবিতে লাগিলেন]

ইন্দ্রজিৎ। আকাশের বিদ্যুৎকে আপনি পৃথিবীতে ধরে রেখেছেন!

পুরোহিত [সস্নেহে ইন্দ্রজিৎকে স্পর্শ করিয়া] ওরে অবোধ! [নিম্নস্বরে] ওর চুম্বনে মরণের ছায়া পড়ে, ওর স্পর্শে জীবনের স্পন্দন আড়ষ্ট হয়, ওর আলিঙ্গনে মৃত্যু আলিঙ্গন দেয়!...সাবধান! অভিশাপে অভিশপ্তা ঐ নারী!...সাবধান!

ইন্দ্রজিৎ। ঐ অভিশাপই আমার আশীর্বাদ!

পুরোহিত। [হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বজ্র-কঠোর স্বরে] তুমি তিন তিনবার আমার আদেশ লঙ্ঘন করেছ! তার শাস্তি নিজমুখেই স্বীকার করেছ —মৃত্যু!

ইন্দ্রজিৎ। আমার প্রার্থনাও পূর্ণ হোক।...একরত্তি একটি চুম্বন...তার পর মৃত্যু!...জীবনের সুধায় আমার মৃত্যু স্নান করে উঠুক!

পুরোহিত। বটে!

ইন্দ্রজিৎ। [পুরোহিতের মুখের পানে হঠাৎ মুখ তুলিয়া] হাঁ!

পুরোহিত। এই কি আমার শিক্ষা? আদর করে বুকে তুলে নিয়ে আশৈশবে যে শিক্ষা দিয়ে এসেছি, সে কি এই শিক্ষা?

ইন্দ্রজিৎ। আমি ভেবে দেখেছি। আপনার শিক্ষা আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায়। আমি চাই জেগে থাকতে, আমি চাই আমার রক্তের তালে তালে নাচতে...যেমন নাচ ঐ বিদ্যুৎপর্ণা নেচে গেল! আমি কি জন্মেছি ঘুমিয়ে থাকতে?

পুরোহিত। এত অসংযম! এত অসংযম!

ইন্দ্রজিৎ। সংযম তাদের জন্য যারা বিপদকে ডরায়, যারা মরতে ভয় পায়, যারা গণ্ডীর মধ্যে থেকে সুখ-শান্তিতে জীবন নির্বিবাদে কাটিয়ে দিতে চায়! জীবনের ষোলআনা তারা চায়ও না, পায়ও না! আমি ঠকবার পাত্র নেই. আমি জীবন-মৃত্যু পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে চাই। আমি চাই বিদ্যুৎ!....মাথায় আমার বজ্র ভেঙে পড়বে, জানি, কিন্তু বিদ্যুৎ! অমন আলো কি কেউ কখনো দেখেছে?

পুরোহিত। ....বটে!....আজ তোমার মুখে এ কি কথা শুনলাম পুত্র! [ক্ষণকাল নীরব রহিয়া] তুমি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছ! [ক্ষণকাল পরে] তোমাকে নিয়ে আমি যে কি করব বুঝছি নে!

ইন্দ্রজিৎ। ...আমার প্রার্থনা পূর্ণ হোক!

[পুরোহিত নীরব রহিলেন]

ইন্দ্রজিৎ। বিদ্যুৎপর্ণাকে ডেকে আনি! সে এসে নৃত্য করুক। রূপে-রসে-গন্ধে জীবন ভরপুর মাতাল হয়ে উঠুক!

পুরোহিত। তার পর?

ইন্দ্রজিৎ। মরণ! আমার সোনার মরণ! সার্থক মরণ!

পুরোহিত। কিন্তু...কিন্তু সে কি তোমাকে ভালোবাসে?

ইন্দ্রজিৎ। হয়ত বাসে,....হয়ত...না। কিন্তু, সে ভালো না বাসলেই আরো ভালো! আমার প্রেম আরো কামনা বুকে নিয়ে আরো সাধনা করবে! আমার অর্ঘ আরো ফলে ফুলে ভরে উঠবে! আমার আরতির আলো আরো ভালো করে জ্বলে উঠবে। আমার ধূপ আরো ভালো করে পুড়বে।.....তবু যদি বর না পাই আবার

নতুন করে তপস্যা আরম্ভ করব!.....তপস্যায় তপস্যায়, আমি সুন্দর থেকে সুন্দরতর হব। তার পর কোনোদিন হয় তো ঐ নীলাকাশে একটি তারা হয়ে আমি আকাশের বুকে স্থান পাব—ঐ বুকে, যে বুকে বিদ্যুৎ খেলে। যে বুকে বিদ্যুৎ নাচে!

পুরোহিত। কিন্তু রাজাও যে তাকে কামনা করে! আজ রাত্রির এই শৃঙ্গার উৎসবে রাজার যোগদানও ঐ উদ্দেশ্যেই বৎস!....সে কি বুঝছ না?

ইন্দ্রজিৎ। বিদ্যুৎপর্ণাকে কে না কামনা করে পিতা!

পুরোহিত। কিন্তু, তুমিই বা তা কেমন করে সহ্য করবে!

ইন্দ্রজিৎ। আকাশের চাঁদ....ঐ বিদ্যুৎ....ভালবাসে সবাই, কিন্তু তা নিয়ে কি হিংসা চলে কখনো?

পুরোহিত। তর্ক নয়, তর্ক নয়। বৌদ্ধ ঐ রাজা আমাদের এই লুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্মের শেষ চিহ্ন এই মন্দিরটুকু ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে আমার কাছে ঐ দেবদাসী বিদ্যুৎপর্ণাকে তার সেবাদাসী করবার অন্যায় প্রস্তাব করেছেন। আমি অসম্মত হলে—যুদ্ধ। যুদ্ধে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য। আর সম্মত হলে আমাদের ধর্মের যুগযুগান্তব্যাপী অপমান, অপযশ। দশ বৎসর হল ঐ হিন্দুদ্বেষী রাজা সিংহাসনে আরোহন করেছে। এই দশ বৎসর আমি প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে এমনি অপমান অপযশ আশঙ্কা করেছি!

ইন্দ্রজিৎ। প্রতিকার থাকে, প্রতিকার করুন।....কিন্তু....

পুরোহিত। কিন্তু?

ইন্দ্রজিৎ। কিন্তু, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

পুরোহিত। প্রতিকার আছে। শুনবে, কি প্রতিকার?

ইন্দ্রজিৎ [নিরুপায় হইয়া]। বলুন—

পুরোহিত। প্রতিকার ঐ বিদ্যুপর্ণা।

ইন্দ্রজিৎ (চমকিয়া উঠিয়া উত্তেজিত বিস্ময়ে)। বিদ্যুৎপর্ণা?

পুরোহিত। হ্যাঁ! বিদ্যুৎপর্ণা। দশ বৎসর পূর্বে.....যেদিন ঐ রাজা সিংহাসন আরোহন করেছে, সেইদিন থেকেই আমি এই প্রতিকারের উপায় ঠিক করতে পেরেছিলুম ঐ শিশুকন্যা বিদ্যুৎপর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে। ঐ শিশুর রূপলাবণ্য দেখে.....তপস্বী আমি.....সন্ন্যাসী আমি.....আমি অকুতোভয়ে বলব...আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। তার পর থেকে আমি তাকে নিজহাতে নিজমনে গড়ে তুলেছি আমার হাতের সুদর্শন অস্ত্রের মতো।

ইন্দ্রজিৎ। অস্ত্র কিনা জানিনে, কিন্তু, সুদর্শনা বটে!.....সুদর্শনা, সত্য সত্যই প্রিয়দর্শনা আমাদের প্রিয়তমা ঐ বিদ্যুৎপর্ণা!

পুরোহিত। আবার প্রগলভতা! তবে শোন—

ইন্দ্রজিৎ। বড় ভালোবাসি আমি তোমায় পুত্র! তুমি যদি আমার অবাধ্য হও, আমার জীবনের সর্ব আশা, সর্ব কামনা, সকল সাধনা ব্যর্থ হবে! আমি তোমাকে রাজা করব বৎস.....তুমি শুধু ঐ বিদ্যুৎপর্ণার আশা ত্যাগ কর।

ইন্দ্রজিৎ। আমি রাজ্যের ভিখারী নই।

পুরোহিত। [স্তম্ভিত হইলেন। পরে উত্তেজিত হইয়া] বেশ তাই হবে! তাই হবে!

ইন্দ্রজিৎ। হবে? হবে?

পুরোহিত। হবে। কিন্তু তার পূর্বে—

ইন্দ্রজিৎ। তার পূর্বে.....?

পুরোহিত। হাঁ, তার পূর্বে ঐ রাজাকে গিয়ে অভ্যর্থনা করে নাটমন্দিরে নিয়ে এসো। তার আসবার সময় হয়েছে।

ইন্দ্রজিৎ। তার পরই—

পুরোহিত। না। তারপর বিদ্যুৎপর্ণার নৃত্য হবে। নৃত্য শেষে রাজাকে বিদ্যুৎপর্ণার শয়নকক্ষে নিয়ে যাবে তার পর—

ইন্দ্রজিৎ। হাঁ, তার পর?

পুরোহিত। তার পরই তোমার পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে বিদ্যুৎপর্ণাকে গ্রহণ করা না করা তোমার অভিরুচি!

ইন্দ্রজিৎ। অভিরুচি! হাঃ হাঃ হাঃ!

পুরোহিত। হেসো না উন্মাদ! তোমার কি পরীক্ষা শুনেছ?

ইন্দ্রজিৎ। বলুন....আপনি বলুন।

পুরোহিত। রাজা বিদ্যুৎপর্ণাকে আলিঙ্গনে চুম্বনে গ্রাস করছে, সেই দৃশ্য তোমাকে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে। আকাশের চাঁদ, আকাশের বিদ্যুৎকে বিশ্বশুদ্ধ লোকে ভালোবাসে, কিন্তু তাতে কেউ কাউকে হিংসা করে না। তুমিও আজ এখানে রাজাকে হিংসা করতে পারবে না। প্রতিবাদ একটি কথাও বলতে পারবে না....

ইন্দ্রজিৎ। প্রতিবাদ চাইও না। বিদ্যুৎপর্ণা, বিশ্বের বিদ্যুৎপর্ণা! সমগ্র পৃথিবী তাকে অভিনন্দন করছে দেখলে আমার বুক ভরে উঠবে! সে ধরণীর বুক জুড়ে বাস করছে। আমারি বুকের বিদ্যুৎ বিশ্ব-হিয়ায় তার নৃত্যের তালে তালে খেলা করছে সে তো আমার গর্ব, আমার গৌরব!

পুরোহিত। যা বলতে হয় বল, কিন্তু ঐ তোমার পরীক্ষা। আমার এই শর্ত তোমাকে পালন করতে হবে। তুমি সেই দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখবে। তারপরও যদি তুমি ঐ বিদ্যুৎপর্ণাকে কামনা কর—

ইন্দ্রজিৎ। আমি করি! আমি করি!

পুরোহিত। তখন আমার আর কোনো আপত্তি থাকবে না। তুমি তাকে গ্রহণ কর।

ইন্দ্রজিৎ। আমি চললুম। আমি চললুম! আমি রাজাকে অভ্যর্থনা করে এগিয়ে নিয়ে আসি। আজ আমি কার মুখ দেখে উঠেছিলুম জানিনে, কিন্তু আমার সেই অজ্ঞান ভাগ্য-দেবতার উদ্দেশ্যে....প্রণাম....শত কোটি প্রণাম! আমি চললুম, আমি চললুম!

[প্রস্থানোদ্যত, এমন সময় পুরোহিত ত্বরিৎপদে তাহাকে পশ্চাৎ হইতে সহসা স্পর্শ করিয়া ফিরাইলেন]

পুরোহিত। রাজ্য চাই!

ইন্দ্রজিৎ। বিদ্যুৎ চাই!

পুরোহিত। দাঁড়াও। ওরে আমার অবোধ পুত্র! তোর জন্যই যে আমার এই প্রচণ্ড সাধনা! যদি রাজ্য চাস....বিদ্যুৎপর্ণাকে ভুলে যা! আর যদি বিদ্যুৎপর্ণাকে চাস তবে—

ইন্দ্রজিৎ। তবে?

পুরোহিত। আমার হৃদয়-শ্মশানে তোর চিতা জ্বলবে।

ইন্দ্রজিৎ। [সহসা রুদ্র-আনন্দে অট্টহাস্যে] হাঃ হাঃ হাঃ! বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান]

[পুরোহিত বিস্মিত স্তম্ভিত ভাবে ইন্দ্রজিতের পথের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। ক্ষণপরে লীলায়িত গতিতে চঞ্চল চরণে বিদ্যুৎপর্ণা আসিয়া তাঁহার সেই নির্বাক বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তখনি ছুটিয়া গিয়া পুরোহিতের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিলেন। পুরোহিত চমকিয়া উঠিলেন]

পুরোহিত। কে?

বিদ্যুৎপর্ণা। আমি। হাঃ হাঃ হাঃ....ভয় পেয়েছ! চমকে উঠেছ! হাঃ হাঃ হাঃ।

পুরোহিত। তোমাকে এখানে কে আসতে বলেছে?

বিদ্যুৎ। 'বিদ্যুৎ' 'বিদ্যুৎ' বলে এখনি আমাকে ডাকল কে!

পুরোহিত। কে ডাকল?

বিদ্যুৎ। আমায় ভালোবাসে......যে!

পুরোহিত। আমি তোমার রসিকতার পাত্র নই বিদ্যুৎ। আজ কিছুদিন হল তোমার মধ্যে আমি দেবদাসীর সংযম দেখতে পাইনে।....পরিণতি অতি কঠোর....বুঝলে?

বিদ্যুৎ। নির্জনে কারাবাসে?

পুরোহিত। হতে পারে!

বিদ্যুৎ। হয় না! নির্জন কারাবাস আমার হতে পারে না! কারাগারে তোমার রক্ষী আমার রূপের স্তব করবে। শুধু কি তাই? কারাগারের আশেপাশে অন্ধকারের মৃদু গুঞ্জন উঠবে...

"কালো কালো ভোমরা করে হায় হায়!
বধূর অধরে মধু কোথা পাওয়া যায়!"

পুরোহিত। দুর্বিনীত অসংযমী তবে শুধু ইন্দ্রজিৎ নয়—

বিদ্যুৎ। না আমি তার এক ধাপ উঁচু। সে নাচতে জানে না। আমি জানি। এমন নাচতে জানি, যা দেখলে—

পুরোহিত। এখনো তুমি সেই নাচ নাচো বিদ্যুৎ? আমার নিষেধ তবে তুমি অগ্রাহ্য করবার স্পর্ধা রাখ?

বিদ্যুৎ। 'রক্তের ডাক'! 'রক্তের ডাক'! আমি কি করব! আমার মা নেচেছে, আমি নাচব না?

পুরোহিত। কিন্তু...আমি তোমাকে 'মানুষ' করেছি, সভ্যতা শিক্ষা দিয়েছি—

বিদ্যুৎ। তারি ফলে আমার দেহে এই মিথ্যা আবরণ উঠেছে! কারাগার! কারাগারে তুমি আমায় বেঁধে রেখেছ! ঢেকে রেখেছ!....ভালো লাগে না! আমার ভালো

লাগে না! কোন দিন তোমরা বলবে এই যে আমার চোখ দুটি—এরাও নরকের দুয়ার....ঢাকো....ঢাকো ওদের—কোথায় ঠুলি! কোথায় ঠুলি!

পুরোহিত। পাপ! মূর্তিমান পাপ তোমার চোখে মুখে—

বিদ্যুৎ। শুধু চোখে মুখে কেন? বল.....এই বুকে—!....সন্তানও যেন বুকের দুধ চোখ বুজে খায়!.....হাঁ! ভয় নেই, আমার বসন সংযতই রয়েছে!

পুরোহিত। আর আমি বিস্মিত হচ্ছি নে! এর আভাস আমি ইন্দ্রজিতের মাঝেই পেয়েছি! তোমাদের দুজনকে নিয়ে যে আমি কি করব বুঝতে পারছি নে!

বিদ্যুৎ। সেই কথা বলতেই আমি এসেছি। আমাদের দুজনকে মুক্তি দাও। আর হাতে তুলে দাও আমার পৈত্রিক সম্পত্তি 'বঙ্করাঙ্গ' 'শঙ্খচূড়' আর 'দুধসাগর' ঐ সাপ তিনটি! আমরা সাপ খেলিয়ে জীবন কাটাব! দেশে দেশে বেড়াব! নাচব! গাইব! মজ্‌ব! মজাব।

পুরোহিত। আমি তোমাদের পরিণাম ভেবে শিউরে উঠছি।

বিদ্যুৎ। নরক?

পুরোহিত। [মুহূর্তকাল, রোষে নির্বাক রহিয়া] হা, নরক।

বিদ্যুৎ। তবে আমি একা যাবো না! বোধ করি ইন্দ্রজিৎও যাবে। যাবে না?

পুরোহিত। সে তোমার সাথী, তোমার দোসর। যাবে বই কি?

বিদ্যুৎ। সেও যাবে আমিও যাব। নরক গুলজার হয়ে উঠবে। সেই নরকই তবে আমাদের মিলন স্বর্গ!....কবে যাব?

পুরোহিত। তোমার সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয় করবার সময় নেই, প্রবৃত্তিও নেই। রাজার আসবার সময় হয়েছে। আমাকে তার অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু তার পূর্বে তোমাকে একটি কথা বলে যাই। রাজার সম্মুখে তুমি তোমার ঐ বর্বর বেশভূষা, ঐ ইতর আচরণ, ঐ অসভ্য বন্য নৃত্যগীত নিয়ে বের হয়ো না, তিনি তোমাকে দেখলে বড়ই বিরক্ত হবেন, হাঁ—

বিদ্যুৎ। তিনি আমাকে দেখলে আমার পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বেন, হাঁ—

পুরোহিত। আমি না হেসে থাকতে পারছি না! হাঃ হাঃ হাঃ।

বিদ্যুৎ। তুমি হাসছো! তুমি হাসছো!

পুরোহিত। হাঃ হাঃ হাঃ।

বিদ্যুৎ। গুরু!

পুরোহিত। কি?

বিদ্যুৎ। যদি সে আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে, যদি আমি তা পারি,.....তবে?

পুরোহিত। হাঃ হাঃ হাঃ।

বিদ্যুৎ। আমাকে ক্ষেপিয়ো না তুমি। সন্ন্যাসী যদি আমার জন্যে ঘুমুতে না পারে, তবে....সে তো বিলাসী—তার কথা.....

পুরোহিত। [চমকিয়া উঠিয়া] তুমি কি বলছ?

বিদ্যুৎ। হাঁ....আমি সন্ন্যাসীর কথাও বলছি।

পুরোহিত। সন্ন্যাসী?

বিদ্যুৎ। হাঁ, সন্ন্যাসী! সে জীবনরসে ভরপুর, যে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে আছে, যে ঘুমিয়ে নেই, যে জীবনের দুঃখ-সুখের উচ্ছলিত মদিরা পান করে মত্ত মাতাল, শুধু সে নয়.....শুধু সে নয়....

পুরোহিত। তবে আর কে?

বিদ্যুৎ। যে জীবনকে অস্বীকার করে মৃত্যুর বৈরাগ্য বরণ করে নিয়ে মনে করে পরমার্থেরপথে চলেছি, হৃদয়কে শুষ্ক রেখে মরণকে তপস্যা করে জড়িয়ে ধরতে চায়,.....কিন্তু মনের এক কোণে, ঘুমের ঘোরে, অতি সংগোপনে কোনোদিন বা স্বপ্ন দেখে চমকে ওঠে যে—সে হয়ত ত ঠকল....

পুরোহিত। [রুদ্ধ নিঃশ্বাসে] সে কে?

বিদ্যুৎ। যে জাগরণে ঘোষণা করে যে আত্মসংযম চিত্তসংযম...সকল রকমের সংযম সে আয়ত্ত করেছে, কিন্তু, ঘুমের মধ্যে অসহায় নিরুপায় হয়ে নিজেরি অজ্ঞাতে অসংযমের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়—

পুরোহিত। তার মানে? তার মানে?

বিদ্যুৎ। তার মানে অনেকের সুনিদ্রা হয় না!

পুরোহিত। [সন্দিগ্ধ ভাবে] বটে!

বিদ্যুৎ। ....তোমারো! ...তুমি ঘুমের ঘোরে মনের কথা বিড় বিড় করে বল।

পুরোহিত। [কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে] ....কি বলি?

বিদ্যুৎ। ঠিক ঐ ইন্দ্রজিৎ যা বলে....তাই!

পুরোহিত। কন্যার স্নেহে আমি তোমাকে লালন পালন করেছি, সাবধান....

বিদ্যুৎ। সে আমার বাল্যে।....কিন্তু—আজ সেজন্যে হয় তো অনুতাপই হচ্ছে!

পুরোহিত। বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎ। তাই বলছিলুম...সন্নাসী যদি আমার জন্যে ঘুমুতে না পারে, রাজা তো বিলাসী! তার কথা না বললেও চলে!

পুরোহিত। মুগ্ধ বিস্ময়ে তোমার প্রলাপ আলাপ শুনলুম বিদ্যুৎ। কত কথাই না তুমি বলতে পার। হাঃ হাঃ হাঃ [কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিলেন] যাক!

বিদ্যুৎ। [সঙ্গে সঙ্গে] হাঃ হাঃ হাঃ।

পুরোহিত। হাসির কথা নয়। পারবে তুমি আমাদের ধর্মের....আমাদের দেবতার....আমাদের তপস্যার সেই মহাশত্রুকে বশ করতে...জয় করতে....জয় করে ক্রীতদাস করে রাখতে?

বিদ্যুৎ। [ক্ষণেক ভাবিয়া] পারব!....পারতুম! ...কিন্তু করব না। হাঁ, করব না!

পুরোহিত। কেন? কেন বিদ্যুৎ?

বিদ্যুৎ। সে তোমার শত্রু, কিন্তু তুমি আমার শত্রু!

পুরোহিত। সে কি! সে কি বিদ্যুৎ?

বিদ্যুৎ। তুমি আমাকে কারাগারে রেখেছ। আমি যাদের ভালবাসি, তুমি আমার কাছ থেকে তাদের কেড়ে নিয়েছ, সরিয়ে রেখেছ, তাড়িয়ে দিয়েছ!

পুরোহিত। বল কি বিদ্যুৎ?

বিদ্যুৎ। কোথায় ইন্দ্রজিৎ? কোথায় বঙ্করাজ? কোথায় শঙ্খচূড়? কোথায় দুধসাগর?

পুরোহিত। এই কথা!....তবে কি আমাদের চাইতে তোমার কাছে বিষধর সাপই প্রিয় হল?

বিদ্যুৎ। হল। হাঁ, হল.....আমি তাদের ভালোবাসি। তারা আমায় ভালোবাসে। এ আমাদের রক্তের টান।....কোথায় তারা? কোথায় তারা?

পুরোহিত। আছে, তারা আছে। তাদের আমি দুধকলা দিয়ে পুষে রেখেছি!

বিদ্যুৎ। মিথ্যা কথা। তারা বেঁচে আছে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আর যদিই বা বেঁচে থাকে, তাদের তুমি খেতে দাও না! বঙ্করাজ একবেলা কলা না পেলে ঢলে পড়ত! শঙ্খচূড় একবেলা ব্যাঙ না পেলে গোসা করত! দুধসাগর একবেলা দুধ না পেলে আমার মার বুকের দুধ চুষে খেত! সেই তারা! আজ কোথায় তারা?

পুরোহিত। আছে, তারা....আছে।

বিদ্যুৎ। ও কথায় আমি ভুলব না! একসঙ্গে আমরা মানুষ হয়েছি, একসঙ্গে আমরা খেলা করেছি, দুধ খেয়েছি, আদর পেয়েছি, বড় হয়েছি! কই তারা? কোথায় তারা?

পুরোহিত। আছে, তারা আছে, কিন্তু...অনশনে। আমি তাদের কিছুদিন হল অনশনে রেখেছি!

বিদ্যুৎ। বটে! বটে! কিন্তু, কেন?

পুরোহিত। মাঝে মাঝে ও-রকম প্রয়োজন হয়। কেন, তা কি জান না?

বিদ্যুৎ। জানতে চাইও না! তুমি আমার শত্রু! তুমি আমার শত্রু!

পুরোহিত। যা বলতে হয়, পরে বোল। আগে শুনে নাও....কেন। তারা আমার অস্ত্র।....কামন্দককে মনে পড়ে?

বিদ্যুৎ। কামন্দক!....কোথায় সে? রসের গল্প অমন আর কেউ বলতে পারত না!...কোথায় সে?

পুরোহিত। এক দিন সে তোমার অধর দংশন করতে ছুটে গিয়েছিল। উপবাসক্লিষ্ট বঙ্করাজ তার অধর দংশন করে তৃপ্ত হল।

বিদ্যুৎ। সে কি?

পুরোহিত। হাঁ!...যুধাজিৎকে ভোলনি, না?

বিদ্যুৎ। শত যুদ্ধের বীর সেই যুধাজিৎ! সে আমাকে রাজমুকুট উপহার দিয়েছিল!

পুরোহিত। এবং রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে তোমার ভালে চুম্বন-তিলক এঁকে দিয়েছিল—

বিদ্যুৎ। তুমি তা জেনেছ?

পুরোহিত। জেনেছিলুম বলেই তো অনাহারী শঙ্খচূড় যুধাজিতের মণি-মুকুটমণ্ডিত ভালে বিষ-চুম্বন এঁকে দিয়ে কী বনরসে ভরপুর হয়ে উঠল!

বিদ্যুৎ। সত্যি? সত্যি?

পুরোহিত। তবে কি তোমার সঙ্গে পরিহাস করছি?

বিদ্যুৎ। কি করেছ! তুমি কি করেছ!.....কেন তুমি তাদের এ শাস্তি দিতে গেলে?

পুরোহিত। কেন তারা আমার নিষেধ মানেনি?

বিদ্যুৎ। তোমার স্বপ্ন যে কতখানি সত্য, আজ তা বুঝছি! তুমি হিংসায় আকুল! তারা যে আমার ভালবাসত তুমি তা সহ্য করতে পারনি। এখন বুঝছি তোমার ঐ নিষেধাজ্ঞা, ঐ দণ্ডাজ্ঞার মুলে কোন প্রবৃত্তি জল সেচন করে! এখন বুঝছি কামনা বয়সের অপেক্ষা রাখে না! এখন বুঝছি আমার শক্তি কতখানি!....পুত্র আমার পদানত, পিতাও মনে মনে, স্বপ্নের সংগোপনে আমার পদাত!

পুরোহিত। বল কি?

বিদ্যুৎ। হাঁ, পিতা হয়েও তুমি ইন্দ্রজিতের বৃদ্ধ প্রতিমূর্তি!....উভয়ের দেহে একই রক্ত প্রবাহিত, না?

পুরোহিত। [বিচলিত হইয়া] না..না..না! এ তুমি কি বলছ? ...তা কি হয় বিদ্যুৎ, তা কি হয়?...না...না...না...তা নয়। তা কখনই নয়। তা হয় না। [ভাবিয়া] ছিঃ ছিঃ ছিঃ....না, তোমার সঙ্গে আর কোনো কথা নয়।....কি বল?...না...না...না..., হাঁ, আমরা যেন প্রথমে কি কথা বলছিলুম? —হাঁ, মনে পড়েছে। রাজাকে তোমার জয় করতে হবে বিদ্যুৎ! আমি তোমার ভরসাতেই নিশ্চিন্ত রয়েছি। প্রতিদানে তুমি যা চাও...পাবে।—রাণী হতে চাও....রাণী হও....কিন্তু রাজাকে জয় কর—

বিদ্যুৎ। তোমার এই আত্ম-প্রবঞ্চনা, তোমার এই অপ্রকৃতিস্থতা আমার বেশ লাগছে। কিন্তু আমি এ সুযোগ হারাব না। আমি চাই মুক্তি, যদি দাও তবে—

পুরোহিত। তবে ঐ রাজাকে জয় করবে?

বিদ্যুৎ। করব!

পুরোহিত। রাজা তোমাকে কামনা করে।

বিদ্যুৎ। কিন্তু....যদি তুমি—

পুরোহিত। বল...

বিদ্যুৎ। যদি তুমি ঐ ইন্দ্রজিৎকে আমায় দান কর!....যদি তুমি ঐ বঙ্করাজ, শঙ্কচূড় আর দুধসাগরকে আমার হাতে তুলে দাও!

পুরোহিত। তার পর?

বিদ্যুৎ। তারপর আমরা এই কারাগার থেকে বের হয়ে পড়ব। সমুদ্র আমাদের পথ চেয়ে আছে। পর্বত আমাদের মুখপানে তাকিয়ে আছে। বন-বীথি আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ইন্দ্রজিৎ আর আমি হাত ধরাধরি করে পথ চলব। ও বাজাবে ডমরু, আমি বাজাব বাঁশি। বঙ্করাজ আমার গলা জড়িয়ে আনন্দে দুলবে! শঙ্খচূড় আমার মাথায় উঠে খেলা করবে! দুধসাগর আমায় নাগপাশে বেঁধে দুধ খাবার জন্য বায়না করবে!.....ঠিক তেমনি করে চলব....যেমনি করে

আমার বাবা আর মা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছিল!....বেদে আর বেদেনী! আমার জীবনের স্বপ্ন! আমার স্বপ্নের জীবন!

পুরোহিত। সে না হয় হবে এখন! কিন্তু, রাজাকে বশ করা সহজ নয়। তোমার মতো কত সুন্দরী তার ক্রীতদাসী! পারবে তো? তুমি পারবে তো?

বিদ্যুৎ। আমি আমার শক্তি জানি। যা জানতুম না, তাও জানিয়েছ তুমি! [ক্ষণিক নিস্তব্ধতার পর] রাজার মতো কতো সুন্দর আমার মুখের একটি কথা শোনবার জন্য ক্রীতদাস হয়েছে!....বেশি নয়! বেশি নয়। এই বেদেনীর একটি চুম্বন!....রাজা আমার পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বে!....আমি তা ভাবছি নে, আমি ভাবছি আমার স্বপ্নের জীবন! জীবনের স্বপ্ন।...কোথায় আমার সাথী?....কোথায় তার বাঁশি?....বঙ্করাজ কি ঘুমিয়ে আছে? শঙ্খচূড় কি কাঁদছে? দুধসাগর কি রাগ করেছে?

পুরোহিত। সব আছে.....সব পাবে! [বাহিরে ভেরীবাদ্য] ঐ শোন ভেরীবাদ্য!

বিদ্যুৎ [নাচিয়া উঠিয়া]। সে এসেছে! সে এসেছে! এইবার বঙ্করাজ লাফিয়ে উঠবে। শঙ্খচূড় ফণা ধরবে! দুধসাগর নাচবে!

পুরোহিত। রাজা এসে পড়েছেন। ও তারি আগমনী ভেরীবাদ্য। সঙ্গে ইন্দ্রজিৎ আছে।

বিদ্যুৎ। আমি জানি! আমি জানি! সে আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে! আমরা যাব। ঐ সাগরের পারে....ঐ পাহাড়ের ধারে....ঐ বনের কোলে!

পুরোহিত। উতলা হয়ো না বিদ্যুৎ! তুমি প্রস্তুত হও। রাজাকে গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত হও।

বিদ্যুৎ। আমি প্রস্তুত আছি! আয়! আয়! কে আসবি আয়!

সাপের খেলা ভারি
যে না আসবে আড়ি!

পুরোহিত। উতলা হয়ো না বিদ্যুৎ। আজ দশ বৎসর হল যে কামনা নিয়ে সসর্প গৃহে বাস করে তোমাকে লালন পালন করেছি, আমার সে কামনা আজ সিদ্ধ কর!....ঐ রাজা!.....ঐ রাজা! ওকে জয় কর, বশ কর। তোমার দেহের নাগপাশে ওকে জড়িয়ে ধর। চুম্বন দাও...আলিঙ্গন দাও! ও তোমার পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বে! পড়বে, নিশ্চয়ই পড়বে...আমি জানি পড়বে।

বিদ্যুৎ।

আয় আয় আয়!
চুমু খাব বঙ্করাজ
আয় আয় আয়!
দুধ দেব দুধসাগর
আয় আয় আয়!
শঙ্খ বাজে শঙ্খচূড়!
আয় আয় আয়!
মা মনসা মা মনসা!
আয় আয় আয়!

[সর্প-নৃত্য আরম্ভ করিলেন]

পুরোহিত। হাঁ নাচো! ঐ নাচো! ঐ নাচ নাচো! আর আমার নিষেধ নেই, নাচো বেদেনী, নাচো! ঐ রাজা....বীরদর্পে আসছে! ঐ অহঙ্কার চূর্ণ কর! নাচো! সৃষ্টির সেই আদিম নাচ নাচো! সাপের নাচ নাচো!—নাগপাশে বাঁধো! জয় কর! ক্রীতদাস কর!

বিদ্যুৎ।
কালনাগিনি! কালনাগিনি!
আজকে তুমি রাজরানি।
মাথার মণির কিবা আলো!
বঁধু তোমার বাসে ভাল!
তোমার মুখে আছে মধু!
লোভে লোভে আসে বঁধু!
রানি রানি ওগো রানি!
কালনাগিনি! কালনাগিনি!

[সর্প-নৃত্য চলিতে লাগিল]

পুরোহিত। বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!...আমি....আমি....এ পৌরোহিত্য চাইনে! আমি রাজা! আমিই রাজা!....দেবে?...একটি চুম্বন... [বিদ্যুৎপর্ণার কাছে গেলেন]

বিদ্যুৎ। হাঃ হাঃ হাঃ। [পুরোহিতের মুখের কাছে আসিয়া মুখ বাড়াইয়া অট্টহাস্য করিলেন]

পুরোহিত [সভয়ে পিছাইয়া গিয়া]। বিষ! বিষ! বিষ!...ওগো আমার বিষকন্যা! ওগো আমার স্বহস্ত-রচিত বিষবৃক্ষ!....ক্ষুধায় প্রাণ যায়....পিপাসায় ছাতি ফেটে যায়, কিন্তু তোমার ঐ ফলফুল....আমি হাত বাড়িয়ে ধরতে পারি নে....হায় হায় হায়! এ আমি কি করেছি! এ আমি কি করেছি!

বিদ্যুৎ [অট্টহাস্য]। হাঃ হাঃ হাঃ।

[পুনরায় সর্প-নৃত্য আরম্ভ করলেন। ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া দণ্ডধারী পারিষদগণ সেনানীগণ পরিবৃত হইয়া নীরবে রাজা তথায় প্রবেশ করিয়া নীরবেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ নয়নে বিদ্যুৎপর্ণার নৃত্য দর্শন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ চোখের নিমেষে যবনিকা উঠিয়া গেল। সহস্র দীপ জ্বলিয়া উঠিল! দুই পার্শ্ব হইতে দুই দল দেবদাসী চকিতে আত্ম-প্রকাশ করিয়া রাজার প্রতি পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিয়া বিদ্যুৎপর্ণার সহিত তালে তালে নাচিতে লাগিল। ক্রমে নৃত্য শেষ হইয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে দীপ সকলও নিষ্প্রভ হইয়া আসিল। অপূর্ব ভঙ্গিতে নর্তকীগণ রাজাকে অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান রহিল]

বিদ্যুৎ। একটি পয়সা রাজা একটি পয়সা! কে দেখবে সাপের খেলা! দুধসাগরের নষ্টামি! দেখবে যদি তাই বল...যদি কেউ বাসো ভাল!

রাজা [ইন্দ্রজিতের প্রতি]। কে?

ইন্দ্রজিৎ। সে!

রাজা [পুরোহিতের প্রতি]।...সে?

পুরোহিত। হাঁ...সে!

বিদ্যুৎ। শঙ্খচূড়, বঙ্করাজ!
নাই ভয় নাই লাজ!
দুধসাগর দুধ চায়
সামলানো হল দায়!
দেখবে যদি তাই বল!
যদি কেউ বাসো ভাল!

রাজা। ভালবাসি! ভালবাসি!

ইন্দ্রজিৎ। দেখব! দেখব!

সকলে। দেখব! দেখব!

[বিদ্যুৎপর্ণা পুনরায় নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সহস্র প্রদীপ দ্বিগুণিত তেজে জ্বলিয়া উঠিল। দেবদাসীরা সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যগীতে যোগ দিল। হাতছানি দিয়া রাজাকে ডাকিতে ডাকিতে বিদ্যুৎপর্ণা যবনিকার অন্তরালে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। রাজা ও ইন্দ্রজিৎ পুরোহিতের প্রসারিত হস্ত-সংকেতে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িয়া গেল। পুরোহিত তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া চোরের মতো যবনিকার এক প্রান্তভাগ উত্তোলন করিয়া কি দেখিতে লাগিলেন। দীপের তেজ ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল। দেবদাসীদের একটি করুণ সঙ্গীত শ্রুত হইতে লাগিল। দীপ নির্বাণোন্মুখ হইয়া আসিল। সঙ্গীত থামিয়া গেল। দীপ নিভিয়া গেল। তখন দূরাগত এক বংশীধ্বনির মৃত্যু-মূর্ছনা শোনা যাইতে লাগিল। ক্রমে তাহাও ডুবিয়া গেল।...হঠাৎ সেই অন্ধকারে অন্তর হইতে বিদ্যুৎপর্ণার স্বর শোনা গেল]

বিদ্যুৎ। জয়! জয়! জয়!...জয় করেছি! বশ করেছি। বশ করেছি!....রাজা....দেশের রাজা...ধরণীর ঈশ্বর...ক্রীতদাস হয়ে আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে! মাত্র একটি চুম্বন! একটি আলিঙ্গন!

ইন্দ্রজিৎ। কিন্তু তাকে কি হত্যা করে এলি পাষাণি!....ঐ শোন তার আর্তনাদ! উঃ, কি কাতর আর্তনাদ!

বিদ্যুৎ। মাতলামি! মাতলামি! ও তার মাতলামি! গুরু কোথায়? কোথায় তুমি? কোথায় আমার বঙ্করাজ! শঙ্খচূড়? দুধসাগর?

ইন্দ্রজিৎ। ঐ শোন অসির ঝনঝনি! ঐ শোন রাজার মর্মভেদী আকুল মৃত্যু-যন্ত্রণা! ঐ শোন তার সেনানীদের ক্ষিপ্ত কোলাহল! ঐ আবার অসির ঝনঝনি! রাজাকে তুমি হত্যা করেছ, হাঁ, নিশ্চয়ই হত্যা করেছ। তার সেনানীরা ক্ষেপে উঠেছে। কিন্তু....কি নিদারুণ অন্ধকার! পিতা কোথায়! প্রভু কোথায়! আমার অসি কই?

বিদ্যুৎ। রাজাকে আমি চুম্বন করেছি, আলিঙ্গন দিয়েছি!

পুরোহিত। হাঃ হাঃ হাঃ!

বিদ্যুৎ। কে ও? ঐ অট্টহাস্যে পরাণ কেঁপে ওঠে! কে তুমি!

পুরোহিত। আমি পুরোহিত!

বিদ্যুৎ। গুরু! গুরু! আমি জয় করেছি! আমি বশ করেছি!

পুরোহিত। বটে?

বিদ্যুৎ। এক চুম্বনে...এক আলিঙ্গনে...বেশি নয়; বেশি নয়,...তাতেই সে আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে।

পুরোহিত। ঐ এক চুম্বনে...ঐ একটি আলিঙ্গনেই রাজা পঞ্চত্ব লাভ করেছে! তার মৃতদেহ তোমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে। ওগো বিষকন্যা! প্রতিদিন তিল তিল করে বিষ খাইয়ে আজ দশ বৎসর হল আমি যে কালনাগিনী সৃষ্টি করেছি, আজ সে আমার গোপন অভিসন্ধি পূর্ণ করেছে ঐ রাজাকে দংশন করে!

বিদ্যুৎ। সে মরে গেছে?

পুরোহিত। মরে গেছে।

বিদ্যুৎ। চুম্বনেই বিষ? আলিঙ্গনেও বিষ?

পুরোহিত। ইন্দ্রজিৎ! তুমিই উত্তর দাও! স্বচক্ষে তুমি দেখে এসেছ!

বিদ্যুৎ। ইন্দ্রজিৎ! ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিৎ। বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎ। আমি কালনাগিনী? আমি কালনাগিনী?

পুরোহিত। তুমি বিষকন্যা! তুমি আমার স্বেচ্ছাকৃত সৃষ্টি। আমি নিজ হাতে তোমাকে গড়েছি।....কিন্তু....

বিদ্যুৎ। বল! বল—

পুরোহিত। কিন্তু ঐ যে রাজা—ও তো মরে বাঁচল; আর আমি! আমি যে দিবানিশি অনুতাপে জ্বলে মরছি! কে জানত আমারি বিষকন্যার একটি চুম্বনের জন্য বৃদ্ধ সন্ন্যাসী স্বপ্নের মাঝে কামনার বিষে জর্জরিত হবে! হায় হায়! এ আমি কি করেছি! এ আমি কি করেছি!

বিদ্যুৎ। আজ দেখছি সবাই ক্ষেপে উঠেছে! তোমরা কি সবাই মাতাল হলে? কিন্তু আমি ঠিক আছি। আমি ভুলব না....ঠকব না! গুরু! রাজাকে জয় করেছি, এইবার আমার সাপ তিনটি দাও....ইন্দ্রজিৎ, কোথায় তুমি? কাছে এস। ঐ কান পেতে শোন সমুদ্রের গর্জন। ডাকছে! আমাদের ডাকছে। গুরু! আর বিলম্ব নয়, কোথায় আমার বঙ্করাজ? শঙ্খচূড়? দুধসাগর?

পুরোহিত। আছে, তারা আছে, আমার সঙ্গেই আছে। কিন্তু....বিদ্যুৎ!...আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবে?

বিদ্যুৎ। না—! না! তুমি এই মন্দিরেই রইবে। আমরা আবার ফিরে আসব। ঠিক আমার বাবা সদল-বলে যেমন ফিরে এসেছিল। সঙ্গে আনব আমাদের খোকাখুকু। গুরু! কাছে এস...শোন। আমাদের খোকাখুকু আরো সুন্দর হবে... আমার চাইতেও.....ইন্দ্রর চাইতেও! তুমি তাদের আবার বুকে তুলে নিয়ো। আবার মানুষ কোর....আবার ভালবেসো....

পুরোহিত। বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ....ভুল! ভুল! ভুল! সব তোমার ভুল। আমি তোমার সর্বনাশ করেছি।....কাকে নিয়ে তুমি জীবনের স্বপ্ন দেখছ! স্বপ্নের জীবন কল্পনা করছ....তুমি কালনাগিনী! তুমি বিষকন্যা। রাজাকে হত্যা করেছ, ইন্দ্রজিৎকেও...

বিদ্যুৎ। আবার সেই কথা?

পুরোহিত। আরো প্রমাণ চাও?

বিদ্যুৎ। তুমি আমার সাপ দাও! কোথায় তারা?...আমি আর মুহূর্ত অপেক্ষা করব না, কোথায় তারা?

পুরোহিত। সর্বনাশ হয়েছে বিদ্যুৎ, সর্বনাশ হয়েছে! চুপড়ির আবরণ খুলে এই অন্ধকারে দুধসাগর বের হয়ে পড়েছে। আমি তাকে যেতে দিইনি, সে এইবার ছাড়া পেয়ে তার শোধ নেবে! ঐ শোন তার গর্জন। বাঁচাও বিদ্যুৎ, আমায় বাঁচাও! তুমি এসে আমায় জড়িয়ে ধর। দুধসাগর বুঝবে আমি তোমার দেহলগ্ন। সে কাকে দংশন করতে গিয়ে কাকে দংশন করবে মনে করে আর দংশনই করবে না!

বিদ্যুৎ। কিন্তু...ইন্দ্রজিৎ?

পুরোহিত। সে আলো নিয়ে আসুক। যাও ইন্দ্রজিৎ...যাও....

ইন্দ্রজিৎ। হাঁ, আলো! আমি আলো নিয়ে আসছি। [প্রস্থান]

বিদ্যুৎ। দুধসাগর! দুধসাগর! আমি বিদ্যুৎ! আমি তোর দুধবোন! আমি তোকে দুধ দেব!...কিন্তু আমার কাছে আসিস না! আমার গুরু আমার দেহ জড়িয়ে আছেন। বিশ্বাস না হয়....ঐ শোনো আমি তাকে চুমু খাচ্ছি....সাবধান ....কাকে দংশন করতে কাকে দংশন করবি....ঠিক নেই কিন্তু...

পুরোহিত [চিৎকার করিয়া উঠিয়া]। দংশন করেছে...দংশন করেছে।

বিদ্যুৎ। সে কি! সে কি!

পুরোহিত। কিন্তু দুধসাগর নয়....

বিদ্যুৎ। তবে?

পুরোহিত। তুমি!....বিদায়! ইন্দ্রজিৎকে চুম্বন কোর না...আলিঙ্গন দিয়ো না!...আমি তোমার সর্বনাশ করেছি...যদি তোমর খোকাখুকু হবার কোনো আশা থাকত....তবে আমি এই মন্দিরে যেমন করেই হোক তাদের আশায় বেঁচে থাকতুম, কিন্তু...তা যখন নয়....তখন যাকে ভালোবেসে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তারি চুম্বন পেয়ে, আলিঙ্গন পেয়ে আনন্দে মরলুম! প্রতিরাত্রের দুঃস্বপ্নের চাইতে এক দিন এ-ক মু-হূ-র্তে ম-রা ভালো! তৃ-প্ত হ-য়ে ম-রা ভা-লো! বি-দা-য়!

বিদ্যুৎ। গুরু!...গুরু!

[ক্ষণকাল নিস্তব্ধতা বিরাজ করিল। পরে আলো হস্তে ইন্দ্রজিৎ প্রবেশ করিয়া দেখেন বিদ্যুতের পদতলে পুরোহিতের মৃত-দেহ লুটাইয়া পড়িয়াছে! বিদ্যুৎ পাষাণ-মূর্তির মতো সেই দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন]

ইন্দ্রজিৎ। বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎ [চমকিয়া উঠিয়া ইন্দ্রজিৎকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন]। দেখছ?

ইন্দ্রজিৎ। গুরু!

বিদ্যুৎ। গুরু নয়, গুরুর মৃতদেহ!....আমার একটি চুম্বনে, একটি আলিঙ্গনে...পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে...আর উঠবে না।

ইন্দ্রজিৎ। চলে এস বিদ্যুৎ....সেনানীরা উলঙ্গ অসি হস্তে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতো আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে! এতক্ষণ অন্ধকারে নিরাপদে ছিলুম...এখন এই আলো...

বিদ্যুৎ। নিভিয়ে দাও....নিভিয়ে দাও....

ইন্দ্রজিৎ। বেশ!...দিলুম। [দীপ নির্বাপন] এইবার এস, চল....তোমার সেই পাহাড়ের ধারে....সমুদ্রের পারে....বনানীর কোলে—

[কোনো উত্তর পাইলেন না]

ইন্দ্রজিৎ [আরো উচ্চৈঃস্বরে]। বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ! [দূর হইতে উত্তর আসিল]

বিদ্যুৎ। ইন্দ্রজিৎ! ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিৎ। বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎ [আরো দূর হইতে]। বিদ্যুৎ আকাশে!....বাইরে এসে দেখে যাও...

[পট পরিবর্তন। মেঘে ঢাকা পূর্ণিমার চাঁদ, মাঝে মাঝে মেঘ সরিয়া যাইতেছে, জোৎস্না উঠিতেছে, আবার পরক্ষণেই মেঘে ঢাকা পড়িতেছে।...বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। সরসীর বুকে কুমুদ, কহ্লার ফুটিয়া রহিয়াছে, বাতাসে তাহারা দুলিতেছে। সরসীর একপারে ইন্দ্রজিৎ ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন]

ইন্দ্রজিৎ। বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎ [সরসীর অন্যপারে আবির্ভূত হইয়া]। ইন্দ্রজিৎ! ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিৎ। অত দূরে নয়! কাছে এস! চল...চল...সেই পাহাড়ে ধারে, সমুদ্রের পারে, বনানীর কোলে—

বিদ্যুৎ [আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন]। না—না—না!

ইন্দ্রজিৎ। বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎ। আকাশের ঐ চাঁদ...দূরে....কতদূরে....তবু—সরসীর ঐ পদ্ম আনন্দে দুলছে! চুম্বন নয়! আলিঙ্গন নয়!...তবু দোলে! ঐ চাঁদ....আর এই পদ্ম ওর অর্থ জানো? আমি জেনে আসি।

[সুদূরে কণ্ঠস্বর মিলাইয়া গেল]

ইন্দ্রজিৎ। বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ! আকাশের বিদ্যুৎ....আকাশে হারিয়ে গেল।

নব সংস্করণ

বনফুল

চরিত্রলিপি

রক্ষিত	সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ
নিবারণ	রক্ষিতের বাল্যবন্ধু, স্থানীয় কলেজের প্রফেসার
জ্যোৎস্নাভূষণ, বিহঙ্গম, ইন্দ্রলাল ও অমিয়	কলেজের ছাত্র
অপর্ণা	রক্ষিতের মেয়ে
মঙ্গলময়	অপর্ণার স্বামী
কনস্টেবল	

[সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ মিস্টার রক্ষিতের অফিস-কক্ষ। কক্ষটি বেশ প্রশস্ত অর্থাৎ একটি বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিল, কয়েকখানা চেয়ার, ফাইল সমন্বিত কয়েকটি সেল্‌ফ থাকা সত্ত্বেও কক্ষটিতে পরিক্রমণ করিবার মতো স্থান আছে। মিস্টার রক্ষিত একটু উত্তেজিতভাবে পরিক্রমণও করিতেছেন। অফিস-কক্ষের পাশে আর একটি ঘর রহিয়াছে, তাহার দরজা দেখা যাইতেছে। মিস্টার রক্ষিতের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হইলেও শরীর বেশ বলিষ্ঠ। মুখটা দেখিলে ভয় হয়, হঠাৎ মনে হয় বুলডগের মুখে কাঁচা পাকা এক জোড়া গোঁফ গজাইয়াছে। পরিধানে খাকি হাফ শার্ট, হাফ প্যান্ট, হোস এবং মিলিটারি বুট। কোমরে চামড়ার চওড়া কোমরবন্ধ। মুখে পাইপ। দ্বারপ্রান্তে খুট করিয়া শব্দ হইল। মিস্টার রক্ষিত ফিরিয়া দেখিলেন। দ্বাররক্ষী কনেস্টবলটি প্রবেশ করিয়া মিলিটারী কায়দায় স্যালিউট করিল এবং একটি কার্ড দিল। মিস্টার রক্ষিত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কার্ডটি দেখিলেন—]

রক্ষিত [কার্ডটি টেবিলে রাখিয়া]। সা'বকো আনে বোলো।

[কনস্টেবল সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। ক্ষণপরেই ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত পৌঢ় নিবারণবাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। নিবারণ মিস্টার রক্ষিতের বাল্যবন্ধু এবং স্থানীয় কলেজের প্রফেসার]

নিবারণ। রক্ষিত, যা শুনছি তা সত্যি নাকি?

রক্ষিত [ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া]। সত্যি।

[রক্ষিতের চক্ষু দুইটি হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিয়া বাহির হইল। তিনি আরও যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু আত্মসম্বরণ করিয়া পাইপটা কামড়াইয়া ধরিলেন। নিবারণ একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন]

নিবারণ। সত্যি অপর্ণা পালিয়েছে?

রক্ষিত [সহসা উচ্চকণ্ঠে]। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার একমাত্র মেয়ে অপর্ণা পালিয়েছে। তুমি কি তাই নিয়ে ঠাট্টা করতে এসেছ না কি আমাকে! ইফ সো—

[পুনরায় আত্মসম্বরণ করিয়া পাইপ কামড়াইলেন]

নিবারণ [শান্তকণ্ঠে]। এটা কি ঠাট্টা করবার বিষয়! বন্ধুর বিপদে আসা উচিত বলেই এসেছি। যদি বিরক্ত হও, উঠে যাচ্ছি—

[উঠিবার উপক্রম করিলেন]

রক্ষিত [সহসা ঘুরিয়া]। Please take your seat and don't be silly!

[নিবারণ পুনরায় বসিলেন এবং রক্ষিত পদচারণা করিতে লাগিলেন]

নিবারণ। কোনো খবর-টবর পেয়েছ?

রক্ষিত। কিছু না। কিন্তু [সহসা প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইয়া] আচ্ছা, আমার মেয়েকে তো তোমরা পড়িয়েছ। তার সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি বল তো!

নিবারণ। আমার ধারণা খুব ভাল। ফিলজফির নতুন যে ছোকরা প্রফেসারটি এসেছেন, চেনো বোধ হয় তাঁকে, মঙ্গলময়বাবু—তিনিও তো খুব প্রশংসা করছিলেন সেদিন। বলছিলেন খুব ভাল! মেয়েটি—

রক্ষিত। ভাল মানে কি?

নিবারণ। লেখাপড়ায় ভাল, ব্যবহার ভাল।

রক্ষিত। চরিত্র?

নিবারণ। আমার তো ধারণা ছিল ভালই—

রক্ষিত। তা হলে how do you explain this? তোমাদের কেয়ারে মেয়েকে কলেজে পড়তে দিলাম, তার এই ফল?

নিবারণ [হাসিয়া]। দেখ ভাই, ছাত্রছাত্রীদের চরিত্রের দায়িত্ব নেওয়া আমাদের সাধ্যাতীত, একরকম অসম্ভব।

রক্ষিত। তোমরা চার্জ নিয়েছ, তোমরা জানবে না তো কে জানবে!

নিবারণ। নোট বই মুখস্থ করিয়ে পরীক্ষা পাশ করানো যায় কিন্তু চরিত্র গড়া যায় না। চরিত্র জিনিসটা গড়ে উঠে ছেলেবেলায়। সে সময় আমরা কোথা! তাছাড়া—

[সহসা থামিয়া গেলেন ও একটু হাসিলেন]

রক্ষিত। তা ছাড়া কি?

নিবারণ। হেরিডিটি বলেও একটা জিনিস আছে। হাজার চেষ্টা করলেও নিমের বিচি থেকে আম হতে পারে না!

রক্ষিত। তাহলে তুমি কি বলতে চাও?

নিবারণ। আমি বলতে চাই [যেন কোনো একটা রূঢ় সত্য চাপিয়া গেলেন] হুঁ—

রক্ষিত। What do you mean by হুঁ?

নিবারণ। I mean মেয়েদের চরিত্র judge করবার বেলায় বাপেরা নিজেদের চরিত্রটা ভুলে যায়।

রক্ষিত। গস্‌স্‌! তুমি কি আমাকে ধর্মের উপদেশ দিতে এসেছ না কি! ইফ সো—

[আত্মসম্বরণ করিয়া পুনরায় পাইপ কামড়াইলেন]

নিবারণ। দেখ ভাই, মেয়েকে যখন উচ্চশিক্ষা দিয়েছ তখন অত অধীর হলে চলবে না। তার তাল সামলাতে হবে।

রক্ষিত। তার মানে—

নিবারণ। মানে, তার স্বাধীনতাকে সহ্য করতে হবে।

রক্ষিত। স্বাধীনতা মানে উচ্ছৃঙ্খলতা?

নিবারণ। তা অবশ্য নয়। কিন্তু এটাও ঠিক যে, লেখাপড়া শেখানো মানেই শেকল ভাঙবার উপায় শেখানো। খাঁচার পাখিকে আকাশের খবর দিলে খাঁচা সম্বন্ধে তার মোহ না থাকাটাই স্বাভাবিক। তার শিক্ষিত স্বাধীন বুদ্ধির উপর আস্থা রাখা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। অধীর হয়ো না!

রক্ষিত। মেয়ে পালিয়ে গেছে, অধীর হব না বল কি? তাছাড়া, তার বিয়ের সব ঠিকঠাক, জব্বলপুরের জমিদারের বড় ছেলের সঙ্গে। তারা মেয়ে দেখে পছন্দ করে গেছে। তিন জায়গায় তো পছন্দই করলে না!

নিবারণ। ছি ছি ছি ছি, তোমরা লেখাপড়া জানা বড় বড় মেয়েকেও গরু-বাছুরের মতো বের করে দেখাও, ওরা তো রিভোল্ট করবেই!

রক্ষিত। না দেখে লোকে বিয়ে করবে কেন? দেশ সুদ্ধ পাত্রীর বাপ পাত্রদের দোরে সাধাসাধি করছে টাকার থলি নিয়ে—

নিবারণ। তা হলে মেয়েকে লেখাপড়া না শিখিয়ে সকাল সকাল বিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল তোমার। দু নৌকায় পা দিয়ে নদী পার হওয়া শক্ত, ডুবে যাবারই বেশি সম্ভাবনা।

রক্ষিত। দেখ নিবারণ, এটা তোমার লেকচার থিয়েটার নয়। আর তোমার বক্তৃতা শোনবার অবসরও নেই আমার।

নিবারণ। বক্তৃতা দিতে আসিনি আমি। যে জন্যে এসেছি তা হলে শোন। শুনছি নাকি তুমি কলেজের কয়েকজন ছেলেকে অ্যারেস্ট করেছ?।

রক্ষিত। নিশ্চয়ই করেছি। ক্রিমিনালকে অ্যারেস্ট করবার জন্যেই গভর্ণমেণ্ট মাইনে দিয়ে আমাদের রেখেছে!

নিবারণ [সবিস্ময়ে]। এরা সবাই ক্রিমিনাল?

রক্ষিত। আমার সন্দেহ হয়!

নিবারণ। সন্দেহ হবার হেতু?

[মিস্টার রক্ষিত টেবিলের নিকট গেলেন এবং ড্রয়ার টানিয়া কয়েকখানা চিঠি বাহির করিয়া নিবারণের হাতে দিলেন]

রক্ষিত। সব জায়গায় রিপ্লাই প্রিপেড টেলিগ্রাম করে যখন জানলাম যে মেয়ে জানাশোনা কোনো জায়গায় যায়নি, তখন I broke open her boxes and found these love-letters! সব ব্যাটাকে অ্যারেস্ট করেছি আমি!

[নিবারণ সবিস্ময়ে চিঠিগুলি উল্টাইয়া দেখিলেন ও তাহার পর সেগুলি টেবিলে রাখিয়া দিলেন]

রক্ষিত। মানলুম না হয় লাভ-লেটার্স লিখেছে। কিন্তু লাভ-লেটার্স লেখা ক্রাইম নয়। তা যদি হয়, তা হলে সবচেয়ে বড় ক্রিমিনাল তুমি!

রক্ষিত। দেখ নিবারণ, I am not in a mood for jokes now।

নিবারণ। কয়েকটি ছোকরা তোমার মেয়েকে প্রেমপত্র লিখেছে এতে এতটা খাপ্পা হয়ে উঠেছ কেন বল তো! তোমাকে রসিক বলেই জানতুম।

রক্ষিত। রসিকতার সময় অসময় আছে। এ নিয়ে তুমিও রসিকতা করতে না, যদি অপর্ণা তোমার মেয়ে হত।

[নিবারণ স্মিতমুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন]

নিবারণ। যে ছেলেগুলিকে অ্যারেস্ট করেছ—কি করতে চাও তাদের নিয়ে?

রক্ষিত। এনকোয়ারি।

নিবারণ। কোথায় তারা?

রক্ষিত। কাউকে 'বেল' দিইনি আমি। কাল সমস্ত সমস্ত রাত লক্‌আপে ছিল, এখন পাশের ঘরে রয়েছে। Good-for-nothing beggars all of them!

নিবারণ। কেবলমাত্র সন্দেহের উপর নির্ভর করে এতগুলি ভদ্দরলোকের ছেলেকে এমনভাবে—

রক্ষিত। You shut up! ভদ্দরলোকের ছেলে! ভদ্দরলোকের ছেলে ভদ্দরলোকের মেয়েকে একরকম ভাবে চিঠি লেখে না।

নিবারণ। মাঝে মাঝে দু-একটা বানান ভুল ছাড়া চিঠিগুলোতে আর বিশেষ কোনো দোষ দেখলাম না। সকলেই তো বেশ সরস ভাষায় তোমার মেয়ের স্তুতিগান করেছে—এতে অত চটছ কেন?

রক্ষিত। দেখ নিবারণ, there is a limit to everything।

নিবারণ। Ought to be!

রক্ষিত [সহসা আগাইয়া আসিয়া]। তোমার উদ্দেশ্যটা কি?

নিবারণ। এই ছেলেদের গার্জেনরা আমাকে এসে ধরেছে।

রক্ষিত। ও, সুপারিশ করতে এসেছ তুমি! তবে যে বললে বন্ধুর বিপদ শুনে [সহসা অধীরভাবে] O you Teachers and Professors, you are a hopeless lot of hypocrites!

[নিবারণ অবিচলিত]

নিবারণ। একটা বিষয়ে তোমার তারিফ করতেই হয়; এতদিন পুলিশে চাকরি করেও ভাষাটা বেশ শ্লীল রাখতে পেরেছ তুমি!

রক্ষিত। দেখ নিবারণ!

নিবারণ [সানুনয়ে]। এদের ছেড়ে দাও ভাই!

রক্ষিত। না।

নিবারণ। দেখ—

রক্ষিত। [প্রায় চিৎকার করিয়া] না, না, না—কিছুতেই এদের ছেড়ে দেব না আমি! This is abduction!

নিবারণ। আমি বলছি এরা নির্দোষ। শোন—

রক্ষিত। কিছু শুনতে চাই না আমি! তোমার সহানুভূতিজ্ঞাপন যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে—You may go and let me do my duty [সহসা] এরা নির্দোষ! তুমি জানলে কি করে?

নিবারণ। আমার তাই ধারণা।

রক্ষিত। ধারণা! আমার কি ধারণা জান?

নিবারণ। কি?

রক্ষিত। সতেরোটা গাধা মরে একটা মাস্টার হয়!

নিবারণ। মানে?

রক্ষিত। মানে-টানে কিছু শুনতে চাই না আমি—please go, I want to see through the game।

নিবারণ। দেখ, শহরের এতগুলো ভদ্রলোককে চটানো ঠিক নয়। আজকালকার দিনে—

রক্ষিত। তুমি কি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ নাকি?

নিবারণ। মোটেই না। জিনিসটার নানা দিক তোমাকে দেখাচ্ছি—

রক্ষিত। আমি দেখতে চাই না কিচ্ছু—please go।

[নিবারণ হতাশ হইয়া চুপ করিলেন। রক্ষিত একবার ক্রুদ্ধভাবে তাঁহার দিকে তাকাইয়া পদচারণা করিতে লাগিলেন]

রক্ষিত। বসে আছ যে!

নিবারণ। তাড়িয়ে দেবে না কি?

রক্ষিত। অন্যলোক হলে এতক্ষণ দিতাম! [একটু পরে] দশটা তো বেজে গেছে। তোমার কলেজ নেই?

নিবারণ। কলেজের ছুটি। এদের তাহলে ছাড়বে না কিছুতেই?

রক্ষিত। না।

নিবারণ। কাজটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। আচ্ছা, উঠি তাহলে।—জিনিসটা ভেবে দেখো—

[রক্ষিত পাইপ ধরাইতেছিলেন, কোনো উত্তর দিলেন না, নিবারণ চলিয়া গেলে চেয়ারে গিয়া বসিলেন এবং ঘন্টা টিপিলেন। কনস্টেবল আসিয়া প্রবেশ করিল]

রক্ষিত [একটি চিঠি লইয়া ও লেখকের নাম দেখিয়া]। জ্যোৎস্নাভূষণ কো বোলাও।

[কনস্টেবল চলিয়া গেল। একটু পরে একটি লিকপিকে রোগা গোছের ছোকরা প্রবেশ করিয়া সভয়ে প্রণাম করিল। রক্ষিত বার দুই তাহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন]

রক্ষিত। তোমার পুরো নাম কি?

জ্যোৎস্না। আজ্ঞে, জ্যোৎস্নাভূষণ চৌধুরী।

রক্ষিত। তুমি আমার মেয়ে অপর্ণাকে চেন?

জ্যোৎস্না। চিনি।

রক্ষিত। কি করে আলাপ হল?

জ্যোৎস্না। একসঙ্গে পড়ি আমরা।

রক্ষিত। তাকে প্রেমপত্র লিখতে?

জ্যোৎস্না [ঢোঁক গিলে]। আজ্ঞে না।

রক্ষিত [একটি পত্র তুলিয়া]। এটা তা হলে কার লেখা? [পড়িতে লাগিলেন] "প্রাণের অপর্ণা, তুমি আজ থার্ড পিরিয়ডে মুখ ঘুরিয়ে বসেছিলে কেন? আমি কেসে কেসে গলা চিরে ফেললাম তবু আমার দিকে একবার চাইলে না—" এ কার লেখা?

জ্যোৎস্না [শুষ্ককণ্ঠে]। আজ্ঞে ঠিক বুঝতে পারছি না, এ চিঠি কি করে—

রক্ষিত [ধমক দিয়া]। বুঝতে পারছ না, স্কাউন্ড্রেল কোথাকার! চাবুকে পিঠের চামড়া ছাড়িয়ে ফেলব তোমার, তা জান?

জ্যোৎস্না। এই বারটি মাপ করুন, আর কক্ষনো এমন করব না।

রক্ষিত। অপর্ণা কোথায় আছে জান?

[জ্যোৎস্নাভূষণ কাঁদিয়া ফেলিল]

জ্যোৎস্না [চক্ষু মুছিয়া]। আজ্ঞে না।

রক্ষিত [পুনরায় ধমক দিয়া]। সত্যি কথা বল! ঠিক জান তুমি—

জ্যোৎস্না। সত্যি বলছি, জানি না।

রক্ষিত। মিথ্যে বলে আমার কাছে পার পাবে না।

জ্যোৎস্না। সত্যি বলছি স্যার।

রক্ষিত। আচ্ছা যাও, এখন ওই ঘরে গিয়ে বস। সত্যি বলছ কি না, এখনি টের পাব আমি।

[জ্যোৎস্নাভূষণ পাশের ঘরে চলিয়া গেল। রক্ষিত আবার ঘন্টা টিপিলেন, কনস্টেবল আসিল]

রক্ষিত [আর একটি পত্র দেখিয়া]। বিহঙ্গমবাবুকো বোলাও।

[বিহঙ্গম আসিয়া প্রবেশ করিল। বিহঙ্গমের দশ আনা ছ আনা চুল ছাঁটা, পায়ে বকলশ-দেওয়া চেটাই বুনানি স্যান্ডাল। ছোকরা বেশ সপ্রতিভ]

বিহঙ্গম। Good morning, sir.

[রক্ষিত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল বিহঙ্গমের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন]

রক্ষিত। তোমরা কি জাত?

বিহঙ্গম। আজ্ঞে, আমরা কায়স্থ। মিত্তির আমাদের উপাধি।

রক্ষিত। কোন ইয়ারে পড়?

বিহঙ্গম। থার্ড ইয়ারে?

রক্ষিত। কি কম্‌বিনেশন?

বিহঙ্গম। হিস্ট্রি, ফিলজফি। হিস্ট্রিতে অনার্স আছে।

রক্ষিত। আমার মেয়েকে চেন?

বিহঙ্গম। যতগুলি মেয়ে আমাদের সঙ্গে পড়ে সব্বাইকে চিনি। আপনার মেয়ের নাম কি?

রক্ষিত। অপর্ণা।

বিহঙ্গম [পুলকিত কণ্ঠে]। খুব চিনি! ফরসা ফরসা দোহারা গোছের চেহারা তো?

[রক্ষিত পাইপ কামড়াইয়া জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন]

রক্ষিত। পিঠের চামড়ার প্রতি যদি মায়া থাকে ভদ্রভাবে কথার উত্তর দাও।

বিহঙ্গম [সবিস্ময়ে]। বেফাঁস তো কিছু বলি নি!

রক্ষিত। আমার মেয়েকে তুমি চিঠি লিখতে?

বিহঙ্গম। ক্লাসমেট যখন, লিখে থাকব দু-একখানা, ঠিক মনে নেই।

[রক্ষিত বিহঙ্গমের লেখা পত্রখানা তুলিয়া দেখাইলেন]

রক্ষিত। এটা কি তোমার লেখা?

বিহঙ্গম [আগাইয়া আসিয়া]। কই দেখি—ও হ্যাঁ, আমারই। [সবিস্ময়ে] আপনি পেলেন কি করে!

রক্ষিত। শেষের দুলাইন কবিতাও কি তোমার রচনা?

হিস্ট্রির ক্লাসেতে তুমি কেন হলে লেট
মম হৃদি-গবাক্ষের ওগো জুলিয়েট।

বিহঙ্গম [হাসিয়া]। হাতের লেখা আমার, কিন্তু রচনা ভুতোর।

রক্ষিত। পুরো নাম কি?

বিহঙ্গম। ভূতনাথ পালিত।

রক্ষিত। কোথায় থাকে সে?

বিহঙ্গম। নাপতে পাড়ায়।

রক্ষিত। ঠিকানা কি?

বিহঙ্গম। ফাইভ এ, খললু মিঞা লেন।

[রক্ষিত ঘণ্টা বাজাইলেন। কনস্টেবল প্রবেশ করিল]

রক্ষিত। বদরুদ্দিনকো বোলাও।

[বদরুদ্দিন দারোগা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন]

রক্ষিত। ফাইভ এ খললু মিঞা লেনের ভূতনাথ পালিতকে অ্যারেস্ট করে আন।

[বিহঙ্গম সবিস্ময়ে একবার রক্ষিত এবং একবার দারোগার মুখের পানে চাহিল। দারোগা চলিয়া গেল]

বিহঙ্গম। আমাদের সবাইকে এমন করে হ্যারাস করছেন কেন স্যার? কাল সারারাত মশার কামড়ে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছি আমরা।

রক্ষিত [ধমক দিলেন]। Shut up, আমার মেয়েকে প্রেমপত্র লিখতে গেছলে কেন, তার উত্তর দাও।

বিহঙ্গম। এমনি।

রক্ষিত। এমনি মানে।

বিহঙ্গম। আর পাঁচজন লেখে দেখে আমিও লিখলুম একদিন।

[রক্ষিত কটমট করিয়া তাহার দিকে চাহিলেন। কি একটা বলিতে গিয়া আত্মসম্বরণ করিলেন। তাহার পর সংযতভাবে বলিলেন]

রক্ষিত। অপর্ণা কোথায় পালিয়ে গেছে জান?

বিহঙ্গম। পালিয়ে গেছে নাকি! জানি না তো!

রক্ষিত। সত্যি কথা বল।

বিহঙ্গম। সত্যি কথাই বলছি, এই প্রথম শুনলুম।

[রক্ষিত একটি কাগজ ও পেন্সিল আগাইয়া দিলেন]

রক্ষিত। এই কাগজে লিখে দাও যে অপর্ণা কোথা গেছে—তুমি কিছু জানো না। লিখে নিচে নিজের নাম সই করে দাও। [বিহঙ্গম তাহাই করিল] ও-ঘর থেকে ওকেও ডাকো।

[বিহঙ্গম জ্যোৎস্নাভূষণকে আনিল]

রক্ষিত [জ্যোৎস্নাকে]। এইখানে নাম সই কর। [জ্যোৎস্না নাম সই করিল] যাও। [জ্যোৎস্নার সহিত বিহঙ্গমও চলিয়া যাইতেছিল, রক্ষিত বাধা দিলেন] তুমি যেও না। [জ্যোৎস্নাভূষণ চলিয়া গেল] কলেজের কোন কোন ছেলের সঙ্গে অর্পণার ভাব ছিল জানো? সত্যি কথা যদি বল, তা হলে তোমায় ছেড়ে দেব।

বিহঙ্গম। সত্যি কথা বললে বিশ্বাস করবেন?

রক্ষিত। নিশ্চয় করব।

বিহঙ্গম। কলেজের সমস্ত ছেলেরা ওর সঙ্গে ভাব করবার জন্যে পাগল—ও কিন্তু কাউকেই আমল দেয় না। ইন্দ্রলাল তো ক্ষেপে গেছে বললেই হয়—ছকু—

[রক্ষিত পাইপ কামড়াইয়া আত্মসম্বরণ করিলেন]

রক্ষিত। বাজে কথা শুনতে চাই না। কার সঙ্গে ওর সব চেয়ে বেশি মাখামাখি জানো?

বিহঙ্গম। না।

রক্ষিত। যাও—ওঘরে বস গিয়ে তাহলে। স্কাউন্ড্রেল্‌স্‌!

[বিহঙ্গম গট গট করিয়া চলিয়া গেল। রক্ষিত পুনরায় ঘন্টা টিপিলেন। কনেস্টবল আসিল]

রক্ষিত। ইন্দ্রলাল বাবুকো বোলাও।

[রক্ষিত ইন্দ্রলালের পত্রটি পড়িতে লাগিলেন। ইন্দ্রলাল আসিয়া প্রবেশ করিল। ইন্দ্রলালের চেহারা দেখিলেই মনে হয় সে কবি। মাথায় বাবরি চুল, চোখে চশমা, পাঞ্জাবির উপর চাদরটি বেশ কায়দা করিয়া পরিয়াছে। গোঁফ-দাড়ি নাই। তাহাকে কেহই যেন সম্যকরূপে বুঝিতে পারিতেছে না—মুখে চোখে এমনি একটা মর্মাহত ভাব। ইন্দ্রলাল আসিয়া নমস্কার করিল না, সবিস্ময়ে রক্ষিতের মুখের পানে চাহিল]

রক্ষিত। তোমার পুরো নাম কি?

[ইন্দ্রলাল উত্তর দিল না, কেবল একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল]

রক্ষিত। দেখছ কি অমন করে

[ইন্দ্রলাল সম্বিত ফিরিয়া পাইল]

ইন্দ্রলাল [স-সম্ভ্রমে]। আপনিই কি মিস অপর্ণা রক্ষিতের বাবা?

রক্ষিত। হ্যাঁ। তার সম্বন্ধে কি জান তুমি?

ইন্দ্রলাল [গলা খাঁকারি দিয়া]। আপনার মেয়ে অপর্ণা দেবী, মানে [পুনরায় গলা খাঁকারি দিয়া] মানে আমার বিশ্বাস তিনি একজন আদর্শ নারী। আমরা সীতা, সতী, গার্গী, লীলাবতী নিয়ে উচ্ছ্বসিত হই বটে—

রক্ষিত [সপদদাপে]। Shut up!

[ইন্দ্রলাল হকচকাইয়া থামিয়া গেল। রক্ষিত নিষ্ঠুর নিষ্পলক নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটু সাহস সংগ্রহ করিয়া ইন্দ্রলাল পুনরায় শুরু করিল]

ইন্দ্রলাল। আমার কথাটা শুনুন দয়া করে। ইতিপূর্বে আমি দুতিনবার আপনার কাছে আসবার চেষ্টা করেছি কিন্তু আপনার দারোয়ানরা আমাকে ঢুকতে দেয়নি। আজ যখন ভাগ্যক্রমে আপনার কাছে আসতে পেরেছি তখন সমস্ত কথা খুলে বলতে চাই! আমি! মানে—

রক্ষিত। এ চিঠি তোমার লেখা।

[চিঠি দেখাইলেন]

ইন্দ্রলাল। কই দেখি, এ চিঠি আপনি পেলেন কি করে!

[চিঠিখানি লইয়া সাগ্রহে পড়িতে লাগিল। রক্ষিত ভ্রূকুটি-ভীষণ নয়নে চাহিয়া রহিলেন]

ইন্দ্রলাল। কলমটা একবার দেবেন দয়া করে—ও আমার পকেটই তো আছে—চাঁদের চন্দ্রবিন্দুটা পড়ে গেছে তাড়াতাড়িতে—ঠিক করে দি—

[পকেট হইতে কলম বাহির করিয়া সংশোধন করিতে গেল। রক্ষিত উঠিয়া হাত হইতে চিঠিখানা ছিনাইয়া লইলেন]

রক্ষিত [পুনরায় উপবেশন করিয়া]। আমার কথার জবাব দাও! এ চিঠি তোমার লেখা?

ইন্দ্রলাল। ওটা তো আমার বটেই—আরও অনেক চিঠি লিখেছি আমি—এই বিষয়েই তো আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই খোলাখুলি।

রক্ষিত। কি আলোচনা?

ইন্দ্রলাল। আগেই আপনাকে বলেছি, মানে [গাঢ়স্বরে], আমার দৃঢ় ধারণা মিস অপর্ণা রক্ষিত একজন আদর্শ নারী। আমি যেদিন থেকে তাঁর পরিচয় পেয়েছি সেইদিন থেকেই তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধা অসঙ্কোচে নিবেদন করেছি!

রক্ষিত [ক্ষিপ্তকণ্ঠে]। একটি চড়ে তোমার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেব রাসকেল! শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি!

ইন্দ্রলাল। মিস রক্ষিত বলেছিলেন আপনাকে সব কথা অসঙ্কোচে জানাতে, বলেছিলেন যে আপনার যদি অমত না হয়—

রক্ষিত [সবিস্ময়ে]। অমত?

ইন্দ্রলাল। মানে, [একটু ইতস্তত করিয়া] মানে, আমি তাঁকে পত্নীত্বে বরণ করে ধন্য হতে চাই!

রক্ষিত [অধিকতর বিস্মিত]। তার মানে!

ইন্দ্রলাল। [ঢোক গিলিয়া] মানে বিয়ে করতে চাই।

রক্ষিত। বিয়ে করতে চাও! বাই জোভ! অপর্ণাকে?

ইন্দ্রলাল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রক্ষিত। আমার মেয়েকে বিয়ে করবার সঙ্গতি আছে তোমার? তোমার বাবা কি করেন?

ইন্দ্রলাল। চাকরি করেন।

রক্ষিত। মাইনে কত?

ইন্দ্রলাল। আশি টাকা।

রক্ষিত। তুমি কি কর?

ইন্দ্রলাল। থার্ড ইয়ারে পড়ি।

রক্ষিত। ভাই-বোন আছে?

ইন্দ্রলাল। চার বোন, দু ভাই।

রক্ষিত। বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে?

ইন্দ্রলাল। না।

রক্ষিত। তোমার পুরো নাম কি?

ইন্দ্রলাল। ইন্দ্রলাল পোদ্দার।

রক্ষিত। বেনে?

ইন্দ্রলাল। আজ্ঞে হ্যাঁ, গন্ধবণিক।

রক্ষিত। তুমি অপর্ণাকে বিয়ে করতে চাও?

ইন্দ্রলাল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

[রক্ষিত সকৌতুক বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া রহিলেন]

ইন্দ্রলাল। সবই তো খুলে বললাম। এবার আপনি কি করবেন তা যদি—

রক্ষিত। I shall beat you black and blue!

ইন্দ্রলাল। অপর্ণা দেবীর জন্যে যে-কোনো নির্যাতন আমি হাসিমুখে সহ্য করতে—

রক্ষিত। Shut up you fool! অপর্ণা এখন কোথায় আছে জান?

ইন্দ্রলাল। এখন তো কলেজের ছুটি, খুব সম্ভবত বাড়িতে আছেন।

রক্ষিত। ভণ্ডামি করবার চেষ্টা কোরো না—You can't pull my leg! কাল থেকে অপর্ণাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

ইন্দ্রলাল। তাই নাকি!

রক্ষিত। সে কোথা গেছে জানো?

ইন্দ্রলাল। আজ্ঞে না।

রক্ষিত। এই কাগজে নাম সই কর তা হলে—[বিহঙ্গমের লেখা কাগজটি দিলেন] Please remember, you shall have a very nasty time if your statement is untrue।

[ইন্দ্রলাল সহি করিয়া দিল]

ইন্দ্রলাল [সহসা]। আমার কষ্ট হচ্ছে, ভয়ঙ্কর কষ্ট হচ্ছে!

রক্ষিত। যাও, ওই ঘরে গিয়ে বস।

[ইন্দ্রলাল পাশের ঘরে চলিয়া গেল। রক্ষিত পুনরায় ঘণ্টা টিপিলেন, কনস্টেবল আসিল]

রক্ষিত। অমিয়বাবুকো বোলাও

[কনস্টেবল চলিয়া গেল, অমিয় আসিয়া প্রবেশ করিল। অমিয়র বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ, ধরন-ধারণ একটু উদ্ধতগোছের। পরিধানে হাফ সার্ট, কাপড় মালকোচামারা, পায়ে স্যাণ্ডাল, অমিয় একজন স্পোর্টসম্যান]

অমিয়। আমি জানতে চাই আমাদের এমনভাবে ধরে আনবার মানে কি?

[রক্ষিতের চক্ষু দুইটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিল]

রক্ষিত। তোমরা সবাই ক্রিমিনাল!

অমিয়। ক্রিমিনাল?

রক্ষিত। এ চিঠি কার লেখা?

[পত্রটি দেখাইলেন]

অমিয়। কিসের চিঠি দেখি—[দেখিয়া ফিরাইয়া দিল] কার লেখা জানি না।

রক্ষিত। তোমার লেখা নয়?

অমিয়। না।

রক্ষিত। নিচে অমিয় নাম লেখা রয়েছে দেখতে পাচ্ছ না?

অমিয়। আমাদের কলেজে সাতটা অমিয় আছে। ল্যাংড়া অমিয়, কবি অমিয়, অমিয় দত্ত, অমিয় সেন, প্লেয়ার অমিয়, অমিয় নাগ—আর আমি।

রক্ষিত। তোমার নাম কি?

অমিয়। অমিয় ঘোষাল।

[রক্ষিত একটি সাদা কাগজ ও পেন্সিল আগাইয়া দিলেন]

রক্ষিত। বাকি কজনের পুরো নাম আর ঠিকানা লিখে দাও এতে।

অমিয়। কেন?

রক্ষিত। Because I order you to do so.

অমিয়। দেব না।

রক্ষিত। দেবে না!

অমিয়। না, কারো নামে চুকলি খাওয়া আমার স্বভাব নয়।

রক্ষিত। I order you again.

[অমিয় অবিচলিত দাঁড়াইয়া রহিল]

রক্ষিত। যা বলছি তা কর।

অমিয়। এদের নাম নিয়ে কি করবেন?

[রক্ষিত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন]

রক্ষিত। এই অপরাধে তোমার জেল হয়ে যেতে পারে তা জান?

অমিয়। অপরাধটা কি?

রক্ষিত। You are refusing to help law and justice.

অমিয় [নির্বিকারভাবে]। জেলে যেতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। নন-কো-অপারেশনের সময় ছমাস খেটেও এসেছি।

রক্ষিত। তুমি এদের নাম লিখে দেবে, কি দেবে না?

অমিয়। দেব না।

রক্ষিত [চিঠিটা তুলিয়া]। তুমি বলছ এ চিঠি তোমার লেখা নয়?

অমিয়। না। কিন্তু মিথ্যে কথা বলতেও আমার আপত্তি নেই। ও-চিঠি আমার লেখা স্বীকার করলেই যদি বখেড়া মিটে যায় স্বীকার করতে রাজী আছি।

রক্ষিত। আমার মেয়ে অপর্ণা কোথায় আছে জানো?

অমিয়। আপনার মেয়ে অপর্ণা কোথায় আছে আমি কি করে জানব? আপনারই জানবার কথা—

রক্ষিত। দেখ, বেশি কথা যদি বল —I shall tear out your dirty tongue! আমার মেয়ে কোথায় আছে জানো কি? Yes or no?

অমিয়। না।

রক্ষিত। অপর্ণার বিষয়ে কি জান?

অমিয়। অনেক কিছু জানি, কিন্তু বলব না।

রক্ষিত। I know how to break you and your like, যাও, ওঘরে বস গিয়ে এখন। রাসকেল্‌স।

[ঘন্টা টিপিলেন। কনস্টেবল আসিল। কনস্টেবলের সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণা আসিয়া প্রবেশ করিল এবং তাহার পিছু পিছু অধ্যাপক মঙ্গলময় দাস]

রক্ষিত। এ কি অপর্ণা

অপর্ণা [হাসিয়া]। আমরা দুজনে তোমাকে প্রণাম করতে এলুম বাবা।

রক্ষিত। তার মানে?

[মঙ্গলময় খুব সপ্রতিভভাবে আগাইয়া আসিলেন]

মঙ্গলময়। আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করেছি।

[রক্ষিত সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন অপর্ণার মাথায় সিঁদুর রহিয়াছে]

রক্ষিত। বিয়ে করেছেন! আপনি! আমার মেয়েকে!

মঙ্গলময়। আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেক আগে থেকেই ঠিক করেছিলাম আমরা।

অপর্ণা [আবদার-তরল কণ্ঠে]। তুমি রাগ করতে পাবে না বাবা।

রক্ষিত [মঙ্গলময়কে]। আপনি ওর প্রফেসার না?

মঙ্গলময় [স্মিতমুখে]। তাতে কি হয়েছে? শাস্ত্রে শিষ্যার স্ত্রী হতে বাধা নেই।

রক্ষিত। এমনভাবে লুকিয়ে বিয়ে করার মানে?

মঙ্গময়। আপনাকে বললে আপনি বিয়ে দিতে রাজী হতেন না।

[রক্ষিত গুম হইয়া রহিলেন]

অপর্ণা [আবদারমাখা সুরে]। রাগারাগি কোর না বাবা।

রক্ষিত। আমি মত দিতুম না জানলেন কি করে আপনি? পাত্র হিসেবে আপনি খারাপ নন।

মঙ্গলময়। কিন্তু জাতে আমি সদগোপ, আপনারা কায়স্থ!

রক্ষিত। সদগোপ—অ্যাঁ—বলেন কি! সদগোপ আপনি! সদগোপ!

মঙ্গলময়। আইন অনুসারে তাতে কোনো বাধা নেই। আপনার মেয়ে মাইনর নয়, সে স্বেচ্ছায় আমাকে বিয়ে করেছে—আইন অনুসারে আমাদের ম্যারেজ রেজিস্টার্ড হয়েছে। [হাসিয়া] বে-আইনি কিছু করিনি।

রক্ষিত। No no, this cannot be, I want an explanation for all this, [প্রায় চিৎকার করিয়া] do you hear, I want an explnation!

[কেহ কোনো উত্তর দিল না। রক্ষিত পাইপটায় দুবার টান দিলেন—ধোঁয়া বাহির হইল না। ছাত্র চারিজন দ্বারের নিকট আসিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রফেসারের সহিত চোখাচোখি হইবামাত্র সকলে যুগপৎ তাঁহাকে নমস্কার করিল]

সকলে [স-সম্ভ্রমে]। নমস্কার মাস্টার মশাই!

সরীসৃপ

বিধায়ক ভট্টাচার্য

চরিত্রলিপি

সারদাসুন্দরী	সেকালের নাট্যসম্রাজ্ঞী লোকে 'ম্যাডাম' বলে ডাকে
নিকুঞ্জ	সেকালের প্রখ্যাত নায়ক
নোংরা	যুবক চোর
মাতাল	মঞ্চে আসবে না
বৃদ্ধ	পরে যার নামকরণ হবে রামকৃষ্ণ ভিখিরি
সুখন, ভোলা, মাণিক	মস্তানের দল
চাঁপা	ভেসে আসা ফুলের মতো একটি তরুণী
অফিসার	ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের কর্মচারী

সেটঃ অধুনা নিশ্চিহ্ন মনোমোহন থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহ-সংলগ্ন একটি ঘর।
সময়ঃ রাত নটা থেকে ভোর।

[মনোমোহন থিয়েটার....

বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যশিল্পীদের রস-সৃষ্টির পাদ-প্রদীপ। এখনো কিছুটা তার দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু আর বুঝি থাকে না।

ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট সোজা রাস্তা বার করে বাগবাজারের খালধারে নিয়ে যাবেই। নির্মম হাতে বাড়ি, ঘর, প্রাসাদ, বস্তি ভাঙতে ভাঙতে মনোমোহন থিয়েটারকে স্পর্শ করেই পথ থমকে দাঁড়িয়েছে। একটু একটু চক্ষু লজ্জাই দেখা দিল বোধ হয়। থিয়েটারের দিকে চাইলে মনে হবে যেন একটা ভয়ঙ্কর দৈত্য থাবা মেরে সামনের দিকটা ভেঙে চুরমার করে দিয়ে চেয়ে চেয়ে ভাঙনটাকে দেখছে। কাজেই সবটা যায়নি এখনো মনোমোহন থিয়েটারের। পেছন দিকে প্রেক্ষাগৃহের কিছুটা ও তার উত্তরে দুএকখানি ঘর এখনো অক্ষত আছে। বিডন স্ট্রিট থেকে সেখানে পৌঁছতে হলে অনেক ইঁট, কাঠ, পাথর, সুড়কি ও রাবিশের জঙ্গল পার হয়ে যেতে হয়। দিনের বেলায় একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, রাবিশের মধ্যে দিয়ে একটু যেন পথের রেখা। বোঝা যায়—ওই পরিত্যক্ত ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে দিয়েই হয়তো দুচারটি লোকজন যাতায়াত করে। সাধারণ মানুষের ওই পথের রেখাটুকু দেখলে মনে হবে, এর মধ্যে যারা বাস করতে পারে—তারা মানুষ নয়—অন্য কিছু। কথাটা একটুও অতিরঞ্জিত নয়। বিডন স্ট্রিট পাড়ায় সবে সন্ধ্যা হয়েছে। রাস্তায় প্রচুর আলো, কিন্তু ভাঙা মনোমোহন থিয়েটারের ভগ্নস্তূপের ওপর অন্ধকারটা তত গাঢ় নয়। আকাশে একফালি চাঁদ। তারই আলোতে থিয়েটারের রাবিশ মায়াময় হয়ে উঠেছে।

প্রেক্ষাগৃহ সংলগ্ন ঘরখানিতে একটি বড় মোমবাতি জ্বলছে। টুলের ওপর বাতি। এক প্রৌঢ়া চুপ করে বসে আছেন দড়ির খাটিয়ার ওপর। তাঁকে দেখলে মনে হয় মেক আপ করেছেন। নিঃশব্দে বসে আছেন পাথরের মূর্তির মতো। যেন অভিনয় শেষ করে এখন বিশ্রামের পালা। বৃদ্ধার নাম সারদাসুন্দরী। সেকালের অত্যন্ত নামকরা অভিনেত্রী। লোকে 'ম্যাডাম' বলে জানে। চিরকাল নায়িকার পার্ট করেছেন। মুখের দিকে চাইলে দেখা যায় অসাধারণ ব্যাক্তিত্বের স্পর্শ এখনো লেগে আছে।

খাটিয়া থেকে ম্যাডাম উঠলেন। গেলেন বন্ধ দরজার কাছে। খিল খুলে পাল্লা দুটি মেলে ধরলেন। চাঁদের আলো এসে পড়ল ঘরের মেঝেতে। তিনি পায়ের দিকে চেয়ে আলোটা দেখলেন, তারপর বাইরের দিকে খানিকটা চেয়ে থাকলেন। ঘোড়ার গাড়ির শব্দ হচ্ছে। তিনি দরজা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে এসে বসলেন খাটিয়ার ওপর। আবার উঠলেন। ঘরের কোণে একটা ভাঙা আলমারির ডালা খুলে আধখানা পাঁউরুটি বার করে কিছুক্ষণ সেটিকে দেখে—আবার রেখে দিয়ে ফিরে গিয়ে বসলেন খাটিয়াতে।

খুট্ করে দরজায় শব্দ হল। ম্যাডাম সেদিকে চেয়ে কি ভাবলেন। তারপর উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। ঘরে ঢুকলেন একজন বৃদ্ধ। ম্যাডাম দরজা বন্ধ করে ঘুরে চাইলেন বৃদ্ধের দিকে। বৃদ্ধ কিন্তু সেদিকে ফিরেও চাইলেন না। গায়ের পাঞ্জাবিটা খুলে পেরেকে ঝুলিয়ে রাখলেন। গায়ে দেখা গেল শতছিদ্র একটা ময়লা ফতুয়া। পকেট থেকে বিড়ি আর দেশলাই বার করে ধরিয়ে একটা ভাঙা প্যাকিং বাক্সে বসে নিঃশব্দে অন্য দিকে চেয়ে টানতে লাগলেন। ম্যাডাম গিয়ে বসলেন খাটিয়াতে। হঠাৎ বৃদ্ধ ম্যাডামের দিকে না চেয়ে বললেন]

বৃদ্ধ। খবরটা ঠিকই। কাল ভোর থেকে শুরু করবে।

ম্যাডাম। ঠিক খবর?

বৃদ্ধ। হ্যাঁ।

ম্যাডাম। তাহলে উপায়?

[বৃদ্ধ ঠোঁট উল্টে একটা হতাশার ভঙ্গি করে আবার বিড়ি টানায় মন দিলেন। ম্যাডাম শুয়ে পড়লেন খাটিয়ার ওপর, আর বৃদ্ধের বিড়ি টানার বেগ কমে কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ল। দেখা গেল বৃদ্ধ চোখ বুঁজে মাঝে মাঝে বিড়ি টানছেন। কিন্তু বোঝা যায় তিনিও কি একটা গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছেন। হঠাৎ বিড়িটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন]

বৃদ্ধ। আজ আমরা ঠিক তিনমাস এখানে আশ্রয় নিয়েছি। না ম্যাডাম?

বৃদ্ধ। হ্যাঁ। তিন মাস সতেরো দিন। অথচ আশ্চর্য! একবারও মনে হয়নি আমাদের যে এটা সাময়িক আশ্রয়। এখানে বাসা বাঁধা একটা বিরাট বোকামি।

ম্যাডাম। তখন তো এ ছাড়া আর কোনো উপায়ও ছিল না নিকুঞ্জ!

নিকুঞ্জ। না, তা অবিশ্যি ছিল না। কিন্তু একথা ভাবাও তো শক্ত যে, নতুন রাস্তা আমাদের বাড়ি-ঘরদোর সব ভেঙে মাঠ করে দেবে, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের টাকাগুলো আমার দুই ছেলে আর বৌ ভাগ করে নিয়ে আমায় পথে বার করে দেবে। আর আমি! আমি নিকুঞ্জ নাগ,—গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখরের সঙ্গে পার্ট করেছি। এই খানে—এই মনোমোহন থিয়েটারে বোর্ডে দাঁড়িয়ে দর্শকের হাততালি কুড়িয়েছি,—সেই আমি এসে আশ্রয় নেব—

ম্যাডাম। এই ভাঙা মনোমোহন থিয়েটারের ভেতরে।

নিকুঞ্জ [বিরক্ত হয়ে]। বাজে বোকোনা। সবটা ভাঙেনি এখনো।

ম্যাডাম। সবটাই ভাঙবে। মনোমোহনের মোহনটুকু সামনের দিকে ছিল, ভেঙে ফেলেছে। ভেতরে ছিল মন, তা তুমি তো খবর এনেছ সেই মনটুকুও কাল সকাল থেকে ভাঙবে।

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, কাল সকাল থেকেই ভাঙা সুরু হবে। [একটু থেমে] আমি আজকাল আর আমার কথা ভাবিনে ম্যাডাম। ভাবি তোমার কথা।

ম্যাডাম। আর ভেবো না।

নিকুঞ্জ। না ভেবে পারছি কই? বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের নাট্য-সম্রাজ্ঞী সারদাসুন্দরী ওরফে ম্যাডাম।—এই স্টেজে দাঁড়িয়ে লক্ষ লক্ষ লোককে তুমি হাসিয়েছ, কাঁদিয়েছ।—তোমাকে বাংলা স্টেজ ভুলে গেল কী করে?

ম্যাডাম। কেন? কাগজেই তো পড়েছ যে, নিকুঞ্জ-সারদা সুন্দরীর বস্তা পচা অ্যাক্টিং আর চলবে না। দেশে নব নাট্যের নতুন হাওয়া বহিতেছে—

নিকুঞ্জ। কেন? এইতো কিছুদিন আগেই বুড়ো বয়সে আমরা শচীন সেনগুপ্তের 'রক্তকমল' যখন করলাম, তখনো কি নতুন হাওয়া বয়নি? সেই যে নজরুলের গানটা—আহা, কি যেন গো?

ম্যাডাম। "কেউ ভোলে না কেউ ভোলে অতীত দিনের স্মৃতি।
কেউ দুখ লয়ে কাঁদে, কেউ ভুলিতে গায় গীতি।"

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ-হ্যাঁ! অতীতদিনের স্মৃতি কেউ ভোলে না কেউ ভোলে।

[নিকুঞ্জ নাগ চুপ করে দর্শকের দিকে চেয়ে যেন ওই গানটাই মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহের পেছন থেকে গান ভেসে এল মেয়েলি গলায়। অতীতের স্মৃতি গান হয়ে ফিরে এল]

কেউ জ্বালেনা আর আলো
তার চির দুখের রাতে—
কেউ দ্বার খুলি জাগে....
চায় নব চাঁদের তিথি
কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে।

[যাঁরা এই নাটিকা অভিনয় করবেন, তাঁদের একটা কথা মনে রাখতে হবে। প্রেক্ষাগৃহের পেছনে, মফঃস্বলে একজন অভিনেতা, একজন অভিনেত্রী এবং একজোড়া মেয়ে-পুরুষ গাইয়ের বসবার জায়গা দিতে হবে। দর্শক দেখতে পাবে না তাঁদের। নাটকের প্রয়োজনে তাঁদের আবৃত্তি ও গান করতে হবে। অবশ্য গ্রামে সেখানে ইলেকট্রিক নেই—সেখানকার জন্য এই ব্যবস্থা। বিদ্যুৎ থাকলে মাইকে গাইতে হবে। স্পীকার থাকবে দর্শকের পেছনে। শহরে অবশ্য মাইকে কিংবা টেপ রেকর্ডে গাইবে। কিন্তু স্পীকারটাকে অডিটোরিয়ামের পেছনের দেওয়ালের গায়ে রাখতেই হবে। স্বর এমন মৃদুভাবে নিয়মিত হবে, যাতে মনে হয় বহুদূর থেকে, তার মানে অতীত থেকে, ভেসে আসছে এইসব টুকরো গান আর অ্যাক্টিং]

[নিকুঞ্জ আর ম্যাডাম দুজনেই অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইলেন। একটু পরে ম্যাডাম বললেন]

ম্যাডাম। ভারী অদ্ভুত লাগে ভাবতে, না নিকুঞ্জ? এইতো সেই মনোমোহন থিয়েটারের অডিটোরিয়াম! স্তব্ধ, শূন্য, নির্জন। কে বলবে আজ—যে এখানে আগে হাজার বাতি জ্বলত। আজো এর শূন্যে—বোবা হয়ে, বন্দী হয়ে আছে—গিরিশবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু, অমরবাবু, চুনীবাবু, তারাসুন্দরী, নরীসুন্দরী, কুসুমকুমারী, বড় সুশীলা, দানীবাবু, ভুনীবাবুর কণ্ঠ। এইতো সেদিনও ইন্দু গান গেয়ে পাগল করে দিয়ে গেছে মানুষকে।....সবশেষ! কাল সকাল থেকে রোলার চলবে আবার।

নিকুঞ্জ। রোলার চলবে। ঠিকই বলেছ ম্যাডাম। মোহনকে চুরমার করেছে, কাল থেকে ভাঙবে মনোমোহনের মনকে। ভাঙুক। মোহনকে ছেড়ে মনের বেঁচে থেকে লাভ নেই। [একটু থেমে] উঃ! আজ যেন বড্ডো শীত পড়েছে, না?

[ম্যাডাম উঠে এসে নিকুঞ্জের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এইবার ফিরে গিয়ে বসলেন আবার]

নিকুঞ্জ। র‍্যাপার আছে তোমার কাছে, র‍্যাপার?

ম্যাডাম। না।

নিকুঞ্জ [চটে গিয়ে]। কেন? তোমার তো অনেকগুলো কাশ্মিরী গায়ের কাপড় ছিল! কী হল সেগুলো?

ম্যাডাম। ছেলে আর বৌ রেখে দিয়েছে।

নিকুঞ্জ। ছেলে বোল না। বল পিলে। পালিত পুত্রকে ছেলে বললে, ছেলের অপমান করা হয়। [ম্যাডাম কথার জবাব দিলেন না] তখন পই পই করে বারণ করেছিলাম। বলেছিলাম ম্যাডাম, ডাস্টবিনের ধারে যে ছেলে কুড়িয়ে পাওয়া যায়, সে ছেলে নিশারানীর হোক,—কী শশিবাবুর হোক,—তারা তো তাকে পথে ফেলে দিয়ে

গেছে। তাকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে নিজের ছেলে বলে মানুষ করে, তার বিয়ে দিয়ে, তার পরে যথাসর্বস্ব তাদের হাতে তুলে দিয়ে—। কী খাওয়া হবে রাত্তিরে?

ম্যাডাম। আধখানা পাঁউরুটি আছে। আমি খাইনি।

নিকুঞ্জ। কেন?

ম্যাডাম। খিদে নেই।...বাইরে বেরিয়ে কিছু পাওনি বুঝি?

নিকুঞ্জ। না।

ম্যাডাম। তাহলে আজ রাত্রেও হরিমটর?

নিকুঞ্জ। তা আমি কী করব?

[গিয়ে বসলেন টুলটায়। একটা বিড়ি মুখে দিয়ে দেশলাই খুঁজলেন, পেলেন না। বিড়িটা গুঁজে রাখলেন। তারপর বললেন—]

নিকুঞ্জ। আফটার অল আই অ্যাম এ হিউম্যান বিয়িং। ইম্‌পসিবল কিছু আমার দ্বারা হবে না। সেই বেলা দুটো থেকে পরিচিত বন্ধুবান্ধবের কাছে ঘুরেছি। কিন্তু পাঁচটা টাকা দূরে থাক—পাঁচটা পয়সাও কেউ দিতে চাইল না। [একটু থেমে] অটলকে মনে আছে?

ম্যাডাম। অটল? কে অটল?

নিকুঞ্জ। আরে অটল পান। আমাদের স্টেজে শিফ্‌টার ছিল। সে এখন শিষমহল থিয়েটারের ম্যানেজার।

ম্যাডাম। ম্যানেজার! অটল পান?

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ। পাঁচটা টাকা চাইলাম। বললে—এভাবে তো পয়সা-কড়ি দেওয়া যায় না নিকুঞ্জবাবু। তার চাইতে এক কাজ করুন। আমি আপনাদের থিয়েটারে শিফ্‌টারের কাজ করেছি, এবার না হয় আপনি আমার থিয়েটারে সিন শিফ্‌টিং টিফ্‌টিংগুলো করুন। কাজও পেলেন, পয়সাও পেলেন।

ম্যাডাম। অটল বললে এই কথা? তোমাকে?

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ।

ম্যাডাম। যাঃ!

নিকুঞ্জ। বিশ্বাস কর, অটল বলেছে এই কথা।

ম্যাডাম। তুমি কি জবাব দিলে?

নিকুঞ্জ। কিছুক্ষণ চুপ করে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে চলে এলাম। কথা বলবার দিন তো ফুরিয়ে গেছে আমাদের ম্যাডাম! এবার শোনার দিন এল। যখন কথা বলবার দিন ছিল, তখন এইখানে, এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বলেছি। আমি বলেছি, তুমি বলেছ, আর হাজার হাজার লোক মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে শুনেছে।

[দুজনেই হঠাৎ চুপ করে গেলেন। আবার প্রেক্ষাগৃহের পেছন থেকে ধ্বনিত হয়ে উঠল রিজিয়ার অভিনয়াংশ। যাঁরা এই নাটক অভিনয় করবেন, তাঁদের মনে রাখতে হবে, এই গান, আবৃত্তি, যা ভেসে আসবে, সেগুলি এই বৃদ্ধ অভিনেতা-অভিনেত্রীর মনে যে কথা, যে তরঙ্গ, যে চিন্তা উঠছে, সেই স্মৃতির বাণীরূপ।

টেপ রেকর্ডে অথবা মাইকে এঁদেরই গলা শোনা যাবে। এই অ্যাকটিং সে যুগের একটু সুরেলা অ্যাকটিং হবে]

রিজিয়া [ম্যাডামের গলা]। বক্তিয়ার! বক্তিয়ার! এখনো কি বুঝ নাই রিজিয়ার মন? ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নি যথা পাংশু আবরণে রাখে লুকাইয়া আপন দাহিকা শক্তি, স্পর্শমাত্রে ভস্ম করে সব; রিজিয়াও সেইরূপ হাসি দিয়ে রেখেছে ঢাকিয়া হৃদয়ের তেজ। আরে, আরে, ঘৃণিত তাতার! জাননা কি রিজিয়ার নয়নের কণামাত্র জ্যোতি—স্পর্শমাত্র দহিবারে পারে শত শত তাতারেরে?

বক্তিয়ার [নিকুঞ্জের গলা]। শাহাজাদি! সম্রাটনন্দিনি! মৃত্যুভয় দেখাও কাহারে? জান না কি তাতার বালক মাতৃঅঙ্ক হতে ছুটে যায় সিংহ শিশুসনে করিবারে মল্ল রণ? তুমি দিল্লীশ্বরী। কটাক্ষে তোমার শত শত তাতারের হৃদয় শোণিতে বধ্য-ভূমি হইবে রঞ্জিত; কিন্তু যদি এই রক্ষীশূন্য কক্ষে এই দণ্ডে নিষ্কোষিত অসি মম দ্বিখণ্ডিত করে তব শির—কি করিতে পার তুমি?

রিজিয়া। কি করিতে পারি আমি। আরে, আরে, বাতুল তাতার! এই বাম পদাঘাতে ক্ষুদ্র পতঙ্গের মতো এই দণ্ডে তোমারে দলিতে পারি। মুর্খ বক্তিয়ার! বাসনা যদ্যপি তব, দেখ প্রত্যক্ষ প্রমাণ—কি করিতে পারি আমি।

[বাঁশির শব্দ। পরক্ষণেই রিজিয়ার খিল খিল হাসি শোনা গেল ও মিলিয়ে গেল। খাটিয়ার উপর ম্যাডাম বসেছিলেন, দুহাতের মধ্যে মুখ ঢেকে। নির্বিকার চিত্তে নিকুঞ্জ বিড়ি টানছিলেন। এইবার মুখটা ঘুরিয়ে ম্যাডাম বললেন]

ম্যাডাম। রিজিয়াটা অনেক—দিন চলেছিল, না?

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ।

ম্যাডাম। কত কথাই যে মনে পড়ে। একদিন প্লের পর ঘরে বসে বিশ্রাম করছি—এমন সময় পাঁচি এসে বললে—গিরিশবাবু এসেছেন। ঘরে ঢুকলেন। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে প্রণাম করলাম। অনেকক্ষণ চুপ করে মুখের দিকে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললেন—সারদা, আজ তোমার অভিনয় দেখে মনে হল—তুমিই বোধ হয় দিল্লিতে রিজিয়া হয়ে জন্মেছিলে। জাতিস্মরের যেমন সব কথা মনে পড়ে, তেমনি করে তোমারও বোধহয় সব মনে পড়ছে। এই বলে একটু থেমে বললেন—অ্যাকটিংটা হয়, চরিত্রও হয়, কিন্তু ওই অ্যারিস্টক্র্যাসিটা অভিনয় করা যায় না। তুমি সেইটেই পেরেছ।

নিকুঞ্জ। তারপর তো বোধ হয় তুমি—ওঁর সঙ্গে অভিনয়ও করেছিলে?

ম্যাডাম। হ্যাঁ, পাঁচ-সাতখানা বই করেছি। আহা! জ্ঞানের সমুদ্র! আর কি শেখানোর কায়দা! মুস্তফী সাহেবও খুব ভাল শেখাতেন, ভুনীবাবুও বেশ শেখাতেন। কিন্তু গিরিশবাবু—গিরিশবাবু।

[হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন]

ম্যাডাম। নিকুঞ্জ!

নিকুঞ্জ। বল!

ম্যাডাম। বাংলা দেশের লোকগুলো কি সব মেয়েছেলে হয়ে গেল? বল, বীর্য, ক্ষমতা বলে আর কিছুই নেই তাদের?

নিকুঞ্জ। কেন?

ম্যাডাম। নইলে—এই মনোমোহন থিয়েটার, বাংলা দেশের বাঙালি জাতির এত বড় একটা কীর্তি, এটাকে রক্ষা করবার কথা কেউ বললে না? বাড়ির মালিক না হয় চাপে পড়ে—বাড়ি বিক্রি করতে পারে। কিন্তু দেশের লোক? তাদেরও কি দাঁত বার করে দেখা ছাড়া আর কিছু করবার ছিল না?

নিকুঞ্জ। কী করবে? কলকাতাকে বাড়াতে হবে, বড় বড় রাস্তা চাই। ভাঙনের মুখে—

ম্যাডাম। আমি তো শুনলাম—আমাদের গিরিশবাবুর বাড়িও নাকি এই পথে পড়বে। তখন?

নিকুঞ্জ। তখন আমার কি? সে বাড়িও ভাঙবে।

ম্যাডাম। ওমা! সে বাড়ি ভাঙবে কী গো? সে বাড়িতে যে ভগবান রামকৃষ্ণের পায়ের ধুলো পড়েছে!

নিকুঞ্জ। পায়ের ধুলো—পথের ধুলোর সঙ্গে মিশে যাবে ম্যাডাম! ভগবান রামকৃষ্ণ নিজেই তো ধুলো হয়ে গেছেন। তাঁর পায়ের ধুলো—ধুলো হবে—আশ্চর্য কি।

ম্যাডাম। সেদিনও বাঙালি কিছু বলবে না?

নিকুঞ্জ। না।

ম্যাডাম। ধর যদি এটা বাংলা না হয়ে বিলেত হত, আর বাড়িটা গিরিশবাবুর না হয়ে শেকসপীয়রের হত! তাহলে?

নিকুঞ্জ। তাহলে বাড়ি ভাঙতো না, মাথা ভাঙতো।

[একটুকাল নিকুঞ্জের মুখের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ ম্যাডাম বলে উঠলেন]

ম্যাডাম। ওঃ। ভীষণ শীত করছে আমার। বেশ কষ্ট হচ্ছে নিকুঞ্জ!

[এই বলে খাটিয়ার কাছে গিয়ে তার তলা থেকে একটা পুরোনো তোরঙ্গ টেনে বের করলেন। সেটাকে খুলে, তাঁর মধ্য থেকে একটা ছেঁড়া এবং জীর্ণ কাশ্মিরী শাল বার করে গায়ে জড়িয়ে বসলেন। তারপর নিকুঞ্জের দিকে চেয়ে আবার তোরঙ্গ থেকে বার করলেন আর একখানি দামী জীর্ণ তুষের আলোয়ান। ছুঁড়ে দিলেন নিকুঞ্জকে। বললেন]

ম্যাডাম। জড়িয়ে বস।

[নিকুঞ্জ জড়িয়ে নিচ্ছে। এমন সময় দরজায় জোরে করাঘাত শোনা গেল। চমকে উঠলেন দুজনে। আজ তিনমাস এখানে তাঁরা বাস করছেন, কিন্তু এমন ঘটনা ঘটেনি। করাঘাত দ্রুততর হল। মনে হয়, যে করাঘাত করছে, তার বোধহয় দাঁড়াবার সময় নেই। নিকুঞ্জ উঠে দরজার দিকে চললেন]

ম্যাডাম। একটু দাঁড়াও!

নিকুঞ্জ [থেমে]। কী?

ম্যাডাম। দরজা খুলতে যাচ্ছ, যদি পুলিশ হয়?

নিকুঞ্জ। হলে—?

ম্যাডাম। এক্ষুণি জিনিসপত্র টান মেরে বাইরে ফেলে দিয়ে—আমাদের ঘর থেকে বার করে দেবে।

নিকুঞ্জ। কেন?

ম্যাডাম। বাঃ! আমরা তো অনধিকার প্রবেশ করেছি! বেআইনী ভাবে বাস করছি তো আমরা?

নিকুঞ্জ [হঠাৎ বুঝতে পেরে]। হ্যাঁ-হ্যাঁ-অ্যাঁ! তাহলে কি করা যায়?

[করাঘাত একটু থেমেছিল। আবার শুরু হল]

নিকুঞ্জ। যা হয় হবে ম্যাডাম। খুলে দিচ্ছি।

[দরজা খুলে দিতেই হুড়মুড় করে একটি বছর উনিশ-কুড়ির যুবক ঢুকে পড়ল। জামাটা ছিঁড়ে ফাত্তাফাঁই হয়ে গেছে। কপাল কেটে রক্ত জমে গেছে। একটা চোখ ফুলে চোখটাই ঢাকা দিতে চলেছে। ছেলেটি ঢুকেই ত্রস্ত গলায় বলল]

ছেলেটি। বন্ধ করুন, বন্ধ করুন, শিগগির দরজা বন্ধ করুন।

নিকুঞ্জ। কে তুমি? এখানেই বা এলে কী করে? এই ভাঙা বাড়ির মধ্যে—

ছেলেটি। বলছি, সব বলছি। আগে দরজাটা বন্ধ করুন না!

[নিকুঞ্জ দরজা বন্ধ করলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাইরে কথা শোনা গেল—প্রত্যেকটি বিভিন্ন কণ্ঠ হলে ভাল হয়।]

যাঃ, শালা এদিকটা তো সব ভাঙা!

কোথায় গেল বল্ দিকিনি—ছোঁড়াটা।

তৈরি মাল।

শালা! শুয়োরের বাচ্চা!

তোকে বললাম খ্যাঁদা—ব্যাটাকে শক্ত করে ধরে রাখ। তোর আবার সিগরেট খাবার বাই উঠল। নে, এখন যত পারিস সিগরেট খা।

আমি কি জানি যে শালা সাপের মতো ফস করে কোনো গর্তে গিয়ে ঢুকে পড়বে?

আরে এখানে যে একটা ঘর দেখতে পাচ্ছি। এটাতো ভাঙেনি! ডেকে দেখব নাকি কেউ আছে কি না?

[ম্যাডাম চট করে উঠে ফুঁ দিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিলেন। ঘর অন্ধকারে ভরে গেল]

ওরে বাবা! আর ডেকে দরকার নেই। এটা মনোমোহন থিয়েটার। ভূতের আড্ডা।

ভূতের আড্ডা মানে?

ভূতের আড্ডা মানে, যত অ্যাকটর অ্যাকট্রেস মরেছে সব.....

[নিকুঞ্জ দেশলাই জ্বেলে আবার মোমবাতি ধরালেন। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে শোনা গেল—]

ওরে পালিয়ে আয়। দেখছিস নে ঘরের মধ্যে একবার আলো জ্বলছে আর নিবছে। ওরে বাবা।

[অনেকগুলো পলায়মান পায়ের শব্দ শোনা গেল। বাইরে ঝিঁঝিঁর ডাক স্পষ্ট হয়ে উঠল। নিকুঞ্জ ফিরে টুলে বসলেন। ছেলেটি দরজার পাশে দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে]

নিকুঞ্জ। তুমি চোর?
ছেলেটি। হ্যাঁ।
নিকুঞ্জ। কী চুরি কর?
ছেলেটি। যখন যা পাই।
নিকুঞ্জ। আজকে?
ছেলেটি। একটা টাইম পিস্। বিক্রি করলে দশটা টাকা নিশ্চয় হত। কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় শালা দরজায় ক্যাঁচ করে শব্দ হয়ে গেল কিনা, তাই ধরা পড়ে গেলাম।
নিকুঞ্জ। কপালে ওটা কী?
ছেলেটি। রক্ত। ওই ওরা মেরেছে তো? তাই—
নিকুঞ্জ। বাঃ!
[ম্যাডাম উঠে গিয়ে কোণের কুঁজো থেকে একটা কলাই করা চটা ওঠা গেলাসে জল নিয়ে এলেন। বললেন]
ম্যাডাম। এই জল নিয়ে রক্তটা ধুয়ে ফ্যালো। জামাটাও কি ওরাই ছিঁড়ে দিয়েছে?
ছেলেটি। হ্যাঁ।
[গেলাস নিয়ে ফুটলাইটের কাছে এসে হাতে জল নিয়ে রক্ত মুছে ফেলল। বাকি জলটুকু এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলল। গেলাসটা ফেরত দিল ম্যাডামকে]
ম্যাডাম। তোমার নাম কী?
ছেলেটি। আমার নাম? নোংরা।
নিকুঞ্জ। নোংরা মানে?
ছেলেটি। নোংরা মানে নাম। আমার নাম।
ম্যাডাম। আমি তা বলিনি। বলছি—তোমার ভাল নাম কি?
নোংরা। ভাল নাম ভাল লোকে দেয়। শালা—ভাল লোকই নেই তো ভাল নাম থাকবে কি করে।
ম্যাডাম। তোমার বাবা-মা নেই?
নোংরা। না। ওস্তাদের কাছে শুনেছি—আমাকে চুরি করে আনা হয়েছিল। তাই...
[ম্যাডাম তৎক্ষণাৎ ফিরে গেলেন তাঁর খাটিয়ায়। গেলাসটা মাটিতে রাখলেন। তারপর দুই হাতের তালুর মধ্যে নিজের গাল দুটো রেখে চেয়ে রইলেন নোংরার দিকে]
নিকুঞ্জ। তা এখানে মরতে ঢুকলে কেন?
নোংরা। মরতে ঢুকব কেন গো? ঢুকেছি তো বাঁচবার জন্যে!
ম্যাডাম [হেসে উঠে]। বেশ কথা বল তো! অথচ আমরা এখানে ঢুকেছি কেন জান?
নোংরা। কেন?
ম্যাডাম। মরবার জন্যে!
নোংরা। না, না। মিথ্যে কথা বলছো।
[ম্যাডাম হাসলেন আবার]

নিকুঞ্জ। চলে যাও এবার।

[ম্যাডাম চমকে উঠে কী যেন বলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু না বলে চুপ করে গেলেন]

নোংরা। কী করে যাব?

নিকুঞ্জ। কেন? পায়ে হেঁটে!

নোংরা। এখান থেকে বেরোলেই তো ওরা আবার ধরে ফেলবে।

নিকুঞ্জ [জ্বলে উঠলেন]। হ্যাঁ, ধরে ফেলবেই তো! চুরি করেছ, অথচ শাস্তি পাবে না—তা তো হয় না। আব্দার, না? এই বয়সে চুরি করতে শিখেছ। চোরের সব রকম সাজাই পেতে হবে! না-না, এখানে থাকা তোমার চলবে না। আমাদের নিজেদের খাবার-থাকবার কোনো জায়গা নেই। কাল কী করব, কোথায় যাব, তার স্থিরতা নেই। এই সময় নতুন করে তোমাকে নিয়ে—[হঠাৎ থেমে গিয়ে] আচ্ছা থাকো।

[নোংরা খুশি হয়ে দুপা ঘুরে বেড়াল। তারপর জামাটা ছাড়ল। তলায় কোনো গেঞ্জি নেই বলল—]

নোংরা। ভীষণ খিদে পেয়েছে। কাল রাত্তির থেকে কিছু খাইনি।

নিকুঞ্জ। ব্যাস্! তবে আর কী? এবার যাই, এই রাত্রে বেরিয়ে তোমার জন্যে রাবড়ি যোগাড় করে আনি!

নোংরা [লজ্জা পেল যেন]। না, রাবড়ি অবশ্য দেখেছি বড় বড় দোকানে। সাদা মতো। সর ভাসে। খাইনি কখনো। কী করে খাব? শালার রাবড়ি চুরি করা যায় না।

ম্যাডাম [রুটিটা নিয়ে]। এই যে নাও।

নোংরা। রুটি?

ম্যাডাম। হ্যাঁ। খাও।

নোংরা। আমি খেলে তুমি—আপনি কি খাবেন?

ম্যাডাম। আমাদের না খেলেও চলবে। তুমি তো বললে কাল রাত্তির থেকে কিছু খাওনি!...খাও।

[নোংরা রুটিটা হাতে নিয়ে কী যেন ভাবতে লাগল। একদৃষ্টে চেয়ে রইল ম্যাডামের দিকে। তারপর হঠাৎ বলল]

নোংরা। আপনাকে কিছু একটা বলে ডাকতে হবে তো? যদি 'মা' বলে ডাকি, তাহলে কি আপনি রাগ করবেন?

ম্যাডাম [হেসে]। রাগ করব কেন?

নোংরা। না। আমি চোর তো, তাই বলছি। যদি পেস্‌টিজে লাগে!

ম্যাডাম। না, লাগবে না।

নিকুঞ্জ। কিন্তু 'মা' কাকে বলে, তা কি তুমি জান?

নোংরা। জানি, জানি। মা কাকে বলে জানি না?

[নিরাসক্ত মুখে পাঁউরুটি কামড়ে খেতে লাগল। নিকুঞ্জ বিড়ি ধরাল। নোংরা খেতে খেতে বললে]

নোংরা। সব জানি।

[প্রেক্ষাগৃহের পেছন থেকে ভেসে এল, নিকুঞ্জের গলা—]

নিকুঞ্জ। না জান না। মা—যার সঙ্গে একদিন এক অঙ্গ ছিলে—এক প্রাণ, এক মন, এক নিঃশ্বাস, এক আত্মা। যেমন সৃষ্টি একদিন যোগনিদ্রায় অভিভূত ছিল। তারপর পৃথক হয়ে এল অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মতো, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মতো, চিরন্তন প্রহেলিকার প্রশ্নের মতো। মা—যে তার দেহের রক্ত নিঙড়ে বক্ষের কটাহে চড়িয়ে, স্নেহের উত্তাপে জ্বাল দিয়ে সুধা তৈরি করে তোমায় পান করিয়েছিল, যে তোমার অধরে হাস্য দিয়েছিল, রসনায় ভাষা দিয়েছিল, ললাটে আশিস চুম্বন দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিল,—এই সেই মা।

নোংরা [হঠাৎ]। মা!

ম্যাডাম। কী বাবা?

নোংরা। জল খাব।

[ম্যাডাম জল ভরে নিয়ে গেলাস দিলেন। নোংরা জলটা খেয়ে গেলাস হাতে খাটিয়ায় গিয়ে বসল। তারপর ম্যাডামের দিকে চেয়ে বলল]

নোংরা। আমার কী মনে হচ্ছে জানেন? হাসবেন না তো? মনে হচ্ছে, আপনি সত্যিই আমার মা।

ম্যাডাম। তাই বুঝি?

নোংরা। হ্যাঁ, তাই। [নিকুঞ্জকে] একটু আগে আপনি জিজ্ঞাসা করছিলেন—মা কাকে বলে আমি জানি কিনা! না। মিথ্যে কথা বলেছি। জানি না।

[ম্যাডাম খাটিয়ার আর এক পাশে বসলেন নোংরা একবার চাইল নিকুঞ্জের দিকে—তারপর ম্যাডামের দিকে। তারপর মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল]

নোংরা। কী করে জানব? জ্ঞান হয়ে দেখলাম—একটা বস্তির মধ্যে আরো কতকগুলো ছেলের সঙ্গে মানুষ হচ্ছি। ওস্তাদ বলে একজন আছে। সে হিন্দু না মুসলমান কিছুই জানি না। রোজ সে কোনো লোকের সঙ্গে তিন চার ঘণ্টা করে আমাদের বাইরে পাঠাত—চুরি করা, পকেট কাটা এই সব শিখবার জন্যে। বছর খানেক শিখবার পর—চুরি করতে আরম্ভ করলাম।

নিকুঞ্জ। কত বছর বয়েস থেকে বললে?

নোংরা। কত আর? দশ বছর বয়েস থেকে। মুস্কিল হচ্ছে—দিনের বেলায় যা পাই, সবই তো দিয়ে দিতে হয়। শুধু সন্ধে থেকে রাত্তির নটার মধ্যে কোনো কিছু চুরি করলে সেটা নিজের থাকে। শালা সেই চেষ্টা করতে গিয়েই তো আজ ঠেকে গেলাম।

ম্যাডাম। কিন্তু বাবা, চোরের জীবন তো ভাল নয়। ওখান থেকে পালিয়ে গেলেই পার।

নোংরা। কী হবে পালিয়ে গিয়ে? কোথায় যাব পালিয়ে? ভাল ভাবে কথা বলতে শিখিনি, লেখাপড়া শিখিনি, যাব কোথায়? খাব কী? তার চাইতে এই ভাল।

যা পাই ওদের দিই। ওরা দুবেলা খেতে দেয়। কাপড়-জামাও বছরে একবার দেয়—ঈদের সময়। তাই ন-দশ বছর ধরে ওখানেই আছি।

নিকুঞ্জ। পুলিশ ধরেনি কখনো?

নোংরা। হ্যাঁ, তাও ধরেছে। দুবার তিনমাস করে জেলও খেটে এসেছি।

[হঠাৎ যেন সকলের কথা ফুরিয়ে গেল। ম্যাডাম শুয়ে পড়লেন। নিকুঞ্জ টুলে বসেই দেওয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজলেন। আর নোংরা খাটিয়ার প্রান্তে দুই হাতের মধ্যে মুখটা ঢেকে বসে রইল। একটু দূরে একজন মাতালের গান শোনা গেল—]

আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা।
আমি তাদের পাগলী মেয়ে
মায়ের নাম শ্যামা।

[গানটা কাছে এল। হঠাৎ গান থেমে গিয়ে কথা শোনা গেল]

নেপথ্যে। যা ববাবা! এ কোথায় এসে পড়লাম গো! এতো বেডন্‌ ইস্টিট্‌ নয়। তা হলে? এত চুন সুড়কি-রাবিশ-তাগাড় লাগিয়েছ কে বাবা? ভাঙা বাড়ি জুড়ে দেবে? দাও, বাবা—জুড়ে দাও!

বাবা ববম্‌ ববম্‌ বলে—
ভাও খেয়ে মার গায়ে পড়ে ঢলে—
মায়ের রাঙা পায়ে নূপুর বাজে
ওই শোন না।
আমার পাগল বাবা!—

এই গো! এ যে মনোমোহন থিয়েটার! চিন্তামণি! আমি এসেছি চিন্তামণি! বাপের ছেরাদ্দ সেরে, ঝড়ের নদী পার হয়ে, আমি এসেছি চিন্তামণি! তুমি সাপটা নামিয়ে দাও,—আমি তার ন্যাজ ধরে তোমার কাছে যাব চিন্তামণি! যাঃ শালা! চিন্তামণি নেই। চিন্তা মরে গেছে, তা হলে আর চিন্তা কিসের?

[মাতালের গলার আওয়াজ দূরে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে বাজতে লাগল নারী কণ্ঠ]

নেপথ্যে নারীকণ্ঠ। কই, সই, কই চিন্তামণি?

বল, কোথা গেল?
হৃদয়ের মণিহারা আমি পাগলিনী।
দেখ দেখ এসেছি শ্মশানে,...
সে তো নাই লো এখানে,
পর্বত গুহায় নিবিড় কাননে,
তারই অন্বেষণে কেঁদে গেছে কত দিন।
কই, কই, চিন্তামণি!

[ম্যাডাম মুখ তুলে সবাইকে দেখলেন। কী যেন বলতে গেলেন। কিন্তু না বলে আবার শুয়ে পড়লেন। টেবিলের উপর মোমবাতি পুড়ছে। আবার বিডন স্ট্রিট দিয়ে দুখানা ঘোড়ার গাড়ি গেল। কিছু লোকজনের কথা। তারপর নিশ্চুপ। ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যায়। নিকুঞ্জ বললেন]

নিকুঞ্জ। মিনার্ভার প্লে ভাঙল বোধ হয়? কী প্লে হচ্ছে যেন?

ম্যাডাম। কিন্নরী।

নিকুঞ্জ। খুব বিক্রি, না?

ম্যাডাম। খুব বিক্রি।

[নিকুঞ্জ কী যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর বললেন]

নিকুঞ্জ। ম্যাডাম, তোমার মনে আছে, সেই একবার এখানে প্লে ভেঙে যাওয়ার পর কী কান্ড হয়েছিল? [ম্যাডাম চাইলেন] আরে, সেই যে বাইরে খুব জল ঝড় হচ্ছিল। অডিয়েন্স বললে—এই দুর্যোগে বাড়ি যাব কী করে আমরা? তখন মুস্তফী সাহেব তারাকে ডেকে বললেন—তারাসুন্দরী, এস আমরা নতুন কিছু করি। এই বলে ড্রপ তুলে দিয়ে অর্ধেন্দু মুস্তফী, তারাসুন্দরী আর গিরিশ বাবু তিনজনে মুখে মুখে বানিয়ে নাটক অভিনয় করে যেতে লাগলেন। পঞ্চাশ মিনিট। পঞ্চাশ মিনিট পরে বৃষ্টি কমল। তখন ড্রপ পড়ল আবার। ওঃ। কী স্বর্ণ যুগই গেছে থিয়েটারের। আমার তো মনে হয়—

[হঠাৎ মাথা তুলে নোংরা বলল]

নোংরা। আমার খিদে পেয়েছে। ভীষণ খিদে পেয়েছে। [ম্যাডামকে] আমি একটু বাইরে যাব?

ম্যাডাম। কী করবে বাইরে গিয়ে?

নোংরা। এখনো লোকজন চলছে। কারো পকেট থেকে কিছু পয়সা তুলে নিয়ে,—খাবার দাবার কিনে আনব?

নিকুঞ্জ। তা আনতে পার। কিন্তু থানায় গিয়ে জামিন নিতে পারব না বলে দিচ্ছি।

নোংরা [হেসে]। দাগীকে জামিন দেয়ও না? মা? যাব?

ম্যাডাম [জ্বলে উঠলেন]। কী আপদ বল দিকি? কেন তখন থেকে অমন 'মা' 'মা' বলে ডাকছ? তুমি কি আমার ছেলে, যে মা বলছ? যাও না, যেখানে ইচ্ছে যাও। মরোগে না!

[নোংরা দরজা অবধি এগিয়ে গেল। দাঁড়াল। কী ভাবল! তার পর ফিরে—গলাটাকে একটু চড়িয়ে বলল]

নোংরা। যাবই তো! যাব না তো কি এই ঘরের মধ্যে পেটে হাত দিয়ে পড়ে পড়ে তোমাদের মতো মার খাব না কি। উঃ! নিজেরা পেট ভরে খেয়ে দেয়ে—এখন বক্তিমে হচ্ছে! আমারও যদি অমনি পেট ভরা থাকত, তা হলে—

[চেয়ে দেখল ম্যাডাম তার দিকে মুখ তুলে চেয়ে আছেন। তৎক্ষণাৎ সে বুঝল—এরাও খায়নি। ম্যাডামের চোখে অপরিসীম ক্লান্তি। সে লজ্জা পেয়ে চিঁ চিঁ করে বলল—]

নোংরা। না আমি তা বলিনি। আমি মনে করেছিলাম—তোমরা বুঝি খেয়েদেয়ে—! আমি আসছি। খাবার-টাবার কিনে আনছি। আমার ফিরতে দেরি হলে তুমি কিন্তু ভেবোনা মা? কেমন—?

[দরজা খুলে নোংরা বেরিয়ে গেল]

ম্যাডাম। ছেলেটা নির্ঘাৎ গিয়ে সেই লোকগুলোর হাতে পড়বে এবার।

নিকুঞ্জ। পড়ুক না। তাতে তোমারই বা কী, আর আমারই বা কী? কে না কে—তার ঠিক নেই। চোর। কী রকম পাকা চোর তৈরি হয়েছে,—দেখেছ? [হঠাৎ জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে] আঃ! কাটলেট ভাজার গন্ধ পাচ্ছ ম্যাডাম?

ম্যাডাম। হুঁ।

নিকুঞ্জ। ওই নতুন দোকানটায় ভাজছে। থিয়েটার ফেরতা কোনো লোক হয়তো অর্ডার দিয়েছে। [একটু থেমে] গরম চিকেন কাটলেটের কিন্তু স্বাদই আলাদা, সামান্য একটু নুন-মরিচ ছড়িয়ে দিয়ে—। সেই পাঁউরুটি আধখানা আছে না?

ম্যাডাম। না। সে তো ওই ছেলেটাকে দিলাম।

নিকুঞ্জ। ও! হ্যাঁ হ্যাঁ।

[উঠে দরজার কাছে গেল। কিছুক্ষণ চেয়ে রইল বাইরের দিকে। তারপর দরজাটা বন্ধ না করেই ফিরে এসে টুলে বসল। বলল]

নিকুঞ্জ। ম্যাডাম?

ম্যাডাম। উঁ?

নিকুঞ্জ। আচ্ছা সেই রসগোল্লার পায়েস—কার বাড়িতে খেয়েছিলাম বল তো? মনে করতে পাচ্ছনা, না? আরে, সেই যে দুরকম হয়েছিল। রসগোল্লার চাটনি খেতে খেতে গিরিশবাবু ঠাট্টা করে বললেন—সারদা,—আমাকে আর একটু—! এই দেখ! কী আশ্চর্য! তোমারই বাড়িতে তো! তোমার ছেলে সরলের অন্নপ্রাশনের সময়। তাই না?

ম্যাডাম। হ্যাঁ। খেতে বসে গিরিশবাবু তারার দিকে চেয়ে ঠাট্টা করে বললেন,—তারা! রসগোল্লার যদি চাটনি হয়, তা হলে সোনার পাথরবাটিও হয়।

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ হ্যাঁ। কী সব দিনই গেছে। Those days are dead and gone. Dead and gone. Positively dead and—

[দুজনের দৃষ্টি পড়ল দরজার দিকে। একটা দাড়ি গোঁফওলা শতছিন্ন পোশাক পরা বৃদ্ধ ঢুকল। বগলে তার একটা ছেঁড়া মাদুর, ময়লা বালিশ। গায়ে একটা ছেঁড়া ওভার কোট। সে সটান ঘরে ঢুকে এক ধারে মাদুরটা পাতল। বালিশটা রাখল, তারপর বসে নিকুঞ্জ আর ম্যাডামের দিকে চেয়ে বেশ সপ্রতিভ গলায় বলল]

বৃদ্ধ। বাইরে কিছুতেই থাকা গেল না। উঃ। একেই তো শীত যা পড়েছে,—তার ওপর হু হু করে উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে,—তার ওপর হয়েছে আবার জ্বর, বাঁ দিকের বুকটায় খুব ব্যথা, পিঠেও তাই। হাত দেওয়া যাচ্ছে না।

[ওঁরা চেয়েই আছেন। বৃদ্ধ আবার বলল]

বৃদ্ধ। না না, সে সব কিছু না। চোর ছ্যাঁচোড় নই—ভিখিরি। চিরকাল ভিক্ষে করেছি। খেয়েছি। না, টাকা পয়সা কিছু জমাতে পারিনি। ওই যা দুচারটে পয়সা—। ঘরটা খোলা দেখে—। ভোরেই চলে যাব। এটা তোমাদেরই স্বামী-স্ত্রীর বাড়ি বুঝি?

নিকুঞ্জ। কারোরই বাড়ি নয়। এটা মনোমোহন থিয়েটার। এখান দিয়ে রাস্তা যাবে বলে প্রায় সবটাই ভেঙেছে।—এই যেটুকু বাকি আছে—কাল সকাল থেকে ভাঙবে।

বৃদ্ধ। কাল সকাল থেকে? ওঃ! তা হলে অনেক সময় হাতে আছে। প্রচুর সময়। চাই কি—এর মধ্যে কলিযুগ শেষ হয়ে গিয়ে সত্যযুগ শুরু হয়েও যেতে পারে। পারে কি না?

নিকুঞ্জ। পারে বৈকি! কিন্তু খামোখা কতকগুলো মানুষের সুবিধে হবে বলে সত্যযুগই বা শুরু হবে কেন? যা ভাবা যায়—তা কি হয়?

বৃদ্ধ। হয়। আবার হয়ও না। আমি নিজে বরাবর ভিক্ষে করেছি আর ভেবেছি, কিছু পয়সা-কড়ি জমিয়ে গঙ্গার ধারে একটা কুঁড়ে তৈরি করে থাকব। মরবার সময় হয়েছে বুঝতে পারলে গঙ্গায়—একটু জল খেতাম।

ম্যাডাম। আমি দিচ্ছি।

[উঠে বৃদ্ধকে জল দিল। জলটা খেয়ে বৃদ্ধ একটু সুস্থ বোধ করল যেন। হাসল]

বৃদ্ধ। বুকটা বড় ব্যথা করছে। এই বাঁ দিকটা, আর এই পিঠটা। আমি শোব?

ম্যাডাম। হ্যাঁ হ্যাঁ।

বৃদ্ধ। বয়েস, হ্যাঁ, তা বয়েস হয়েছে আমার। বয়েস হয়েছে। [হেসে] সে দিন একজন জ্যোতিষীকে বললাম—হাতটা দেখে বলে দাও দিকিনি—গঙ্গার ধারের ঘরটা হবে কিনা আমার? বললে—কী মাস জম্মো মাস? জম্মোদিন কোন দিন? ব্যাস! হল না ভাগ্য গণনা।

নিকুঞ্জ। কেন?

বৃদ্ধ। কী করে হবে? জম্মোদিন-মাস-এসব তো জানি না। মৃত্যুর দিনটা অবিশ্যি মনে করে টুকে রাখব।

[নিকুঞ্জও ম্যাডাম পরস্পরের দিকে চাইল]

বৃদ্ধ। আচ্ছা, আমি তা হলে শুই এবার? বুকটায় বড় ব্যথা করছে!

[বৃদ্ধ শুয়ে পড়ল। ম্যাডাম বলল—]

ম্যাডাম। একটু সরষের তেল পাওয়া গেলে গরম করে বুকে মালিশ করলে—

নিকুঞ্জ। আচ্ছা, তুমি কী? ম্যাডাম তুমি কী? দেখছ যে রাতটা উপোস করে কাটছে আমাদের, এর মধ্যে গরম সর্ষের তেল মালিশ করে পরোপকারের কথা মনেও আসে তোমার?

[হঠাৎ বৃদ্ধ উঠে বসল]

বৃদ্ধ। পঞ্চাশ বছর ধরে ভিক্ষে করে—পয়সা যা পেয়েছি—খাইনি। এঁটো পাত কুড়িয়ে খেয়ে দিব্যি বেঁচে আছি। কিন্তু গঙ্গার ধারের জমি—কে মালিক, কে বেচবে—জানি না তো,—তাই কেনা হল না।

[আবার শুয়ে পড়ল। এঁরাও দুজনে চুপ করে বসে। হঠাৎ শুয়ে পড়লেন নিকুঞ্জ। ম্যাডাম আস্তে আস্তে

উঠে দরজা বন্ধ করতে গেলেন। দরজার কাছে ম্যাডাম দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। কী যেন ভাবছিলেন তিনি। হঠাৎ বৃদ্ধ মাদুরে উঠে বসল। চিৎকার করে বলল—]

বৃদ্ধ। আমি মরে যাচ্ছি। নিশ্চয় মরে যাচ্ছি। ওগো মা, শোন এদিকে। যদি মরে যাই, নাও মরতে পারি, যদি না মরি, তা হলে যেন চুরি কোর না। আর যদি না বাঁচি, তবে সকালে উঠে—

[এই অবধি বলে আড় চোখে নিকুঞ্জের দিকে চাইল। তারপর গলা নামিয়ে বলল]

বৃদ্ধ। শোন!

[ম্যাডাম কাছে এলেন]

বৃদ্ধ। আমার এই পঞ্চাশ বছরের ভিতরে—টাকা, একত্রিশ টাকা কম দুহাজার টাকা,—বালিশের মধ্যে ভরা আছে। তুমি নিও। কেমন? আর যদি না মরি, তা হলে নিওনা মা!

ম্যাডাম। তা টাকাই যদি থাকে তোমার, তাহলে ডাক্তার ডাকি একটা? এত কষ্ট পাচ্ছ—

বৃদ্ধ। খবরদার! [বালিশটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরল] খবরদার! এর থেকে একটা পয়সাও কেউ নেবে না। ডাক্তার ডাকবে। তা আর ডাকবে না? [রেগে উঠল] এক পয়সা-দুপয়সা করে ভিক্ষে করে পঞ্চাশ বছরে কেমন করে দুহাজার টাকা হয়—জানো? উঃ! বড় ব্যথা। বুকটায় বড় ব্যথা।

[আবার শুয়ে পড়ল। নিকুঞ্জ চেয়ে চেয়ে শুনছিলেন, এবার চোখ বুঁজলেন। ম্যাডাম চুপ করে দাঁড়িয়েই রইলেন। দেখা গেল তিনি ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস গোপন করে—দরজা বন্ধ করে ফিরে এলেন। খাটিয়ায় বসে চেয়ে রইলেন সামনের দিকে। অতি মধুর কণ্ঠের ফিস ফিস আবৃত্তি ভেসে এল—]

ম্যাডামের কণ্ঠ। কেনরে পাষাণ হৃদি
হতেছে কম্পিত?
পরের কথায়
কাঁদিতে তো দেখিনি তোমায়?
আরে মন,
একি তোর নব প্রতারণা?
তুমি বারাঙ্গনা
বেশভূষাপরায়ণা
মলিন-বসনা বিভূষণা
পাগলিনী সম হতে চাও?
তবে, কেন তোর এত প্রবঞ্চনা?
কেন এত করেছ ছলনা?
কার তরে করিয়াছ অর্থ উপার্জ্জন?
দেহ পণে বিবিধ কাঞ্চন,

কার তরে করেছ সঞ্চয়,
কার তরে প্রাণ বিনিময়
কর নাই এত দিন?
একি শিক্ষা দিতেছ নূতন?
পর কভু না হয় আপন—
জান তুমি চিরদিন।
মন, গেছে দিন বয়ে
ফিরে তো পাবি নে আর।

[সঙ্গে সঙ্গে শান্ত গলায় পুরুষ কণ্ঠে গান ভেসে গেল]

কেন ভূতের বোঝা বহিস পিছে
ভূতের ব্যাগার খেটে মরিস মিছে
ওই দ্যাখ্ সুধা সিন্ধু উথলিছে
পূর্ণ ইন্দু পরকাশে।
ভূতের বোঝা ফেলে ঘরের ছেলে
আয় চলে আয় আমার পাশে—
ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে
কী সঙ্গীত ভেসে আসে।

[নিকুঞ্জ ঘুমিয়ে পড়েছেন, বৃদ্ধও ঘুমিয়ে পড়েছে। এবার দেখা গেল ম্যাডাম কাঁদছেন। কোনো কারণ নেই। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন তিনি। বসে থেকেই উবুড় হয়ে পড়লেন বালিশের ওপর।
হঠাৎ দরজার ওপর দুম্ দুম্ শব্দে করাঘাত সুরু হল। আর্ত করাঘাত। উঠে বসেছেন নিকুঞ্জ—ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছেন দরজার দিকে। কিন্তু বৃদ্ধ পড়ে পড়ে ঘুমুতে লাগল। করাঘাত দ্রুততর হল। ম্যাডাম উঠে তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে একটি বছর-ষোল বয়সের সুন্দরী তরুণী ঢুকে পড়ল। পরনের শাড়িটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন। জামাটাতেও আবরু রক্ষা হয় না। সে ঢুকেই ম্যাডামকে জড়িয়ে ধরল। ঠক ঠক করে কাঁপছে সে। ম্যাডাম তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ করে দিলেন। বাইরে তিন-চারজন লোকের চিৎকার শোনা গেল]

গোলমাল। এই দিকে! এই দিকে পালিয়েছে!

অনাকণ্ঠ। দূর শালা! সুড়কি আর খোয়ার মধ্যে ঢুকে থাকবে কি?

আর একটি গলা। আরে ভাই, আমি দেখেছি—ছুঁড়িটা এই এই দিকে ঢুকেছে।

মোটা গলা। চোপ শালা। নেশাখোর, মাতাল কোথাকার! চল্! ওই দিকে চল্! নিশ্চয় ওই গলিটায় ঢুকেছে।

[সব চুপ হয়ে গেল। ম্যাডাম এতক্ষণ মেয়েটিকে বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঠক ঠক করে কাঁপছে মেয়েটি]

ম্যাডাম। কী হয়েছে? তুমি অমন করে—একি! ও নিকুঞ্জ! শিগগির এস। মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে গেছে।

[নিকুঞ্জ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন। মেয়েটিকে ধরাধরি করে খাটিয়ার কাছে নিয়ে গেলেন। শুইয়ে দিলেন। নিকুঞ্জ ভাল ভাবে মেয়েটিকে দেখে বললেন]

নিকুঞ্জ। একি! এর ওপর তো দেখছি—

[ম্যাডাম মুখে আঙুল দিয়ে কথা কইতে বারণ করলেন। বললেন—]

ম্যাডাম। সে তো আমি ওকে দেখেই বুঝেছি। কিন্তু জ্ঞান না হলে তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

[ম্যাডাম গেলাসে জল নিয়ে এসে মেয়েটির মুখে চোখে দিতে লাগলেন। একটু পরেই মেয়েটির সম্বিৎ ফিরে এল। সে চিৎকার করে উঠল]

মেয়েটি। না, না, না! আমাকে ছেড়ে দাও। তোমাদের পায়ে পড়ি—আমাকে ছেড়ে দাও!

ম্যাডাম। শোন, চেঁচিয়ো না। তুমি খুব নিরাপদ জায়গায় আছ। কিছু ভয় নেই তোমার!

মেয়েটি। আমি কোথায়?

ম্যাডাম। খুব ভাল জায়গায় আছ। কিছু ভয় নেই তোমার। ওঠো। উঠে বসতে পারবে কি?

মেয়েটি। হ্যাঁ। পারব। পারব।

[বাইরে আবার গোলমাল শোনা গেল]

১ম কণ্ঠ। আরে! ছুঁড়িটা গেল কোথায়?

২য় কণ্ঠ। বললাম যে এই দিকে যেতে দেখেছি।

১ম কণ্ঠ। আরে শালা, ওদিকে যে চুন সুড়কি!

৩য় কণ্ঠ। বলা যায় না বাবা। চুন সুড়কির গাদার মধ্যেও ইচ্ছে করলে মেয়েছেলে লুকিয়ে থাকতে পারে।

২য় কণ্ঠ। আরে ওই তো ঘর। আলো জ্বলছে মনে হচ্ছে।

মেয়েটি [উঠে দাঁড়িয়ে]। ওই ওরা আসছে। আমার ধরে নিয়ে যাবে। আমায় বাঁচান!

[দরজার করাঘাত হল। মেয়েটি ভয়ে চিৎকার করতে যাবে, ম্যাডাম তার মুখ চেপে ধরলেন। নিকুঞ্জকে বললেন—]

ম্যাডাম। নিকুঞ্জ, একে নিচের রিকুইজিশন রুমে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখ।

নিকুঞ্জ। রিকুইজিশন রুম—কোথায় নিয়ে যাব?

ম্যাডাম। আঃ! তুমি বড় ছেলে মানুষ হচ্ছ নিকুঞ্জ। [পা দিয়ে মেঝে দেখিয়ে] এটার তলায় একটা ঘর আছে না?

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ।

ম্যাডাম। সেইখানে নিয়ে গিয়ে অপেক্ষা কর। আমি লোকগুলোকে বিদেয় করে দিলে—ওকে নিয়ে এস আবার। যাও মা, যাও, আমি দোর খুলে দিচ্ছি।—যাও, কোনো ভয় নেই তোমার।

[মেয়েটিকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। ম্যাডাম একবার বৃদ্ধের দিকে চাইল। সে নিথর হয়ে ঘুমোচ্ছে। ম্যাডাম গিয়ে দরজা খুলে দিতেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল লম্বা-চওড়া, লুঙ্গি পরা, গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে একটি লোক। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স হয়েছে। সঙ্গে আরো দুটি লোক। একজনের পরনে খাকি ট্রাউজার, বুশশার্ট—পুরনো ও ময়লা। তার বয়স ত্রিশ। আর একটি যুবক—পরনে পায়জামা ও ফিনফিনে হাফশার্ট তিন জনেই মাতাল হয়ে আছে। ঘরে ঢুকে ম্যাডামকে দেখেই থমকে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক চাইল]

ম্যাডাম। কী চাই তোমাদের?

সুখন [লুঙ্গি পরা]। চাই,—[চারদিকে চেয়ে] একটা মেয়েছেলেকে।

ম্যাডাম। মেয়েছেলে? না বাবা, আমি ছাড়া এ ঘরে আর কোনো মেয়েছেলে নেই।

সুখন। সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু লুকিয়ে রেখেছ কোথায়—সেইটে বল না!

ম্যাডাম। খুঁজে দেখ।

ভোলা [পায়জামা পরা]। দেখব ওস্তাদ?

সুখন। দাঁড়া! মাণিক!

মাণিক। ওস্তাদ!

সুখন। তুই তো শালা বাঙালির ছেলে। এ বেটিকে ভাল করে সুধিয়ে লে,—কোথায় রেখেছে ছুঁড়িটাকে।

মাণিক। ও মাসি! [প্রত্যেকের উচ্চারণ 'স'-দুষ্ট] কোথায় রেখেছ জিনিসটাকে বল না ভাই?

ম্যাডাম। কী জিনিসের কথা বলছ তোমরা?

মাণিক। আবার কী জিনিস? দুনিয়াতে শালা একটাই তো জিনিস আছে। মেয়েমানুষ।

[হ্যা হ্যা করে তিনজনেই হেসে উঠল]

ম্যাডাম। চুপ কর! যাও, চলে যাও। এখানে কোনো মেয়েছেলে টেয়েছেলে নেই। আমরা বুড়ো মানুষ, এখানে একটু আশ্রয় নিয়ে মাথা গুঁজে পড়ে আছি,—এই এত রাত্রে ঘরে ঢুকে হল্লা করতে লজ্জা করে না তোমাদের? নিজেদের বাড়িতে মা বোন নেই বুঝি?

সুখন। আছে আছে, নিশ্চয় আছে। ঠিক আছে, আমরা চলে যাচ্ছি। চলে আয় ভোলা! আয় মানকে। বললাম—এখানে আসেনি। সে ছুঁড়ি ভীষণ চালাক। সুড়ুক করে শালা কোন গলিতে ঢুকে পড়েছে। ওর গুষ্টিকে বেচি। চল্! যাবে কোথায়? এটা হল বিডনিস্টিট পাড়া। এখানে সুখন মস্তানের পাঞ্জা থেকে যে মেয়েমানুষ পালিয়ে যাবে, সে এখনো জনমায়নি। চল্!

[দুজন বেরিয়ে গেল। সুখন বেরোতে গিয়ে ফিরে এল]

সুখন। মাসি! তুমি আমার আপন মাসি। মেয়েটা যদি আসে,—তা হলে ওকে

আটকে রেখে আমাকে খবর দিও। ওই মিনর্ভা থ্যাটারের পাশে বুদ্ধু পানবালাকে খবর দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক আছে মাসি?

ম্যাডাম। আচ্ছা।

[সুখন বেরিয়ে গেল। ম্যাডাম কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কী ভাবলেন। তারপর দরজা বন্ধ করে ডান পাশের ভাঙা দরজার কাছে গিয়ে মুখ নিচু করে ডাকলেন]

ম্যাডাম। নিকুঞ্জ! [একটু থেমে] নিকুঞ্জ! ওকে নিয়ে বেরিয়ে এস।

[নিকুঞ্জ মেয়েটিকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। মেয়েটি পাথরের মতো হয়ে গেছে]

ম্যাডাম। বস! ভয় নেই, ওরা চলে গেছে।

[মেয়েটি চেয়ে আছে]

ম্যাডাম। কী নাম তোমার?

মেয়েটি। চাঁপা?

ম্যাডাম। কী হয়েছিল—একটু বলবে? ওরা ওভাবে খুঁজছে কেন তোমাকে?

চাঁপা। আমার মামা,—ওই সুখনের কাছে আমাকে বিক্রি করে দিয়েছে।

ম্যাডাম। মামা তোমাকে বিক্রি করে দিয়েছে? সেকি! কেন?

চাঁপা। টাকার দরকার ছিল।

ম্যাডাম। বাঃ! টাকার দরকার ছিল বলে—একটা জলজ্যান্ত মেয়েকে বিক্রি করে দেবে? কেন? এটা মগের মুল্লুক নাকি? কোথায় তোমার মামা?

চাঁপা। পালিয়ে গেছে।

নিকুঞ্জ। তারপর?

চাঁপা। পরশু রাত্রে আমাকে অজ্ঞান করে সুখন নিয়ে গিয়েছিল ওর ডেরায়। [কেঁদে ফেলল] পরশু আর কাল—আমাকে নিয়ে—

[ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ম্যাডাম সেই দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন]

ম্যাডাম। বাঃ। এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, আর পাড়া—প্রতিবেশীরা কেউ কিছু বলল না!

চাঁপা। তারা কেউ জানে না। তা ছাড়া সুখনকে সবাই যমের মতো ভয় করে। আজ রাত্রে ওরা যখন—মদ কিনবার জন্য বাইরে গিয়েছিল, সেই সময় জানালা দিয়ে টপ্‌কে আমি পালিয়ে আসি। কিন্তু পথে ওরা আমাকে দেখতে পেয়ে তাড়া করে। আমি—[হু হু করে আবার কেঁদে উঠল] পরশু থেকে আমি কিছুই খাইনি। আমার—

ম্যাডাম। জানি, জানি। একটু চুপ কর। এই রাত্তিরে আমি তো তোমাকে কিছু খেতে দিতে পারছি না, মা। আমরাও এখানে নিরুপায় হয়ে আশ্রয় নিয়েছি। কাল সকালেই অবশ্য অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে। কারণ কাল থেকেই এ ঘর ভাঙতে সুরু করবে।

চাঁপা। একটু জল খাব।

[ম্যাডাম জল এনে দিলেন। খেল চাঁপা। বসে বসে ধুঁকতে লাগল]

ম্যাডাম। তুমি শুয়ে পড়। একটু ঘুমিয়ে নাও। রাত বোধ হয় একটা বাজে। ভোর অবধি ঘুমিয়ে নিলে—শরীরটা সুস্থ হবে। তারপর সকালে কী করা হবে, সে কথা সকালে উঠে ভাবা যাবে। অমন করে আমার মুখের দিকে চেয়ে কী দেখছ? ভয় নেই তোমার। সুখন ছেড়ে সুখনের বাপ এলেও আমার কাছ থেকে কেউ তোমায় নিয়ে যেতে পারবে না। শোও! ঘুমোও! লক্ষ্মী মা আমার, একটু ঘুমিয়ে নিলে অনেকটা ভাল বোধ করবে কাল সকালে।

[নিকুঞ্জ এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। হঠাৎ বললেন]

নিকুঞ্জ। ম্যাডাম!

ম্যাডাম। কী!

নিকুঞ্জ। আচ্ছা, এই যে সব ঘটনা সন্ধে থেকে এ ঘরে ঘটছে,—এগুলো ঠিক ঠিক ঘটছে তো? না-কি, এটাও মনোমোহন থিয়েটারের ভাঙা বোর্ডে কোনো নাটক অভিনয় হচ্ছে?

ম্যাডাম [ম্লান হেসে]। না নিকুঞ্জ, নাটক নয়। যা হচ্ছে—তা কঠিন বাস্তব।

নিকুঞ্জ। আশ্চর্য! অথচ তখন থেকে খালি মনে হচ্ছে আমার—যে আমরা একটা নাটক এখানে অভিনয় করছি, উইদাউট মেক আপ। [নিজের মনে] কেন যে এররকম ভুল হয়—!

[চাঁপা চেয়ে ছিল ম্যাডামের দিকে আর ম্যাডাম চেয়েছিলেন নিকুঞ্জের দিকে। চাঁপা এইবার বাধ্য মেয়ের মতো শুয়ে পড়ল খাটিয়ায়। নিকুঞ্জ বেঞ্চিতে শুয়ে পড়লেন। ম্যাডাম মাটিতে বসলেন চুপ করে। তারপর খাটিয়ার ধারে মাথাটা রাখলেন। আলো জ্বলতে লাগল। একটু পরেই বোঝা গেল, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আরো পরে, ফিস ফিস করে মাইকে দুজনের কথা শোনা গেল। পুরুষ কণ্ঠটি মাতালের, দ্বিতীয়টি সারদার]

পুরুষ। সারদা! প্লিজ!

স্ত্রী। ছি ছি! একি প্রবৃত্তি আপনার! চলে যান। চলে যান এ ঘর থেকে!

পুরুষ। যাবার উপায় থাকলে অনেক আগেই চলে যেতাম সারদা। কিন্তু উপায় নেই। সারদা! আমাকে দয়া কর, কৃপা কর আমাকে। আর আমি নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারছি না, সারদা!

স্ত্রী। আপনি মদ খেয়ে কেন আমার ঘরে ঢুকেছেন? বাবা-মা বাড়িতে নেই,—এ সময় আপনার এ ভাবে আসা উচিত হয়নি। আমি আপনাকে কাকা বলে ডাকি—

পুরুষ। আমি তো তোমার বাবার ভাই নই সারদা!

স্ত্রী। নাই বা হলেন আপন কাকা! লজ্জা করল না আপনার? রাত্তির বেলায় এ ভাবে একটা কুমারী মেয়ের ঘরে ঢুকে—বেরিয়ে যান!

পুরুষ। হারামজাদী! মিষ্টি কথার মানুষ তুমি নও, না? বেশ। তবে সেই চেহারাই দেখ!

[নারী কণ্ঠের একটা চাপা চিৎকার ভেসে এল। কিছুক্ষণ ধরে গোঁ গোঁ শব্দ শোনা গেল। তারপর সারদার

কান্না জড়ানো ডাক ভেসে এল—মা! ঘুমের ঘোরে চাঁপা চিৎকার করে উঠল—মা! বাইরে থেকে কে যেন ডাকছে—মা! মা! চমকে জেগে উঠলেন ম্যাডাম। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। সামনের দিকে। দুচোখ দিয়ে জল পড়ছে। আবার ডাক শোনা গেল]

নেপথ্যে [ও মা! দরজা খোল!]। ম্যাডাম ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন নোংরা ঢুকল এক ঠোঙা খাবার হাতে করে

নোংরা। খুব দেরি হয়ে গেল মা! তাল-মাফিক না পেলে তো পয়সা গ্যাঁড়া দেওয়া যায় না? এই নাও খাবার। ও বাবা! এত লোক আবার কোত্থেকে এল?

ম্যাডাম। ও লোকটা একজন ভিখিরি। শীতের জ্বালায় ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। আর ওই মেয়েটি—

নোংরা। কে ও?

ম্যাডাম। ওকে সুখন গুন্ডা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। চুরমার হয়ে পালিয়ে এসেছে।

নোংরা। সুখন? ওরে বাবা! সে শালাতো ভয়ানক গুন্ডা গো!

ম্যাডাম। হ্যাঁ। এখানেও খুঁজতে এসেছিল! আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম বলে দেখতে পায়নি।

[ম্যাডাম খাবার নিয়ে সবাইকে ডাকলেন। সবাই উঠল। উঠল না কেবল বৃদ্ধ। সে শুয়েই রইল। সকলকে খাবার দিলেন ম্যাডাম]

নিকুঞ্জ। কচুরি, সিঙাড়া, মিষ্টি! এই এত রাতে পয়সা কোথায় পেলে হে?

নোংরা। একটা মাতালের পকেট মারলাম। দশটা টাকা পাওয়া গেল। সাড়ে তিন টাকার খাবার কিনেছি। মা, এই যে বাকিটা—

[ম্যাডামকে দিতে গেল]

ম্যাডাম। তোমার কাছেই রাখ বাবা।

[সবাই খাবার খেল, জল খেল। তারপর আবার যে-যার জায়গায় শুয়ে পড়ল। মোমবাতিটা পুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছিল। মুমূর্ষু আলোটুকুতে দেখা গেল, সবাই ঘুমচ্ছে। অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গেই ওপরের ঘুলঘুলি দিয়ে ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটে উঠতে লাগল। দিনে আলো ঢুকল ঘরে। প্রথমে জাগলেন ম্যাডাম। তিনি সকলকে ডেকে দিলেন]

ম্যাডাম। নিকুঞ্জ! নোংরা! চাঁপা! ওঠো, ওঠো, আর ঘুমিয়ো না। ভোর হয়েছে। এবার আমাদের চলে যেতে হবে এ ঘর থেকে। ডানদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলে—কল বাথরুম পড়বে। জল এখনো পড়ে। যাও, একে একে মুখ ধুয়ে এস।

[নোংরা বেরিয়ে গেল। ম্যাডাম ভিখিরি বৃদ্ধকে ডাকতে লাগলেন।]

ম্যাডাম। শুনছ? ও বাবা! ওঠ, ওঠ, ভোর হয়ে গেছে।

[উঠল না দেখে তাকে ধাক্কা দিয়ে চমকে উঠলেন।]

ম্যাডাম। নিকুঞ্জ?

নিকুঞ্জ। কী হল? ওর ভোর হল না বুঝি?

ম্যাডাম। শিগগির এদিকে এস! [নিকুঞ্জ এলেন] দেখ তো ভাল করে!

[নিকুঞ্জ উবুড় হয়ে দেখল]

নিকুঞ্জ। এতো মারা গেছে। অনেকক্ষণ মারা গেছে।

[ম্যাডাম চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। নোংরা এল। চাঁপা চলে গেল। সে যেন পাথর হয়ে গেছে। ম্যাডাম নিচু হয়ে লোকটার মাথার নিচে থেকে বালিশটা তুলে নিলেন। একটা দিক খুলে ফেলে—নোটগুলো বার করলেন]

ম্যাডাম। নিকুঞ্জ! লোকটা একবর্ণও মিথ্যে বলেনি। এই দেখো! সত্যি, এই বালিশের মধ্যে দুহাজার টাকা। ওর পঞ্চাশ বছরের ভিক্ষের টাকা,—ভরা আছে। কত রকমের টাকা দেখেছ?

নিকুঞ্জ। বাক্সে ভরে ফেলো। এ হল করুণাময় রামকৃষ্ণের দান। অভাগা নট-নটীর অন্নসংস্থানের জন্য তিনি ভাঙা থিয়েটারের রাবিশ থেকে টাকা কুড়িয়ে দিলেন। মাথায় ঠেকাও ম্যাডাম, কপালে ঠেকাও!

[কেঁদে ফেলল। বেলা হয়েছে একটু। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে ঘরের পেছন দিকের দেওয়ালের চুন-বালি খসে পড়ল]

নোংরা। মা! এরা যে ভাঙতে আরম্ভ করল গো! এবার তো আমাদের চলে যাওয়া উচিত! নইলে ওদের লোক এসে বার করে দেবে। কী বল?

ম্যাডাম। হ্যাঁ। এই যে চল বাবা!

[কি যেন ভাবলেন ম্যাডাম। তারপর নিজের মরচে ধরা ট্রাংক বার করে বালিশ থেকে টাকাগুলো বার করে ভরতে লাগলেন ট্রাংকে]

ম্যাডাম। নোংরা।

নোংরা। কী মা?

ম্যাডাম। সত্যি তুমি আমার ছেলে হতে চাও? তা হলে শুধু মা বলে ডাকলেই হবে না। ছেলের পরিচয়ও দিতে হবে। নইলে আমি তোমার মা হব না।

নোংরা। বেশ তো বল না, কী করতে হবে?

ম্যাডাম। চুরি করা ছেড়ে দিতে হবে। আমি তোমায় দুশো টাকা দেব, তা দিয়ে পানের দোকান, কি সিগারেটের দোকান, কি অন্য কোনো ছোট ব্যবসা করবে।

নোংরা। করব মা।

ম্যাডাম [চাঁপাকে ফিরে আসতে দেখে]। আর এই যে চাঁপা, একে আমার ছেলের বৌ করে দিতে হবে।

নোংরা। তাই হবে মা। ওকে আমি বিয়ে করব।

নিকুঞ্জ। থামো, থামো! ফস করে বিয়ে করব বলছ—চাঁপার ইতিহাস জান?

নোংরা। ইতিহাস জেনে কি আমার ন্যাজ বেরোবে? ইতিহাস! ইতিহাস-ফিতিহাস, শালা ছেলে-পিলেদের পড়ার জন্যে থাক। আমি মায়ের হুকুম তামিল করব।

ব্যস্! তা ছাড়া আমিই বা কি এমন নবাব খাঞ্জা খাঁয়ের নাতি——? আমিও তো চোর!

[আবার প্রচন্ড শব্দে চুন-বালি খসে পড়ল। দরজায় করাঘাত হচ্ছে। নোংরা গিয়ে দরজা খুলে দিল। একজন বাঙালি অফিসার প্রবেশ করলেন]

অফিসার। একি! এ ঘরটার মধ্যে এত লোক থাকত? ক্লিয়ার আউট! ক্লিয়ার আউট!

ম্যাডাম। অফিসার! আপনাকে একটা অনুরোধ করব? এই লোকটি কাল রাত্রে মারা গেছে। বুকব্যথা বলছিল। রাত্রেই হার্টফেল করে মারা গেছে।

অফিসার। ও! তা কী করতে হবে?

ম্যাডাম। ওর যাতে গঙ্গার ধারে সৎকার হয়, দয়া করে তার ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে। এই পঞ্চাশটা টাকা কাছে রাখুন। এইটে দিয়ে দয়া করে ব্যবস্থা করবেন।

অফিসার। পঞ্চাশ টাকা! আমি কী করে——! লোকটা কে?

ম্যাডাম। আমার বাবা।

অফিসার। তোমার বাবা? কী নাম?

নিকুঞ্জ। ওঁর নাম রামকৃষ্ণ।

অফিসার [নোট বই বার করে লিখতে লিখতে]। রামকৃষ্ণ কী?

সারদা। রামকৃষ্ণ ভিখিরি।

অফিসার। ভিখিরি? তোমার নাম কী?

সারদা। সারদা ভিখিরি?

অফিসার। ভিখিরি কি টাইটেল হয়?

সারদা। হয় বৈকি বাবা। রামকৃষ্ণের হয়।

অফিসার। আচ্ছা তোমরা যাও এখন। ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

[ম্যাডাম এগিয়ে মৃতের পা স্পর্শ করে হাত মাথায় ঠেকালেন। দেখাদেখি নোংরাও তাই করল। তারপর ম্যাডামের তোরঙ্গটা তুলে নিল মাথায়। তারপর সবাই রওনা হল। প্রথমে নিকুঞ্জ, তারপর নোংরা তারপর চাঁপা, সব শেষে ম্যাডাম].

অফিসার। বাইরে থেকে আমার একজন লোককে পাঠিয়ে দিও। বুঝলে? 'হিন্দু সৎকার সমিতিকে খবর দিতে হবে তো?

নোংরা। আচ্ছা।

[অফিসার মৃতদেহের কাছে গিয়ে ভাল করে দেখলেন। কিছু সন্দেহজনক মনে হল না। ডাকলেন]

অফিসার। তোমরা কতদিন থেকে বাস করছিলে এখানে? এ্যাঁ?

ম্যাডাম। আজ তিন মাস আঠারো দিন।

অফিসার। বা-বা! এত দিন? কিন্তু এখানেই বা বাস করছিলে কেন? তোমরা কারা?

নিকুঞ্জ। আমরা—

ম্যাডাম। হয়েছে কি জানেন অফিসার? রাত্তিরে লোকজনের কাছে মুখ দেখিয়ে দেখিয়ে এমন অব্যেস হয়ে গেছে যে, এখন দিনের আলোতে মুখ দেখাতে লজ্জা করে আমাদের। তবে আমাদের খুব ভাল একটা পরিচয় আছে। আমরা—আমরা সরীসৃপ। এটা জানা জায়গা। ভালই ছিলাম এতকাল। আশ্রয় ভেঙে দিলেন—আবার একটা গর্ত-টর্ত খুঁজে নিয়ে ঠিক ঢুকে পড়ব আমরা।

[এক এক করে সবাই বেরিয়ে গেল। অফিসার বোকার মতো নিজের মনেই উচ্চারণ করলেন—স-রী-সৃপ! যা-ব্বাবা! অফিসার ঘরের মধ্যে পায়চারী করে এদিকে ওদিক দেখতে লাগলেন। লাথি মেরে বালিশের খোলটাকে সরিয়ে দিলেন মাইকে ঠিক আগের মতো ফিস ফিস করে গান বাজতে লাগল]

কেউ শীতল জলদে হেরে অশনির জ্বালা।
কেউ মুঞ্জরিয়া তোলে তার শুষ্ক কুঞ্জবীথি।
হেরে কমল মৃণালে কেউ কাঁটা কেহ কমল,—
কেউ ফুল দলি চলে, কেউ মালা গাঁথে নিতি।
কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে...

[অফিসার ঘুরে দাঁড়িয়ে দর্শকের দিকে চেয়ে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। হঠাৎ বেরিয়ে গেলেন। প্রচন্ড শব্দে পেছনের দেওয়ালের খানিকটা ভেঙে পড়ল। সেই ফাঁক দিয়ে প্রভাত-সূর্যের আলো এসে বৃদ্ধ ভিখারীর মৃতদেহের উপর পড়ল। গান মিলিয়ে গেল। যবনিকা নেমে এল]

মেঘের আড়ালে সূর্য

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্রলিপি

ভবেশ....অধ্যাপক, বয়স পঞ্চাশের কোঠায়
সুচেতা....ভবেশের স্ত্রী, বয়স পঁয়তাল্লিশ
সুখেন....ভবেশের পুত্র, বয়স পঁচিশ
জনার্দন....প্রধান শিক্ষক, ভবেশের সমবয়সী
অরবিন্দ, সোমেন, কমলেশ,
শেখর, অনুপম, সুনীত এবং...সুখেনের সমবয়সী বন্ধু
একদল যুবক

[সকালবেলা। মধ্যবিত্ত পরিবারের শয়ন ঘর। সুচেতো বিছানা তুলছে। পেছনের দিকে একটা জানালা। তা দিয়ে দূরের কয়েকটা গাছপালা দেখা যায়। বাঁদিকে অন্যঘরে যাবার দরজা। তাতে একটা পর্দা ঝুলছে]

সুচেতা। না, ভাল লাগে না! ভোর না হতেই কোথায় চলে গেছে! বাড়ির সঙ্গে শুধু খাওয়া আর শোওয়ার সম্পর্ক। দু-দন্ড যদি বাড়িতে থাকে! কিছু বলতে গেলেই লম্বা লেকচার দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করে দেবে। ঝামেলা আমার আর ভাল লাগে না। কার জন্মদিন করব! দুটো পেটে ধরেছিলাম—একটা তো গেছেই, এটাও কবে যাবে ঠিক কি? আমার হয়েছে মরণ।

ভবেশ [পাশের ঘর থেকে]। সকালবেলা আপন মনে কি বকছ?

সুচেতা [গলা চড়িয়ে]। নিজের সপিন্ডকরণের মন্ত্র আওড়াচ্ছি।

ভবেশ। তা ভাল—পরকাল ঝরঝরে হবে।

[বাঁদিকের পর্দা সরিয়ে প্রবেশ করেন ভবেশবাবু। চুল কাঁচাপাকা ও এলোমেলো। পরনে ধুতি ও গায়ে গেঞ্জি। ঘুম থেকে উঠে এসেছেন]

সুচেতা। ইহকালে যা সুখ পেলাম! ভাবগতিক দেখে পিত্তি জ্বলে যায়।

ভবেশ। বাষ্প বেশি জমলেই ঢাকনা ঠকঠক করে।

সুচেতা। একজনের দর্শন, আর একজনের বিপ্লব।

ভবেশ। ভারসাম্যের প্রয়োজন আছে বৈকি। জিনিসের ওজন করতে গেলে বিপরীত পাল্লায় বাটখারা চাপাতেই হয়।

সুচেতা। কলেজে পড়িয়ে পড়িয়ে তোমার এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে সবাইকে মনে কর ছাত্র।

ভবেশ [একটা চেয়ারে বসে]। ছাত্র পেলাম কোথায়? মনে হয় সবই ব্যর্থ।

সুচেতা। হাজার দিন বলেছি ছেলেটার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে অত আলোচনা কোর না।

ভবেশ। মনে প্রশ্ন জাগলে তার উত্তর দিতে হবে না?

সুচেতা [ঘরের এলোমেলো জিনিস গুছোতে গুছোতে]। কই, আমার মনের প্রশ্নের উত্তর তো কখনও দাও না!

ভবেশ। যেহেতু তোমার প্রশ্নের উত্তর তুমি নিজেই খুঁজে পাও। তুমি যে স্বয়ংসম্পূর্ণা।

সুচেতা। খেয়ালী।

ভবেশ। না, খেয়ালী নয়। তোমার মায়া-মমতার কাছে কে না বশ?

সুচেতা। ওগুলোর এখন কোনো দামই নেই।

ভবেশ। কে বললে তোমাকে?

সুচেতা। দেখতেই পাচ্ছি। কাল শুকুটাকে অত করে বললাম, আজ তার জন্মদিন, বাড়িতেই যেন থাকে। ঘুম থেকে উঠে দেখা পাওয়া গেল তার? চারদিকে খুনোখুনি। আমার কিছু ভাল লাগে না। এত করে বলি ওসবের মধ্যে যাস নে, শত্রু বাড়িয়ে লাভ কী?

ভবেশ। শত্রু-মিত্র জ্ঞানই নেই।

সুচেতা। ও যা বুঝবে তাই ঠিক। ওর কথায় সায় না দিলেই মাথা গরম।

ভবেশ। কিছু বোঝেনি বলেই মাথা গরম।

সুচেতা। না বুঝে অত লাফালাফি কেন?

ভবেশ। তপ্ত বালুতে পা ফেললে ছটফট না করে উপায় আছে?

সুচেতা। তোমার কাছে আশকারা পেয়েই...

ভবেশ। যুক্তি দিয়ে বোঝানোকে যদি বল আশকারা...

সুচেতা। তোমার কথা শোনে কই?

ভবেশ। মন্ত্রণায় ওদের স্নায়ুগুলো সর্বদাই উত্তেজিত। তাই কারো যুক্তিই মাথায় ঢোকে না।

সুচেতা। নিজেকে শেষ করা।

ভবেশ। সূর্যের মধ্যে প্রতিনিয়ত চলেছে ধ্বংস আর সৃষ্টির খেলা। যে ধ্বংসে সৃষ্টি নেই তা ব্যর্থ, নিষ্ফল আত্মহনন।

সুচেতা। দার্শনিক কচকচি থাক। সংসারটা যেন শুধু আমারই। তিনি কখন আসবেন তার তো ঠিক নেই। যাদের খেতে বলা হয়েছে তাদের পাতে যাই হোক কিছু দিতে হবে তো।

ভবেশ। বাজার করার কথা বলছ?

সুচেতা। লজ্জার কথা!

ভবেশ। বাজার তো আমিই করি। তাতে আর লজ্জার কী আছে?

সুচেতা। দশবারো জনকে খেতে বলেছি। এতটা বাজার তো তোমাকেই বয়ে আনতে হবে।

ভবেশ। ছেলে জানে তার বাবার বোঝা বইবার সামর্থ্য এখনও আছে। বল, কী কী আনতে হবে?

সুচেতা। বাসি মুখে এখনও জল দিলে না। চা খেয়ে যাবে তো?

ভবেশ। বেলায় গেলে কিছু পাব না। বাজারটা সেরে এসেই চা খাব। তুমি একটা ফর্দ করে রাখ।

সুচেতা। সুকু যা যা খেতে ভালবাসে সেগুলোই লিখে দিলাম। কোনটা কত আনতে হবে তুমি নিজেই আন্দাজ করে এনো।

ভবেশ। পুরো ফর্দ করে দিও—আবার যেন বাজারে যেতে না হয়।

[যুবকের প্রবেশ]

সোমেন। সুখেন কই, মাসিমা?

সুচেতা। কী করে বলব! বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক তো শুধু থাকা আর খাওয়ার।

সোমেন। রাগ করে লাভ নেই, মাসিমা। আমাদের অনেক কাজ।

সুচেতা। তা বই কি। মিটিং, মিছিল, পোস্টার—কত কাজ। আমরা সারাদিন নিষ্কর্মা বসে থাকি তো।

সোমেন। আমাদের কাজেও তো আপনারা কতভাবে সাহায্য করে থাকেন।

সুচেতা। তা হলে আমাদের কাজেও তোদের সাহায্য করা উচিত।

সোমেন। তা বলতে পারেন। কিন্তু মাসিমা, ছোট কাজে ডুবে থাকলে বড় কাজে মন যায় না।

সুচেতা। তোরা তবে চাস নে সংসারগুলো সুন্দর হয়ে উঠুক?

সোমেন। কটা সংসার সুন্দর বলুন তো? চেষ্টা করেও কেউ সুন্দর করতে পারছে কি?

[পাঞ্জাবি গায়ে ভবেশের প্রবেশ]

ভবেশ। অতএব আরো অ-সুন্দর করে দাও। [সুচেতাকে] দাও, ফর্দটা দাও। [সুচেতা ফর্দ দেয়। তাতে চোখ বুলিয়ে] দু-কেজি মাংসেই তো যাবে ষাট টাকা।

সুচেতা। তার কমে হবে কেন?

ভবেশ। হুঁ! থলে দুটো এনে দাও।

[সুচেতা পাশের ঘরে চলে যায়]

সোমেন। বুর্জোয়া অভ্যেস ছাড়তে সময় লাগে।

ভবেশ। কি বললে?

সোমেন। এত ঘটা করে জন্মদিন করার কি দরকার?

ভবেশ। খালি পেটে উৎসব হয় না, সোমেন।

সোমেন। জন্ম-মৃত্যু প্রকৃতির নিয়ম। তা নিয়ে উৎসব করার কী আছে।

ভবেশ। তবু মানুষ জীবনের পুজোই করে থাকে চিরদিন। সন্তানের দীর্ঘজীবন কামনা মা-বাপ করবে না?

সোমেন। আমি কি তা অস্বীকার করছি?

ভবেশ। তবে জন্মদিনের উৎসবে তোমার আপত্তি কেন?

সোমেন। উৎসবে আপত্তি নেই, আপত্তি অপব্যয়ে। কত গরিব আছে যাদের দু-বেলা দু-মুঠো জোটে না।

ভবেশ। বটে! ইলেকশনে জয়ী হয়ে মুহুর্মুহু বোমা ফাটালে বুঝি অপব্যয় হয় না?

সোমেন। জনতার জয়ে জয়োল্লাস হবেই।

ভবেশ। মানুষের মনে ত্রাস সৃষ্টি করে?

সোমেন। জনতার জয়ে দালালরা তো ভয় পাবেই। সাধারণ মানুষ কী বলে জানেন?

ভবেশ। কী বলে জানি নে, তবে কী ভাবে তা জানি। ভয়ে কেউ মুখ খোলে না। শক্তি কম বলেই ভয় দেখিয়ে মানুষকে স্তব্ধ রাখতে চাও। কিন্তু জানো, অনেক সময় মুখর না হয়ে মৌন মুখই বেশি কথা বলে?

সোমেন। তাই যদি হবে তবে লোকে আমাদের সমর্থন করে কেন? বন্ধের একটা ডাক দিলে....

ভবেশ। সব অচল হয়ে যায়? জন-জীবন অচল করা সহজ, কিন্তু সচল করা বড় কঠিন। তোমরা চাও অচলকে আরো অচল করে দিতে—তাই কথায় কথায় বন্ধের ডাক...

সুচেতা। আজ আবার বনধ্ নাকি?

[বলতে বলতে সুচেতার প্রবেশ। হাতে দুটো থলে]

সোমেন। না মাসিমা, মেসোমশাইর সঙ্গে একটা academic discussion হচ্ছিল।

সুচেতা। আর পারি নে, বাবা। তোর মেসোমশাইর দর্শন আর তোদের শ্রেণীসংগ্রাম। শুনে শুনে কান পচে গেল। আমরা যে কোন শ্রেণীর মানুষ বুঝতেই পারিনে।

ভবেশ। তোমরা? তোমরা গয়া প্যাসেঞ্জারের তৃতীয় শ্রেণী।

সুচেতা। তার মানে যত আবর্জনা....

[সোমেন হো হো করে হেসে ওঠে]

সুচেতা। বাজারটা হবে, না কী?

[সোমেন আবার হাসে]

ভবেশ। Yes madam. Don't mind Somen. I am a nonpartisan. I try to understand all.

[ফর্দটা পকেটে ফেলে থলে দুটো হাতে নিয়ে বাইরে প্রস্থান]

সোমেন। মেসোমশাই ভারী মজার মানুষ। যখন তর্ক করেন তখন মনে হয় আমাদের তিনি সহ্যই করতে পারেন না। কিন্তু মনে মনে আমাদের তিনি সত্যিই ভালবাসেন

সুচেতা। আমি কিন্তু তোদের ঘৃণা করি।

সোমেন। তাই আদরের মাত্রা বেশি আর আমাদের আবদারও অশেষ।

সুচেতা [মৃদু হেসে]। খুব হয়েছে, ভাগ। আমার কাজ আছে।

সোমেন। সুখেনকে আগেই ছেড়ে দেব। ওকে বেশিক্ষণ আটকে রাখব না।

সুচেতা। আর তুই?

সোমেন। আসব বই কি!

সুচেতা। বেলা চারটে, না পাঁচটায়?

সোমেন। না না মাসিমা, বেশি দেরি করব না। আপনার হাতের রান্না খাবার লোভ আমার ষোল আনার ওপর আঠারো আনা।

[সোমেনের প্রস্থান]

সুচেতা। লক্ষ্মীছাড়ার দল। এগুলোকে দেখলে গা-জ্বালা করে, আবার না দেখলেও পুড়ে মরি।

[ভবেশের বন্ধু জনার্দনের প্রবেশ]

জনার্দন। ভবেশবাবু আছেন তো?

সুচেতা। না, তিনি বাজারে গেছেন। বসুন।

[জনার্দনের চেয়ারে উপবেশন]

জনার্দন। কী ব্যাপার সুখেনের মা? আজ আবার নিমন্ত্রণ কিসের?

সুচেতা। সুখেনের আজ জন্মদিন।

জনার্দন। ও। তার বন্ধুদের বললেই তো হত।

সুচেতা। সুখেনের বাবার ইচ্ছে আপনার সঙ্গে বসে আমোদ করে খাবেন।

জনার্দন। ভবেশবাবু আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়েও হাসতে পারেন। সেদিন ওনার কলেজে

দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেল। পথে আমার সঙ্গে দেখা। হাসতে হাসতে নির্বিকার চিত্তে সব বলে গেলেন, যেন কিছুই হয়নি।

সুচেতা। ওনার কথা ছেড়ে দিন।

জনার্দন। বললেন কি জানেন? বললেন, মানুষ যেদিন প্রথম আগুন পেলে সেদিনও বুঝি উল্লাসে এমনি আত্মহারা হয়ে পড়েছিল। আগুনে যে পুড়ে মরতে পারে সে হুঁশও হয়তো তাদের ছিল না।

সুচেতা। ওনার সব কথাই সৃষ্টিছাড়া। বলেন হাসি-কান্নায় তফাৎ নেই। কেঁদে মানুষ হালকা হয়, হেসেও মানুষ হৃদয়ের ভার লাঘব করে। যাক গে, বসুন। চা করে দিচ্ছি।

[সুচেতার পাশের ঘরে প্রস্থান। টেবিল থেকে একখানা বই টেনে জনার্দন পড়তে থাকেন। প্রবেশ করে সুখেন, কমলেশ, অনুপম, শেখর ও অরবিন্দ]

সুখেন। জনার্দন কাকার স্কুলের খবর কি?

জনার্দন। আর বল কেন বাবা! যা অবস্থা...

সুখেন। নতুন কিছু হল নাকি?

জনার্দন। যে কোনোদিনই হতে পারে। মাস্টার মশাইদের মধ্যেও তিনটে দল, ছাত্রদের মধ্যেও তিনটে। আমি হেডমাস্টার কোন দলে যাই?

কমলেশ। যে-দল শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় সে-দলেই থাকবেন।

জনার্দন। তা হলে তো কথাই ছিল না। কোনো দলই চায় না স্কুলটা ঠিক মতো চলুক। তিন দলেরই চলেছে শক্তি পরীক্ষা। ত্রিশূলের ঘায়ে পড়াশুনো বন্ধ। আমি সাক্ষীগোপাল হয়ে সব দেখছি।

অনুপম। আপনি একটু শক্ত হলে...

জনার্দন। ওরে বাবা! শৈব-শাক্তের লড়াই। নিরামিষ নয়, আমিষ। এর মধ্যে শক্ত হতে গেলেই জান ধরে টান দেবে। তাই অফিস ঘরটা এসে যখন তছনছ করছিল আমি তখন শুধু বসে বসে হাসছিলাম। বিজ্ঞজনের মতো সংযমের বরফ চাপা দিয়ে স্নায়ুগুলোকে ঠান্ডা করে রাখলাম। কিছু বললেই তো অমনি বোম—ভোলানাথ। [সবাই হেসে ওঠে] হাসবারই কথা বটে! বোমারুদের যুগে একটা বোমা ফাটলে রাজ্যিশুদ্ধ তোলপাড় হত। এখন হাজার হাজার বোমা ফাটছে, কিন্তু কেউ গ্রাহ্যও করছে না। বুকের পাটা কি আমাদের কম! বৈপ্লবিক গতিবেগে আমরা মহাকাশযানকে হার মানাতে চলেছি।

[চায়ের কাপ নিয়ে সুচেতার প্রবেশ]

সুচেতা। মিষ্টি আনা হয়নি যে, মিষ্টি মুখ করব। শুধু চা-ই দিতে হল।

[জনার্দনকে চা দেয়]

জনার্দন। আচমনটা গঙ্গা-জলেই হোক। মধ্যাহ্ন ভোজনে ষোড়শোপচার তো আছেই।

সুচেতা। দেখুন আপনার বন্ধুবর কি আনতে কি এনে হাজির করেন।

জনার্দন। দ্রৌপদীর হেঁশেলে এলে বিষও অমৃত হয়ে উঠবে।

সুচেতা। ছেলেপিলেদের সামনে কি-যে বলেন!

জনার্দন। আমোদে নিয়ম নাস্তি। উপমায় দোষ নেই। তবে আজকাল হাস্য-পরিহাসও করতে হয় সাবধানে। কখন কোন কথা বেফাঁস মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়বে আর অমনি শুনতে হবে—বুর্জোয়ার দালাল, চরম প্রতিক্রিয়াশীল। তাই expression of truth-এর চেয়ে suppression of truth-ই ভাল।

সুচেতা। না যাই, কাজ আছে। আপনার গল্প শোনার সময় এখন নেই।

জনার্দন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যান। নারী রন্ধনে আর বন্ধনেই ভাল।

সুচেতা। রন্ধনে না গেলে তো একবেলাও চলে না আপনাদের। শুকু, শুনে যা। তোমরা বসো বাবারা।

[সুচেতা ও সুখেনের প্রস্থান। যুবকদের চৌকিতে উপবেশন]

শেখর। আচ্ছা মাস্টারমশাই, আপনার স্কুলে সেদিন যারা হামলা করল তারা কি বাইরের ছেলে?

জনার্দন। না, না, সবাই চেনা।

শেখর। তাদের নাম জানেন?

জনার্দন। জানি। [একটু থেমে] তবে জানলেও বলার উপায় নেই।

অরবিন্দ। ভয়ে?

জনার্দন। যাই বল। তবে স্নেহ-মমতাও তো একেবারে খোয়াইনি।

অরবিন্দ। এসব সমাজবিরোধীদের প্রতিও আপনার স্নেহ-মমতা আছে।

জনার্দন। তা থাকবে না! জানি, ভুল করছে। এ-ভুল একদিন ভাঙবেই। শিক্ষার মাথায় কুড়োল মারলে, মনীষীদের মূর্তি ভাঙলেই শাসনব্যবস্থাটাও ভেঙে পড়বে এটা ওদের মাথায় কারা ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাই স্নানের টবের ময়লা জল ফেলতে গিয়ে বাচ্চাটাকেও ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। ভুল যেদিন ভাঙবে সেদিন লক্ষ্য স্থির করতে ওদের কষ্ট হবে না।

অরবিন্দ। আপনাদের সহানুভূতি আছে বলেই ওদের সাহস বাড়ছে।

জনার্দন। কি করতে বল? পুলিশে ধরিয়ে দেব?

কমর্দন। দরকার হলে তাও করতে হবে।

জনার্দন। তোমরা পার, আমি পারিনে।

কমর্দন। সমাজবিরোধীদের প্রশ্রয় দেয়া চলে না।

জনার্দন। তা যদি বল তাহলে তো অনেককেই ধরিয়ে দিতে হয়।

অনুপম। দেন না কেন?

জনার্দন। দিইনি কেন? থাক, উত্তরটা না দেয়াই ভাল।

শেখর। উত্তর থাকলে তো দেবেন।

জনার্দন। Do you want to provoke me?

কমলেশ [শ্লেষ দিয়ে]। চেপে যা শেখর। দুর্বল স্থানে ঘা দিতে নেই। মাস্টারমশাই রেগে যাচ্ছেন।

জনার্দন [ক্ষুব্ধ কণ্ঠে]। It's nothing but witch-hunting. মতের অমিল হলেই কারো ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেয়া, যেভাবেই হোক তাকে জব্দ করা এখনকার একটা রোগ। এ-রোগ না সারলে আমরা শেষ হয়ে যাব, শেষ হয়ে যাব।

[চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন হঠাৎ মনে হতে ফিরে এসে টেবিলের ওপর রাখলেন ও কারো দিকে না তাকিয়েই প্রস্থান করলেন]

কমলেশ। বড্ড রেগে গেছেন।

অরবিন্দ। ভালই হয়েছে। তা না হলে উঠতেন কি? বসে বসে শুধু জ্ঞান দিতেন।

শেখর। পুরোন স্কুল কমিটিটা ভেঙে দেবার পর থেকেই আমাদের ওপর হাড়েহাড়ে চটা।

অনুপম। ঘুঘুর বাসা না ভাঙলে এই স্কুলে নাক গলাবার উপায় ছিল?

অরবিন্দ। অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সঙ্গে কোনোভাবে কোঅপারেশনই করলেন না উনি।

অনুপম। নতুন স্কুল কমিটির সঙ্গেও প্রায় ননকোঅপারেশন।

কমলেশ। টিচার্স কাউন্সিলে ওরাই মেজরিটি।

শেখর। আর একটু চাপ দিতে পারলেই সব সোজা হয়ে আসবে।

কমলেশ। জনার্দনবাবু ধুরন্ধর। মুখে বলেন তিনি কোনো দলেই নেই, তলে তলে আমাদের বিরুদ্ধে শিক্ষক ও ছাত্রদের উস্কানি দিয়ে গন্ডগোল পাকান।

অরবিন্দ। বেশি বাড়াবাড়ি করেন তো তাঁকে স্কুলছাড়া করব।

[সুখেনের প্রবেশ]

সুখেন। তোরা একটু বোস, আমি ঘুরে আসছি।

শেখর। কোথায় যাবি?

সুখেন। তোদের মিষ্টিমুখ করাতে হবে না।

কমলেশ। এখন কিরে!

অনুপম। ডবল ডেকার।

অরবিন্দ। বাড়াবাড়ি করিস নে সুখেন।

সুখেন। আমার ইচ্ছেয় তো হবে না। মা চান...

শেখর। আর সুবোধ বালকের মতো অমনি চললি মিষ্টির দোকানে!

কমলেশ। মাসিমার ইচ্ছে পূরণ করতেই হবে।

অরবিন্দ। কমলেশ, তুই এমন পেটুক!

কমলেশ। দ্যাখ অরবিন্দ, তুইও কিছু কম যাস নে। পেটে ভুখ মুখে লাজ।

অনুপম। বাড়াবাড়ি অবশ্য কিছুতেই ভাল নয়। তবে যদি মাসিমার ইচ্ছে হয়ে থাকে।—

শেখর। খাসা, অনুপম, খাসা। সত্যি তোর তুলনা নেই।

অনুপম। বেশি বকিস নে শেখর। পাত চেটে খাওয়া অভ্যাস, তার আবার অত কথা।

কমলেশ [স্লোগানের ভঙ্গিতে]। তবে মাসিমার ইচ্ছে পূরণ হোক।

অন্যান্য। তাই হোক, তাই হোক।

শেখর। যা সুখেন, নিয়ে আয়। আজ তোর জন্মদিনে খাইয়ে আমাদের একেবারে ফ্ল্যাট করে দে।

[সবাই হেসে ওঠে। সুখেন বেরিয়ে যায়]

কমলেশ। চল আজ সন্ধ্যার শোয়ে সুখেনকে নিয়ে সবাই সিনেমায় যাই।

অনুপম। প্রস্তাবটা মন্দ নয়।

শেখর। মৃণাল সেনের ছবিটা ফার্স্ট প্রাইজ পেল!

অরবিন্দ। বুর্জোয়া গল্প, পাবেই।

কমলেশ। উৎপল দত্ত অভিনয় করেছে সত্যি চমৎকার।

অরবিন্দ। অতিবিপ্লবীর অবক্ষয়ী বাহার।

অনুপম। মাধবী তবে উর্বশী হল?

শেখর। সিনেমার স্টাররা সবাই উর্বশী।

কমলেশ। এ-বছরের ফুটবল খেলাটা মাঠে মারা গেল।

অরবিন্দ। শোধনবাদীদের ভূমি-দখল আন্দোলনটাও।

শেখর। ওটা স্রেফ ভাঁওতা।

কমলেশ। রাজন্য-ভাতা নিয়ে বেশ চাল চেলেছে ইন্দিরা।

অনুপম। আরব-ইজরায়েল বিরোধটা মিটবে বলে মনে হয় না।

অরবিন্দ। আরে আসলে ওটা ডলার-রুবলের ঝগড়া।

শেখর। মস্কো-বন আতাঁত হয়ে গেল!

অরবিন্দ। শোধনবাদের ওটাই চরিত্র।

কমলেশ। এই, সোনালির বিয়েতে কি দিবি রে?

শেখর। আজই তো ভাবতে হবে!

কমলেশ। তবু?

অনুপম। সবাই মিলে যা হয় একটা কিছু কিনে দেওয়া যাবে।

[একবাক্স সন্দেশ নিয়ে সুখেনের প্রবেশ]

সুখেন। একটু দেরি হয়ে গেল। দোকানে যা ভিড়।

শেখর। কেন? বিয়ের মতো জন্মদিনেরও লগনশা নাকি?

সুখেন। অন্তত মিষ্টিমুখের লগন যে এক তাতো দেখতেই পাচ্ছিস।

[সুখেনের কক্ষান্তরে প্রস্থান]

অনুপম। সুখেনের মনটা খুব সরল।

অরবিন্দ। ভয় তো সেখানেই। কখন যে কিসে ওর সেন্টিমেন্টে লাগবে।

সুখেন [নেপথ্য থেকে]। না মা, ও ফোঁটা আমি পরতে পারব না।

[বলতে বলতে সুখেন ঢোকে, পেছনে একটা চন্দনবাটি, ধান, দুর্বা ও সন্দেশের বাক্স নিয়ে সুচেতার প্রবেশ]

সুচেতা। জন্মদিনে মায়ের হাতে একটা ফোঁটা নিলে তোর বিপ্লব পেছিয়ে যাবে না সুকু।

সুখেন। না-না, হাতে মিষ্টি দেবে নাকি দাও। ওসব রাখ।

শেখর। লজ্জা করে নাকি সুখেন? আমরা না হয় চোখ বুজি।

সুখেন। ফাজলামো রাখ।

কমলেশ। বটে! দেখি তুমি কেমন করে ফোঁটা না নিয়ে পার। ধর তো সবাই ওকে।

[সবাই মিলে সুখেনকে জাপটে ধরে]

সুখেন। কি হচ্ছে এসব?

শেখর। দিন তো মাসিমা ওর কপালে চন্দনের ফোঁটা।

[সুচেতা প্রথমে চন্দনের ফোঁটা ও পরে ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে। সবাই মুখে আঙুল দিয়ে নকল জোকার দেয়। সুচেতা হাসে]

সুখেন। ফাজিলের দল।

শেখর। শুভদিনের শুভ কাজ।

[সুখেনকে সবাই ছেড়ে দেয়]

অনুপম। কই মাসিমা, আমাদের ফোঁটা দিলেন না?

শেখর [অনুপমকে পেছনে সরিয়ে]। অনুপম পরে, আমি আগে ফোঁটা নেব।

অরবিন্দ। শেখরের আহ্লাদ বেশি। [এগিয়ে গিয়ে] আমাকে আগে ফোঁটা দিন মাসিমা।

কমলেশ। অরবিন্দ গবানন্দ সরো। মাসিমা আমাকে বেশি ভালবাসেন। আমার দাবি আগে।

সুচেতা [মৃদু হেসে]। তোদের সবাইকে আমি ভালবাসি। লাইন করে দাঁড়া।

[সবাই লাইন করে দাঁড়ায়। সুচেতা সবাইকে ফোঁটা দেয়]

কমলেশ। কই মাসিমা, আশীবাদ করলেন না?

সুচেতা। সবাই দীর্ঘজীবী হ, আর তোদের সুমতি হোক।

[সবাইকে সন্দেশ দেয়। দেবতার প্রসাদ নেবার মতো ভঙ্গি করে জোড় হাতে তারা সন্দেশ নেয়। সুখেন তা করে না]

সুচেতা। সুখেন, ওদের জল এনে দে।

[সুখেন কক্ষান্তরে যায়]

কমলেশ। এই রে মাসিমাকে প্রণামই করা হয়নি।

শেখর। তাই তো। সন্দেশের লোভে ভুলে গেছি।

[সবাই সুচেতাকে প্রণাম করে। সুখেন একটা কাঁচের গ্লাস ও কেটলিতে করে জল নিয়ে আসে]

অনুপম। এই সুখেন, মাকে প্রণাম কর। খালি মায়ের আদর নেয়া, প্রণাম করার নাম নেই।

[সুখেন মাকে প্রণাম করে। বন্ধুরা একে একে গ্লাসে জল ভরে খেতে থাকে]

সুচেতা। বোস। তোদের চা করে দিচ্ছি।

[সুচেতার কক্ষান্তরে প্রস্থান]

অরবিন্দ। জন্মদিনের প্রথম পর্ব তো হল। আসল কাজের কথা হোক এবার।

শেখরর। কাজ তো ঠিক হয়েই আছে। আজকের মিছিলটা জোর হওয়া চাই।

সুচেতা [নেপথ্য থেকে]। সুকু, কেটলিটা দিয়ে যা বাবা।

[কেটলি নিয়ে সুখেনের প্রস্থান]

কমলেশ। কাল মিছিল করে ওরা চ্যালেঞ্জ করেছে। তার উচিত জবাব আমাদের দিতেই হবে।

অনুপম। স্লোগানগুলো বেশ কড়া হওয়া দরকার।

শেখর। কী কী স্লোগান হবে?

অরবিন্দ। এখানে নয়, পার্টি অফিসে গিয়ে ঠিক হবে।

[সুখেনের প্রবেশ]

কমলেশ। সুখেন, মিছিলে যাবি তো? না ঘরে বসে শুধু জন্মদিনই করবি?

সুখেন। পার্টির ডাকে যাইনি এমন হয়েছে কোনোদিন?

কমলেশ। না, বলছিলাম, মাসিমার আপত্তি থাকতে পারে তো?

সুখেন। মা কখনো আমাকে বাধা দেন না।

অরবিন্দ। এগারোটায় মিছিল বেরুবে। আর দেরি করা ঠিক হবে না। বেরুবার আগে মিটিং-এ সব ঠিক করে নিতে হবে।

কমলেশ। ভালভাবে তৈরি হয়ে বেরুতে হবে। [হাত মুঠো করে দেখিয়ে] মাল-মশলা সব ঠিক আছে তো?

অরবিন্দ। চুপ কর। এমন মুখ পাতলা তুই!

[সুচেতা ট্রে-তে করে চা নিয়ে আসে। সবাই চা নেয়]

সুচেতা। গত সনে এমন দিনে সুনীত তোদের মধ্যে ছিল। সারাদিন থেকে কত আনন্দ করল।

অরবিন্দ। আমাদের সঙ্গে তার পোষাল না। আমরা নাকি নয়া-শোধনবাদী।

শেখর। বন্দুকের নলে শক্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে সে এখন।

কমলেশ। পার্লামেন্ট শুয়োরের খোঁয়াড়।

অনুপম। জোতদার খুন কর।

শেখর। বোমা মেরে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উড়িয়ে দাও!

সুচেতা। মরণবুদ্ধিতে পেয়েছে ওদের। যেমন মারছে তেমন নিজেরাও মরছে।

অরবিন্দ। এসব ছেলেমানুষি করে বিপ্লব হয় না, মাসিমা। বিপ্লবের একমাত্র পথ শ্রেণীসংগ্রাম। অন্ধকারে গুপ্তহত্যা বা খুনের নীতিতে আমরা বিশ্বাসী নই।

সুখেন। এসব আলোচনা এখানে না করলে হয় না তোদের?

সুচেতা [বিরক্তভাবে]। এসব আলোচনা ছাড়া অন্য কথা তোরা বলিস কখন! সর্বদাই তো কানে আসে—হঠকারীদের খতম কর,—খুনকা বদলা খুন হ্যায়....

[দ্রুতপদে প্রস্থান]

অরবিন্দ। মাসিমাকে কেউ ভুল বুঝিয়েছে।

শেখর। শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে ধারণা এখনো পরিষ্কার হয়নি।

কমলেশ। আরো পড়াশুনো করা দরকার।

অনুপম। সুখেন পার্টি লিটারেচার বাড়িতে আনা দরকারই মনে করে না।

সুখেন। মোটেই তা নয়। মাকে পড়তে বললেই বলেন...ঢের পড়েছি। তোরা তো একতরফা কথা বলিস।

অরবিন্দ। বিপ্লবীরা যে এককথাই বলে সেটা বুঝিয়ে দেয়াই তো আমাদের কাজ।

সুখেন। সুনীত আমাদের এ-কথাটায়ই আপত্তি করত। সে বলতো—বিপ্লবীরা তো যন্ত্র নয় যে তাদের মনে প্রশ্ন থাকবে না।

অরবিন্দ। আমরা বিপ্লবের সৈনিক। পদে পদে প্রশ্ন তুললে সৈনিক সংগ্রাম করতে পারে না। সেনাপতির আদেশ মেনে চলাই তার কাজ। পার্টি ডিসিপ্লিন না মানলে বিপ্লবী পার্টির সভ্য থাকা চলে না।

অনুপম। ব্যক্তিগত জীবনেও ?

অরবিন্দ। বিপ্লবীর কোনো ব্যক্তিগত জীবন থাকতে নেই।

সুখেন। ভুল করি আমরা সেখানেই যেখানে মনে করি দরদীরাও পার্টি সভ্যেরই মতো।

অরবিন্দ। সুখেন!

সুখেন। হ্যাঁ তাই। আমরা আমাদের মতটাকে সবার ওপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চাইনে কি ?

অরবিন্দ। কখ্খনো না।

সুখেন। তা হলে কারো প্রশ্ন জাগলে আমরা তা চাপা দিতে চাই কেন ?

অরবিন্দ। সুখেন, তোকেও কি সুনীতের রোগে পেল নাকি ?

সুখেন। হাজার মনে হাজার প্রশ্ন উঠবে। তার উত্তর আমাদের দিতে হবে।

অরবিন্দ। শ্রেণীসংগ্রামের শত্রুরাই হাজার প্রশ্ন তুলছে।

সুখেন। লক্ষ মনে যদি লক্ষ প্রশ্ন থাকে তবে তা দাবিয়ে দেবার সাধ্য আমাদের নেই।

অরবিন্দ। লক্ষ জনের কথা ছেড়ে দে। বল তোর মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

সুখেন। সে প্রশ্নেরও উত্তর দিতে হবে। কারণ আমি যখন পার্টির একজন সভ্য তখন সেটা আমার একার প্রশ্ন নয়। নিশ্চয়ই বহুজনের প্রশ্ন।

অরবিন্দ। নেতৃত্বকে প্রশ্ন করিস—সেখান থেকেই উত্তর পাবি।

সুখেন। না, আমরা এখানে একসঙ্গে কাজ করি। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেই উত্তর খুঁজে পেতে হবে।

অরবিন্দ। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে অস্বীকার করে ?

সুখেন। আমার মাকে কেন্দ্রীয় নেতারা চেনেন ?

অরবিন্দ। তা কি করে সম্ভব!

সুখেন। আমার মায়ের মতো যদি আরো অনেক মায়ের প্রশ্ন থাকে ?

অরবিন্দ। সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব নয়।

সুখেন। এই করেই সুনীতের মতো সাচ্চা কমরেডকে আমরা হারিয়েছি।

অনুপম। তাকে রাখতে হলে তো তার মতবাদটা মেনে নিতে হত।

কমলেশ। তার অর্থ জনারণ্য ছেড়ে অরণ্যে গিয়ে বিপ্লব করা।

সুখেন। না। তাকে আমরা প্রকৃত রাজনীতি দিতে পারিনি।

অরবিন্দ। তুই দিলেই পারতিস।

সুখেন। পারিনি, কারণ আমার রাজনৈতিক জ্ঞান তোদের কারো চাইতে বেশি নয়।

শেখর। এখন তো খুব জ্ঞান দিচ্ছিস।

সুখেন। শেখর, বিদ্রূপ করে লাভ নেই। সুনীতের কথা শুনেও তোরা এভাবেই বিদ্রূপ করতিস। প্রশ্ন তাকে পাগল করে তুলেছিল, পথ চেয়েছিল সে। তার সততার অভাব ছিল না। পথ না পেয়ে সেই বৈপ্লবিক প্রেরণাই তাকে ভুলপথে নিয়ে গেল।

শেখর। প্রেরণা না, উম্মাদনা।

কমলেশ। অরবিন্দ, এখন থেকে পার্টির কাজকর্ম শিকেয় তুলে রেখে মার্কসবাদের একটা টোল খুলে দে।

অনুপম। আমরা ব্রহ্মচারী হয়ে সেখানে জ্ঞান অর্জন করব।

সুখেন। পরিহাস! প্রশ্নকে পরিহাস করলে তোরা নিজেরাই একদিন পরিহাসের পাত্র হয়ে উঠবি।

অরবিন্দ [সুখেনকে]। তুই তাহলে মিছিলে যাচ্ছিস নে?

সুখেন। কেন যাব না। প্রশ্ন থাকলেও পার্টির প্রতি আনুগত্য তোদের কারো চাইতে আমার কম নয়।

অরবিন্দ। That's like a comrade. চল, আর দেরি নয়।

শেখর। চল, চল, উত্তর যারা চেয়েছে তাদের উত্তর দিয়ে আসি। সুনীতের দল আজ উচিত জবাব পাবে।

[একে একে সবাই বেরিয়ে যায়। সুখেন বেরুতে যাবে এমন সময় সুচেতা প্রবেশ করে]

সুচেতা। সুকু!

সুখেন [থমকে দাঁড়িয়ে]। বল মা।

সুচেতা। এখন না বেরুলেই নয়?

সুখেন। দেরি হবে না। যাব আর আসব।

সুচেতা। মনে হয় আজ তোরা একটা কিছু করবি।

সুখেন। কিছু না। মিছিল তো আমরা ফি-রোববারই বার করি।

সুচেতা। কি একটা আলোচনা হচ্ছিল তোদের। আমি আসায় চেপে গেলি।

সুখেন। এত ভয় কেন মা তোমার!

সুচেতা। কোন মা আজ ভয়ে ভয়ে না আছে রে? সবাইকে ভয় দেখানোই তো আজ রাজনীতি। ভালবাসা দিয়ে কেউ কাছে টানতে চায় না, চায় ভয় দেখিয়ে জয় করতে।

সুখেন। সবাইকে ভালবাসা যায় না, মা! শত্রুকে ঘৃণা করতেই হবে। গান্ধীবাদের যুগ আর নেই।

[সুখেনের প্রস্থান। সুচেতা বিস্মিত হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে ও পরে কাপ-ডিশগুলো ও কাঁচের গ্লাসটা ট্রে-তে তোলে। বাজার নিয়ে ভবেশের প্রবেশ]

সুচেতা। এত দেরি করলে! কখন রেঁধে নামাব?

ভবেশ। কি করব। আধ ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে তবে মাংস পেলাম। মনে হচ্ছিল এর চেয়ে নিজের গায়ের মাংস কেটে খাওয়া ভাল।

সুচেতা। ভেব না। দু-দিন বাদে হয়তো মানুষ মানুষের মাংসই খাবে।

[ট্রে-টা রেখে দিয়ে বাজার নিয়ে সুচেতা কক্ষান্তরে যায়। ভবেশ একটা চেয়ারে বসে ক্লান্তি দূর করেন]

ভবেশ [স্বগত]। সুচেতা মিথ্যে বলেনি। সময় সময় মনে হয় আদিম মানুষের হিংস্রতা মরেনি, শুধু ভব্যতার আবরু পরে আছে। প্রতিহিংসার ব্যারোমিটার চড়লেই আবরুটা ফেলে দিয়ে সেটা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

[জনার্দনের প্রবেশ]

জনার্দন। ভবেশবাবু আছেন, ভালই হল।

ভবেশ। বসুন।

জনার্দন [চৌকির ধারে বসে]। দেখুন, দুপুরে আমার আসা সম্ভব হবে না। রাত্রের দিকে এসে আমি যা হয় চারটি মুখে দিয়ে যাব।

ভবেশ। কেন দুপুরে অসুবিধে কি? আজ রোববার, আপনার স্কুল নেই।

জনার্দন। স্কুল থাকলেও আটকাত না। ক্লাস আর হচ্ছে কই! ঘন্টা পড়ে, মাস্টার মশাইরা হাজিরা খাতায় সই করেন, তারপরে চলে যান। এসে একদল ছাত্র বললে, আজ আমাদের অমুক কারণে স্কুল বন্ধ। পরদিনই বিরুদ্ধ পক্ষের অন্যদল এসে স্লোগান দিতে শুরু করল—অমুকের প্রতিবাদে ছাত্র ধর্মঘট। কোনোদিন বা হাতাহাতি ঘুষো-ঘুষি হয়ে গেল। তারপর দপ্তরীকে বলি ছুটির ঘন্টা বাজিয়ে দিতে। যাত্রার আসর ফাঁকা হয়ে যায়। তখন একা বসে থেকে স্কুল পাহারা দেবার মানে তো হয় না। আমিও চলে আসি।

ভবেশ। স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কোথায়ই বা লেখা-পড়া হচ্ছে বলুন? ছাত্রদের খাতায় নাম রাখতে হয় তাই রাখে। মাইনে পাই বলে কলেজে যেতে হয়, আমরা যাই। ক্লাসের বেঞ্চগুলোর যদি চোখ, কান ও মস্তিস্ক থাকত ক্লাস করা চলত। তা যাই হোক, এ-বেলাই আসছেন তো?

জনার্দন। না দেখুন, বলছিলাম কি...[ইতস্তত করে] বলব?

ভবেশ। বলুন না। অত কিন্তু কিন্তু কচ্ছেন কেন?

জনার্দন। বলছিলাম, এ-বেলা তো সুখেনের বন্ধুরা আমোদ-আহ্লাদ করে খাবে....

ভবেশ। তা খাবে ওরা। আর সবাই পাড়ারই তো ছেলে। আপনার কিছু অসুবিধা হবে না।

জনার্দন। না, না অসুবিধে হবে কেন। তবে ওদেরই বাধো বাধো ঠেকবে। প্রাণ খুলে আমোদ করতে পারবে না।

ভবেশ। আপনার জন্যে না হয় আলাদা ঘরে ব্যবস্থা করা হবে।

জনার্দন। না না, সেটাও ভাল দেখাবে না। এক বাড়িতে খেতে এসে একটা আলাদা আলাদা ভাব ভাল কি? তার চেয়ে স্বয়ং...

ভবেশ। আপনার আটকাচ্ছে কোথায় বলুন তো জনার্দনবাবু?

জনার্দন। তবে খুলেই বলি। [সুচেতা এসে ট্রে নিয়ে যায়] দেখুন ভবেশবাবু, এক জায়গায় যদি পাঁচটা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, একেবারে মুখ বুজে থাকা যায় না।

ভবেশ। মুখ বুজে থাকার দরকারই বা কি?

জনার্দন। আপনি যদি সব কথায়ই সায় দিয়ে যান তবে সেটা খোশামোদের মতো শোনায় না কি?

ভবেশ। তা তো বটেই।

জনার্দন। কোনো অসঙ্গত কথা শুনে প্রতিবাদ না করাটাও সত্যকে চাপা দেয়ারই সামিল।

ভবেশ। ভীরুতাও বলতে পারেন।

জনার্দন। সত্য প্রকাশে সাহস দেখালে আপনি হয়তো অপমানিত হবেন।

[সুচেতা ঢুকে দুটো করে সন্দেশ দ-জনকে দেয়, দু-কাপ চা ও দু-গ্লাস জল রেখে প্রস্থানোদ্যত হয়]

জনার্দন। আবার সন্দেশ কেন?

সুচেতা। সুকুর জন্মদিনে মিষ্টিমুখ করবেন না।

[সুচেতার প্রস্থান]

ভবেশ। সুখেন আপনাকে কোনো অপমানজনক কথা বলেছে নাকি?

জনার্দন [খেতে খেতে]। না না, সুখেন তা করতে পারে না। সে তেমন ছেলেই নয়। কিন্তু সবার মুখে তো লাগাম নেই। আকার-ইঙ্গিতে এমন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখায় যা চুপ করে বসে থেকে সহ্য করা মুশকিল। আমাদের ভেতরের আগুন নাকি শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখন উনোনের বাসি ছাইয়ের মতো আবর্জনা মাত্র। ওদের শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বটা তাই আমাদের মাথায় ঢোকে না। আমরা নাকি এখন চতুষ্পদ জন্তুর মতো গিলিত-চর্বণ করি।

ভবেশ। শক্তির দাপাদাপি যেখানে, অপচয় সেখানেই, জনার্দনবাবু।

জনার্দন [খেতে খেতে]। শেক্সপীয়র সেজন্যেই তাঁর Fool-এর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন: Speak less than thou knowest. Have more than thou showest.

ভবেশ। শেক্সপীয়র মানব চরিত্রের খবর ভাল রাখতেন কিনা।....

[দু-জনে চায়ের কাপ হাতে নেয়। দূরে একটা উত্তেজিত জনতার কোলাহল শোনা যায়। দু-জনেই উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন। অকস্মাৎ অনতিদূরে কয়েকটা বোমার আওয়াজ হয়। রাস্তা দিয়ে লোকজনকে ছুটোছুটি করতে দেখা যায়। কোলাহল বাড়ে। সুচেতা উদ্বিগ্ন হয়ে প্রবেশ করে। রাস্তার দিকে তাকায়]

সুচেতা। কি হল! বুঝতে পারছি নে।

[সোমেন ছুটতে ছুটতে দোর গোড়ায় এসে দাঁড়ায় তার হাতে একটা লম্বা লাঠি]

সুচেতা। কি হল, সোমেন?

সোমেন। সুখেনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

তিনজন [এক সঙ্গে]। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সোমেন। হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গেই ছিল। বোমা ফাটার পর আমরা ছিটকে পড়ি। তারপর থেকে সুখেনকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সুচেতা। আমি জানতাম, আমি জানতাম আমার এমন সর্বনাশ হবে। আমি খুঁজে বার করব, যেখান থেকেই হোক আমার সুকুকে খুঁজে বার করব।

[হঠাৎ সুখেনের প্রবেশ]

সুখেন। মা!

সুচেতা। এসেছিস বাবা, এসেছিস। হাজার দিন তোকে বারণ করেছি...

সুখেন। সেসব কথা এখন থাক মা। সোমেন, তোরা কেন রটিয়েছিস আমাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?

সোমেন। কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

সুখেন। যেখানেই থাকি, আমি যে মরিনি তা তো দেখতেই পাচ্ছিস। এখন যা।

সোমেন। তুই যাবি নে?

সুখেন। পরে যাব।

সোমেন। মায়ের আঁচল ধরে থাকবি? You are a coward.

[রাগতভাবে সোমেনের প্রস্থান]

ভবেশ [চা শেষ করে]। Sometimes cowardice is better than bravery.

জনার্দন [কাপ রেখে]। আমি এখন উঠি।

ভবেশ। একটু দেখে যান। Stray dogs are about.

জনার্দন। এখানেও তো বিপদ হতে পারে।

ভবেশ। বিপদের সময় সাহস করে দাঁড়াতে হবে। এড়িয়ে নিরাপদ হতে পারবেন না।

[আবার কোলাহল]

সুচেতা। সুকু, কি হয়েছে বল?

সুখেন। বুঝতেই পারছ।

সুচেতা। বোমা ফাটাল কারা?

সুখেন। সে কথা পরে বলব। সুনীতকে বোধ হয় বাঁচানো গেল না, মা।

সুচেতা। কেন, কী হয়েছে তার?

সুখেন। ধরা পড়েছে।

সুচেতা। পুলিশের হাতে?

সুখেন। না।

সুচেতা। ও বুঝেছি? খুব মারছে বুঝি?

সুখেন। মা, সুনীত এখন আমাদের শত্রু। আমি দেখলাম ঘোষ বাড়ির পেছনের গলি দিয়ে সে হেঁটে চলেছে। ওকে দেখে কেমন মায়া হল। বললাম, সুনীত, শত্রু হলেও আমি চাই নে তুই খুন হোস। বাঁ দিক দিয়ে পালিয়ে যা। ডানদিকে গেলে ধরা পড়বি। শুনে সে বলল, আত্মরক্ষা কি করে করতে হয় আমি জানি। আমি তোকে সহ্য করতে পারিনে। যদি বাঁচতে চাস এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে থেকে দূর হ।

সুচেতা। তারপর?

সুখেন। তারপর আর বলতে পারব না, মা। এতক্ষণ সে বেঁচে আছে কি নেই....

সুচেতা। তাকে বাঁচাতেই হবে। আমি তাকে বাঁচাব...আমি যে মা...

[গমনোদ্যত হয়]

ভবেশ। আমিও যাব।

সুচেতা। না, তুমি সুকুকে আগলাও।

সুখেন। আমি কোথাও যাব না, মা।

সুচেতা। না—না, আমি তোদের কাউকে বিশ্বাস করিনে, কাউকে বিশ্বাস করিনে। একাই যাব আমি, একা—আমি যে মা।

[সুচেতা বেরিয়ে যায়। কোলাহল স্পষ্টতর হয়। সুখেন জানালার ধারে দাঁড়ায় ও বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে]

জনার্দন। কেমন হল!

ভবেশ। অনেকক্ষণ মেঘের আড়ালে ঢাকা থাকার পর আকাশে সূর্যটা হঠাৎ দেখা দিলে আলোটা প্রথমে খানিকটা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, জনার্দন বাবু।

জনার্দন। আপনি আলো দেখতে পাচ্ছেন—আমি তো দেখছি শুধু অন্ধকার।

ভবেশ। ঊষার আলো দেখা দেবার আগে অন্ধকার বেশি হয় জানেন তো?

জনার্দন। যা অবস্থা তাতে আর সূক্ষ্ম কথা মাথায় ঢোকে না মশাই।

ভবেশ। সূক্ষ্ম অনুভূতি ছাড়া তো আপনি স্থূলত্বকে আঘাত করতে পারবেন না।

জনার্দন। তার মূল্য দেয় কে?

ভবেশ। দেবে দেবে, একদিন দেবে। তাৎক্ষণিক বিপর্যয়ে মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাবেন না।

জনার্দন। আমার ভাল লাগছে না। সুখেনের মা একা গেলেন...

ভবেশ। আপনি ভাববেন না। সুচেতা একাই একশো।

সুখেন [ব্যাকুল কণ্ঠে]। সুনীতকে ওরা মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছে....

[ভবেশ, জনার্দন জানালার কাছে যায়]

জনার্দন। কি ভয়ঙ্কর! একজন থান ইট তুলেছে ওকে মারতে। এ-দৃশ্য আর আমি দেখতে পারছি নে। চোখের সামনে খুন হয়ে যাবে অথচ কিছু করা বা বলার উপায় নেই। কি অসহায় আমরা।

[জনার্দন একটা চেয়ারে বসে মাথা হেঁট করে ভাবতে থাকেন কোলাহল বাড়ে। ভবেশ এসে জনার্দনকে সুস্থ করার চেষ্টা করেন]

সুখেন [উল্লাসে]। মা ছুটে গিয়ে সুনীতকে জড়িয়ে ধরেছে। না, ওরা কিছুতেই ছাড়বে না। মা সুনীতকে বুকের নিচে রেখে নিজের মাথাটা ওদের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

জনার্দন [দুর্বল কণ্ঠে]। ওরা মারছে না তো?

সুখেন। না, মারতে পারছে না। মার সঙ্গে তর্ক করছে।

ভবেশ। ওরা হার মানবেই, মানতেই হবে। হাজার মুষ্টির চেয়ে একটা মায়ের প্রাণে শক্তি বেশি।

জনার্দন। তাই হোক ভবেশবাবু, তাই হোক।

সুখেন। সুনীতকে মা নিয়ে আসছে।.....ওরাও আসছে পিছনে পিছনে।

জনার্দন [বিচলিত কণ্ঠে]। এখানে এসে হামলা করবে না তো?

ভবেশ। আগুনে জল ঢালতে গেলে নিজের গায়ে খানিকটা তাপ লাগে বৈকি। তা-বলে আগুনকে তো আর বাড়তে দেয়া যায় না। অত বিচলিত হবেন না। যত ভয় পাবেন ততই ওদের ভয় দেখাবার সাহস বাড়বে।

[সুনীতকে নিয়ে সুচেতার প্রবেশ। সুনীতের কপালে দু-এক জায়গা দিয়ে রক্ত ঝরছে। সুখেনের চোখে চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে নেয়। সুখেনকে বিষণ্ণ দেখায়। বাইরে চিৎকার—খুনীকে আমরা ছাড়ব না—ওর বিচার হবে। কাউকে রেহাই দেব না—খুনীকে যারা আশ্রয় দেয় তারাও খুনী—খুনের বদলে খুন চাই—হঠকারীর রক্ত চাই—ইত্যাদি]

সুচেতা [ভবেশকে]। ওকে পাশের ঘরে নিয়ে যাও। আলমারিতে ডেটল আছে, ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দাও। দরকার হলে ব্যান্ডেজ করে দিয়ো।

[ভবেশ ও সুনীতের প্রস্থান]

সুখেন। আমিও ওর কাছে যাই।

সুচেতা। না, তোর বাবা একাই পারবে।

জনার্দন [ভয়ে কাঁপছে]। আমি কি করব?

সুচেতা। এখানেই চুপ করে বসে থাকুন। আপনি কোনো কথা বলবেন না।

[সুচেতা উদ্বিগ্ন হয়ে পায়চারি করতে থাকে। অরবিন্দ, কমলেশ, শেখর, অনুপম, সোমেন ও তাদের সঙ্গে আরো তিন-চারজন যুবক ঘরের মধ্যে ঢোকে]

সুচেতা। কি চাই তোদের?

সোমেন। সুনীতকে চাই।

সুচেতা। পাবি নে।

অরবিন্দ। আপনি তাকে আটকিয়ে রাখতেও পারবেন না।

সুচেতা। আমার দেহে প্রাণ থাকতে তোরা তাকে নিয়ে যেতে পারবি নে।

জনৈক যুবক। বোমা মেরে বাড়ি উড়িয়ে দেব।

সুচেতা [এগিয়ে গিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে]। মার না—এখনই মার না।

দ্বিতীয় যুবক। মারবই তো?

অরবিন্দ [ধমক দিয়ে]। এই, চুপ কর। মাসিমা, আপনি আমাদের লোক। আপনি যদি শত্রুকে প্রশ্রয় দেন পরিণাম খারাপ হবে।

সুচেতা। তোদের লোক বলেই তো সুনীতকে বাঁচাব। এ সর্বনাশা পথ তোরা ছাড়। এমন তো ছিলি নে। এ খুনের নেশা তোদের মাথায় কে ঢোকাল। ভাইয়ের বুকে ভাই ছুরি বসাবে, ধারালো অস্ত্র দিয়ে ধড় থেকে মুন্ডু খসাবে, অন্ধকারে খুন করবে—বন্ধু বন্ধুকে চিনবে না, ভাই ভাইকে বিশ্বাস করতে পারবে না।....

অরবিন্দ। শ্রেণীসংগ্রামে তাই হয়, মাসিমা। সমস্ত সম্পর্ক বদলে যায়।

সুচেতা। হাঁ, মা-ছেলে, ভাই-বন্ধু, প্রতিবেশী, সবাইয়ের সম্পর্ক বদলে যায়। শ্রেণীসংগ্রাম! প্রতিদিন খবরের কাগজ খুলি আর মন বিষাদে ভরে যায়! খালি খুন আর খুন। শ্রমিক শ্রমিককে খুন করছে, কৃষক কৃষককে খুন করছে, বন্ধুর বুকে বন্ধু ছুরি বসাচ্ছে। এই কি তোদের বিপ্লব? যাদের তোরা শত্রু বলিস সেই টাটা-বিড়লাদের কতটুকু ক্ষতি হচ্ছে এতে? প্রাণভয়ে মানুষ অস্থির। একদিকে

পুলিশের দাপট, আরেক দিকে বিপ্লবের নামে নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি। কোন দিকে যাবে মানুষ।

সোমেন। আপনাকে রাজনৈতিক জ্ঞান দিতে হবে না।

সুচেতা। জ্ঞান তো তোরাই দিচ্ছিস। শুনতে ভাল না লাগে চলে যা।

শেখর। সুনীতকে দিন। আমরা চলে যাচ্ছি।

সুচেতা। কি করবি তাকে নিয়ে?

কমলেশ। তার বিচার হবে।

সুচেতা। কি করেছে সে?

সোমেন। সে বোমা মেরেছে।

জনার্দন। বোমা মেরেছে, তাকে পুলিশের হাতে দিলেই হয়।

সোমেন। চুপ করুন আপনি। ভেজা বেড়ালটি হয়ে বসে আছেন। আপনাদের প্রশ্রয় পেয়েই ওরা...

অনুপম। মাসিমা, ঝামেলা বাড়াবেন না। এরপর জনতা যদি আপনার বাড়িতে এসে হামলা করে আমরা ঠেকাতে পারব না।

সুচেতা [দৃপ্তকণ্ঠে]। জনতা! আসুক-না জনতা। সেই জনতার মুখগুলোকে ভাল করে চিনে নেয়া যাবে।

অরবিন্দ। সুনীতকে ছেড়ে দিন। আমরা ওর কিছু করব না।

সুচেতা। ওকে মারা হল কেন?

অরবিন্দ। ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে মেরেছে।

সুচেতা। তোরা তো ছিলি, ঠেকালি নে কেন?

অরবিন্দ। ও ঠেকানো যায় না।

সুচেতা। তবে সুনীতকে তোদের হাতে ছেড়ে দেব কোন ভরসায়?

সোমেন। রাখতেও পারবেন না। তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাব গণ-আদালতে তার বিচার হবে।

সুচেতা। বিচার! আগে নিজেদের বিচার কর—তারপর করবি অন্যের বিচার।

অরবিন্দ। সুনীত বোমা মেরেছে এটা তো সত্য।

সুখেন। না, সুনীত বোমা মারেনি।

অরবিন্দ। তবে কে মেরেছে?

সুখেন। কে মেরেছে তুইও জানিস, অরবিন্দ।

[দলবদ্ধ ভাবে কয়েকজন]

কয়েকজন। বিশ্বাসঘাতক, তোকেও শেষ করব।

[সুখেনের দিকে এগিয়ে যায়। সুচেতা রুখে দাঁড়ায়]

সুচেতা। সাবধান! আমি শুধু সুখেনের মা নই, তোদেরও মা। সাহস থাকে আমার গায়ে হাত তোল। [সবাই থমকে দাঁড়ায়] কই মার, মার আমাকে।

[এক-পা দু-পা করে সবাই পেছনে সরে যায়]

অরবিন্দ। চল, এর বিচার হবে পরে।

সোমেন। সুখেনের মা বলে রেহাই পাবেন না। এর সমুচিত জবাব দিতেই হবে।

[একে একে সবার প্রস্থান। সুচেতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নেপথ্যে স্লোগান....খুনীকে আশ্রয় দেয়া চলবে না—চলবে না...বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি চাই—শাস্তি চাই...হঠকারীদের খতম কর...খতম কর ইত্যাদি]

জনার্দন [ভীত কণ্ঠে]। আবার যদি ওরা আসে।

সুচেতা [আর্দ্রকণ্ঠে]। আসুক। আমি পারব না, পারব না। মা হয়ে প্রাণ থাকতে একটা জলজ্যান্ত ছেলেকে আমি হাড়িকাঠের দিকে ঠেলে দিতে পারব না।

[ভবেশের প্রবেশ]

ভবেশ। কোনো মা-ই তা পারে না।

জনার্দন। ভবেশবাবু, আপনাদের বোধ হয় এখানে আর থাকা চলবে না।

ভবেশ। কোথায় যাব ভাই? রক্তের হোলি খেলা তো আজ সর্বত্র। [সুচেতাকে] দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আজ সুকুর জন্মদিন, উৎসব করতে হবে তো?

সুচেতা [কান্নায় ভেঙে পড়ে]। ভাল লাগে না, আমার কিছু ভাল লাগে না।

ভবেশ। কাঁদবে না। আজই তো সবচেয়ে শুভদিন গো। মরণকে হটিয়ে জীবনের উৎসব। [পাশের ঘরে গিয়ে সুনীতকে নিয়ে আসেন। সুনীতের মাথায় ব্যান্ডেজ] নাও, নাও, ওকে আশীর্বাদ কর। তোমার আশীবাদে ওর উত্তপ্ত মস্তিষ্ক শীতল হবে। সুনীত, মাসিমাকে প্রণাম কর। [সুনীত প্রণাম করে। সুচেতা তার মাথায় আশীবাদ করার পর তাকে বুকে চেপে ধরে কেঁদে ওঠে] মেঘে শুধু বজ্রবিদ্যুৎই থাকে না, বুক ভরা তার বর্ষণের জলও থাকে। [এগিয়ে গিয়ে সুনীতের মাথায় হাত বুলোতে থাকেন] সুনীত, তোদের জেনারেশনের অস্থিরতার কথা আমি বুঝি। এমন একটা অন্ধকারে কেউ স্থির থাকতে পারে না। সবাই চায় আলো। কিন্তু অসহিষ্ণুতায় অন্ধকার আরও বাড়ে। বিপ্লবের বীজ অঙ্কুর মেলে লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি মানুষের মনে। তাকে বাড়িয়ে দেয়া সতেজ করাই বিপ্লবীর কাজ। শক্তির উৎস বন্দুকের নল নয়, মানুষ। মানুষকে ভয় দেখিয়ে কি সঙ্গে পাবি? বিপ্লব তো অঙ্কুর মেলছে মাঠে খামারে, কলে কারখানায়, গরিবের ভাঙা ঘরে। একদিন দেখবি ধানের ক্ষেতের লক্ষ কোটি শিষের মতো তারা এক সঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সেদিন বিপ্লবের ফসল তুলতে হবে ঘরে। আর আমরা সবাই মিলে সেই শুভদিনটিতে করব বিজয়োৎসব—শুরু হবে সৃষ্টির মহাপর্ব। [সুচেতাকে] যাও, যাও, সুনীতকে মিষ্টি মুখ করাও। সুকুর জন্মদিনের উৎসব সার্থক হোক।

[সবারই মুখে হাসি ফুটে ওঠে]

সত্যসন্ধ

বুদ্ধদেব বসু

চরিত্রলিপি

জয়ানন্দ

উর্মিলা [জয়ানন্দর স্ত্রী]

পুলিশের দারোগা

পুলিশের ইন্সপেক্টর

উকিল

জয়ানন্দর একটি বন্ধু ও বন্ধুপত্নী

জয়ানন্দর আপিসের বড় কর্তা ও ছোট কর্তা

দুটি সুশ্রী মহিলা

দুই প্রৌঢ়

এক বালক

দুটি কলেজের ছাত্র

একটি ছাত্রী

কাগজের হকার

নেপথ্যে বিবিধ কণ্ঠস্বর

[কলকাতার যে-কোনো . . . থানা। লম্বা টেবিলের সরু দিকে একটি ছোকরামতো দারোগা বসে আছে, তার সামনে একটা বালি কাগজের খাতা খোলা, হাতে কলম। শ্রাবণ মাসের মেঘলা বিকেল, কড়া ইলেকট্রিক বাল্‌ব ঝুলছে সিলিং থেকে]

দারোগা [খাতা থেকে গুনগুন করে পড়ে]। I hereby depose...on the second of August..my wife...at 600 X Block, New Alipore... [ইন্সপেক্টর ঢুকল, দারোগা পড়া থামিয়ে উঠে দাঁড়াল] আসুন, স্যার। আপনার জন্যই বসে আছি।

ইন্সপেক্টর। কোনো জরুরি ব্যাপার ?

[টেবিলের লম্বাদিকটায় বসল]

দারোগা। সেই যে আপনাকে ফোন করলুম দুপুরে—

[সেও বসল]

ইন্সপেক্টর। ও, সেই মার্ডার-কেস। আসামী কোথায় ?

দারোগা। তাকে পাশের ঘরে বসিয়ে রেখেছি।

ইন্সপেক্টর। হাজতে দাওনি ?

দারোগা। একজন রেসপেক্টেবল ভদ্রলোক, স্যার—

ইন্সপেক্টর। ঢের, ঢের ভদ্দরলোক দেখেছি হে, জগন্নাথ। কাউকে বিশ্বাস নেই।

দারোগা। ঠিক কথা, স্যার, যা বলেছেন। তবে—এই জয়ানন্দবাবু—মানে, আসামি—লোকটি কেমন অদ্ভুত-মতো। নিজেই চলে এল থানায়, আমরা কেউ জিগ্যেস করার আগেই বলে কিনা—'আমি আমার স্ত্রীকে খুন করেছি, আপনারা আমাকে গ্রেপ্তার করুন।'

ইন্সপেক্টর। এতে আর অদ্ভুত কী আছে। খুন করলেই কনফেস করার ভীষণ ইচ্ছে হয় কারো-কারো।

দারোগা। তাই বলে পুলিশের কাছে! আর ভদ্রলোকটির কথাবার্তাও কেমন বাঁকাচোরা। সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে, মনে হল।

ইন্সপেক্টর। কী-রকম ?

দারোগা। হয়তো আসল খুনেকে বাঁচাতে চাচ্ছে। বা লুকোতে চাচ্ছে কোনো পারিবারিক কলঙ্ক। বা হয়তো...[মাথায় টোকা দিয়ে] মাথায় গোলমাল।

ইন্সপেক্টর। বাঁচার জন্য পাগল সাজা আর নতুন কী।

দারোগা। না, স্যার, এখানে ঠিক উল্টো ব্যাপার। জোর করে বলছে সে খুনে। আমি যখন বললুম, 'হুট করে একটা কথা বললেই তো হল না, আদালতে প্রমাণ হওয়া চাই—' তখন মুখটা এইটুকু হয়ে গেল। 'আপনারা তাহলে আমার কথা বিশ্বাস করছেন না? ভাবিনি আমাকে কেউ অবিশ্বাস করবে।' খুনে হবার জন্য এমন হামলাতে আর দেখিনি কাউকে।

ইন্সপেক্টর। তুমি আর কতটুকু দেখেছ, জগন্নাথ। এই সেদিন সার্ভিসে ঢুকলে। আমার বয়সে কিছুতেই আর অবাক হবে না।

দারোগা। ঠিক কথা, স্যার। কিন্তু ভদ্রলোকটি—

ইন্সপেক্টর। ভদ্রলোকটি হয়তো উচ্চাঙ্গের ক্রিমিনাল—ভাবছে নিজের দোষ নিজে জাহির করলে অন্যেরা নির্দোষ বলে ধরে নেবে। পোস্ট-মর্টেমের রিপোর্ট আসেনি?

দারোগা। আসেনি এখনো। তবে সেখানেও এক ফ্যাকড়া, স্যার। জয়ানন্দবাবুর যিনি ফ্যামিলি-ফিজিশিয়ান, তিনি এসেছিলেন খানিক আগে। লিখে দিয়ে গেছেন ওটা ন্যাচারেল ডেথ—হেমারেজ অব দি হার্ট। খুব বড় ডাক্তার, স্যার। এম.আর.সি.পি,এফ.আর.সি.এস—

ইন্সপেক্টর। বাদ দাও ও-সব। বাড়ির বাঁধা ডাক্তার—ওটুকু বন্ধুকৃত্য করবে না!

[টেলিফোন বাজল]

ইন্সপেক্টর [টেলিফোনে]। হ্যালো—মেডিকেল কলেজ?—হ্যাঁ, বলুন। ডাউটফুল?... পয়জনিং-এর কোনো এভিডেন্স নেই?...ভায়োলেন্স?...তা হতে পারে, কিন্তু...? আচ্ছা, রিপোর্টটা পাঠিয়ে দিন। [টেলিফোন নামিয়ে রাখল]

দারোগা। এই যে,স্যার— [খাতা এগিয়ে দিল]

ইন্সপেক্টর [খাতায় চোখ বুলিয়ে]। Jayananda Sarkar, Public Relations Officer, All-India Chemicals...my wife Srimati Urmila Sarkar....deceased...এনকোয়ারিতে কে গিয়েছিল?

দারোগা। নগেনবাবু স্যার—পাকা লোক। এই তাঁর রিপোর্ট।

[একটা ফাইল এগিয়ে দিল]

ইন্সপেক্টর [ফাইলে চোখ ফেলে, সরিয়ে রেখে]। ইনফরমেশন কোত্থেকে এল?

দারোগা। সেই তো মজা, স্যার। পাড়া-পড়শি কেউ কিছু সন্দেহ করেনি। কেউ কল্পনাও করেনি গোলমেলে কিছু আছে। ভদ্রলোক নিজে এসে বললেন আমাদের—বেলা এগারোটা নাগাদ, আত্মীয়েরা সাজিয়ে-টাজিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে—ওরই মধ্যে হঠাৎ অত লাল পাগড়ি দেখে যা অবস্থা সকলের! আমরা যখন বললুম এই ব্যাপার, জয়ানন্দবাবুর একটি শালী ফিট হয়ে পড়ল। ভেবে দেখুন, স্যার, উনি যদি থানায় না-আসতেন, কিছু না-বলতেন, তাহলে এতক্ষণে নিশ্চিন্তে শোক করতে পারতেন স্ত্রীর জন্য, দু-বছর পর আবার বিয়ে করে ঘর বাঁধতেন—কোনো জন্মে কিচ্ছুটি হত না।

ইন্সপেক্টর। আসামিকে ডাকো। চেহারাটা দেখি।

দারোগা [হাঁক দিয়ে]। তেওয়ারি! জয়ানন্দ সরকারকো বোলাও।

[নেপথ্যে তেওয়ারির ভারি বুটের শব্দ। একটু পরে জয়ানন্দর প্রবেশ। আধ-বয়সী, মাথার চুল পাৎলা ও উশকো খুশকো, চেহারা সম্ভ্রান্ত কিন্তু এ-মুহূর্তে মলিন, পরনে প্যান্ট-শার্ট]

ইন্সপেক্টর [তাকিয়ে, বাঁ দিকে চেয়ার দেখিয়ে]। বসুন। [জয়ানন্দ বসল।] আপনার নাম...[দারোগার ডায়েরি দেখে] জয়ানন্দ সরকার?

জয়ানন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইন্সপেক্টর। বয়স...উনচল্লিশ?

জয়ানন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইন্সপেক্টর। আপনি বলেছেন আপনি আপনার স্ত্রীকে খুন করেছেন?

জয়ানন্দ। যা সত্য তা-ই বলছি।

দারোগা। সত্য-মিথ্যা হাইকোর্টে ঠিক হবে। তা আপনিও জানেন না, আমরাও জানি না।

জয়ানন্দ। আপনার কথার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছি। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ শুধু আমিই জানি।

ইন্সপেক্টর [খাতায় চোখ ফেলে]। আপনি বলছেন...বাই স্ট্র্যাংলিং....গলা টিপে মেরেছিলেন?

জয়ানন্দ। ঠিক তা-ই।

ইন্সপেক্টর। কী করে? ফাঁস জড়িয়ে? না, এমনি শুধু হাতে?

[হাত তুলে আঙুল বাঁকালো]

জয়ানন্দ। বালিশ চাপা দিয়ে। একটা, দুটো, তিনটে বালিশ।

[দারোগা ও ইন্সপেক্টরের চোখাচোখি]

ইন্সপেক্টর। কী বাজে বকছেন! বালিশ চাপা দিয়ে কোনো সাবালক মানুষকে মারা যায় না।

জয়ানন্দ। আমি বালিশের ওপর হাঁটু চেপে বসেছিলাম। আমার ওজন দেড় মন। আর ঊর্মিলা ছিল ছোটখাট, দুর্বল মতো।

ইন্সপেক্টর। উনি ছটফট করেননি? চিৎকার করেননি? চিৎকার শুনে ছুটে আসেনি কেউ?

জয়ানন্দ। ও বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা। চেঁচোবার সাধ্যও ছিল না। আর চেঁচালেই বা শুনত কে? শেষরাত, অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে, আমরা স্বামী-স্ত্রী দরজা বন্ধ করে ঘুমোচ্ছি।

ইন্সপেক্টর। তারপর?

জয়ানন্দ। তারপর আমি উঠে গিয়ে ডাক্তারকে ফোন করলাম। ডাক্তার তক্ষুনি এলেন; দেখে বললেন স্ট্রোক।

ইন্সপেক্টর। আপনি ডাক্তারকে বলেননি যে আপনি চাপা দিয়ে—

জয়ানন্দ। না, বলিনি। ডাক্তার আমার অনেকদিনের বন্ধু, বিশ্বাস করত না। তাছাড়া—কেমন লজ্জাও করল। কিন্তু আপনারা পুলিশ—ভগবানের প্রতিনিধি....আপনাদের কাছে লজ্জা নেই।

দারোগা। মাপ করবেন, আমরা আইনের প্রতিনিধি, ভগবানের সঙ্গে কোনো কারবার নেই আমাদের।

জয়ানন্দ। কিন্তু সব আইন তো ভগবানেরই সৃষ্টি।

দারোগা। ভুল বলছেন। আমাদের ইন্ডিয়ান পেনাল কোড ইংরেজের তৈরি—অন্য অনেক দেশের সঙ্গে তা মেলে না। আইন যদি ভগবানের তৈরি হবে তাহলে তা এক-এক দেশে এক-এক রকম কেন?

ইন্সপেক্টর। অত বকবক কোর না, জগন্নাথ, আমি চিন্তা করছি। কী যেন ভাবছিলাম—হ্যাঁ—[জয়ানন্দর দিকে ঝুঁকে] আপনার মোটিভ কী ছিল?

জয়ানন্দ [যেন কথাটা বুঝতে না-পেরে]। মোটিভ?

ইন্সপেক্টর। মানে—কারণটা কী? ব্যাপারটা—কী বলে গিয়ে—একটু অস্বাভাবিক কেন হবে? অনেকেরই অনেককে মারতে ইচ্ছে করে মাঝে-মাঝে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, যারা একসঙ্গে এক বাড়িতে থাকে, তাদের মধ্যে তো খুবই বেশি। একটা বয়সে বোনেরা চুলোচুলি করে, ভাইয়েরা কিল-ঘুষি চালায়। সবই তো ঐ এক ব্যাপার। আমরা আজকাল নরম করে হিংসে বলি, কিন্তু হিংসার আসল অর্থ তো মেরে ফেলার ইচ্ছে। বড় হয়, বুদ্ধি পাকে—তখনও কথা দিয়ে মারে, কেউ কোনো ব্যবহার দিয়ে। পুরোপুরি খুন পর্যন্ত গড়ায় না—সময় নেই বলে, সুযোগ নেই বলে। তাছাড়া, রাগও পড়ে যায়।

দারোগা [সে খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছিল]। আপনার তাহলে রাগ ছিল আপনার স্ত্রীর ওপর?

জয়ানন্দ। তা ছিল বইকি।

ইন্সপেক্টর। সেই রাগের কারণটাই জানতে চাচ্ছি।—জগন্নাথ, উনি যা বলছেন লিখে নাও।

দারোগা [খাতা টেনে নিয়ে লিখতে-লিখতে]। আমার স্ত্রীর ওপর আমার রাগ ছিল—' তারপর?

জয়ানন্দ [ক্লান্তভাবে কপালে হাত বুলিয়ে]। আমি—আমি ঠিক— [থেমে গেল]

ইন্সপেক্টর [জয়ানন্দকে সাহায্য করার ধরনে]। আচ্ছা শুনুন—আপনার স্ত্রী—কিছু মনে করবেন না, আমাদের সবই জানতে হয়—তাঁর কোনো গুরুতর অপরাধ কি ধরা পড়েছিল বিয়ের পরে? যেমন ধরুন, যদি কোনো পুরুষের সঙ্গে—আই মীন, ইজ ইট এ কেইস অব কনজুগেল জেলাসি?

জয়ানন্দ। জেলাসি? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ওটা বড্ড ছিল আমার। ভীষণ।

ইন্সপেক্টর। মাপ করবেন, কারো ব্যক্তিগত জীবন দিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি বড় নোংরা ব্যাপার, কিন্তু আমাদের তো ঐ কাজ, আর আপনিও প্যাঁচে পড়ে গেছেন। আমি যা জানতে চাচ্ছি তা এই আপনি কি আপনার স্ত্রীর ইনফিডেলিটির কোনো প্রমাণ পেয়েছিলেন?

জয়ানন্দ। প্রমাণ?...ইনফিডেলিটি? না তো।

ইন্সপেক্টর। এমন কোনো লক্ষণ, যাতে তাঁর চরিত্র বিষয়ে—

জয়ানন্দ [ঝাঁঝিয়ে উঠে]। ইন্সপেক্টরবাবু, আপনি মুখ সামলে কথা বলবেন।

ইন্সপেক্টর। কী মুশকিল! তাহলে আপনার জেলাসি কেন?

জয়ানন্দ। ঐ আমার স্বভাব। বিয়ের ছ-মাস পর থেকেই মনে হতে লাগল আমার স্ত্রী আমার অসহ্য। সব সময় নয়। মাঝে মাঝে। তখন মনে-মনে প্ল্যান করতুম কী করে তাকে দূর করা যায়।

ইন্সপেক্টর। সে কী! ছ-মাস পর থেকেই? অদ্ভুত!

দারোগা [যেন হঠাৎ নতুন সূত্র খুঁজে পেয়ে ডায়েরি পাতা উল্টে]। আপনাদের বিয়ে হয়েছিল...দু-বছর আগে। তা-ই না?

জয়ানন্দ। ঠিক।

দারোগা। তখন আপনার বয়স ছিল...সাঁইত্রিশ, আপনার স্ত্রীর...উনিশ। ঠিক? [জয়ানন্দ মাথা নাড়ল] দ্বিতীয় পক্ষ?

জয়ানন্দ। আজ্ঞে না। বিয়ে এই প্রথম, যদিও আগে—

দারোগা [উৎসাহিত হয়ে]। বলুন, বলুন থামলেন কেন?

জয়ানন্দ। ব্যাচেলার—যুবক—রোজগার করি প্রচুর—মেয়েদের নিয়ে খেলাধুলো করতুম আর কি।

দারোগা [হেসে উঠে]। খেলাধুলো! বেশ বলেছেন কথাটা।

ইন্সপেক্টর [দারোগার দিকে ভ্রূকুটি করে]। তুমি বড্ড বাজে কথা টেনে আনতে পার,

জগন্নাথ। ও-সবের কোনো বেয়ারিং নেই।

দারোগা। ঠিক কথা, স্যার, যা বলেছেন। তবে কী জানেন—আমি ভাবছিলুম বয়সের এতটা তফাৎ যখন, আর উনি নিজে ফুলে-ফুলে মধু খেয়ে বেড়াতেন—ব্যাপারটা হয়তো—যাকে বলে সন্দেহবাতিক, তা-ই।

জয়ানন্দ [ঝাঁকিয়ে উঠে]। ছি! আপনারা কি আমাকে ইতর ভাবলেন?

ইন্সপেক্টর। কী মুশকিল! জেলাসির একটা কারণ চাই তো?

জয়ানন্দ। সেটা অন্য ধরনের জেলাসি।

ইন্সপেক্টর। ধরনটা একটু বুঝিয়ে বলুন।

জয়ানন্দ। মানে, আমি যে সত্যি বিয়ে করব তা ভাবিনি। দিব্যি ছিলুম বেপরোয়া, ফুর্তিবাজ, লাফিয়ে-লাফিয়ে উন্নতি করেছি চাকরিতে। ঢুকেছিলাম তেইশ বছর বয়সে অ্যাপ্রেনটিস হয়ে পাঁচশো টাকায়, দু-বছর পর কনফার্মেশন—আটশো—তারপর হাজার—বারো—বারো শো—হতে হতে এমন একটা অঙ্ক দাঁড়িয়ে গেলো যা বলতেও লজ্জা করে। ন-টা থেকে পাঁচটা আপিস, একবারও অন্য কিছু ভাবি না সেই আট ঘণ্টার মধ্যে, ভাববার সময়ও থাকে না। কিন্তু যেই আপিস থেকে বেরোলাম—সন্ধেবেলা—রাত্তিরে—আমার অন্য চেহারা। চমৎকার জীবন। একা থাকি, কিছুরই জন্য কোনো জবাবদিহি নেই কারো কাছে, মনে-মনে ভাবি—সারা কলকাতায় যদি এমন একজনও থাকে যে সত্যি স্বাধীন, মন যখন যা চায় তা-ই করতে পারে, সে হচ্ছি আমি। এমনি করে চোদ্দ বছর কাটাবার পর একদিন ঊর্মিলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিন মাসের মধ্যে বিয়ে।

দারোগা [সাগ্রহে]। লাভ-ম্যারেজ তো?

জয়ানন্দ। তা বলতে পারেন। কিন্তু আমি অবাক।

ইন্সপেক্টর। অবাক কেন?

জয়ানন্দ। প্রথমে ভেবেছিলুম, খুকিটি তো দেখতে-শুনতে বেশ, একটু খেলানো

যাক। কিন্তু আস্তে-আস্তে অন্য কিছু ঘটতে লাগল আমার মধ্যে—ঘটে গেল। এমন কিছু—যা নতুন, যাতে সুখের যেন সীমা নেই, আবার কষ্টও বড্ড।

দারোগা [সত্যিকার উৎসাহিত হয়ে, তার আসল কাজ প্রায় ভুলে গিয়ে]। একেই বলে লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। কিন্তু কষ্ট আবার কোত্থেকে এল?

জয়ানন্দ। মানুষের যদি স্বাধীনতা চলে যায়, তার চেয়ে কষ্ট আর কী? যদি সব চিন্তা সব সময় শুধু একদিকে ছোটে, তার চেয়ে কষ্ট আর কী? [ইন্সপেক্টরের ইঙ্গিতে দারোগা আবার লিখতে আরম্ভ করল] আমার নানা দিকে ঝোঁক ছিল—কিছু ভাল, কিছু বদখেয়াল বই, নাটক, মদ, জুয়ো, মেয়েরা। কিন্তু হঠাৎ অন্য সব মেয়ে অত্যন্ত সাধারণ হয়ে গেল—সাধারণ—বাজে—কথা বলার অযোগ্য, তাকিয়ে দেখার অযোগ্য। কী অন্যায় বলুন তো, কী অবিচার, কী স্বার্থপরতা! [দারোগা কলম নামিয়ে অবাক হয়ে মুখ তুলল] বিয়ে হল—আমার যেন বিশ্বাস হয় না সে এখন থেকে আমারই কাছে থাকবে—একই বাড়িতে—একই ঘরে—একই বিছানায়। [ইন্সপেক্টর কাসল] অথচ আমার কাছে ব্যাপারটা কিছু নতুন নয়; আমি সাঁতার কেটেছি অনেক জোয়ারে, অনেক শরীরে—নির্বিঘ্নে।

ইন্সপেক্টর [কেশে]। আপনার এ-সব কথা অবান্তর হচ্ছে, জয়ানন্দবাবু। এবার আসল ব্যাপারে চলে আসুন।

জয়ানন্দ [উন্মনভাবে]। হঠাৎ কী-রকম বদলে গেল সব। আপিসের কাজে কখনো আমার অমনোযোগ ছিল না, সারা ডালহৌসি পাড়ায় বিখ্যাত ছিল আমার ভাল পোশাক, ভাল ব্যবহার, দক্ষতা, উপস্থিতবুদ্ধি, সব ধরনের লোকের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মেলামেশার ক্ষমতা। আমার সারা জীবনটাই ছিল বলতে গেলে পাবলিক রিলেশন্সের চর্চা। কোথাও কোনো নিমন্ত্রণ বাদ দিই না, কলকাতার ছোট-বড় নামজাদারা প্রায় সকলেই আমার পরিচিত, এমনকি আমার নৈশ ক্রিয়াকর্মেও কোনো ঢাক-ঢাক গুড় গুড় নেই। কিন্তু বিয়ের পরে আমি যেন বড্ড একটা প্রাইভেট মানুষ হয়ে গেলাম, যেন আমাকে ঘিরে অদৃশ্য একটা দেয়াল উঠে গেছে। আপিসে বসে মাঝে-মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাই, কেউ দেখা করতে এলে বিরক্ত হই মনে মনে, পার্টিগুলোকে মনে হয় সময় নষ্ট। যেন সারা জগৎ থেকে আমাকে ছিনিয়ে এনেছে একটা উনিশ বছরের মেয়ে।—কী অপমান!

ইন্সপেক্টর। তা মশাই নতুন বিয়ের একটা মৌজ আছে তো। ওটা কিছু না—সকলেরই হয়, সকলেরই কেটে যায়, আপনারও যেত। আরো কিছুটা সময় দিলেন না কেন?

জয়ানন্দ। মৌজ? নেশা? কিন্তু আমার কেন নেশা হবে বলুন—আমি তো হরেক নেশায় ওস্তাদ, বাঙালি ঘরের দুধ-ভাত খাওয়া ভাল ছেলে তো নই, বরং কিছুটা—যাকে বলে ভোগক্লান্ত। ভেবেছিলুম বয়স হচ্ছে, এখন দেখাশোনার জন্য কাউকে দরকার, করেই ফেলি না বিয়েটা। ঘরে একটি নরম-তরম সরল বালিকা, আর বাইরে কাজ—অন্য সব-কিছু—মাঝে-মাঝে, আগের চাইতে কিছুটা বেশি সাবধানে—আমার

রঙ্গময়ী সখীরা। কে জানত আমার জীবনটা এমন চুরমার হয়ে যাবে। কে জানত আমি সাঁতার ভুলে যাব। হাঁটুজলে ডোবার মতো দুর্দশা হবে আমার। [দারোগা ও ইন্সপেক্টরের চোখাচোখি, দারোগা কপালে টোকা দিল] সন্ধেবেলা বাড়ি বসে থাকি—দেখি তাকে, শুনি তাকে, তার গন্ধ যেন বাতাসে ভেসে বেড়ায় আর আমি যেন তাতেই ভরপুর, তারই জন্য আমি বিকিয়ে দিচ্ছি আমার সুস্থ, স্বাভাবিক জীবন—যা-কিছু আমাকে দিয়েছে এতদিন, যা-কিছু দিয়ে অন্যদের আমি সুখী করেছি। অভ্যেসের দোষে নতুন বই কিনে আনি, কিন্তু পাতা ওল্টাই না, মনে হয় আমার বই পড়ে কিছু জানার নেই আর, কিন্তু ঊর্মিলার কাছে অনেক কিছু শেখার আছে। ভাবি—এ কি কোনো রোগ, ব্যাধি, আমি কি বোকা হয়ে যাচ্ছি? কী করে এই তফাৎটা হতে পারল? অণু-পরমাণুর যে-বিশেষ সংযোগ ও সামঞ্জস্যের নাম ঊর্মিলা, তার রহস্যটা কী?

ইন্সপেক্টর [গলা-খাঁকারি দিয়ে]। অত জ্ঞানের কথা আমাদের মাথায় ঢুকবে না মশাই। খুনটা কেন করলেন তা-ই বলুন।

জয়ানন্দ। তা-ই তো বলছি। চাই, আমি তাকে চাই—প্রতি মুহূর্তে, প্রতি নিশ্বাসে। কখনো ভাবিনি কোনো চাওয়া অমন তীব্র হতে পারে। অমন নিষ্ঠুর। কখনো ভাবিনি ভালবাসা মানে দাসত্ব। কখনো ভাবিনি একজনকে চাইলে অন্য সব চাওয়া মরে যায়। কখনো ভাবিনি ভালবাসা এত ছোট জিনিস যে একজনকে দিলে অন্য কারো জন্য কিছু বাকি থাকে না। কখনো ভাবিনি ভালবাসা এত স্বার্থপর। আর তাই আমার রাগ, আক্রোশ, আমার ঈর্ষা। অন্য সব মানুষ—যারা স্বাধীন, যাদের মন নানা দিকে ছড়ানো, তাদের ওপর। দু-বছর আমি সহ্য করেছি এই যন্ত্রণা—কিন্তু মানুষ আর কত পারে! এখন দেখুন আমাকে—আবার আমি স্বাধীন—আমি আমার পৃথিবীকে ফিরে পেয়েছি।

ইন্সপেক্টর [হাই চেপে]। নাঃ, এর কথার মাথামুন্ডু কিছু বোঝা যায় না। ডায়েরিতে সই করিয়েছ, জগন্নাথ?

দারোগা [খাতা দেখিয়ে]। এই যে, স্যার।

ইন্সপেক্টর [খাতাটা একটু নেড়ে-চেড়ে]। ঠিক আছে। তাহলে [জয়ানন্দর দিকে তাকিয়ে, অতিথিকে বিদায় দেবার ধরনে] আপনার উকিল কে?

জয়ানন্দ। উকিল? উকিল দিয়ে কী হবে?

ইন্সপেক্টর। হরিবোল! আপনি একজন খুনের আসামি, আর কোনো উকিল ঠিক করেননি?

[গাউন-পরা উকিলের প্রবেশ। লম্বা, লিকলিকে রোগা, তীক্ষ্ণ নাক, চোখ দুটো ছোট ও চকচকে। কথা ও নড়াচড়া খুব ক্ষিপ্র]

উকিল। এই যে আমি এঁর উকিল। [কার্ড বের করে] গোবিন্দমাধব ভট্টাচার্য বি. এস. সি, এম. এ, বি. এল. অ্যাডভোকেট। আমি মিস্টার সরকারের জামিন

হচ্ছি, এর কেসও আমিই লড়ব। [একটা টাইপ-করা দলিল বের করে] এখানটায় আপনার একটা সই দরকার, জয়ানন্দবাবু।

জয়ানন্দ। কী এটা?

উকিল [সহাস্যে]। কিছু নয়, জাস্ট এ ফর্ম্যালিটি। জামিনের জন্য দশ হাজার, দশ হাজার আমার ফি। এটা আপনার এস্টেট থেকে আমার প্রাপ্য হবে—এস্টেট মানে প্রভিডেন্ট ফান্ড, ব্যাঙ্কের টাকা, ইনসিওরেন্স, ইনভেস্টমেন্ট, স্থাবর সম্পত্তি, যা-ই হোক না। আমি ডিফেন্ড করব আপনাকে, মার্ডার কেস বড্ড ড্র্যাগ করে—ইট্‌স নাথিং, এ পেটি সাম রিয়েলি। আরে মশাই আপনি ফেরার হবেন না, জানি, এও জানি আপনি বেকসুর খালাশ পাবেন, তবে লিগেল ব্যাপারে সবদিকেই চোখ রাখতে হয় জানেন তো। এই যে, এখানে। [উকিল বিদ্যুৎবেগে কলম বের করল, না-পড়ে সই করে দিল জয়ানন্দ।] এখন বাড়ি চলুন মশাই, কোনো ভাবনা নেই, এল্‌বা থেকে নেপোলিয়নের মতো সগৌরবে স্বস্থানে ফিরে আসবেন আপনি। আমি দুঁদে উকিল গোবিন্দ ভটচায, তেমন-তেমন শয়তানকেও বাঁচিয়ে দিয়েছি, আর আপনি তো রিয়েলি ইনোসেন্ট....

[মঞ্চে আলো বদল হল, থানা রূপান্তরিত হল জয়ানন্দর বাড়ির বসার ঘরে। রাত নেমেছে, এক কোণে জ্বলছে দাঁড়ানো আলো, জয়ানন্দ একটি সোফায় আধো শুয়ে। উকিল পায়চারি করতে করতে কথা বলছে, মাঝে-মাঝে তার ছায়া পড়ছে দেয়ালে। তাকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করছে জয়ানন্দ]

উকিল [আগের কথার জের টেনে]। ...অ্যাব্‌স-ল্যুটলি ইনোসেন্ট। এক নম্বর [আঙুলে কর গুনে] ডাক্তার সেনের লেখা ডেথ-সার্টিফিকেট। হেমারেজ অব দি হার্ট, কার্ডিয়াক অ্যাপোপ্লেক্‌ক্সি। অত বড় ডাক্তার, মৃত্যুর কয়েক মিনিট পরেই পরীক্ষা করেছিলেন, কোনো বাপের ব্যাটার সাধ্যি নেই উড়িয়ে দেয়। দুই, ঐ যে আপনি বালিশ চাপা দেবার কথা বলেছেন—মাপ করবেন, বলতে বাধ্য হচ্ছি ও-ভাবে প্রোলিসাইড হতে পারে, ইনফ্যান্টিসাইড হতে পারে, কিন্তু হোমিসাইড—অ্যামাউন্টিং অর নট অ্যামাউন্টিং টু মার্ডার—একসট্রিমলি ডিফিকাল্ট। আপনি কি মশাই আর-কিছু ভেবে পেলেন না—ক্রাইম ফিকশন পড়েন না বুঝি? তারপর তিন নম্বর পোস্ট-মর্টেমেও কনক্লুসিভ কিছু পাওয়া যায়নি। 'May have been a case of strangling—' তার মানেই 'may not', স্বাভাবিক মৃত্যুর সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা হয়নি। ঐ 'may' কথাটার ওপর বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ব আমি, জজেদের মুন্ডু ঘুরিয়ে দেব, জুরিদের চোখে রোদনধারা নামিয়ে আনব আপনার জন্য সমবেদনায়। আর কেনই বা সমবেদনা হবে না? আপনি, একজন উচ্চশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, অত বড় একটা চাকরিতে আছেন—স্ত্রীর শোকে কান্ডজ্ঞান হারিয়েছিলেন সেদিন, আপনার মাথার ঠিক ছিল না; কেন থানায় গিয়েছিলেন, কী বলেছিলেন, কিছুই আপনার মনে নেই। আপনি কোর্টে দাঁড়িয়ে ওথ্‌ নিয়ে বলেছেন, 'আমি কিছুই জানি না, আমার কিছু মনে নেই।' আপনার মুখ দেখেই বোঝা যায়, আপনি কত কষ্ট পেয়েছেন স্ত্রীর জন্য, এখনো পাচ্ছেন। [নিজের বাগ্মিতায় অভিভূত হয়ে]

আপনার জাজ্বল্যমান পত্নীপ্রেম দেখে জুরিদের হৃদয় দ্রব হবে; বাড়ি ফিরে স্ত্রীদের সঙ্গে একটু ভাল ব্যবহার করবেন তাঁরা, হয়তো ফেরার পথে কিনে নিয়ে যাবেন একখানা শাড়ি বা বেলফুলের মালা, বা মিঠেপানের খিলি। অনেক সধবা মনে-মনে বলবে, 'আহা, আমার যদি অমন স্বামী হত।' অনেক কুমারী আপনার দ্বিতীয় পক্ষ হতে চাইবে।

দয়ানন্দ [শেষ পর্যন্ত শুনে, চোখে আঙুল ঘষে]। আপনি কে বলুন তো? আমি ঠিক—চিনতে পারছি না।

উকিল। যাকে এখন আপনারা সবচেয়ে বেশি দরকার, আমি তা-ই। উকিল।

দয়ানন্দ। আমার মনে হচ্ছিল—ঐ যে দেয়ালে আপনারা ছায়াটা নড়ছে—দেখে-দেখে মনে হচ্ছিল—আপনি শকুন। প্রকাণ্ড শকুন—গলাটা নড়বড়ে—পাখা নেড়ে-নেড়ে থপথপ করে হাঁটছেন।

উকিল। শকুন? [জোরে হেসে উঠে] বেশ বলেছেন, মশাই, বেশ বলেছেন। তা এক হিসেবে আমরা শকুনেরই মতো। আমাদের হল লার্নেড প্রোফেশন, জ্ঞানের ঊর্ধ্বলোকে আমরা বিচরণ করি, কিন্তু আমাদের দৃষ্টি পড়ে থাকে সেই রসাতলে, যেখানে কিলবিল করছে চুরি, জোচ্চুরি, লোভ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা—যত রকম দুর্মতি মানুষের, যত রকম অন্যায়। দুঃখীর দীর্ঘশ্বাস, বিধবার সর্বনাশ, বঞ্চিতের হাহাকার, অত্যাচারীর আস্ফালন—এই সবের চিকিৎসার ভার আমাদের ওপর। যা অসুন্দর, যা অশোভন, এমনকি যা জঘন্য, আমরা তারই মধ্যে মশাল নিয়ে নেমে যাই—নির্ভয়ে। উদ্ঘাটন করি গোপন কুৎসা, ছিঁড়ে ফেলি কপট আচ্ছাদন, উদ্ধার করি বিপন্নকে। আমরা অন্য মানুষের ভাগ্য নিজের হাতে তুলে নিই: আমরা দেবতার মতো দুঃসাহসী। আমাদেরই ওপর নির্ভর করছে ন্যায়, ধর্ম, সুবিচার, মানুষে-মানুষে সৌভ্রাত্র, সভ্যতা। যুদ্ধের সময় সঙিন দিয়ে নাড়িভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেয়া চলবে কিনা, না কি শুধু গোলাগুলি চালিয়ে মারতে হবে, তাও ঠিক করে দিই আমরা। অপরাধীর মুন্ডু না-কেটে তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো কেন বেশি সভ্য, বেশি মানবিক, তা নিয়ে আমরা দিনের পর দিন তর্ক করতে পারি। আমাদের কাছে কিছুই সরল নয়; আপনি শতকরা সাত টাকা সুদে এক হাজার টাকা ধার নিচ্ছেন, এই দলিল আমি লিখে দিলে তা বোঝার জন্য অন্য একটি উকিল ডাকতে হবে আপনাকে। রোদ্দুর শুধু সাত রঙে তৈরি, আমরা অন্ধকারের অসংখ্য রং বের করেছি। বাইবেলে আছে দশটি মাত্র অনুজ্ঞা, কিন্তু আমাদের চোখে সম্ভবপর অপরাধের অন্ত নেই। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর ভেদ, তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর যুক্তি— ছেঁড়া, কাটা দোমরানো, মোচড়ানো, বাঁকানো, প্যাঁচানো, ওল্টানো, চ্যাপ্টানো: আমাদের পেশা হল বুদ্ধির ভোজবাজি, বিজ্ঞানের ভেল্কি। কোনো মানুষের ওপর বিশ্বাস নেই আমাদের, কিন্তু সকলেরই ওপর দয়া আছে। অর্থাৎ—[একটু কেশে]-আমরা ঐ বুদ্ধ মুশা যীশু ইত্যাদির চাইতে মানবচরিত্র একটু বেশি বুঝি। আমরা কখনো বলি না, 'মা গৃধঃ', 'মা জহি';

আমাদের ভাষায় একটি মাত্র নিষেধ আছে 'মাভৈঃ।' অপরাধ তোমরা করবে জানি, কিন্তু মাভৈঃ, তোমাদের ত্রাণের জন্য আমরা আছি। [একটু থেমে, জয়ানন্দর সামনে দাঁড়িয়ে] আপনি কখনো হাইকোর্টের ভেতরে গিয়েছেন?

জয়ানন্দ। গিয়েছিলাম একবার।

উকিল [সাগ্রহে]। কোনো লিটিগেশন ছিল?

জয়ানন্দ। না। আমাকে জুরি করেছিল। শমন পেয়ে গিয়েছিলাম।

উকিল। তাহলে তো লিগেল প্রসিডিওর আপনার জানা আছে?

জয়ানন্দ। ঠিক জানা নেই। একদিন গিয়েই আমার এত খারাপ লেগেছিল যে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে নিষ্কৃতি নিয়েছিলুম। আর যাইনি।

উকিল [ঈষৎ নিরাশ হয়ে বসে]। খারাপ লেগেছিল? কেন?

জয়ানন্দ। পুরো ব্যাপারটা কেমন—অবাস্তব লেগেছিল আমার। আমার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। কী জাঁকজমক, কী এলাহি কান্ড—কিংবা যেন এক আশ্চর্য নাটক, অথবা এক ঐতিহাসিক মিছিল, যার মধ্যে আমাদের দেশের কিছুই নেই। [পিঠ খাড়া করে] এরাসমুসের মতো পোশাক, ডক্টর জনসনের মতো পরচুলা—এই সব পরে জজেরা এসে বসলেন। উকিলদের পরনে ফাউস্টের মতো গাউন, মুখের ভাব জ্ঞানগম্ভীর। হঠাৎ একটা তূর্যধ্বনির মতো নিনাদ হল; আমি অবাক হয়ে দেখলাম, উল্টোদিকের উঁচু পাটাতনে একটি লোক এসে দাঁড়িয়েছে, তার পরনে কুচকুচে কালো রঙের আঁটো পাৎলুন আর গলাবন্ধ কোর্তা—অতি উচ্চস্বরে একটি ল্যাটিন শ্লোক আবৃত্তি করলে সে। আমি চমকে গেলাম রীতিমতো: ল্যাটিন শ্লোক—এই কলকাতায়, গঙ্গার তীরে, ফ্লেমিশ রেনেসাঁস স্টাইলে তৈরি এই হাইকোর্টে। তারপর—আর সেইটেতে প্রায় গায়ে কাঁটা দিল আমার, মাটির তলা থেকে এক গোপন লিফটে চড়ে উঠে এলো আসামি, যেন পাতাল থেকে এক পিশাচকে তুলে আনা হল, বা হেরড-এর সভায় জন দি ব্যাপ্টিস্টকে। ছোট্ট কালো রোগা একটা মানুষ, গরিব, হাবাগোবা, হয়তো আগে কখনো কলকাতাতেই আসেনি—সে টালুমালু চোখে তাকাচ্ছে চারদিকে; কী হচ্ছে, বা হতে চলেছে, কিছুই যেন তার মাথায় ঢুকছে না। ঐ দুটোকে কিছুতেই মেলাতে পারছিলাম না আমি: একদিকে ঐ বোকাসোকা দেহাতি লোকটি, আর অন্যদিকে গাউন, পরচুলো, গাম্ভীর্য, তার স্বরে আওড়ানো ল্যাটিন মন্ত্র, গমগমে গলায় জমকালো ইংরেজি। আমি বুঝতে পারছিলাম ও-সবের প্রয়োজন আছে; আইনের শুভ্রতা, নিরপেক্ষতা, নিক্তির ওজনে সুবিচার—সেই মহিমান্বিত বিরাট ধারণার দৃশ্যরূপ হল ঐ আড়ম্বর। বুঝেছিলাম ঐ অদ্ভুত পোশাকের অর্থ কী—অমনি করে সাধারণ জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে বিচারকদের, উকিলদেরও—মহাপুরুষদের মতো কোনো অলৌকিক লক্ষণে চিহ্নিত করা হয়েছে, নয়তো আমাদের বিশ্বাস ও ভক্তি জাগবে কী করে? কিন্তু সেইজন্যেই—সেইজন্যেই আমার মনে হচ্ছিল যে এখানে আমার

একমাত্র আপন জন আর কেউ নয়, ঐ ছোট্ট কালো টালুমালু চোখের লোকটি, ঐ খুনের আসামি।

উকিল [সাগ্রহে]। খুনের আসামি? কোন বছরের কথা বলুন তো?

জয়ানন্দ [একটু ভেবে]। ঠিক মনে নেই। দশ-বারো বছর আগেকার কথা হবে।

উকিল। জুন মাস ছিল কি?

জয়ানন্দ। তা হতে পারে। খুব গরম চলছিল তখন।

উকিল [উজ্জ্বল মুখে]। সেই মামলায় আসামি পক্ষের কৌঁসুলি ছিলুম আমি। ব্যাটা তার বৌয়ের মাথায় দা বসিয়েছিল। আমি তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলুম।

জয়ানন্দ। আশ্চর্য! কী করে বাঁচালেন?

উকিল [সহাস্যে]। আফ্‌ট্রল, শুধু স্বামী মারলেই মাথা ফাটবে তা তো নয়, অন্য অনেক কারণেও মাথা ফাটে মানুষের। কোনো আই-উইটনেস ছিল না, স্বচক্ষে কেউ দ্যাখেনি। অকুস্থলে একটা বঁটি-দা শোওয়ানো ছিল, রক্তে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল সেটা। পুলিশ খানাতল্লাশ করে অন্য কোনো দা খুঁজে পায়নি, আসল অস্ত্রটি নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। আমি কেসটা এইভাবে সাজালুম: বৌটি বঁটি দায়ে কুটনো কুটছিল—একমাস আগে বাচ্চা হয়েছে তার, শরীর দুর্বল—তার পাঁচ বছরের ছেলে ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার পিঠে, সে টাল সামলাতে পারলে না, ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে এমন পড়া পড়লো যে মাথার চাঁদিতে দেড় ইঞ্চি বসে গেল বঁটি-দা। বড্ড খাটতে হয়েছিল ঐ বদমাশটাকে বাঁচাতে গিয়ে, কিন্তু তারপর থেকেই প্র্যাকটিস জমে উঠল আমার। এখন ক্রিমিনাল কেস-এ আমার প্রায় জুড়ি নেই—এক অঘোর দাশ ছাড়া—তা অঘোরবাবুর বয়স প্রায় সত্তর হল বুঝেছেন না—

[দাঁত বের করে হাসল]

জয়ানন্দ। আপনি তাহলে জানতেন যে ঐ লোকটাই খুনে?

উকিল [সহাস্যে]। কী করে জানব মশাই, আমি কি উপস্থিত ছিলুম সেখানে? যেটা প্রমাণ হল সেটাকেই ঠিক বলে ধরে নেবেন।

জয়ানন্দ। আপনি তাহলে মিথ্যেটাকেই সত্য প্রমাণ করলেন?

উকিল [গম্ভীর ভাবে]। শুনুন, জয়ানন্দবাবু। সত্য, মিথ্যা—এগুলো এক-একটা ধারণা মাত্র, নিজস্ব কোনো সত্তা সেই এদের, এরা এক-পাত্রে এক-একরকম চেহারা নেয়, এক-এক যুগে এক-এক বর্ণ ধারণ করে। আমরা ছেলেবেলায় ইউক্লিডের জ্যামিতিকে নির্ভুল বলে জানতাম, এখন শুনছি তাতে ঢের গলদ বেরিয়েছে। নিউটনের ফিজিক্সকে মহাসত্য বলে ভাবতাম, সেই ভাবনাকে বদলে দিলেন আইনস্টাইন। ফ্রয়েডকে ফুটো করে দিলেন ইয়ুং। আবার দেখুন, আণবিক বোমা, শব্দ-পেরোনো প্লেন, মহাশূন্যে ভ্রমণ—এগুলো এখন আমাদের কাছে যতটা সত্য, ততটাই সত্য ছিল মধ্যযুগের খ্রিস্টানের কাছে স্বর্গ-নরক, প্রাচীন হিন্দুর কাছে পরলোক, পিতৃলোক, ব্রহ্মলোক। কেমন করে আমরা ধরে নিতে পারি যে এ-মুহূর্তের

সত্য কোথায়? যদি বা কিছু থাকে কোথাও, কেন তাকে বলা হচ্ছে কখনো অব্রণ, কখনো হিরণ্ময়, কখনো কাকাতুয়া, আর কখনো বা—হঠাৎ প্রায় রসিকতা করে—অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ? এতেই বোঝা যায় সত্যের অনেক নাম, অনেক চেহারা, সব সত্য আংশিক, আপেক্ষিক—একেবারে সুগোল নিটোল পুরোপুরি সত্যটিকে—সেই অণোরণীয়ান মহতোমহীয়ানকে—কোনো মানুষ কখনো ধরতে পারে না, জানতে পারে না। তাছাড়া, এই যে তথাকথিত সত্য—মানে, এ-মুহূর্তে আমরা যাকে সত্য বলছি—সেটা এমন জিনিসও নয়, যার অভাবে সভ্যতা অচল হয়ে পড়ে। যখন পিরামিড তৈরি হচ্ছে, প্লেটো তাঁর খাপসুরৎ ছোকরাদের নিয়ে মজলিশ জমিয়েছেন, ভগবদগীতা লেখা হচ্ছে, তখন কেউ কল্পনাও করেনি যে পৃথিবীটা লাট্টুর মতো ঘুরছে, বা কোনো-কোনো অদৃশ্য জীবাণুর আক্রমণে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। আর, সবচেয়ে বড় কথা, সত্য বলে যদি কিছু থাকবেই, আর যদি তা শতকরা-একশো-পরিমাণ সত্যই হবে—ধ্রুব, সুস্পষ্ট, প্রাঞ্জল, তাহলে তা কেন স্বপ্রকাশ হতে পারে না, বিনা চেষ্টায় জাগাতে পারে না বিশ্বাস, যেন আলো, যেন সূর্য, কেন পারে না বেরিয়ে আসতে স্ফটিকস্তম্ভ থেকে নরসিংহের মতো, উঠে আসতে যীশুর মতো অমর দেহে ক্রুশকাষ্ঠ থেকে? কেন, তবে, সত্যও প্রমাণ সাপেক্ষ? কেন সেই দিব্য বিভাকে নির্ভর করতে হয় মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধির ওপর, তৈরি-করা যুক্তির ওপর, বানিয়ে-তোলা সংকীর্ণ লজিকের ওপর? আপনার অবাক লাগে না ভাবতে যে সত্য—সেই মহাজ্যোতি—সারা বিশ্বে তার একমাত্র আশ্রয় হল পুঁচকে মানুষ—যার পাঁচটা মাত্র ইন্দ্রিয়, এক মাইল দূরের জিনিসও যে চোখে দেখতে পায় না, শুনতে পায় না বিশ গজ দূরে কেউ কথা বললে, যে জন্ম নেয় ন্যাংটো হয়ে, অজ্ঞান হয়ে, গুঁতিয়ে-গুঁতিয়ে মগজে না-ঢোকালে যে অ-আ-ক-খ যোগ-বিয়োগ পর্যন্ত শিখতে পারে না! তাহলে তো দেখছেন, যে-বুদ্ধির জোরে আমরা ক-খ যোগ-বিয়োগ শিখি, সেই বুদ্ধিই আলো, তার বাইরে সত্য-মিথ্যা কিছুই নেই। এই ধরুন না, সত্য হল এই যে আপনি সম্পূর্ণ নিরপরাধ, কিন্তু আপনার কপালে তা লেখা নেই, আপনার চোখের কোনো সংকেতে তা ধরা পড়ে না, কেউ নেই, যে আপনাকে দেখামাত্র তা বুঝে নেবে—সেটাও আমাকে প্রমাণ করতে হবে, সেই গঙ্গার ধারের ফ্লেমিশ স্টাইলের বড়ো বাড়িটায়, বহু লোকের সামনে, অনেক মাথা খাটিয়ে, অনেক যুক্তি সাজিয়ে। দেখেছেন তো, সত্য কী দুর্বল, আর আমাদের বুদ্ধি কী দুর্দান্ত!

জয়ানন্দ। হা ভগবান, আমি কি কাউকে বিশ্বাস করাতে পারব না যে আমি খুন করেছি?

উকিল। কেন পারবেন না? কিন্তু প্রমাণ করতে হবে তো। আপনি চোর বলে ধরা পড়লে রাস্তার লোকেরা তক্ষুনি আপনাকে লাশ বানিয়ে ছেড়ে দেবে—সত্যি-মিথ্যে কিছু পরোয়া না-করেই—কিন্তু আমরা যারা আইনজীবী, আমাদের তো মাথা গরম করলে চলে না। এমনকি, স্বচক্ষে দেখলেও সেটাকে এভিডেন্স বলে মেনে নিতে পারি না আমরা। হয়তো ভুল দেখেছিলাম—কে জানে।

জয়ানন্দ। আপনি কি বলতে চান আমি হাত দিয়ে যা করেছি, আমার মন তা জানে না?

উকিল [সহাস্যে]। আচ্ছা, বেশ—আমি চ্যালেঞ্জ করছি আপনাকে, প্রমাণ করুন।

জয়ানন্দ। আমি—আমি—আমি— [থেমে গেল]

উকিল [বিজয়ী ভঙ্গিতে]। ঐ তো! পারবেন না আপনি। যদি আপনাকে খুনে বলে সাব্যস্ত করতে হয়, তাও আমাকেই করতে হবে—[বুকে টোকা দিয়ে] এই আমাকেই—বা আমারই মতো অন্য কাউকে। আপনি দোষী কি নির্দোষ, তার মীমাংসা এখন নির্ভর করছে—আমরা যারা আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, সেই আমাদেরই ওপর।

জয়ানন্দ [অনুনয়ের সুরে]। আমি কি এমন আশা করতে পারি না যে আপনি আমাকে দোষী বলে প্রমাণ করবেন?

উকিল [ঘোড়ার মতো শব্দ করে হেসে উঠে]। আপনি দেখছি বেশ সুরসিক লোক, মশাই। আপনার ব্যঙ্গ উপভোগ করলুম, কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনার সে-আশা সুদূরপরাহত। [গম্ভীর হয়ে] ভয় নেই—আমার হাতে আপনার মামলা ফেঁসে যাবে না। কিন্তু আপনারও একটু সাহায্য চাই। শুনুন—[জয়ানন্দর চোখে চোখ ফেলে]—আমার কাছে শুনে নিন—আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, আপনি সম্পূর্ণ নির্দোষ—খুন আপনি করেননি।

জয়ানন্দ [বিহ্বলভাবে]। ভুল...আমি কি...আমি কি ভুল ভাবছি?

[মঞ্চের একটি অংশ অন্ধকার হয়ে গেল, উকিলটি ঝাপসা হয়ে গেলেন, উজ্জ্বল আলোয় জয়ানন্দ। তার সামনে এসে দাঁড়াল তার একটি বন্ধু ও বন্ধুপত্নী। দু-জনেরই চেহারা ও বেশবাস সম্ভ্রান্ত]

বন্ধু। ভুল, জয়ানন্দ ভুল।

বন্ধুপত্নী। আমরা বিশ্বাস করিনি। কখনো বিশ্বাস করব না।

বন্ধু। আমরা জানি, ও-রকম কাজ তোমার পক্ষে অসম্ভব।

বন্ধুপত্নী। তুমি কখনো একটা রূঢ় কথা বলনি কাউকে।

বন্ধু। তোমার মন আকাশের মতো উদার।

বন্ধুপত্নী। কেউ তোমার কাছে টাকা চেয়ে, সাহায্য চেয়ে, ফিরে যায়নি।

বন্ধু। পরের দুঃখে তোমার প্রাণ কাঁদে। কোমল তোমার অন্তঃকরণ।

বন্ধুপত্নী। আমরা মেয়েরা তোমাকে আদর্শ স্বামী বলে জেনেছি।

বন্ধু। আমরা পুরুষরা তোমাকে আর্দশ বন্ধু বলে ভালবেসেছি।

বন্ধুপত্নী। আমরা জানি তোমার স্ত্রীকে তুমি কত ভালবাসতে।

বন্ধু। আমরা বিশ্বাস করিনি।

বন্ধুপত্নী। কখনো করব না।

অনেক স্ত্রী-পুরুষের কণ্ঠ [নেপথ্যে]। আমরা বিশ্বাস করিনি! কখনো করব না!

বন্ধু ও বন্ধুপত্নী [একসঙ্গে]। আমরা সাক্ষী দেব!

[বন্ধু ও বন্ধুপত্নী অন্তর্হিত হলেন। জয়ানন্দর আপিসের বড় কর্তা ও ছোট কর্তার প্রবেশ]

বড় কর্তা। মিস্টার সরকার, আপনি আমাকেও সাক্ষী মানতে পারেন।

ছোট কর্তা। আমাকেও।

বড় কর্তা। আপনার মতো সৎ, পরিশ্রমী, বিবেকসম্পন্ন অফিসার আমি কমই দেখেছি।

ছোট কর্তা। আপনি কখনো এক মিনিট দেরি করেও আপিসে আসেননি।

বড় কর্তা। কোনো ফাইল ফেলে রাখেননি—

ছোট কর্তা। কতদিন ছুটির পরেও কাজ করেছেন—

বড় কর্তা। আপিসে এমন কেউ নেই, আপনাকে যে পছন্দ না করে।

ছোট কর্তা। একবার একটি লিফটম্যানের স্মল পক্স বেরোল—

বড় কর্তা। আপনি তাকে নিজের গাড়িতে হাসপাতালে রেখে এসেছিলেন।

ছোট কর্তা। আর-একবার একটি ছোকরা কেরানি মারা গেল—

বড় কর্তা। আপনি সকলের আগে পাঁচশো টাকা দিয়ে তার বিধবার জন্য চাঁদার খাতা খুললেন।

বড় কর্তা ও ছোট কর্তা [একসঙ্গে]। আমাদের বিশ্বাস এ-ব্যাপারে আপনি সম্পূর্ণ নির্দোষ!

[আপিসের বড় কর্তা ও ছোট কর্তা অন্তর্হিত হলেন। দু-জন সুশ্রী মহিলার প্রবেশ। একজনের বয়স পঁচিশের ঘরে, আর-একজনের ত্রিশ-বত্রিশ। দু-জনেই সুবেশ, ফ্যাশনদুরস্ত]

প্রথম মহিলা [এগিয়ে এসে]। হেলো, জয়। কী-ব্যাপার? তুমি নাকি মর্বিড হয়ে যাচ্ছ?

দ্বিতীয় মহিলা। সত্যি! হঠাৎ হল কী তোমার? কেন এ-সব ছাইভস্ম ভাবছ বল তো?

প্রথম মহিলা। আমরা কি জানি না তুমি কত উঁচু দরের প্রেমিক—মানে, পত্নীপ্রেমিক?

দ্বিতীয় মহিলা। হ্যাঁ—একটু বেশি—একেবারে আঁচলে বাঁধা! বিয়ের পরে পুরোন বন্ধুদের ভুলেই গিয়েছিল।

প্রথম মহিলা। তাবলে ভেব না আমার তোমার বন্ধু আর নেই। আমরাও আছি তোমার পেছনে—তোমার হয়ে সাক্ষী দেব।

দ্বিতীয় মহিলা। নিশ্চয়ই! আমি পাঁচ বছর ধরে দেখছি তোমাকে। তোমার বুড়ি বেড়ালটা যখন অন্ধ হয়ে গেল, তুমি আপিস থেকে ফিরে কত যত্ন করে তাকে খাওয়াতে, তা আমি তো জানি।

প্রথম মহিলা। আর যেবার আমার দিদির মেয়ের পা পুড়ে গিয়েছিল, তুমি তাকে দেখতে রোজ হাসপাতালে যেতে। রোজ। কতবার তোমাকে বলতে শুনেছি, 'আমি কেন ডাক্তার হলাম না? অন্যের কষ্ট দূর করার মতো আর কী আছে?'

দ্বিতীয় মহিলা। আর সেই তুমি কিনা আজ ভাবছ—ছি! কে না বলবে ও-রকম একটা কাজ তোমার পক্ষে অসম্ভব?

প্রথম মহিলা। তুমি কি নিজেও বোঝ না, কত অসম্ভব?

অনেক স্ত্রী-পুরুষের কণ্ঠস্বর [নেপথ্যে]। অসম্ভব! অসম্ভব!

[মহিলা দুটি অন্তর্হিত হলেন। উকিলটিকে আবার দেখা গেল। উকিলের গালের ভাঁজে-ভাঁজে হাসি, জয়ানন্দর মুখের ভাব উদভ্রান্ত। একটু সময় চুপচাপ কাটল]

জয়ানন্দ [বিহ্বল চোখে চারদিকে তাকিয়ে]। ঊর্মিলা কোথায়? তোমরা কেউ জানো সে কোথায়?

উকিল। তাঁর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হচ্ছে, আপনি তাঁর জন্য চিন্তা করবেন না। সতীলক্ষ্মী ছিলেন, তাঁর আত্মার সদগতি হবে।

[উকিল অন্তর্হিত হলেন]

জয়ানন্দ। ঊর্মিলা, তুমি কোথায়? তুমি কি অনেক দূরে চলে গিয়েছ এরই মধ্যে? এখনো কি স্মৃতি আছে তোমার? তুমি এস—পার তো মুহূর্তের জন্য ফিরো এস—আমাকে আমার সত্য বলে যাও।

[মঞ্চ মুহূর্তের জন্য অন্ধকার, তারপর আবছা নীল আলোয় দেখা গেল জয়ানন্দ একটা লম্বা সোফায় কুঁকড়ে ঘুমিয়ে আছে। পিছনে একটা জানলা খোলা, বাইরে অন্ধকার, বৃষ্টির শব্দ। ঊর্মিলাকে দেখা গেল মঞ্চে, অস্পষ্ট, যেন কুয়াশায় জড়ানো। তার কণ্ঠস্বর যেন দূর থেকে ভেসে আসছে]

ঊর্মিলা। আমাকে ডাকছিলে?

জয়ানন্দ [চোখ মেলে একটু তাকিয়ে থেকে, যেন ঘুমে জড়ানো গলায়]। কী হয়েছিল বল তো?

ঊর্মিলা। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। আধো ঘুমে বৃষ্টির শব্দ শুনলাম। [কান পেতে] আঃ, কী ভাল বৃষ্টির শব্দ। চোখ মেলে দেখি ঘরে আলো জ্বলছে, তুমি বিছানায় উঠে বসে আছ, আমার দিকে তাকিয়ে। আমি তোমাকে জিগেস করতে যাচ্ছিলাম, 'তুমি বসে আছ যে?'

জয়ানন্দ। আমারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল বৃষ্টির শব্দে। এত অন্ধকার যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না; আমার খুব ইচ্ছে করল তোমাকে দেখতে, উঠে আলো জ্বাললাম। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ তোমার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ঊর্মিলা। তাই অমন অদ্ভুত ছিল তোমার তাকানো। বেশিক্ষণ একদিকে তাকিয়ে থাকতে নেই: চোখ টাটায়, মাথা ধরে। আমি বলতে যাচ্ছিলাম, 'কী দেখছ? অমন করে তাকিয়ে আছ কেন?'

জয়ানন্দ। তুমি ঘুমুচ্ছিলে। আমার মনে হল, আগে তোমাকে ঘুমন্ত কখনো দেখিনি। আমরা তো একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়তাম, জেগেও উঠতাম একসঙ্গে। কী ভাল সেই ঘুমিয়ে পড়া, জেগে ওঠা। একটু কাৎ হয়ে শুয়ে ছিলে, বালিশে চুল ছড়ানো, একটি হাত বুকের কাছে এলিয়ে আছে। আমি দেখছিলাম তোমার বুকের মৃদু ওঠা-পড়া—মৃদু, কোমল, অতি কোমল নিশ্বাস; তোমার গলার দু-একটি নীলচে শিরা, নিজেরা না-জেনে, মাঝে-মাঝে একটু যেন কেঁপে উঠছে। যেন পাখির

পাখা, যে-পাখি এখন আকাশ ভুলে গেছে। যেন শালুকের ডাঁটি, রাতের পুকুরে, রাতের হাওয়ায়, শিরশির।

ঊর্মিলা [হালকা হেসে]। কী যা-তা বলছ! আমার মা সব সময় বকতেন আমাকে, আমার শোওয়া সুন্দর নয় বলে। আমার ঘুমের মধ্যে শাড়ি সরে যায়।

জয়ানন্দ। তখনও সরে গিয়েছিল। আমি তোমার একটি পা দেখতে পাচ্ছিলাম। পায়ের উঁচু ডিমের মতো গোল জায়গাটা। পায়ের পাতা—তাও কী সুন্দর। ঘুমের মধ্যে অনেককে বোকা-বোকা দেখায়, কিন্তু তোমাকে আমার—আরো সুন্দর লাগছিল। যেন তোমার একটি কণাও বাইরে পড়ে নেই, যেন সবটুকু তুমি ফুটে উঠছ, ঘুমের তলা থেকে। আমার অবাক লাগছিল যে সেই তোমাকে বসে-বসে দেখছি আমি—আমারই ঘরে, নির্জনে, কোনো শব্দ নেই—শুধু বৃষ্টির শব্দ বাইরে।

ঊর্মিলা [ঈষৎলজ্জিত]। আমি কিন্তু ফাঁকি দিচ্ছিলাম তোমাকে। আসলে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ইচ্ছে করে চোখ বুজে ছিলাম। আমার ভাল লাগছিল। গা ভরা আরাম। সুখ। চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে দেখছিলাম তোমাকে। দেখছিলাম, তুমি আমাকে দেখছ। আমার মজা লাগছিল।

জয়ানন্দ। আমি অনেক কথা ভাবছিলাম। এই তো আমি—তোমাকে ছুঁইনি, রাখিনি তোমার গালের ওপর গাল—শুধু চোখে দেখছি, কিন্তু তা-ই যেন যথেষ্ট, তা-ই যেন সব। মনে হল আমি যেন চুরি করে নিয়ে এসেছি তোমাকে, জগৎকে বঞ্চিত করে; অনেক, অনেক চোখের তৃষ্ণা অতৃপ্ত রেখে তোমাকে অন্যায়ভাবে খাঁচায় পুরেছি।

ঊর্মিলা। ছি! কী অসভ্যের মতো কথা! আমি তোমার স্ত্রী, আমরা বিবাহিত!

জয়ানন্দ। তারপর ভাবলাম—না, খাঁচায় যাকে পোরা হয়েছে সে তুমি নও, সে আমি। তুমি আমার খাঁচা। আমি জগৎকে বঞ্চিত করিনি, আমি বঞ্চিত হয়েছি জগৎ থেকে। কেন এমন হল যে অন্য কোনো মেয়েকে আমার ভাল লাগে না, সেই মেয়েরা, যাদের নিয়ে—

ঊর্মিলা। আমার কাছে বড়াই কোর না তো! আমি যেন চিনি না তোমাকে! বিয়ের আগে কত বদনাম শুনেছি তোমার! মদ খেয়ে নর্দমার পড়ে থাক—আরো কত লোমহর্ষক গল্প। বাবার তো বেশ আপত্তি ছিল বিয়েতে। কিন্তু তোমার সঙ্গে আলাপ করে বললেন—ছেলেটি ভারি ভাল তো। যেমন নম্র, তেমন বুদ্ধিমান।

জয়ানন্দ। আমি দরকার মতো ভোল বদলাতে পারি, ঊর্মিলা। সেইজন্যেই তো চাকরিতে এত উন্নতি হল।

ঊর্মিলা। বাজে বোক না। নিজের বদনাম নিজে রটিয়ে বেড়ানো—এই এক খেয়াল ছিল তোমার।

জয়ানন্দ। না, ঊর্মিলা, না। যা শুনেছ তার অনেকটাই সত্য।

ঊর্মিলা [হেসে]। তা তো বটেই। সেইজন্যেই রাস্তায় কোনো ভিখিরি দেখলেই তোমার পকেটে হাত চলে যায়। সিনেমার করুণ দৃশ্যে কাঁদো।

জয়ানন্দ। ওগুলো রিফ্লেক্স অ্যাকশন—বা বলতে পারো বিবেকের ঘুষ। ওগুলোর কোনো মূল্য নেই।

ঊর্মিলা। তুমি যা-ই হও, আমি তোমাকে ভালবাসি। হল?

জয়ানন্দ [কপালে হাত বুলিয়ে]। তুমি কি বুঝবে না ভালবাসা কত কঠিন? কত নিষ্ঠুর? বুঝবে না যে ভালবাসার প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য সব মানুষ, এই বিশাল পৃথিবী? বুঝবে না যে একজনকে ভালবাসলে অন্য কাউকে ভালবাসা যায় না? আমি হঠাৎ স্থির করলাম বাঁধন ছিঁড়ে দেব। স্বাধীন হব। খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসব বাইরে, আকাশের তলায়, সকলের সঙ্গে সমান হয়ে বাঁচব। আমার ভালবাসা—তার মানেই অন্য কারো প্রতি অন্যায়। বিদ্যুতের মতো এটা ঝিলিক দিল আমার মনে—তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে। ঝিলিক দিয়ে মিলিয়ে গেল না, একটা আলো যেন উজ্জ্বল হতে-হতে আমাকে অন্ধ করে দিল—সেই এক মুহূর্তে। আমি তুরীয়ানন্দের স্বাদ পেলাম, মনে হল আমি জগতের প্রেমিক, মানুষের ত্রাতা—আমি সব পারি, আমার পক্ষে নিষিদ্ধ কিছু নেই। আমি একটা বালিশ তুলে নিয়ে তোমার মুখে চাপা দিলাম।

ঊর্মিলা। ও মা, সে তো তুমি দুষ্টুমি করছিলে। আমি কি তা বুঝিনি ভাবছ? ঠিক তক্ষুনি আমি চোখ মেলে তাকিয়েছিলাম। বলতে যাচ্ছিলাম, 'আলো নিবিয়ে দাও, এস ঘুমোই।' তোমার গলা জড়িয়ে ধরব বলে হাতও তুলেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ—হঠাৎ যেন এক হাজার ছোরা আমার বুকে বিঁধল। অসহ্য যন্ত্রণা—কিন্তু ওরই মধ্যে আমার মনে পড়ল আমার ছেলেবেলা থেকেই হার্ট দুর্বল, মনে হল আমার বিয়ের আগেই বলা উচিত ছিল তোমাকে—কিন্তু আমার যে কোনো অসুখ আছে তা আমার নিজেরও মনে ছিল না, অনেকদিন একটানা সুস্থ ছিলাম তো, আর বিয়ের পরে আমার শরীরের সব ছোটখাট কষ্ট ম্যাজিকের মতো সেরে গিয়েছিল। আমি বুঝতে পারলাম আমার মরণের ডাক এসেছে।

জয়ানন্দ। একটা, দুটো, তিনটে বালিশ। আমি হাঁটু দিয়ে চাপা দিতে লাগলাম তার ওপর।

ঊর্মিলা। কী বাজে বকছ! তুমি ঝুঁকে পড়েছিলে আমার মুখের ওপর, বুঝতে পারোনি কী হল—আমি কিছু বলতে চাইলাম তোমাকে, 'ভাল থেকো', বা ঐ রকম কোনো সহজ, সাধারণ কথা—কিন্তু আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না, এত কষ্ট যে চিৎকার করাও অসম্ভব, আমি আর নিশ্বাস নিতে পারছি না। ভেব না, আমি বেশিক্ষণ কষ্ট পাইনি—একটু পরেই শান্তি।....আমি যাই তবে? তুমি ঘুমোও। [ঊর্মিলা সরে যেতে লাগল]

জয়ানন্দ [চিৎকার করে]। আমি! আমি! আমি! আমি তোমাকে গলা টিপে মেরেছিলাম।

উর্মিলা। যাঃ, তা কি কখনো হতে পারে! [অন্তর্হিত হল]

[একটু চুপচাপ। ঘুমের মধ্যে জয়ানন্দর মুখে যন্ত্রণার রেখা ফুটল]

জয়ানন্দ [উপরের দিকে হাত তুলে]। ভগবান, তুমি আমার শেষ আশ্রয়। বল—আমাকে বলে দাও—কী করে আমি বোঝাই আমি কী, আমি কী করেছি।

[জয়ানন্দ পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল। মঞ্চে আলো বদল, দৃশ্য বদল। শীতের সন্ধ্যা, লেকের ধারের রাস্তা। দুই প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাঁটছেন, কাঁধে শাল ফেলা। একজনের সঙ্গে একটি আট বছরের বালক]

প্রথম প্রৌঢ়। এবারে শীতটা তেমন জমছে না এখনো।

দ্বিতীয় প্রৌঢ়। এদিকে এইটুকু-টুকু ফুলকপি এক-এক টাকা।

প্রথম প্রৌঢ়। সেদিন শেয়ালদার বাজারে দেখলুম কইমাছ উঠেছে।

কাগজের হকার [প্রবেশ করে]। সরকার ট্রায়াল! নিউ আলিপুর খুনের মামলা! খুনের মামলা! [দুই প্রৌঢ় দুটো কাগজ কিনলেন। হকার কাগজ হাঁকতে-হাঁকতে বেরিয়ে গেল]

প্রথম প্রৌঢ় [কাগজে চোখ ফেলে]। ওঃ, প্রসিকিউশন টুঁটি চেপে ধরেছে একেবারে। লোকটাকে ঝুলিয়ে না দেয়।

দ্বিতীয় প্রৌঢ়। তার আগে চৌরাস্তায় ধরে চাবকানো উচিত। ইনহিউম্যান! মন্সট্রাস।

প্রথম প্রৌঢ়। সত্যি—একটা একুশ বছরের মেয়ে—আবার নাকি লাভ-ম্যারেজ হয়েছিল!

দ্বিতীয় প্রৌঢ়। লাভ-ম্যারেজের নিকুচি! লোকটাকে নপুংসক করে দেয় না কেন?

বালক। বাবা, নপুংসক কাকে বলে?

দ্বিতীয় প্রৌঢ় [বালকের গালে চড় বসিয়ে]। চুপ, অসভ্য ছেলে!

[আলো বদল, একই দৃশ্য। চৈত্র মাসের সন্ধ্যা, দুটি কলেজের ছাত্র ও একটি ছাত্রীর প্রবেশ]

প্রথম ছাত্র [উপরের দিকে তাকিয়ে]। বাবাঃ, কত ফুল ফুটেছে গাছটায়। কী-ফুল এগুলো?

ছাত্রী। চেনো না? এই তো শিরীষ। ভারি সুন্দর ফুল।

দ্বিতীয় ছাত্র। তোমার চাই? পেড়ে দেব?

প্রথম ছাত্র [তাড়াতাড়ি]। আমি দিচ্ছি। [ছাত্র দুটি একসঙ্গে হাত বাড়াল গাছের দিকে]

কাগজের হকার [প্রবেশ করে]। খুনের মামলা—নিউ আলিপুর খুনের মামলা—নতুন খবর—জোর খবর—গরম খবর!

[ছাত্র দুটি শিরীষ না-পেড়েই সরে এল, দু-জনে দুটো কাগজ কিনল। হকার কাগজ হাঁকতে-হাঁকতে বেরিয়ে গেল]

প্রথম ছাত্র [কাগজে চোখ ফেলে]। জয়ানন্দর ছবি দিয়েছে। আর এই তার স্ত্রী। কী সুন্দর মেয়েটা! একে কখনো মারতে পারে কেউ?

ছাত্রী। আর এই বুঝি জয়ানন্দ? কী চমৎকার দেখতে। অত সুন্দর মুখ নিয়ে কেউ খুন করতে পারে?

দ্বিতীয় ছাত্র। তা কেন পারবে না? এই দুর্ভিক্ষের দেশে যে তিন হাজার টাকা

মাইনে পায় সে খুনে ছাড়া আর কী? একশো লোকের ভাত মারলে তবে তো ঐ মাইনে হয়। যাও এবার—লপসি খাও, ঘানি টানো।

ছাত্রী। না, কক্‌খনো না, কক্‌খনো জেল হবে না।

দ্বিতীয় ছাত্র। আলবৎ হবে! যাবজ্জীবন! কুড়ি বছর! পচে মরবে। তিন হাজার টাকা—স্ক্যান্ডেলাস!

প্রথম ছাত্র। বলা যায় না কিন্তু। সেদিন আমাদের ল ক্লাশে কথা হচ্ছিল—প্রোফেসর বললেন যথেষ্ট এভিডেন্স নেই, মোটিভও পাওয়া যাচ্ছে না। তা ব্যাপারটা বেশ রোমান্টিক যা-ই হোক।

দ্বিতীয় ছাত্র। রোমান্টিক ধুয়ে জল খাও।

[মঞ্চে আলো বদল, একই দৃশ্য। বর্ষার সন্ধ্যা। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রৌঢ়ের প্রবেশ]

প্রথম প্রৌঢ়। কী-রকম মেঘ করল হঠাৎ। বৃষ্টি না আসে।

দ্বিতীয় পৌঢ়। বর্ষাকালে এই এক মুশকিল। সন্ধেবেলায় একটু যে লেকের ধারটায় বেড়াবো—

প্রথম প্রৌঢ়। এদিকে হজম নেই। ঢেঁকুর।

কাগজের হকার [প্রবেশ করে]। স্পেশল! স্পেশল! স্পেশল! সরকার ট্রায়াল! নিউ আলিপুর মার্ডার কেস! চোদ্দ বছর জেল—চোদ্দ বছর জেল—

[প্রৌঢ় দু-জন দুটো কাগজ কিনল। কাগজ হাঁকতে-হাঁকতে হকার বেরিয়ে গেল]

দ্বিতীয় প্রৌঢ়। তাহলে এবার ঘানি টানবেন জয়ানন্দ!

প্রথম প্রৌঢ়। সত্যি! ভাগ্য যে কখন কাকে কোনদিকে টানে!

দ্বিতীয় প্রৌঢ়। ভাগ্য-ফাগ্য রেখে দিন মশাই। নরাধম! পাপিষ্ঠ!

প্রথম প্রৌঢ়। তা জুরি কিন্তু একমত হতে পারেনি। কান ঘেঁষে রায় বেরোল। আর গোবিন্দ ভটচাযের ডিফেন্স—

দ্বিতীয় প্রৌঢ়। ও-সব বোলচালে ভবি ভোলে না—বুঝেছেন!

প্রথম প্রৌঢ়। এখন হাইকোর্টে কী হয় দেখা যাক।

[মঞ্চে আলো বদল, একই দৃশ্য। শীতের বিকেল। পুর্বোক্ত তিনটি ছাত্রছাত্রীর প্রবেশ। ছাত্র দুটির গায়ে সোয়েটার]

দ্বিতীয় ছাত্র। সমীর, তোমার বাবা নাকি তোমার বিয়ে ঠিক করেছেন?

প্রথম ছাত্র। যাঃ! এ-সব বাজে কথা কে যে রটায়!

[ছাত্রীটির দিকে এক ঝলক তাকাল]

দ্বিতীয় ছাত্র। কেন, ল-এ ফার্স্ট ক্লাশ পেলে—শিগগিরই মুন্সেফ হবে—বিয়ের পক্ষে এ-ই তো সুসময়। দশ হাজার টাকা নগদ, পঞ্চাশ ভরি সোনা—

ছাত্রী [বাধা দিয়ে]। যে-পুরুষ টাকা নিয়ে বিয়ে করে, আমি তাকে ঘৃণা করি।

প্রথম ছাত্র [গলা চড়িয়ে]। আমি ততধিক!

কাগজের হকার [প্রবেশ করে]। স্পেশল! স্পেশল! হাইকোর্টে সরকার ট্রায়াল! নিউ আলিপুর খুনের মামলা—খুনের মামলা—

[ছাত্র দু-জন দুটো কাগজ কিনল। হকার হাঁকতে-হাঁকতে বেরিয়ে গেল]

প্রথম ছাত্র। একদিন যেতে হবে তো হাইকোর্টে মামলাটা শুনতে। একদিকে গোবিন্দ ভটচায, আর-একদিকে এক দুর্ধর্ষ ব্যারিস্টার।

ছাত্রী। আমিও যাব! জয়ানন্দকে দেখতে চাই।

দ্বিতীয় ছাত্রী [বাঁকা হেসে]। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি শিপ্রা। আমাদের নবযুগ-সংঘের মিটিঙে তোমাকে একদিনও নিয়ে যেতে পারলুম না, আর এখন একটা খুনেকে দেখতে—

ছাত্রী। আমার ওকে আশ্চর্য লাগে। নিজে থানায় গিয়ে....

[মঞ্চে আলো বদল, একই দৃশ্য। পূর্বোক্ত দুই প্রৌঢ়ের প্রবেশ]

প্রথম প্রৌঢ়। ভাবছি বিঘে পঞ্চাশ ধানের জমি কিনে ফেলব। দিনে-দিনে দেশের যা অবস্থা হচ্ছে।

দ্বিতীয় প্রৌঢ়। তাতেই কি শান্তি আছে ভেবেছেন? এই লেভি—এই কর্ডন—অনাবৃষ্টি—ঝামেলা লেগেই আছে। বাড়ি তুলে ফ্ল্যাট ভাড়া দিন—নিশ্চিন্তি।

প্রথম প্রৌঢ়। নিশ্চিন্তি কোথায়? আমাদের শ্রীধরবাবু দেড় বছর ভাড়া পাননি, তাও কি তুলতে পারছেন ভাড়াটেকে!

কাগজের হকার [প্রবেশ করে]। স্পেশল! স্পেশল! স্পেশল! নিউ আলিপুর খুনের মামলা! জোর খবর! গ্রম্ খবর! জয়ানন্দ সরকারের খালাস! খালাস!

[প্রৌঢ় দু-জন দুটো কাগজ কিনল। হকার হাঁকতে-হাঁকতে বেরিয়ে গেল]

দ্বিতীয় প্রৌঢ়। ইশ্‌শ্! আস্ত একটা খুনেকে ছেড়ে দিলে!

প্রথম প্রৌঢ়। কেস যে ফেঁসে গেল মশাই। প্রমাণ হল না।

দ্বিতীয় প্রৌঢ়। ফেঁসে তো যাবেই—টাকার কাছে গোপাল নাচে জানেন তো।

প্রথম প্রৌঢ়। ও-সব বলবেন না। ওতে কনটেম্‌ট অব কোর্ট হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় প্রৌঢ় [ঈষৎ বিচলিত]। আমি তো জজেদের কিছু বলছি না—কিন্তু উকিলগুলো ঝাড়-কে-ঝাড় স্কাউন্ড্রেল। দিনকে রাত করে দেয়।

প্রথম প্রৌঢ়। ভুলে যাচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী উকিল ছিলেন। সি. আর. দাশ উকিল ছিলেন।

দ্বিতীয় প্রৌঢ় [রেগে]। আরে মশাই আপনি দেখছি বেজায় তার্কিক হয়ে উঠলেন। একটা জ্বলজ্যান্ত খুনে—কোল্ড ব্লাডে নিজের স্ত্রীকে মার্ডার করেছে—সে পার পেয়ে গেল। ছি—ছি—ছি!

[প্রৌঢ় দু-জন বেরিয়ে গেল। প্রথম ছাত্র ও ছাত্রটির প্রবেশ। ছাত্রীর হাতে কাগজের স্পেশল]

ছাত্রী [সোল্লাসে]। ছেড়ে দিয়েছে! জয়ানন্দকে ছেড়ে দিয়েছে!

ছাত্র। গোবিন্দ ভটচাযের কেরামতি আছে, সত্যি! আমি এখন ভাবছি, মুন্সেফি নিয়ে নেব, না কি প্র্যাকটিসই করব! [ছাত্রীটির মুখের উপর ঝুঁকে] তুমি কী বল?

ছাত্রী। আমার কী মনে হয়, জান? উনি ভীষণ, ভীষণ ভালবাসতেন ওঁর স্ত্রীকে। স্ত্রীর মৃত্যুর শোক সহ্য করতে পারেননি।

ছাত্র। আমি কেসটা স্টাডি করব পরে—খুব ইন্টারেস্টিং। সব কাটিং রেখে দিয়েছি।

ছাত্রী। তোমার কি মনে হয় উনি আবার বিয়ে করবেন?

ছাত্র। তুমি দেখছি জয়ানন্দর বিষয়ে একটু বেশি কৌতূহলী হয়ে পড়ছ। চল ওদিকে, এসো ফুচকা খাওয়া যাক। না কি আইসক্রীম?

কাগজের হকার [প্রবেশ করে]। স্পেশল! স্পেশল! একস্ট্রা স্পেশল! জয়ানন্দর আত্মহত্যা! খুনের আসামির আত্মহত্যা। জোর খবর। তাজা খবর। গ্রম্—গ্রম্—গ্রম্—

[ছাত্রটি একটি কাগজ কিনল—হকার হাঁকতে-হাঁকতে বেরিয়ে গেল]

ছাত্রী [কাগজে চোখ ফেলে—কাঁপা গলায়]। ভদ্রলোক আত্মহত্যা করলেন! বাড়িতে পা দেয়ামাত্র! কেন? কেন? কেন? কী হয়েছিল? জয়ানন্দ, কী হয়েছিল?

ছাত্র। হঠাৎ হল কী তোমার? এস, এস, ঐদিকে আইসক্রীম। বরং কোয়ালিটিতে গিয়ে একটু বসা যাক চল, তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার।

[ছাত্রীটিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল]

গাউন-পরা উকিল [প্রবেশ করে]। ছি! গলায় দড়ি দিয়ে মরল! একটা ভাল লোক, সত্যিকার ভদ্রলোক, উঁচু দরের! আর আমি আপ্রাণ করে বাঁচিয়ে দিলুম—সত্যি বাঁচাবার যোগ্য মানুষ। কিন্তু বাঁচার যোগ্য ছিল না। ন্যুরটিক! সাইকোটিক। অসুস্থ। তা যাকগে মরুকগে, আমার কী এসে যাচ্ছে, আমার মামলা আমি জিতেছি, আমার পসার আরো ফেঁপে উঠবে। [দ্রুত বেরিয়ে গেল]

[মঞ্চ মুহূর্তের জন্য অন্ধকার। তারপর ঝাপসা নীল আলো, অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে জয়ানন্দ ও ঊর্মিলাকে। দু-জনেই দাঁড়িয়ে আছে, জায়গাটা অনির্ণেয়। ঊর্মিলা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে জয়ানন্দর দিকে, তার কাছে আসার চেষ্টা করছে, কিন্তু কোনো অদৃশ্য বাঁধার জন্য এগোতে পারছে না। জয়ানন্দ স্থির]

ঊর্মিলা [আবেগের সঙ্গে]। কেন? কেন? কেন? কেন তুমি এ-কাজ করলে?

জয়ানন্দ [ঠাণ্ডা গলায়]। তোমার জন্য করিনি। আমি জানতে চাই, সত্য জানতে চাই। তাই, আর-কোনো উপায় না-পেয়ে, অজানায় ঝাঁপ দিলাম। [ঊর্মিলার মুখ বিষণ্ন হল, মাথা নিচু করে আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেল সে] একদিন আমি জানতাম আমি খুন করেছি। তা-ই বলেছিলাম। তারপর জানলাম, করিনি। তা-ই বললাম। কোর্টে দাঁড়িয়ে হলফ করে বললাম, 'আমি কিছুই জানি না, আগে কী বলেছিলাম কিছুই মনে নেই।' মিথ্যে বলেছিলাম? কখন? আগে, না পরে? দুটোই তো সত্য হতে পারে না? না কি এও সম্ভব যে দুটোই সত্য—আমি খুন করেছিলাম, অথচ করিনি? [দর্শকদের দিকে তাকিয়ে] আপনারা জানেন—আপনারা কেউ কিছু জানেন? আপনি?...আপনি?....আপনি? আমি আপনাদের মুখে করুণা দেখতে

পাচ্ছি—কিন্তু আমি করুণা চাই না, আমি জানতে চাই। বলুন, আপনারা কি কখনো স্ত্রীকে গলা টিপে মারেননি? মারতে চাননি? আপনি....? আপনি....? আপনি....? সব চুপ কেন? বলুন, কিছু বলুন! না—বলার কিছু নেই। আমরা সকলেই মানুষ: যে খুন করেছে—বা করেনি, খুন হয়েছে—বা হয়নি, জুরি, জজ, উকিল, সাক্ষী—সকলেই। আইন মানুষের তৈরি, যুক্তি মানুষের তৈরি, আমাদের ধর্মবোধ—তাও মানুষেরই মাপে। সেই মানুষের—যার পাঁচটা মাত্র ইন্দ্রিয়, যে এক মাইল দূরের জিনিসও দেখতে পায় না, যাকে গুঁতিয়ে-গুঁতিয়ে অ-আ-ক-খ শেখাতে হয়। যে কখনো পারে না অন্য একজন হতে, অন্য কারো মনের মধ্যে ঢুকতে—এমনকি নিজের মন, তাও যার অজানা। সেই মানুষ। সেই আমি। এই দু-বছর ধরে আমি ভাবছি—ভাবছি—অনবরত ভাবছি: কী হয়েছিল? সত্যটা কী? সেই সংশয় আর সহ্য হল না আমার। ঝাঁপ দিলাম—পেরিয়ে এলাম। কিন্তু এখানে—এখানেও কোনো উত্তর নেই। এখানেও কেউ নেই, কিছু নেই। কেউ এগিয়ে এল না ফুলের মালা নিয়ে, কেউ আমাকে নরকে ছুঁড়ে ফেলল না। কেউ বলল না, 'এস, জয়ানন্দ। কোনো ভয় নেই।' কেউ বলল না, 'এস, তোমার শাস্তি নিয়ে যাও।' কিছু নেই—না ক্ষমা, না প্রশ্ন, না দন্ড, না সান্ত্বনা। কেউ নেই—যে আমাকে বলে দিতে পারে, আমি যা জানতে চাই। মৃত্যু—তাও কোনো প্রমাণ দিল না আমাকে। আমাদের মৃত্যু—তাও অর্থহীন।

[মঞ্চের আলো আস্তে-আস্তে ম্লান হয়ে এল; জয়ানন্দকে দেখা গেল ছায়ার মতো অস্পষ্ট, এক অসীম নিঃসঙ্গতার মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। ধীরে নামল যবনিকা]

হাঁসখালির হাঁস

বিজন ভট্টাচার্য

চরিত্রলিপি

ধৃতরাষ্ট্র
পাণ্ডু
পরমেশ্বর
যজ্ঞেশ্বর
জনার্দন
মামা
ভাগ্নে
গণৎকার
চাষাবাণ
চাষী বৌ
অনন্ত
মোক্ষদা
অভিমন্যু
শান্তনু
বলরাম
ভীষ্ম
কানা
খোঁড়া
নুলো
আতুর
তিনটি কয়লা কুড়োনো ছোটো ছেলে

[এইখানে বসা যায়। তাই বসা।

উদ্দেশ্য লোপাট। সামনে নেই, পেছনে নেই। তাই হারাউদ্দেশ।

এখানেই যে কিছু খুঁজে পাওয়া গেল তাও নয়। তবু...

চৌরাস্তার মোড়। দু-দিকে রাজপথ। ট্রাম, বাস। ঘাস ঘাস।

বড় একটা ন্যাড়া বুড়ো গাছ। একটাও পাতা নেই। উর্ধ্বমুখ হাতের কঙ্কালে হয়তো হাতছানি দেখেছে ওরা। গুঁড়িটা মোটা। ঝড়ে পড়েনি, বাতাসে হেলেনি। ওপরে যতখানি, তলায়ও হয়তো ততখানিই। শেকড় বাকড় দিয়ে নিজেকে ধরে আছে।

মাটি ধরেই থাকা। মাটি ধরেই বাঁচা। তাই এখানে বসার কথা মনে হল। এইখানে বসা যায়। তাই বসা।

বুড়োদের চোখের চাহনিতে ছেলেরা মেয়েরা বুঝে নেয় ভাষা। মাথায় ভারি মোট—ঘাড় ঘুরিয়ে চোখে চোখে কথা তারপর বস্তাবাঁধা ছেঁড়া কাথা আর হাঁড়িকুড়ির সংসার নামিয়ে ঘাস ঘাস জমিতে বসা।

দূরে ফুটপাথ। দোকান পাট। লোকালয়। বাজার বাজার! শহর বাজার।

শুধু এরা নয়। আরও অনেকে অনেকে আছে। অঞ্চল বসতি মতো ভাগে ভাগে ভাসা। তারপর চাপ চাপ চিংড়ির ডিমের মতো খাল-বিল নদী-নালা বয়ে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তর দিয়ে মাটি ধরে শহরের ফুটপাতে আসা।

হাঁসখালির হাঁসেরা জলে থাকে। মানুষ থাকে মাটিতে। কিন্তু মাটিও আজ নোনাফেনা সব, সব মাটি দিয়েগো গার্সিয়া। রাজপথ মহাশিরা। প্রাণ-কেন্দ্র ধরে চলমান বাস-ট্রাম, গাড়ি-ঘোড়া। অগণন যাওয়াআসা। মিছিলে পদাতিক নেই, তবু পদাতিক।...লোডশেডে চলা-ফেরা, ক্লান্ত পদযাত্রা। হাঁসখালির হাঁস নয় এরা ডালহৌসি থেকে সদ্য ছাড় পাওয়া সাদা শার্ট পরা। রোজ ডিম দেয়, তবু বলে—হাঁস না আমরা। স্বেচ্ছায় ভুলো তাই কতকটা নুলো।—স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা। এদের পিতৃপুরুষের দিব্যি ছিল, সন্তানসন্ততিদের কাছে সোনার হরিণের কথা ঠিকমতো বলে কয়ে যাওয়া।

সাদা শার্ট পরা হাঁসেদের অন্য এক কথা। হাঁসখালির মানুষের ভিন্ন গল্পগাছা। ট্রাম লাইনের সড়ক ধরে তো বসে গেছে ওরা। এখানে ওখানে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে। অনাসৃষ্টির সংসারে।

এখানে জমেছে মেলা। ছিন্নমূল জীর্ণবাস ভিকিরির মেলা। সভ্যসমাজ দেহে চাপ চাপ এঁটুলির দলা। ওপরে ঘোষণা, শহর সোন্দরী হবে। এরা যেন সব দেখতে এসেছে।

মাটি জমে জমে মাটির পাহাড়। সুড়ঙ্গ পথে পাতাল রেল। তাই মাটি কাটা। কোদাল, ঝুড়ি, মাটিকাটারা ছাড়া, কত ক্রেন, বুলডজার। কালিকট্টে কলকাতা। কলকারখানা এমন কিছু নেই। তবু যন্ত্রযুগে স্বপ্নগর্ভা শিল্পের ঝনঝনা। কি যাবে পাতাল রেলে? বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী—বাসি পচা সব কাঁচা মাল—আর অব্যাহত সৈন্য চলাচল।

আপাতত ঢাল জমির নাবাল ধরে হাঁড়িকড়াই-এর সোনার সংসারে আগুন ধরে গেছে। ঘেঁচু-কচু, ডাল-চাল, যার যা সম্বল, সেদ্ধ হচ্ছে। আগুনের আঁচ ঘিরে মাটিসুখ প্রতিমার মুখ, পাঁচিলে রেলিং-এ ছায়া ভাঙে। এখন প্রদোষকাল। পাখিরা কুলায় ফেরে। আর ফেরে ছন্নছাড়া ভিক্ষুকের দল। আনো কাজে ব্যস্ত কেউ। সশ্রম বিশ্রাম দন্ড। অকাজের কাজে সব জীবন মন্থর।

ভাগ ভাগ খাওয়া নাওয়া, ওঠা বসা, তারপর শিয়রে সংসার নিয়ে সরে নড়ে শুয়ে শুয়ে পড়া।

কুরুক্ষেত্রে মনে হয়, এ-ও এক তুর্কম্যান গেট। বা যুদ্ধ বিরতি পর্বে ময়দানে মানভূম, সিংভূম, ধলভূমগড়। ছোটনাগপুর শৈলশ্রেণী। অথচ কোনো গান্ডিবী সাঁওতাল যোদ্ধারা জাগে না হেথা। ঢালের ওপার সি. এম. ডি. এ-র রথের নমিত নিশান। রণভঙ্গে যেন সব মানুষের মৃতদেহ, ইতঃস্তত ছড়ানো ছিটোনো। ধৃতরাষ্ট্র একা নয়। ভগ্নস্বাস্থ্য ন্যুব্জদেহ তিনমাথা এক করে বসা বহু প্রপিতামহ, কান পেতে শোনে রাতে মহাযুদ্ধে হাঁসখালির হাঁসেদের কথা। কাল থেকে কালান্তরে কহেন সঞ্জয়:]

ঘোষণা। সাড়া নেই। সাড়া নেই। নড়ে না। চড়ে না। মরা না। মরা মরা। কারা এরা?

ধৃতরাষ্ট্র। আমরা যারা কানা, খোঁড়া, হাবা, বোবা, নুলো। মোগার অনেক দুঃখু। অনেক কষ্ট। আমরা আর মানুষনি। মান্‌ষির জঞ্জাল। আস্তাকুড়ি থাকি। আঁস্তাকুড়িই বাঁচি তারপর একদিন আঁস্তাকুড়ি হয়ে যাই—

বৃদ্ধ পান্ডু। মোগার দুঃখুকষ্টের শেষনি। আমরা সইতি পারি, বলতি পারি নে। তাই মোগার কিছুই ব্যক্ত হলনি। সব কথা তাই শব্দ হয়ে গেল। বাকিটা ভাবভঙ্গি। খোলপেটে আগুন ধরেছে, চিচিক্কার দে বাবাগো মাগো বলে ভাতরুটি চালাম। না দিলি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললাম। নাক মুখ দে কিছু কিঞ্চিৎ শব্দ হল। হল।...রাগ হল তো লাঠি নেলাম।—ভয় পাই, তাই ভয় দেখাই। জন্তুর নাগাল। আবুস্তান্তরে কেমড়ে দেই।—খাঁচার জানোয়ার যেমন খোঁচা খেয়ে লাঠি কামড়ায়? খুঁইচেছে যে, তারে সে চোখি দেকতি পায় না।

পরমেশ্বর। আগুনির ধম্মই হল পুড়িয়ে ফেলা। তাই খোলপেটের আগুন আঙ্গা মাথাগুলোরে সব আঙরা করে দেছে। আমরা ভাবতি পারি নে। গোটা দেহকান্ড—নাকি চোখ, হাত, পা, মুখ গোড়াকাটা লতাগাছের মতো মরা সাপের খোলসের নাগাল পিরথিমির মাচা কেমড়ে নেতিয়ে পড়ে আছে।...বাবুরাই আমাদের সব—বাপ, ভাই, মা, বোন—ভগবান। অথচ বাবুদির আমরা কেউ না। কিছু না। বিষ হয়ে গেছি আমরা বাবুদির চোখি।...চোখে মোগার জল নি। মরা খালবিলির নাগাল চোখ সব মোগার শুইকে গেছে। নইলি সাঁড়াসাঁড়ির বান ডাকাতাম মোগার সকলার চোখি। বিশ্বসংসার শহর-বাজার, গঞ্জ সব ডুইবে দেতাম অনন্ত সায়রে। এখন আর কিছু ভাবতে পারিনে। সব কিছুর বাইরি চলে গিইছি আমরা।...আঙ্গা এখন আছে শুধু ভঙ্গি। অঙ্গীরা সব কাঁটাপুকুরি চলে গেলিউ ভঙ্গি যাবে না। এই এইখানেই স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে, বায়ুস্তরে কোথাও ঝুলে ঝুলে থাকবে। তারপর কোনোদিন খরা, অনাবৃষ্টি, প্লাবন, ভুঁইচাল, স্যাঁওট, সাপটের গলা জাপটে ধরে আছড়ে এসে পড়বে বাবুদের ঘর সংসারে। বাবুরা ছাড়া অগতিতেও গতি নেই আমাদের।

যজ্ঞেশ্বর। মাঠঘাট পেরিয়ে বুড়োবটের নাবাল ধরেই শিশু হাড়ার মাঠ। সামনে তেপান্তর। ঢিবি ঢিবি এবড়ো খেবড়ো জমি। মাঝে মাধ্যি আল। আলির ধারে মেঠো ইঁদুর আর কাল কেউটের বাসা।—ইঁদুরির গত্তথে ধান বার করতি গিয়ে গোপালের মা-রে সেবারে সাপে কেটেছিল ঐ মাঠে। গর্তের ধান আবার গর্তে নে গেল

ইঁদুর। মরে গেল গোপালের মা তিন তিনটে কচি গ্যাঁদা রেখে। তারপর ঐ তিনটে গ্যাঁদার এট্টা টেঁপি, দুটো ছেলে, ঐ মেঠো পথ ধরে যে কোথায় চলে গেল, তার আর কোনো হদিস হল না। বাপ তো ছিল না! সব কথা স্মরণেও আসে না।

জনার্দন। শিশুহাড়ার মাঠ পেরোলিই গোহাড়ার ভাগাড়। দুরে হাটখোলা। শঙ্খচূড়ের বাসা। শালারা ন্যাজে ভর দে দাঁড়িয়ে দেখে মানষির যাতাআসা।—চৌসাপার রাজা।—তাই গোখরো বল, কেউটে বল, সঞ্চারিণী যে কেউ বা হও না তুমি, হেঁটমুন্ডু মাথানত ন্যাজ তোমার দিতিই হবে রাজার হাঁ-মুখির মধ্যে। তোমার-ও লেখন, খালেন ভাল, গতি হয়ে গেল তোমার।—নয়তো ছাড় যদি পেলে একবার প্রাণ নিয়ে পালাও।—সেই প্রাণ বাঁচাতি পোকামাকড় ব্যাঙ ধরে খাও—ব্যাঙ আবার তখন বলবে বাঁচাও, বাঁচাও।—সে এক জীবনের কেচ্ছা।...ভাগাড় পেরিয়েই পায়ে হাঁটা বাড়ি যাবার পথ।—গাছগুলো এবার এট্টু বড়, তাল, খেজুর, আম, জাম, কলা—কলা বাস্তুঘিরে বসা। মাথায় হলুদ ফুল, ভরদুপুর, শেয়াল কাঁটার ঝাড়। সুয্যিঠাকুর পাটে আর হেটুগঞ্জের পোড়ো ভিটেয় মামাটি বসেছেন জপে।—কুমোর পাড়ার পাশে, এ-ও এক পট বটে!

জনার্দন। আমার মামা এমন হয় জানো?

মামা। ...আমার আর হয় টয় না।

—সেই ভাল।

—হয়ে লাভ?

—কিচ্ছু না।

—সেই কষ্ট।

—সেই দুঃখ।

—হাইনেস।

—আর হুতাশ।

—কেউ নেই।

—কিচ্ছু নেই।

মামার গীত।

ভেসে যায় মান্দাস ভেলা
অভাগিনী অনাথিনী,
দাঁড়াবার নাইরে গাছতলা—
ভেসে যায়রে.....

জনার্দন। তুমি তো দেখি বেশ মজায় আছ।

মামা। হ্যাঁ কত মজা!

—আবার কি?

—না ভাল।

—আর ভাল মন্দ!

—কিছুই কিছু না।

—কিছু না-ই মোগার সব কিছু।

—কি করে বুঝলে ?

—জীবন দিয়ে!—এই যে হাতে খোলা, পোঁদে মালা!—হায় ভগবান!!

—আচ্ছা মামা, ভগবান বড়, না মানুষ বড় ?

—কি করে কি বলব ?

—ভগবানরে তো চোখি দেখা যাবে না ?

—কেউ কেউ বলে নাকি দেখা যায়।

—বাবুদের খবরাখবর ?

—বাবুদেরই তো সব খবরাখবর।

—তেনারা ভগবান দেখেছেন ?

—পুণ্যবানেরা দেখেছেন।

—দেখেছেন ? আচ্ছা মামা, এক এক জেতের একো একো ভগবান, তাই নয় ?

—হ্যাঁ, হেঁদুদের মহাদেব কালী বিষ্ণু, —মোছলমানদের যেমন আল্লা..., ক্রে'তানদের যীশু...এক এক জেতের একো একো ভগবান।

—আঙ্গা কোনো ভগবান নেই, না মামা ?

—হয়তো বা আছে এট্টা, জানি নে।

—নি কেন ?—আমরা মানুষ না ?

—না, অমানুষ।—

ভাগ্নে। তা হলি জন্তু জানোয়ার ?

—তাও না।

—তবে ?

—ঐ, জন্তু আর জানোয়ারের মাঝামাঝি এট্টা কিছু।

—তাই অমানুষ ?

—ভিকিরি, ভিকিরি।

ভাগ্নে। আচ্ছা মামা, আঙ্গা এই নামডা দেছে কেডা ?

—বাবুরা দেছে ;—আবার দেবে কেডা ?

—বাবুরা দেছে ?

—বাবুরা দেছে।

ভাগ্নে। দেছে বলেই মেনে নিতি হবে ?

মামা। তা কি বলবি তোদের তোরা ?...গরু ছাগল যে বলবি তোরা তোদের, তাতে করে গরু ছাগলদের আপত্তি আছে। কীট পতঙ্গ কি পক্ষীকুল যে বলবি সেডাও কোনো নেয্য কথা নয়। কেন না, তারাই বা তাদের কি নামে ডাকাডাকি করবে ?

ভাগ্নে। সেডা ঠিকই তো।—তা হলি, আমরা আমাদের বলব গরীব মানুষ?
মামা। গরীব মানুষ?
ভাগ্নে। হ্যাঁ?
মামা। সেডাও ঠিক হবে না।
ভাগ্নে। কেন?
মামা। গরীব মানুষ হচ্ছে বাবু মানষির নিচির সারি। যারা কোনোমতে দুঃখুকষ্টে দু-বেলা করে কম্মে খায়।
ভাগ্নে। কেও কেও মামা এক বেলাও খায়।
মামা। তা খায়। আবার একদিন অন্তর, দুদিন অন্তরও খায়। কালক্রমে আর সে-ও খেতি পায় না। ঠেলা খেতি খেতি, ঠেলা খেতি খেতি তারাও একদিন পথে নেমে এসে আঙ্গার সামিল হয়ে যায়। তখন তাদেরও হাল হাতে খোলা, পোঁদে মালা, ভিকিরি হয়ে যায়।
ভাগ্নে। আচ্ছা মামা, এমন কেন হয় বলতি পার?
মামা। কর্মদোষ, ভাগ্যদোষ—অনেক কিছুতি অনেক কিছু হয়।
ভাগ্নে। ...ভাগ্য, ভগবান তো এক নাইনির কথা।
মামা। একই তো।
ভাগ্নে। তা ভগবান যখন আঙ্গা না, তখন ভাগ্যই বা আমরা মানব কেন?
মামা। তো কি করবি?
ভাগ্নে। বাবুরা আমাদের যা করেছে, আমরাও তখন বাবুদের তাই করব।
মামা। কি করেছে বাবুরা তোদের?
ভাগ্নে। কি করেছে—ঠেলা মেরেছে। ঠেলতি ঠেলতি রাস্তায় নাবিয়ে দেছে। নাঠি বাটি চাটি ধরিয়ে ভিকিরি করে ছেড়েছে।
মামা। সে তো দেছে!
ভাগ্নে। তা হলি আমরাও বাবুদের ঠেলা মারব।—ঠেলা মারতি মারতি আমরাও একদিন বাবুদের রাস্তায় নেবিয়ে দাঁড় করাব,—ভিকিরি করে দুবো।
মামা। পারবি? সে শক্তি আছে তোদের?
ভাগ্নে। চেষ্টা করে দেখতি দোষ কি?
মামা। বাবুরা শক্তিধর, বুঝলি?—শক্তির সঙ্গে বুদ্ধি। বাঘের থাবা আর শেয়ালের যুক্তিবুদ্ধি,—এই হচ্ছে বাবু। আছে তোদের, বাবুদের সেই শক্তিবুদ্ধি? আছে?
ভাগ্নে। সেই শক্তিই তো নেই শরীলি। শক্তিও নেই, বুদ্ধিও নেই।
মামা। তো তবে?...কথা নেই, আবার কথাও আছে। শক্তি ভক্তি থাকতি থাকতি উঠে পড়ে লাগতি হয়। আমরা না পারলিউ গরিবরা এখনও পারে। সকলা একসঙ্গে উঠে পড়ে লাগলি পরে এট্টা ব্যাপার হয় বটে, এটা মানি। আমরা একা কি পারি? আমরা বড়জোর নাঠি, ঠেঙা, সানকি, বটি হাতে হাতে জোগান দিতে পারি। সে কি হবে? কখনও হবে? বাবুদের গাঁটে গাঁটে বুদ্ধি, গোঁফে

গোঁফে শলা—অনেক গুলি, অনেক বন্দুক, বাণে বাণে একেবারে ধ্বংস করে ফেলে দেবে আমাদের। মাঝে মধ্যে আবার শিখণ্ডী শ্রীভগবান। তেনার হাতে আবার চক্কর সুদর্শন—পালটি বাণ যে মারবি তোরা সে উপায় নেই। সব বাণ কেটে দেবে সেই চক্কর সুদর্শন। নড়বি যে... ; মুকোবালার অনেক ঝামালা ;—গ্যাঁজা আছে, গ্যাঁজা?

ভাগ্নে। বিড়ি এট্টা দিতি পারি। নেবা এট্টা?

মামা। বকতি বকতি আঠা বেধে গেছে মুখি, তা দে এট্টা?

ভাগ্নে। আগুন আছে কাছে?

মামা। আগুনির খবর তো তোর কাছে। এই না শুনলাম, নড়বি?

ভাগ্নে। নড়ব তো। তবে ঐ যা বললে শক্তি ভক্তি থাকতি নড়তি হবে। আর গরীবগুরবো মানষিরির জানাতি হবে কথাডা। আমরা আছি, ভীষণভাবেই থাকব...

মামা। অগ্রে তুই আমারে এট্টা বিড়ি দে দিনি?

ভাগ্নে। দাঁড়াও, আগুনির খবর করি।

[ভাগ্নের ত্বরিৎ প্রস্থান। এতক্ষণে সাজপাট সাঙ্গ হল গণৎকার ঠাকুরের। প্রোথিত ত্রিশূল, হস্তরেখাপট, খাঁচায় ঘুঘুপাখি...। হঠাৎ অর্বাচীন মামা ভাগ্নের কথার ধ্যানভঙ্গ হয় ছন্নছাড়া হঠযোগীর]

গণৎকার [মামাকে ইঙ্গিত করে]। কথা বলে যেন কত না শাস্তরজ্ঞান?—সুদর্শন, শিখণ্ডী, ভগবান, ভাগ্যবান—শালা যেন কানা ধৃতরাষ্ট্র, দুরিখে সব দেখতেছে, সব বুঝতেছে? জাত ভিকিরি বলে কথা!

মামা [রাগত]। আপনি তুমি কি?

গণৎকার। আমি?—আর যাই হই, তোদের মতো ভিকিরি না। ভাগ্যদোষে পথে এসে দাঁড়িয়েছি। [কোঁচে থেকে থাবা মেরে মেরে কি যেন খায়]—একদিন আমারও শাস্ত্রজ্ঞান ছিল।—পুরাণাদিতে অধিকার ছিল।—অনেক মানুষই এই চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারত না। আর আজ, জেতে অপজেতের চোখে চোখ রেখে দিনরাত আমাকে পেটের জন্যে বকবক করতে হয়। মানুষ আছি নাকি?

মামা। তাহলিই তো স্বীকার মানছ কথাডা—তুমিও আঙ্গা সামিল,—ভিকিরি। তার আবার লম্বা চওড়া কতা বলছ কি?

গণৎকার। লম্বা না চওড়া ছিল।—দশ কাঠার ওপর বসতবাড়ি বলে কথা। পূর্ববঙ্গে। কিন্তু পশ্চিমে কোনো ঠাঁই হল না। ঘর ছিল, সংসার ছিল। এখন সব বিস্মরণ। স্মৃতি, শ্রুতি, কিছু মনে পড়ে না। এ এক মহাকুরুক্ষেত্র। দাহ, দহন।

মামা। আনতি গেছে দাহন। এট্টা বিড়ি, তাই এখনতরি ধরাতি পারলাম না। বকবক করছে?—রাক্ষুসী বেলায় দেবখন জ্বেলে তোমার পৈতেয় আগুন। কাল বেলা, বামুন মানুষ, থাবা মেরে মেরে খইমুড়ি খাচ্ছ তোমার লজ্জা করে না? গাছের পাতাডা পর্যন্ত থির হয়ে আছে, পাখপক্ষু কথা বলে না, আর উনি গরাসে গরাসে,—খাচ্ছেন আর আমারে শাস্তরজ্ঞান দেচ্ছেন? বামুন মানুষ তো বাবুদের

পাড়ায় যাও না। ইজ্জত দেবে নেন। আঙ্গা সঙ্গ আছ কেন? বামুন?—নোকে তোমারে মান্যি দেয়?

গণৎকার। নিচ্চয় দেয়। না দিলি বুঝব রসাতলে গেছে দেশ।—জাহান্নামে গেছে সংসার।

মামা। দেশ বলতি কি বোঝ আপনি তুমি?

গণৎকার। দেশ, মাতৃকা,—শক্তি-রূপিণী।—বল্লি তোমার মাথায় ঢোকপে?

মামা। ঢুকে আমার দরকারনি—খালি আজে বাজে কথা বলবে—বক্‌বক্‌....বক্‌বক্‌....আসলে মাতাডা তোমার গেছে।—দিনরাত বিড়বিড়, কি বক কি দিনরাত?

গণৎকার। ইষ্টজপ, ইষ্টমন্তর—ধরে তো রাখতে হবে নিজেকে?

মামা। ফের বাজে বকে? [ধমক খেয়ে গণৎকার থতমত খেয়ে]—মাটির তো আর তোমার মতো শাস্তরজ্ঞান নেই। মাঠের মধ্যিখানে হা পিত্যেস করে বসে হাজার মন্তর আওড়ালিউ মাটি কথা বলবে না! চরাচর চরাচর! মন্তর সেখানে প্রতিপলে ফুটছে, ভাসছে, হাসছে,—মিলিয়ে যাচ্ছে। মাঠে, বিলি সে মন্তর আমি একদিন দুচোখ ভরে ফুটতি দেখিছি।—মন্তর দেখাচ্ছেন?—মাটি, মাটি।—আর এক কথা কবেন মাটি হালের মুখি, ফালের মুখি—যখন তিনি ধর্ষণ হবেন। মানষির কারকিতিতি মাটি তখন গর্ভবতী হবেন।—প্রকৃষ্ট মাতৃগর্ভ তো জননী জন্মভূমি?—মেয়ে বল, ছেলে বল, সকলার আগাম নিগম ঐ যোনীপথ ধরে।...তন্ত্রের সেই সিদ্ধি—যখন দুলপাকধানে দুধ নামায়...[ছল ছল করে ওঠে মামার দুই চোখ, হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে মামা গানে] কোথায় ছিলাম কমনে আলাম—মাগো, আমার এই ভাবনা,—কোথায় যাবো নাই ঠিকানা, মাগো..

[গণৎকার ভ্যাবাচাকা, বিভ্রান্ত, জলছল। মামা স্থির, চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত। কাগজ পাকিয়ে আগুন জ্বেলে ছুটে প্রবেশ করে ভাগ্নে। মামাকে ঐ অবস্থায় দেখে বলে]

ভাগ্নে। একি দৃশ্য,মামা।—গান গাচ্ছ, কাঁদতেছো—আগুন আনতি বললে, বিড়ি খাবা না?—ধর বিড়ি ধরাও, বিড়ি খাও...

[গণৎকারকে কটাক্ষ করে বলে]

ভাগ্নে। মন্তর করেছো বুঝি তুমি মামারে?—

[গণৎকার মাথা নেড়ে অস্বীকার করে।]

ভাগ্নে। নিজি নিজি বিড়বিড় কর—কর বিড়বিড়। আঙ্গা ঘাঁটাও কেন?...কি একটা বিড়ি ন্যাও। রাস্তায় গিইলাম আগুন আনতি, ধর।...

[মামা বিড়ি ধরায়। বিড়ি টানে। ভাগ্নে পাশে বসে মামাকে লক্ষ্য করে]

ভাগ্নে। এট্টু দিও।

মামা [ভাগ্নেকে বিড়ির শেষ দেয়]। মাঠেই তো ছিলাম। পেরথমে বর্গাদার, ভাগচাষী। তারপর চাষীর হাতে সরকার থেকে যখন জমি দেবার কথা উঠল তখন। পাট্টার ভয়ে মান্যির ভাই নন্দর পুত ষষ্ঠীচরণ আমারে উচ্ছেদ করল জমি থেকে। ছিলাম

বর্গাদার হলাম দিনমজুর। পঙ্গপালের মদ্দি আর এটা পতঙ্গ।...আবাদ গেরাম। কাজ চাইলিই বা পাচ্ছ তুমি কোথায় কাজ!—হাত পাতলিউ ভিক্ষে মেলে না। পেট পোঁদ কতা শোনবে না। পোঙায় না পর, পেটে তোমার দুটো দিতিই হবে।—ভাবলাম, শহরে তো কত কাজ হচ্ছে,—ভাবলাম, শহর গড়ছে, শহর বাড়ছে, নদী বেঁধে লোহার পুল হচ্ছে, পাতাল রেল করতেছে; শ' শ' কোদালি মাটি কাটা হচ্ছে—মাটিকাটা গলাকাটা, পাঁঠাকাটা—এক পাঁঠাই খায় বাবুরা শুনি পিরতিদিন সাত হাজার করে,—আরও কি কি সব খায়, কত খায়, কে বলবে?

[খাওয়া দাওয়ার কথা শুনে লোভাতুর বৃদ্ধ পান্ডু মামার সমীপবর্তী হয়। অতি কৌতূহলে খাওয়ার সূত্র ধরে জিজ্ঞাসা করে]

পান্ডু। কে কোথায় কত কি খাচ্ছে?—খাওয়া দাওয়া আছে নাকি কাছেভিতে?

মামা [চটে যায়]। খাওয়া দাওয়ার কথা আবার তুমি কোথায় শুনলে?

ভাগ্নে। বাবুরা কি না খায় সেই কথা হচ্ছিল।

পান্ডু [দার্শনিক ভাবে]। বাবুরা!—বাবুরা সব খায়।

মামা। কি খায় আর না খায়, তুমি ধারণা করতে পারবে না। বাবুদির কথা?—ভগবান তো দেখিনি চোখে; দ্যাখবও না। দু-চোখ জুড়ে দেখিছি শুধু বাবুদের। ভাবতি পারবে না।—ইঃ, কি করছে আর না করছে বাবুরা!—জল, হাওয়া, মাটি—সে একেবারে কাঁইপে ফেলে দিচ্ছে। ধরছে, মারছে, কাটছে, ছুটছে, স্বর্গমর্তে সে একেবারে ঝড় তুলে মেদিনী কাঁপাচ্ছে।...দেখতিউ সব দেবদূতির নাগাল।—ভাব, ভঙ্গি, চেহারা।—যেমন মদ্দো তেমনি মাগী। কারে ছেড়ে কারে দেখি। মাগীগুলো তো সাক্ষাৎরূপিনী সব জগত্তারিণী। গাব-থোড়পানা ঘাড় বুক পেট উরোত, দেখলি মনে হয় [ভাগ্নেকে থাবায় ধরে] এখুনি আমার মিত্যু হয়ে যাক। [নিজেদের মেয়েদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে] আর আঙ্গা, চেয়ে-দেখ সব শাখিনী ডাকিনী।

[সামনে এক কল্পিতবাবুর খাওয়া লক্ষ করে লাফিয়ে উঠে পান্ডু ভিক্ষে চায় হাত বাড়িয়ে]

পান্ডু। পেইছি এতক্ষণে,—হেই বাবা, দেই বাবা—চোপর দিন খাওয়া হয়নি বাবা...মাগ ছেলে-পুলে নে অনাহারে আছি বাবা! কোলের বাচ্চাটার মুখি এট্টা দানা পড়েনি বাবা, দুটো পয়সা দে যাবেন বাবা,—হেই বাবা দেই বাবা,...

[ভদ্রলোক মনে হয় ভ্রূক্ষেপ করেন না]

পান্ডু। ....চেয়ে দেখে না রে!....[পরিবারস্থ লোকজনকে দেখে] দেখলে দেখলে?—দেখলে কেমন বসে বসে দাঁত কেলাচ্ছে?—কোথায় দোড়ঝাঁপ করে গ্যাঁদা কোলে চারদিক থেকে এসে বেড় দে ফেলবে বাবুডারে, তা না,...ঐরম্ দাঁত বার করে ফষ্টি নষ্টি করলি কোন বাবু তোদের ভিক্ষে দেবে? কেউ দেবে?—শালা দেখতিছিস এট্টা ধরিছি বাবু, দয়াবান লোক, পকেটের মধ্যি হাত সেঁদিয়ে দেব দিচ্ছি করছে পয়সা...কেউ তোদের ঠেকাতি পারবে না মিত্যু,—তোরা সব মরবি!...শুয়ে বসে দন্ত কেলাচ্ছে আর আড়মোড়া ভাঙছে...যা যা পারিস তাই করগে যা।....কিচ্ছু বলব না, কিচ্ছু শোনবো না।

[বিতৃষ্ণায় দূরে গিয়ে বসে। পিছনে পরিদৃশ্যমান—মাটির পাহাড়। সেখানে হাঁকডাক ঝুড়ি বওয়া মাটি কাটা চলছে। এক সারি নেমে যাচ্ছে খাদে তো আর এক সারি মাটি কাটা উঠে আসছে। কাজ চলছে তড়িঘড়ি। বেলা পড়ে আসে।

মঞ্চের সামনের দিককার নাটক কিন্তু আরও তীক্ষ্ণধার বাস্তবধর্মী। বেলা শেষে ক্লান্ত পায়ে ডেরায় ফেরে কিছু কিছু ভিকিরি। শরীর এলিয়ে দেয়—এখানে ওখানে। কাজকর্মে বিরতি ঘনিয়ে আসে।

দিনরাত্রির সংক্রান্তি কালে ভিকিরিদের দঙ্গলের ভেতর থেকে একটা আইবুড়ো মেয়ে বাইরের সভ্য জগতের অসাধু ইঙ্গিতে পেটের দায়ে সর্পিনীর মতো সোজা উঠে দাঁড়ায়—পরোয়া না করে। তার হাবভাব আকার ইঙ্গিতে যৌন তাড়নার অভিব্যক্তি ছাড়া প্রয়োজনের বাধ্যতামূলক তাগিদ বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। ফালুক ফুলুক এদিক সেদিক দেখে নিয়ে সে পা টিপে টিপে ঐ পথে এগিয়ে যায়। মর্মান্তিক এই অভিসার লক্ষ করে এক ঝাঁক পাখির কলকাকলীতে বিপদ সঙ্কেত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোথায় একটা বাঘ বেরিয়েছে হরিণের সন্ধানে। যেন তাই এই সাড়াকাড়া পক্ষীকুলের। মেয়েটা চুপিসাড়ে এগিয়ে যায় বাইরের দিকে। ঠিক নিষ্ক্রান্ত হবার পূর্ব মূহূর্তে তার মা বোনরা ভাগে ভাগে দাঁড়িয়ে ওঠে। দূরে তার যে চাষা বাপ অভিমান করে বসেছিল এতক্ষণ, সে-ও দা হাতে দাঁড়িয়ে পড়ে। সবাই মেয়েটিকে লক্ষ করে। বুকে মুখে ঢেউ ভাঙে মায়ের মেয়ের কথা মনে করে। একটু এগিয়ে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ায় দলবদ্ধ ভাবে। পরে বাপও এগিয়ে যায় একটা বদলার মনোবৃত্তি নিয়ে সব নিথর, নিস্পন্দ।

পিছনে বাঁধের ওপরের মাটি কাটাদেরও ব্যাপারটা নজরে এসেছে। ঝুড়ি কোদাল ফেলে তারাও ঐ দিকে এগিয়ে যায় নিঃশব্দে। একটা কিছু ঘটছে]

চাষা বাপ। মোক্ষদা না?—তা ওখানে কি করতেছে।...[মোক্ষদার ছলা কলা, আকার ইঙ্গিত অভিব্যক্তির শেষ নেই]...হেই দ্যা, হেই দ্যা...উঃ!...দ্যাখ শালীর বিটির শালীর কান্ড? [চাষা বাপ বাঁ হাতের চেটোয় দা-এর ধার মোছে] আর ঐ শালারে আজ আমি খতম করে ছাড়ব। মোক্ষদা?

[এগিয়ে যায় দু-এক পা]

চাষী বৌ। টৌপিরি তুমি ঘাটাতি যেও না বলছি?

চাষা বাপ। ভাবভঙ্গি তো ভাল বলে মনে হচ্ছে না আমার, ই—য়্যা!

চাষা বৌ [মুগুর তোলে]। খবরদার বলছি টৌপিরি ঘাঁটাবে না তুমি।

চাষা বাপ। তুই সরে যা মাগী।

চাষা বৌ। খবরদার বলছি মুগুরির ঘাড়ার বাড়ি মেরে আমি দু-ফাঁক করে দুবো তোর মাথা। তুমি আমারে চেনোনি এখনও।

চাষা বাপ। নতুন করে তুই আমারে আবার কি চেনাবি?

চাষী বৌ। যখন যেমন তখন তেমন। কোলের কচি গ্যাঁদাডার মুখি এখনও একরত্তি ফ্যান পড়েনি। কি বলবে তুমি?

[ঝগড়ার মাঝখানে মোক্ষদা বেরিয়ে যায়]

চাষা বাপ। তাই বলে চোখির ওপর এই অনাচার?

চাষা বৌ। হ্যাঁ, অনাচারই আচার আচরণ।

চাষা বাপ। কখনও না।

চাষী বৌ। একশোবার!

[দা তোলে। মুগুর দা-য়ে ঠোকাঠুকি। চাষা বৌ-এর হাত থেকে মুগুর টেনে ফেলে দেয়। মারামারি, চুলোচুলি]

অনন্ত [জোয়ান ছেলে বাধা দিয়ে বাপকে সরিয়ে বলে]। যে যা করছে করুক গে।—খেতি যখন দিতি পারছ না তুমি, তখন খামিখা....

চাষা বাপ। তাই বলে নাং করবে?

অনন্ত। করবে নাং।

চাষা বাপ। অগ্রজ হয়ে তুই—এই কথাডা উচ্চারণ করতি পারলি?

অনন্ত। কিসির অগ্রজ?—তুমি তো আমারও অগ্রজ। বাপ হও তুমি। কি করতি পারছ? যা দুটো উঠতেছে মুখি অন্ন সে তো টেঁপিই যোগাচ্ছে।

চাষা বৌ। যোগাচ্ছে আর সেই অন্ন তুই খাচ্ছিস। কথা বলতি তোর...তোরে আমি...

[ঝটাপটি, মারামারি। বাপ ছেলেকে মুগুর মারে। এলো পাথাড়ি ঘুঁষি মেরে বিধ্বস্ত করে অনন্ত বাপকে—কষ বেয়ে রক্ত পড়ে বাবার—চিৎকার চেঁচামিচি।

স্বল্পক্ষণের মারামারি অচিরেই থেমে যায় অন্যজনের বাধাদানে। হাত ঝেড়ে একে ওকে ধমকে ওরা চলে যায় নিজের কাজে। চাষা বাপ বসে পড়ে স্থাণু হয়ে। অনন্ত দূরে বসে দাঁত খোঁটে।

ইতিমধ্যে চাষী বৌ মা-কে ঘিরে একদল ছোট মেয়ে মোক্ষদার ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করছিল দূর থেকে। বয়স অনুযায়ী বোধগতভাবে তাদের ভাবভঙ্গি হচ্ছিল। মায়ের মুখ থমথমে। দু-চোখ ভরা জলে। কখনও বা আগুন ঠিকরোচ্ছিল দাঁতে ঠোঁট চিপে।

চাষী বৌ এর চিন্তাভাবনার নিশানা ধরেই লক্ষ করা যায় বাঁধের ওপর থেকে একদল মাটি কাটা বেলচা কোদাল লাঠি নিয়ে মঞ্চের বাইরের গোলমালের ওপর লাফিয়ে পড়ে। মঞ্চের ভেতর থেকেও অনন্ত, ভাগ্নে প্রমুখরা লাঠি হাতে ছুটে যায়। পরিদৃশ্যমান কিছুই নয়; শুধু লাঠিবাজির শব্দ, হট্টগোল, চিৎকার চেঁচামেচি, আর যুগপৎ বোমা বিস্ফোরণের শব্দে ঘটনার ভয়াবহতা প্রতীয়মান হয়। ক্রমশ গোলমাল মিলিয়ে যায়। মাটিকাটারা বাঁধে ফিরে যায়। অনন্ত ও ভাগ্নেরা ডেরায় ফিরে এসে লাঠি ঠেঙা রেখে দেয়।

অপেক্ষমান শুধু মা। একদল মেয়ে তাকে ঘিরে আছে। সবাই মোক্ষদা-কে দূর থেকে দেখছে। মা-এর ক্লান্ত প্রসন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অনুমান হয়; মোক্ষদা ধীরে ধীরে ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে। একপা, দু পা, এগিয়ে যান মা।

দেহভার টেনে স্খলিত পদক্ষেপে এগিয়ে আসে মোক্ষদা মা-এর কাছে। আলুলায়িত ভিজে ভিজে চুল লেপটানো মোক্ষদার তেল-কালো মুখে। কোঁচড়ের খুঁট ঝেড়ে ডান হাতে মায়ের কাঁধে ভর দিতেই সব চাল মোক্ষদার মাটিতে পড়ে যায়। বাঁ হাতে ট্যাঁক থেকে কখানা দুমড়োনো কাগজের নোট বার করে মোক্ষদা মায়ের দিকে বাড়িয়ে ধরে।

মা কিছুই দেখেন না। মায়ের দুচোখ জুড়ে তখন প্রতিমার মুখ। দরবিগলিত বারিধারা চোখে।

এক মুহূর্ত মায়ের বুকে মাথা রেখে মায়ের বুক থেকে পায়ের ওপর মোক্ষদা গড়িয়ে পড়ে অচৈতন্য হয়ে যায়। সকলে তখন ধরাধরি করে মোক্ষদাকে পিছনে নিয়ে যায়;—সেবাযত্নে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

অন্ধকার ক্রমশ ঘনায়মান হয়। ডেরায় ফেরে মাটিকাটারা আর ফেরে চাটি, বাটি, ঠেঙ্গা, খালি হাতে

ভিকিরিরা। এখানে সেখানে ঢাল জমিতে ইঁটের উনুনে আগুন জ্বলে। ধোঁয়া হয়। ধীরে আনা-গোনা স্তিমিত হয়ে আসে। রাতে সবটাই মনে হয় কবরখানা।

ক্রমশ ভোরের অস্পষ্ট আলো ফুটে ওঠে। প্রতীয়মান হয়, মাথা থেকে পা পর্যন্ত চাদর মুড়ে মাটিকাটারা চিৎ হয়ে ঘুমোচ্ছে যেন ছড়ানো ছিটোনো কয়েকটা লাশ। আর সব ভিকিরিরা আশে পাশে কুঁকড়ে শুয়ে শুয়ে আছে।

আলো ফুটে উঠলে বুড়ো ভিকিরিরা চাটি, বাটি, লাঠি নিয়ে ত্রস্তে ভিক্ষার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। মেয়েরা ছেলেরা যে যার কাজে ব্যস্ত হয়।

বেলা হয়। কাজে যেতে হবে। একজন মাটিকাটা ঘুম ভেঙে উঠে বসে। ব্যস্ত ভাবে অপরকে ঘুম থেকে ঠেলা মেরে তোলে]

অভিমন্যু। এই, শান্তনু উঠে পড়। কাজে যাবি নে? হেই....

শান্তনু [উঠে বসে। অপরকে ঠেলা মেরে তোলে]। উঠে পড়, উঠে পড়—দেরি হল!

[চলচ্ছক্তিহীন ভিকিরিরা যে যার মতো নিজের জায়গায় হাত বাড়িয়ে দাঁড়ায়। চাষা বাপ—বাবা, হেই বাবা দেই বাবা বলে পথচারীর কাছে ভিক্ষা চায়। যে যার কাজে ব্যস্ত। মাটিকাটারা কোদাল, ঝুড়ি ইত্যাদি হাতিয়ার নিয়ে তৈরি হয়ে নেয়।

এক ভীষ্ম তখনও ওঠে না। চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকে। গত দিনের ঘটনায়—ভীষ্ম আহত। কাজে যেতে পারবে কি না তাই নিয়ে জওয়ানদের মধ্যে জল্পনাকল্পনা]

শান্তনু। ভীষ্ম এখনও উঠল না।—বোধ হয় ও আর আজ কাজে যেতি পারবে না। চোট আছে।

বলরাম। ভীষ্মের আজ শরশয্যা। প্রাণে বেঁচেছে এই ঢের। ও আজ কাজে যেতি হবে না।

শান্তনু। না যাক। মাটি কাটা ঝুড়ি বওয়া, ওরে দে আজ কোনোটাই হবে না।

[লাফিয়ে ওঠে ভীষ্ম কথা শুনে ঘুম ভেঙে]

ভীষ্ম। হবে না, হওয়াতি হবে।—মাটি কাটতি না পারি ঝুড়ি বইতি পারব। যাব।

অভিমন্যু। না গেলিই ভাল করতে।—যে কাজ নেই তোমার ভীষ্মদা।

ভীষ্ম। সে তো বোঝলাম। কিন্তু কাল যখন পাছায় নাথি মারবে তখন...

শান্তনু। দাঁড়াতিই তো পারছ না।

ভীষ্ম। এই তো দাঁড়িইছি, এই তো!—পাছায় এট্টা চোট আছে, তা সে আর কি করা যাবে। কাজে যেতি হবে।....এট্টু গরম চা পেলি হত।

শান্তনু। আনতি গেছে চা। তুমি বসো।

ভীষ্ম। আমার ঝুড়ি কোদাল নিইছিস।

শান্তনু। সব ঠিক আছে।

[টিনের কৌটোয় গরম চা আসে। ভাঁড়ে ভাঁড়ে চা হাতে হাতে ফেরে]

ভীষ্ম [চাষাবাপ-কে]। কি হেই বাবা, দেই বাবা করছো। আর কেই বা তোমারে পয়সা দেচ্ছে,—ধর এট্টু চা খাও।

চাষা বাপ। খেটে যখন খেতি পারছি নে তখন বসে থাকব?—মেঙে খাই,—যা জোটে।

ভীষ্ম। সে ভাল, আগে চা খাও—গরম আছে।

[চাষাবাপ-কে দেয় শান্তনু]

চাষাবাপ [চা-এ চুমুক দেয়]। বল বল বাহুবল জল জল ইন্দিরির জল;—যদ্দিন খেটে খেতি পারবি।

শান্তনু। মাটি কাটতি, ঝুড়ি বইতি ঠেলা আছে মামা। হাতের নড়া আর পিঠির খাঁচা ফাটো ফাটো।

মামা। লাঙল ধরা অভ্যেস, করতি হচ্ছে মজুরির কাজ—চাষার কি দুর্গতি। তোদের যে কি কষ্ট হচ্ছে সে কি আর আমি বুঝি নে?

ভীষ্ম। তবু করতে হবে। নইলি বাদ দে দেবে ঠিকেদার। উটকো কাজের ঝামালা কত?

বলরাম। ঐ মানিার ভাইরি ইচ্ছে করে একদিন খাদের মধ্যি ফেলে মাটি চাপা দে দিই।—দু টাকা, তিন টাকা, প্রেত্যেকের কাছের থে দালালি উশুল করবে।

ভীষ্ম। আমি দেইনি। এক পয়সা ঠেকাইনি।

বলরাম। আর কারো সঙ্গে কারো কথা বলতি দেবে না। নিরন্তর দৌড়ির ওপর রাখবে। বিড়িটা যে খাবা দু দন্ড বসে, তাও দেবে না! মোটে দাঁড়াতি দেবে না।

ভীষ্ম। পেয়ারের নোক হয়েছে এখন হর্ষবর্ধন। মানিার ভাই হর্ষরে এখন ক্যাম্পে থাকতি দেচ্ছে! হর্ষর বউ আবার ঠিকেদারের ঘরে যাওয়া আসা করছে, পাঁঠা মুরগী রেঁধে নে যাচ্ছে। এদানিতি হর্ষরে কোনোদিন কোদালিতি হাত দিতি দেখিছিস?

শান্তনু। তাই তো বলি তাই, হর্ষ এখন ইস্টোরে কেন?

ভীষ্ম। হর্ষ এখন ইস্টোর মাস্টার। উন্নতি হয়েছে বউ-এর কল্যাণে।

বলরাম। ঠিকেদার আবার এখন হর্ষর বউ-র কল্যাণ করতেছে।

মামা। বৌ-র কল্যাণে সোয়ামির কল্যাণ, সোয়ামির কল্যাণে বৌ-র কল্যাণ;—ঠিকেদারের কল্যাণে সকল্লার কল্যাণ।

ভীষ্ম। খাঁটি কথা বলেছ মামা। ধর এট্টা বিড়ি খাও?...আরও কথা কি জানো মামা?—মাটি কাটা লোকের তো কিছু কমি নেই?—রোজ নতুন নতুন মানুষ এসে লাইন দেচ্ছে মাটি কাটবে বলে। রোজ-এর কোনো অভাবনি। তাই কাজ কামাই-এর ঝুঁকি আছে। শরীল বেযুত হলিউ তোমার যেতি হবে কাজে—নড়াই তোমারে করতিই হবে।

মামা। নইলি তো পথে নাবিয়ে দেবে। ঠিক কথা। নড়াই বই কথা নি। তরিকা নি।

ভীষ্ম। তবে মামা এট্টা কথা জানবে,—এ মাটি কাটার শেষ হবে নি।—মাটিরও শেষ নেই, কাটারও শেষ নেই। এই মাটিকাটা মনে হয় মামা একদিন শহর গঞ্জ ছাড়িয়ে আবাদ পেরিয়ে সাগরের দিকি চলে যাবে।

শান্তনু। আর মাটি বলে মাটি?—খাদের দুধারে মাটি জমেছে তোমার পাহাড় পর্বত। ধ্বস যদি নামে একবার তো ঐ খানেই হয়ে যাবে তোমার জন্মের সমাধি। শালবল্লী কি বাঁশখোঁটার জাঙ্গাল বাগ মানাতি পারবে না ঐ ধ্বস।

মামা। তা হলি কি হবে?

ভীষ্ম। ঝামালা আছে, তা সেই ঝামালা নিয়েই কাজ করতি হবে। আর কাজ তুমি পাচ্ছ কোথায়?

বলরাম। কাজ আছে, আরও অনেক কাজ আছে। কলকারখানায় কি আর আঙ্গা কোনো কাজ নি?

ভীষ্ম। আছে, কিন্তুক তোর আমার জন্যি নেই। যোগার সেখেনে ঢোকাঢুকি নেই। রোড কোলোজ।

মামা। সেডা আবার কি?

ভীষ্ম। ঢুকতি দেবে না। ঢুকতি দেবে না, প্রথমত আমরা তেমন শিক্ষা তো নই। দ্বিতীয়ত, আঙ্গা তেমন জানপরিচয় নি, ধরপাকড় করবার লোক নেই আমাদের।

শান্তনু। নয়তো হতি হয় তোমারে হর্ষবর্ধন!

ভীষ্ম। যা বলিছিস।

মামা। না, না, কক্ষনও না। মেঙে খাব সেও স্বীকের। না।

বলরাম। আচ্ছা ভীষ্মদা, গওরমেন্ট নাকি বাবুদের ঠেঙে সব কলকারখানা খাস করে নেচ্ছে?

ভীষ্ম। শুনি তো কিছু কিছু নেচ্ছে। কেরমে কেরমে জাতীয়করণ হচ্ছে।

মামা। ছাই হচ্ছে জমি জাতীয়করণ হল, জমি পালাম?

ভীষ্ম। তুমি পেলে না, তোমার নাতি-পুতি পাবে। এক জন্মেই সব উশুল করতি চাও?...চল সব কাজে চল।

মামা। মানুষ জাতীয়করণ হল না; সব ভিকিরি হয়ে গেল। জাতীয়করণ হচ্ছে!

ভীষ্ম। এই; এখন এ ব্যাপারে গওরমেন্টই ব্যাগড়াদার না ব্যাগড়াদাররাই গওরমেন্ট—ঠিক ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।—একই অঙ্গে দুই রূপ মেশামিশি হয়ে আছে—অপরূপ এক অর্ধনারীশ্বর মূর্তি।...

[মামা অবাক বিস্ময়ে ভীষ্মর দিকে তাকিয়ে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি দেখে। ভীষ্ম, বলরাম, শান্তনু—প্রত্যেকে কাঁধে হাতিয়ার তুলে চক্রাকার পরিক্রমণ করে আর বলে]

মামা। ...ভোলে বাবা পার করেগা, ভোলে বাবা পার করেগা...

[মাটিকাটাদের প্রস্থান মামা হেই বাবা দেই বাবা, বলে এদিকে সেদিক ভিক্ষে মাঙে। বর্ষীয়ান ভিক্ষুকরা হাত বাড়িয়ে শম্বুক গতিতে চলে উত্তর থেকে দক্ষিণে নড়বড় করে। লোহা পেতলের ভাঙা টুকরো ছিপি কুড়িয়ে দু তিনটে ভিকিরি ছেলে ঘরে ফেরে। ঠাঁই ঠাঁই বসে যে যার সংগ্রহ খতিয়ে দেখে। পেছনে বাঁধের ওপর মাটিকাটারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বেলা বাড়ে।

একদল অন্ধ আতুর কানা খোঁড়া নুলোর ত্বরিৎগতি প্রবেশ, যেন তাড়া খেয়ে ঢুকছে ওরা]

কানা [লাঠি দিয়ে পেছনের সহযাত্রীকে তাড়না করে]। হুড়বড় করিস নি তো! দেখছিস এগুচ্ছি। আর এট্টু হলিই হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়তাম। চোখি দেখি?

খোঁড়া। পেছন থেকে ঠেলা মারতেছে তার আমি কি করব? ইচ্ছে করে মেরেছি?

কানা। ঐ নুলো শালারে আনলি কেন সঙ্গে? নড়ায় জোর আছে, ও তো কালীবাড়ি যেতে পারত।...হেই দ্যা আবার ঠেলা মারে?

খোঁড়া। এগোও না, চলতি চলতি কথা বল।

কানা [দু-পা এগিয়ে ঘুরে]। বল্লাম, আমরা যারা কানা, খোঁড়া, নুলো, অন্ধ আতুর—মোগার তেমন কোনো বিপদ নেই। বিপদ হল তো যাদের শক্তি ভক্তি আছে,—গতর আছে, করে কম্মে খেতি পারে, তাদের। [অন্য ভিকিরিদের লক্ষ্য করে] গতর আছে, ক্ষেমতা আছে তোদের, তোরা কেন মেঙে খাবি শালারা? খেটে খেগে যা না। আমরা হলাম অন্ধ, আতুর চলতি ফিরতি পারি নে। মোগার ক্ষুধার অন্নে ভাগ তোরা বসাচ্ছিস শালারা, তোদের লজ্জা করে না? বাবুরা কত দেবে?—কনথে দেবে?

মামা। কি বিত্তান্ত?—শোরগোল কেন?

খোঁড়া [টিপ্পনি কাটে]। এই আসেন!

কানা। কেডা ওডা?

খোঁড়া [মামাকে]। খুব তো দেখি ডাঁটো আছ।—খুব সাবধান।

মামা। কি সাবধান? সাবধান করতি এলে তুমি আমারে এতকাল পর?

খোঁড়া। এই কথা। পাততাড়ি গুটিয়ে ফেল সময় থাকতি থাকতি। নইলি চালান হয়ে যাবা শহরেত্থে।—সব ধরে নে যাবে।

মামা। কেডা ধরবে ধরুক দিনি? শালা মগা, তুই আমারে সাবধান করতি এলি?

খোঁড়া। আমি কেন?—যে করবার সেইতি এসে সাবধান করবে। ভাল কথা বল্লাম তাই মনে ধরল না। বল্লাম, শহরে আর তোমাদের থাকাথাকি হবে না। ডাঁটো আছ তুমি, করে কম্মে খেতি পার, ভিক্ষে করতি দেবে না;—সব চালান করে দেবে।

কানা। শহর সোন্দরী হবে।—তোমরা নোংরা করছ।—

খোঁড়া। চারদিকি হেগে, মুতে...

মামা। আর তোমরা?—চন্নামেত্য ছিটোচ্ছ?

কানা। তবু কথা বলবে?—আমরা হলাম কানা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর, নুলো। কিছু করবার নি মোগার। আর তোমরা হলে তো সক্ষম দেহধারী মানুষ। খেটে খেতি পার। অন্যায়ডা কি বলা হয়েছে শুনি?

মামা। ও, অন্যায়ডা সয়েই তবে অন্যায় করিছি আমরা...সক্ষম দেহধারী দেখতেছে?

কানা। আঙ্গা হাত আছে তো পা নি, পা আছে তো হাত নি, চোখ নি, মাথা আছে তো হুঁস নি...

মামা। আর আঙ্গা যে সব থাকতিউ কিছু নেই। হাল, গরু, ভিটে, মাটি—সব

বানের জলে ধুয়ে মুছে গেছে। কুটোর মতো মাটি কেমড়ে মরতি মরতি বেঁচে আছি আমরা।—কি বলতেছ তোমরা, দেহধারী?

কানা। তা হলি দেখি তোমাদের আবুস্থা আমাদের চাইতিউ খারাপ।—দেহ তোমারে ধারণ করে আছে?—তুমি দেহের কোনোখানে নেই?

মামা। না, নি।

কানা। কিন্তু কেন?

খোঁড়া। কেন?

নুলো। কি করে হল?

আতুর। কেডা মারা গেল?

[উচ্চকিত থমথমে ভাব। প্রবীণ চলচ্ছক্তিহীন ভিকিরিরা খটমট করে নড়বড়িয়ে পড়ে ওঠে। হঠাৎ পিছন দিককার ভিকিরির জমায়েৎ থেকে নবজাতকের কান্না ফেটে পড়ে]

কানা। আছে।

খোঁড়া। বেঁচে আছে।

নুলো। হৈ!

কানা। আছে, আছে।

[নবজাতকের কান্নার সঙ্গে মাদলসঙ্গীত শ্রুতিগোচর হয়। সামনের দিকে কয়লা কুড়োনো ছোট ছেলেদের মধ্যে কথোপকথন হয়]

এক। ভাই হয়েছে।

দুই। এবার তা হলে তোরা দুটো থলে নিতি পারবি। তুই এট্টা আর তোর ভাই এট্টা?

এক। পেরথমে ছিপি কুড়োবে, আংতা কুড়োবে; তারপর বস্তা ধরবে, কাগজ কুড়োবে।

তিন। আমার যদি এট্টা ভাই থাকতু!

দুই। তোর মা-ডা বেঁচে থাকলি অ্যাদ্দিনি তোরা অনেক কডা ভাই হতি পারতিস।

এক। মা নেই, বাপ তো আছে।

তিন। বাপ কখনও বাচ্চা পাড়ে?

এক। রতন, কালু তো ওর ভাই হয়।

তিন। তাদের মা তাদের ছাড়বে কেন? মা ধরে সম্পর্ক, বল? বাপটা কি? অগামারা।

[পিতৃত্বের উদ্দেশ্যে একজন প্যাঁক দিয়ে ওঠে]

দুই। হেই, বাপরে শালা প্যাঁক দিচ্ছিস?

তিন। দেব তো।

[উপর্যুপরি কয়েকটা প্যাঁক দেয়। জনৈকা ভিকিরি মেয়ে একটা সানকিতে কিছু তেলেভাজা আর জিলিপি আনে ভূমিষ্ঠের কল্যাণে। হাতে হাতে মণ্ডা মিঠাই বিতড়িত হয়]

ধৃতরাষ্ট্র [মিষ্টি হাতে নিয়ে]। কি ব্যাপার?

ভিকিরি মেয়ে। সদার মায়ের ছেলে হয়েছে, তাই...

পান্ডু [হাতে ফুলুরি নিয়ে]। জিলিপি দেখতি পাই।

ভিকিরি মেয়ে। সদার মায়ের ছেলে হয়েছে গো!

পান্ডু। ভগবান মঙ্গল করুন।

ভিকিরি মেয়ে। এই যে, ধর দাদা মিষ্টি নাও।

পরমেশ্বর। হ্যাঁ শোনলাম সব;—ছেলে হয়েছে সদার মার।

[মঙ্গল গান একটানা কান্নার মতো তখনও শোনা যায়। বেলা পড়ে আসে। সহসা বাঁধের ওপর ভীষণ হট্টগোল শোনা যায়। বহু শ্রমিক ও মাটি কাটাদের দৌড়ঝাঁপ, চেঁচামিচিতে বাঁধের ওপরকার ভৌগোলিক রেখা ভাঙতে থাকে। বাঁধ ভাঙছে। সমূহ সর্বনাশের আতঙ্কে থর থর করে মঞ্চ কেঁপে ওঠে। ঊর্ধ্বশ্বাসে কিছু লোক বাইরে থেকে ভেতরে ও ভেতর থেকে বাইরে ছুটোছুটি করে। প্রবীণ ভিকিরিরা দৈত্যের মতো চলাফেরা করে। মামা তারস্বরে বলরামকে ডাকে। শান্তনু খবরদারি করে সবাইকে। ভীষণ বিশৃঙ্খলার মাঝখানে বুনো মোষের মতো ভিড় ঠেলে ঢোকে অভিমন্যু]

অভিমন্যু। তফাৎ যাও; তফাৎ যাও।

শান্তনু। বলা হচ্ছে সরে যাও।

[ঠেলা মেরে ফেলে দেয়]

বলরাম। ভিড় করবে না, সামনে ছেড়ে...

অভিমন্যু। বডি এসে গেছে। তফাৎ যাও। তফাৎ যাও। দুজন মাটিকাটা দুদিকে হাত দিয়ে ভিড় ঠেলে পেছনে হটিয়ে দেয়।

[ভীষ্মর মৃতদেহ মাটিকাটারা কাঁধে নিয়ে ভেতরে ঢোকে। চাপা গন্ডগোলের মাঝখানে মেয়েদের আর্তনাদ হঠাৎ ফেটে পড়ে স্তব্ধ হয়ে যায়]

মামা। একি করলি?—বলরাম!!

শান্তনু। মাটি চাপা।

বলরাম। মাটি কাটতি-কাটতি মাটি চাপা।

অভিমন্যু। ওপর থেকে পনেরো বিশ ফুট মাটি, বলতি গেলি সে পাহাড় পর্বত....

বুড়ি। কেডা গেল

মেয়ে। কার কি হল?

আরেকজন। কেন হল?

[চাপা আর্তনাদ আগুনের মতো গন গন করে]

অভিমন্যু [মামাকে]। মামা, আচার আচরণ যা করবার তুমিই কর সকলার হয়ে।...ভীষ্ম তোমারে খুব ভালবাসতু...[গলা ধরে যায়]...

শান্তনু। যা করবার এট্টু তাড়াতাড়ি করবেন। বডি কিন্তু এখানে বেশিক্ষণ থাকবে না। কাজ হলিই এখান থেকে সিধে কাঁটাপুকুরি চলে যাবে।

গণৎকার। না স্বর্গ, নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিক:—এক্ষেত্রে কাঁটাপুকুরই প্রশস্ত।

ভায়ে [গণৎকারকে]। এট্টু চুপ দেবেন?—এট্টু!

[আর্তিরা ধীর মন্থরে শায়িত শবদেহ অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে দাঁড়ায়। মাথার শিয়রে প্রবীণ প্রধানেরা; পায়ের

দিকে মাটিকাটারা। মামা মৃতের সামনে ক্রিয়াকর্মে ত্রস্ত আনাগোনা করে]

মামা। গেরাম সম্পর্কে আপ্তজন যারা আছেন, তেনারা সব একধার হয়ে যাবেন।—জান পরিচয় নি, প্রবীণ অগ্রজেরা তফাৎখে ভীষ্মের সদগতি কামনা করবেন।...

হাঁসখালির হাঁস, আবাদে থাকলি বাঘের পেটে যেত, সাপে কেটে মারত। পেটের দায়ে মাটি কাটতি এসে আজ যে মাটি চাপা পড়ে মরে গেল, ভীষ্ম আমারে বলিছিল এ মাটি কাটার শেষ হয়নি। এই মাটি কাটতি কাটতি শহরডারে সে একদিন আবাদ পেরিয়ে সাগর পর্যন্ত নে যাবে। ভীষ্ম হেতের এখন আঙ্গা হাতে। মাটি কাটা চলবে।...ভীষ্ম মরত না। মলো যে, ত্যাও এক ঘটনা। কথাডা বলি। কোলের ছেলের এই নিগ্রহ, মা মাটির ভাল লাগল না। ধাড়ে-বাড়ে কাউরি না পেয়ে তখন তিনি বনবিবিরে দে, মা জগদম্বারে খবর করালেন,—যে দিদি, ছেলে যখন তোমার আশ্রয়ে, তখন ছেলের ভালোমন্দ এখন তোমার হাতে। ছেলের আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে। তুমি আমার সন্তানরে দেখো।...জননী জন্মভূমি তখন অস্থির হয়ে উঠলেন। কেঁপে উঠল তেনার বুক। কাঁপতি নাগল মাটি। মা জননী তখন হেঁটমুন্ডু হয়ে দু হাত বাড়িয়ে কোলের ছেলে কোলে তুলে নিলেন।...

ভীষ্ম চলে গেল। মোগার কামনা বাসনার শেষ সলতে আঙ্গা দু চোখের ওপর দাউ দাউ করে জ্বলে গেল।—যদ্দিন না আবার মা মাটির বুক কাঁপবে ভুঁইডোলা কি ভূকম্পন হবে, বাটি-চাপা-মাটি-চাপা-আমরা, তখন আবার ভীষ্মরে নে মাটির বুকি উঠে দাঁড়াব আবার আমরা...[গলা ধরে যায় মামার]...কামনা কথার এই শেষ। এখন ছেলেরে তোমরা সেঁকতাপ দাও, মুখ মিষ্টি করাও...

[আচার আচরণ। মেয়েরা ভীষ্মের মরা মুখে সন্দেশ গুঁজে দেয়]

পান্ডু। আমাদের ছেলে এখন কাঁটাপুকুর চলে যাবে। গওরমেন্ট তার হেফাজতি করবেন।

[কাঁচা বাঁশের চেঁটি আনা হয়। বলরাম, অভিমন্যু, শান্তনু মৃতদেহ বাঁশের চেঁটিতে তুলে হরিধ্বনি দিয়ে শব তোলে। ধীর মন্থরে শবাধার এগিয়ে যায়। পিছনে অগণিত শোকাহত আর্তি। বাঁধের ওপর দিয়ে ধীর মন্থরে এগিয়ে যায় মিছিল। অনাগত ঝঞ্ঝার সঙ্কেত জানিয়ে চাপা বিদ্যুৎ ঝলকে চমকে চমকে ওঠে শৈলশ্রেণী—মাটির পাহাড়]

সন্ন্যাসী

সলিল সেন

চরিত্রলিপি

সোমেন্দ্রনাথ রায় [ডাঃ মণিমোহন]
ধূর্জটি প্রসাদ [শঙ্কর রায়]
আশা দেবী [শ্রীমতী]
নিয়তি
নেপালী দারোয়ান

[বাংলা দেশের বাহিরে কোনো এক প্রদেশে একটা ছোট্ট শহরের এক বাড়ির ড্রয়িং রুম। মঞ্চের পর্দা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গেই একটি সুসজ্জিত ঘর দেখা গেল। ঘরে কেহই নাই। নেপথ্যে একটা গোলযোগ ক্রমশই জোরাল হইয়া উঠিতে লাগিল। এক নেপালী দারোয়ানের গলা শোনা যাইতেছে—]

নেপালী দারোয়ান [নেপথ্যে]। নিকাল যাও, খবরদার—অন্দর ঘুষনা মানা হৈ—

[উত্তরে—নেপথ্যে এক আগন্তুকের কণ্ঠস্বরও শোনা গেল—]

আগন্তুক। আমি ঢুকবই—আমাকে ঢুকতে দাও—খবরদার, আমায় আটকিও না বলছি—ঢুকতে দাও—খবরদার, আমায় আটকিও না বলছি—ঢুকতে দাও—

[চিৎকার ও দরজায় বার বার করাঘাতের শব্দে সচকিত হইয়া একটি আঠারো উনিশ বৎসর বয়স্কা অনূঢ়া তরুণী ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিয়া যেই দিক হইতে সশব্দ চিৎকার আসিতেছিল সেই দিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—]

নিয়তি। বাহাদুর! এই বাহাদুর—কি হয়েছে? এত চিৎকার করছ কেন? বাহাদুর—

[ঘর্মাক্ত কলেবরে এক নেপালী দারোয়ানের দ্রুত প্রবেশ। দরজায় আঘাতের শব্দ তখনও শোনা যাইতেছিল]

নিয়তি। কি হয়েছে—ব্যাপার কি?

বাহাদুর। কই পাগল আদমি মিসিবাবা। কই পাগল....

নিয়তি। পাগল!

বাহাদুর। হ্যাঁ—অন্দর ঘুষনে চাচ্ছে...। বারণ করাতে বলছে জরুরি কাজ আছে অন্দরে। সাহেবের সাথ মোলাকাত করবে। সাহেব অন্দর নেই বলাতে বলছে—আমি ঝুট আদমি—আর জোরসে ঘুষনে চাচ্ছে....।

[দরজায় করাঘাতের শব্দ ক্রমশ তীব্র হওয়ায় নিয়তি সচকিত হইয়া শুনিতে পাইল—]

আগন্তুক [নেপথ্যে]। দরজা খোল—দরজা খোল বলছি—

নিয়তি। বাংলায় কথা বলছে না বাহাদুর?

বাহাদুর। হ্যাঁ মিসিবাবা! পাগলটা এখানকার আদমি নেহি। ওটা আপনাদের বাঙালি মালুম হচ্ছে...

[পুনরায় 'দরজা খোল, আমি ভেতরে যাব' ইত্যাদি চিৎকার সহ সজোরে করাঘাতের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। নিয়তি মুহূর্ত ভাবিয়া বলিল]

নিয়তি। বাহাদুর, দরজা খুলে দাও—

বাহাদুর [বিস্মিত হইয়া]। মিসি বাবা!

নিয়তি। ওকে ভেতরে আসতে দাও—

বাহাদুর [বিস্মিত হইয়া]। ভিতরে আসবে!

নিয়তি। হ্যাঁ শুনিই না, ও কি বলতে চায়। আহা—বিদেশে বাঙালি! কে জানে কত কষ্টে পাগল হয়ে গেছে। তুমি ওকে ভেতরে আসতে দাও বাহাদুর—

[বাহাদুর একটু ইতস্তত করিয়া চলিয়া যাইবার মুখে ঘাড় নাড়িয়া আবার নিয়তিকে সাবধান করিবার উদ্দেশ্যে বলিল—]

বাহাদুর। লেকিন্—পাগল আছে কিন্তু লোকটা—

[কিন্তু নিয়তির নিকট হইতে কোনো সাড়া না পাইয়া বাহাদুর শেষ পর্যন্ত বাহিরে চলিয়া গেল। নিয়তি একটু সরিয়া গিয়া মঞ্চের বিপরীত কোণে দাঁড়াইয়া আগন্তুককে জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। একটু পরেই আগন্তুককে সঙ্গে লইয়া বাহাদুর পুনরায় মঞ্চে প্রবেশ করিল। আগন্তুকের সমস্ত মুখ গোঁফ দাড়িতে ঢাকা। কেশ রুক্ষ ও অবিন্যস্ত। তাহার পরিধানে শতছিন্ন নোংরা এক প্যান্ট ও ততধিক নোংরা একটা পুরাতন সার্ট। সার্টটা প্যান্টের উপর দিয়ে ঝোলান রহিয়াছে। সার্টের উপরে তালি-দেওয়া ছেঁড়া একটা গরম কোট। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও চঞ্চল, যেন বিশেষ কাহাকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে। নিয়তি ভয় পাইয়াছিল, কিন্তু একটু পরেই সংযত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাহাদুর যেন নিয়তির কাছ হইতে হুকুমের অপেক্ষায় আগন্তুকের ঠিক পশ্চাতেই দাঁড়াইল। ঘরে ঢুকিয়া একটু পরেই আগন্তুক বলিল—]

আগন্তুক। মণি কোথায়? মণি?

[নিয়তি আগন্তুকের মুখের দিকে তাকাইয়াছিল; তাহার প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া বলিল—]

নিয়তি। মণি! মণি কে?

আগন্তুক। মণিমোহন। মণিমোহনকে চেন না?

নিয়তি। না তো!

আগন্তুক। না মানে? এ বাড়ি তবে কার?

নিয়তি। এ বাড়ি ছিল শেঠ রাধাভূষণের। উপস্থিত মালিক আমরাই। আর—আমার বাবা ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষ তো এখানে কেউ নেই।...

[এই সময় নিয়তি বাহাদুরকে ইঙ্গিত করিতেই বাহাদুর বাহির হইয়া গেল এবং যাইবার মুখে বাহির হইতে দরজা ভেজাইয়া দিয়ে গেল]

আগন্তুক। তোমার বাবা! কি নাম তার?

নিয়তি। শ্রীসোমেন্দ্রনাথ রায়। মণিমোহন বলে তো এখানে কেউ থাকেন না। অবশ্যি আগে কেউ ও নামে এখানে ছিলেন কিনা বলতে পারব না।

আগন্তুক। ওঃ, মণিমোহন তবে আগে ছিল—এখন চলে গেছে।....কোথায় গেছে বলতে পার?

নিয়তি [মাথা নাড়িয়া]। না।

আগন্তুক। তা হলে কি করি! মণিমোহনকে যে আমার চাই-ই।....তাকে আমার খুঁজে বার করতেই হবে। [একটু চিন্তা করিয়া] আচ্ছা, তোমার বাবা কি ডাক্তার?

নিয়তি। আজ্ঞে না,...কেন—আপনার ডাক্তার দরকার?

আগন্তুক। ডাক্তার! ডাক্তার দরকার—না..না..না....ডাক্তারের আর কোনো দরকার নেই আমার।....ডাক্তারের সঙ্গে দরকার।....তোমার বাবাকে একবার ডাক তো—

নিয়তি। তিনি তো বাড়ি নেই—

আগন্তুক। কোথায় তিনি?

নিয়তি। কারখানায় গেছেন—

আগন্তুক। কোন কারখানায়?

নিয়তি। নিয়তি গ্লাস ওয়ার্কস—

আগন্তুক। নিয়তি কি তোমার মায়ের নাম?

নিয়তি। না। আমার নাম। আমি জন্মাবার পরই বাবা এই কারখানা শুরু করেন—তাই ওর নাম আমার নামের সঙ্গে মিল করে রাখা হয়।

আগন্তুক। তোমার বাবা সকালেই কারখানায় যান বুঝি?

নিয়তি। সকালে কারখানা থেকে ফেরেন। দিনের বেলায় ম্যানেজার কারখানা দেখেন, আর রাতের শিফ্‌টে যাতে কেউ কাজে ফাঁকি না দেয় তাই প্রতি রাতেই বাবা কারখানায় থাকেন। শুধু আজ নয়, চিরকাল—

আগন্তুক। তোমার বাবা প্রতি রাতে কারখানা আগলান! খুব টাকার লোভ তো তোমার বাবার।....কিন্তু যাকে আমি খুঁজছি—সে খুব দিলদরিয়া ছিল। সে ডাক্তার, কারখানার মালিক নয়। তোমার বাবা কারখানার মালিক—ডাক্তার নয়! মণি নেই, কিন্তু মণিকেই যে আমার চাই। [প্রস্থানোদ্যত হইয়াই আবার ফিরিয়া] তা হলে কি আমি বাড়ি ভুল করলাম? হয়তো অন্য কোনো বাড়ি.....

নিয়তি। দেখুন! এ অঞ্চলে তো আর কোনো বাঙালি নেই...

আগন্তুক। মিথ্যে কথা। মণিকে থাকতেই হবে এখানে। আমাদের এক বন্ধু বলেছে—চার বছর আগে সে মণিকে এখানে দেখেছে। তোমার বাবাও হয়তো তাকে এখানে দেখেছেন।

নিয়তি। সম্ভব...

আগন্তুক। তোমার বাবাকে বোল—আমি আবার আসব।

নিয়তি। কে এসেছিলেন, কি নাম বলব?

আগন্তুক। কার নাম?

নিয়তি। আপনার।

আগন্তুক। আমার নাম কেন? আমার নাম নেই।...হ্যাঁ,—হ্যাঁ, আমার নাম সংহার। না...সংহারের দেবতা—ধূর্জটি...

নিয়তি। পদবী কি?

আগন্তুক। প্রতিহিংসা...। বুঝতে পেরেছ মেয়েটি?

নিয়তি [হাসিয়া]। না কি করে বুঝব?...আপনি বরং এখানে বিশ্রাম করুন—আপনার জন্যে চা-জলখাবার নিয়ে আসি।...বাবার সঙ্গে দেখা করে আপনি খুশিই হবেন।....

আগন্তুক। উহুঁ, তা হয় না—আমার এক মুহূর্তও বিশ্রামের সময় নেই।....আমি আজ অনেক বছর ধরে ঝড়ের গতিতে গোটা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছি মণির সন্ধানে। আর যতদিন আয়ু অর্থ ক্ষমতা আছে—তাকে খুঁজে বার করতেই হবে—

নিয়তি। কেন খুঁজছেন মণিকে?...প্রতিহিংসার জন্যে? তাকে সংহার করার জন্যে?

আগন্তুক। তুমি কি করে জানলে?

নিয়তি। এই যে বললেন—একটু আগে—

আগন্তুক [হাসিয়া]। হুঁ—হুঁ—হুঁ...তুমি ঘাবড়ে গেছ বুঝি?

নিয়তি। হ্যাঁ...

আগন্তুক। না—না...ইয়ে...এমনি খুঁজে...। তাকে আমি সব চেয়ে ভালবাসি যে।...মণি আর সত্য ছাড়া আমার আর কোনো বন্ধু নেই।....কিন্তু...থাক-থাক সে সব কথা...

নিয়তি [করুণা মিশ্রিত হাসি সহ]। সেই ভাল—

আগন্তুক [ফিরিয়া]। তুমি হাসছ কেন?

নিয়তি। কোথায়!

আগন্তুক। এই একটু আগে—বাঁকা ঠোঁটে...? পাগল ভেবেছ আমাকে?

নিয়তি [থতমত খাইয়া]। ওহ্ হো—

আগন্তুক। আমি পাগল নই।...নই বা কেন? যার কার্যকারণের অর্থ বোঝা যায় না—সেই তো পাগল। তোমার কাছে—তোমার কাছে কেন...দুনিয়ার কাছে আমি পাগল।...তুমি লজ্জা পেও না। তুমি তো আর মুখ ফুটে সে কথা বলনি—বরং বসতে বলেছ—খেতে বলেছ—তুমি ভাল মেয়ে নিয়তি—তুমি ভাল মেয়ে। তোমার মত একটি মেয়ে থাকলে আমি সুখীই হতাম।

[এই বলিয়া আগন্তুক প্রস্থানোদ্যত হইতেই বাড়ির বাহিরে মোটর গাড়ি থামিবার আওয়াজ শোনা গেল]

আগন্তুক। আচ্ছা—আমি চললাম।

[বাহিরের দিক হইতে কেহ যেন ভিতরে আসিতেছিল—সেই দিকে তাকাইয়া নিয়তি বলিল]

নিয়তি। ঐ তো বাবা এসে গেছেন....

[সোমেন্দ্রনাথ রায়ের প্রবেশ। তাঁর সমস্ত চুল সাদা, মুখ দেখিয়া বয়স অনুমান করা কঠিন। চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হইতে পারে—আবার সাদা চুল দেখিয়ে পঞ্চাশ চুয়ান্ন বৎসর বয়স মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নয়]

নিয়তি। বাবা দেখো [আগন্তুককে দেখাইয়া] এই বাঙালি ভদ্রলোক কাকে যেন খুঁজছেন। [আগন্তুকের উদ্দেশ্যে] ইনিই আমার বাবা—সোমেন্দ্রনাথ রায়। আর ইনি ধূর্জটি...ধূর্জটি বাবু।

[আগন্তুক ও সোমেন্দ্রনাথ রায়ের মধ্যে পরস্পর নমস্কার বিনিময় হইল]

আগন্তুক। আপনাকে যেন কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে—

সোমেন্দ্রনাথ। কোথায়—বলুন তো?

আগন্তুক। কলকাতায়।

সোমেন্দ্রনাথ। না—না..সাত আট বছর বয়স থেকেই আমি কলকাতা ছাড়া ...আপনি বসুন, চা-টা খান—আমি ততক্ষণ জামা কাপড় পালটে আসি—

আগন্তুক। আপনার সঙ্গে আমার দরকার আছে—

সোমেন্দ্রনাথ। কি দরকার—বলুন?

আগন্তুক। একটা গোপনীয় কথা আছে...

সোমেন্দ্রনাথ। গোপনীয়!

আগন্তুক। হ্যাঁ, কথাটা আপনাকে শুনতেই হবে।...নিয়তি, তুমি ভেতরে গিয়ে আমার জন্যে চা আর খাবার নিয়ে এস।

[নিয়তি ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া চা জল-খাবার আনিতে যাওয়া মাত্র আগন্তুক লাফাইয়া উঠিয়া ভিতরের

দিকে যাওয়ার দরজা বন্ধ করিয়া দিতেই সোমেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া বলিল—]

সোমেন্দ্রনাথ। ওকি! দরজা—বন্ধ করলেন কেন?

ধূর্জটি। পরিচয় দেবার জন্যে।...আমায় তুমি চিনতে পারছ না?

সোমেন্দ্রনাথ। না—

ধূর্জটি। মিথ্যে কথা বোল না মণি—মিথ্যে বললেও এড়াতে পারবে না।...আমি শঙ্কর!

সোমেন্দ্রনাথ। শঙ্কর! শঙ্কর! তুমি?—

ধূর্জটি। হ্যাঁ, আমিই শঙ্কর!

মণিমোহন। একি চেহারা হয়েছে তোর! সেই সুন্দর ফুটফুটে চেহারা!—কালো রোগা নোংরা জামা কাপড়—পাগলের মতো চেহারা করে কোথা থেকে এসেছিস?

শঙ্কর। তা হলে চিনেছিস বল?

মণিমোহন। তোকে কি ভুলতে পারি!...আলো বাতাসকে যেমন ভুলতে পারি না—তোকে আর সত্যকেও তেমনি ভুলতে পারি না। তোদের ভুললে যে আমার আর কোনো অস্তিত্বই থাকে না...

শঙ্কর। সেটুকু তো আমাদের তিনজনের ভেতরে কারুরই অজানা ছিল না।...তিনজন তিনজনের বিপদ নিজের বলে মনে করব, একজনের বিপদে তিনজনই বুক পেতে দাঁড়াব—তোদের বাড়ির ঠাকুর ঘর ছুঁয়ে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—মনে আছে?

মণিমোহন। আছে—শঙ্কর, একথা কি ভোলার?

শঙ্কর। তবে তুই কেন এ কাজ করলি? কেন তুই এত বড় বেইমানি করলি? কেন তুই সত্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলি?

মণিমোহন। কে বলেছে এ কথা?

শঙ্কর। খবরদার—নিজের দোষ ঢাকতে যাস না—

মণিমোহন। তুই কতটুকু জানিস?

শঙ্কর। স—ব জানি। সত্য মরবার একটু আগে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আমাকে স—ব বলে গেছে।

মণিমোহন। বেচারি সত্য! তার জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু সে নিজেও তো সব ঘটনা জানত না—

শঙ্কর। সে জানত না—তার প্রণয়িনী, সে জানত না—জানতিস তুই!

মণিমোহন। হ্যাঁ—জানতাম আমি।

শঙ্কর। জানতিস তো সত্যকে মরবার আগেও জানাসনি কেন? কেন তুই আর তার সঙ্গে দেখা করিসনি?

মণিমোহন। উপায় ছিল না রে—উপায় ছিল না।...কিন্তু তোকে রুড়কি এঞ্জিনিয়ারিং হোস্টেলে চিঠি দিয়েছিলাম—সোমেন রায় ছদ্মনামে, কিন্তু তুই কলেজ ছেড়ে

দিয়েছিস এই মর্মে চিঠি আসে।....আর আজই প্রথম জানলাম যে, সত্য মরবার সময় তুই কলকাতায়ই ছিলি....

শঙ্কর। হ্যাঁ, আমি সেইদিনই পৌঁছই—

মণিমোহন। আমার দুর্ভাগ্য—আমি তা জানতাম না।...তারপর বারো বছর বাদে তোকে আবার একটা চিঠি দিয়েছিলাম—তোর বাড়ির ঠিকানায়—পোস্টকার্ডে। খবর এসেছিল—তুই আর্মস অ্যাক্ট ভায়োলেট করেছিস—তোর নামে বডি ওয়ারেন্ট আছে—তোর খবর কেউ জানে না।...হোম ডিপার্টমেন্টে খবর করেছি—তুই কোথাও ধরা পড়েছিস কি না, কোনো পাত্তা পাইনি। সেন্ট্রাল আর প্রদেশের সিভিল লিস্টে খুঁজেছি—এঞ্জিনিয়ার শঙ্কর রায়কে—কিন্তু হদিস আমি পাইনি—তাই তোকে জানাতে পারিনি।

শঙ্কর। তারপর—

মণিমোহন। আমাদের তিন বন্ধুর জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে গেল। তুই, আমি—আর সত্য। তুই এঞ্জিনিয়ার হবি, আমি হব ডাক্তার—আর সত্য ব্যারিস্টার হয়ে আসবে।...সবাই হিংসে করত, ঈর্ষা করে বলত—ত্রিমূর্তি। সত্যকে বলত ব্রহ্মা—আমাকে বলত বিষ্ণু—আর তুই তো স্বনামেই প্রকাশ ছিলি। কিন্তু কি হয়ে গেল! সত্য ব্যারিস্টার না হয়ে বিলেত যাওয়ার আগের দিন—সুইসাইড করতে নিজেকে গুলি করল। বিলেত যাওয়ার ঠিক আগের দিন সবাইকে ছেড়ে গেল। আমি ডাক্তার না হয়ে—সমাজের একজন না হয়ে—পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আর তুই! এঞ্জিনিয়ার না হয়ে তুই পাগলের বেশে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিস—

শঙ্কর। হ্যাঁ, আমি শঙ্কর—মহেশ্বর—সংহারের রূপ—আজও ঠিক তেমনি আছি। আর তুই আজ বিষ্ণু নস—তুই আজ—

মণিমোহন। কি বলবি?

শঙ্কর। বল না—কি বলা উচিত?

মণিমোহন। তুই-ই বল, শুনি—

শঙ্কর। ইউ আর এ ক্রিমিন্যাল—তুই একটা জঘন্য নারকী।

মণিমোহন। তুই জানিস না—

শঙ্কর। ডোন্ট আরগু—আমায় বোঝাতে যাস না।—আমি যুক্তি তর্কের বাইরে চলে গেছি। আজ বিশ বছর বন্ধুভাবে তোর কৃতকর্মের যুক্তি খুঁজে বেড়িয়েছি—কিন্তু তোকে সমর্থন করার মতো কোনো দিক থেকে কোনো যুক্তিই আমি খুঁজে পাইনি।

মণিমোহন। যুক্তি খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য?

শঙ্কর। সত্যিই খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। সত্য যখন শ্রীমতীদের বাড়ির তেতলার ঘরে সুইসাইড করে—তখন তুই সেইখানে পৌঁছুলি কি করে?

মণিমোহন। পরে বলব।

শঙ্কর। বলতে হবে না। আমি জানি। বল—সত্য নিজের গুলিতে নিজে আহত হয়ে তোকে কী বলেছিল?...বলেনি যে শ্রীমতী তাকে বিট্রে করেছে?

মণিমোহন। বলেছিল।

শঙ্কর। তোকে সে অনুরোধ করেনি যে, শ্রীমতীর ওপর প্রতিশোধ নে—

মণিমোহন। করেছিল—

শঙ্কর। তুই তার গাঁ ছুয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলি যে, শ্রীমতীকে খুন করে সত্য মরবার আগেই সে খবর তাকে জানাবি? বলিসনি?—

মণিমোহন। বলেছিলাম।

শঙ্কর। কিন্তু তুই কি করলি? পুলিশ এসে সমস্ত বাড়ি সার্চ করল—কোনো ঘরে কাউকে পাওয়া গেল না। শ্রীমতীকেও না—তোকেও না—কাউকে না। রিপোর্টেড হল যে, সত্য পাশের বাড়িতে—মানে শ্রীমতীদের বাড়িতে ঢুকে শ্রীমতীর বাবার রিভলবার নিয়ে নিজেকে গুলি করেছে। শ্রীমতীর বাবা সেদিন সেই সময় পুলিশ-কমিশনারের অফিসে কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাই পুলিশ তাঁকে সন্দেহ করল না, কিন্তু সেদিন থেকে শ্রীমতীকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। তার নামে বডি ওয়ারেন্ট ছিল—কিন্তু পৃথিবীর কোথাও তার খোঁজ পাওয়া গেল না, রুড়কি থেকে পরের দিন এসে পৌঁছুলাম আমি—সত্যকে বিলেত যাওয়ার আগে সি-অফ করতে। কিন্তু এসে সব খবর শুনলাম। আরও শুনলাম মুমূর্ষু সত্যের কাছে তোর প্রতিজ্ঞার কথা। মনে মনে তৃপ্তি পেলাম এই ভেবে যে, তুই যখন প্রতিশোধের ভার নিয়েছিস—তখন শ্রীমতীকে সত্যি পৃথিবীর কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ছুটে গেলাম তোর হোস্টেলে, কিন্তু গিয়ে যা শুনলাম—

মণিমোহন। কী শুনলি—?

শঙ্কর। শুনলাম—সেই রাতে তুই একটি মেয়েকে নিয়ে নাকি হোস্টেলে উঠেছিলি। বন্ধুদের বলেছিলি—তিনি তোর অসুস্থ স্ত্রী। তারপর সেই রাতেই তুই তাকে নিয়ে সবার অলক্ষ্যে হোস্টেল ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

মণিমোহন। সত্যি।

শঙ্কর [ঘৃণামিশ্রিত কণ্ঠে]। সত্যি! তোর লজ্জা করল না সে কথা বলতে? আমি তো বিশ্বাসই করতে পারিনি যে,—যে শ্রীমতীকে তুই চাক্ষুষ দেখিসনি—কেবলমাত্র সত্যের মুখে নাম শুনেছিলি—আর যার জন্যে সত্যের মৃত্যু,—সেই—সেই মেয়েকে একবার দেখেই তুই স—ব ভুলে গেলি! বন্ধুত্ব, মনুষ্যত্ব স—ব ভুলে গিয়ে তাকে নিয়ে তুই পালিয়ে গেলি!

মণিমোহন। তুই একথা বিশ্বাস করেছিলি?

শঙ্কর। আমি—আমি করিনি, কিন্তু সত্য বিশ্বাস করেছিল। তাই মরবার আগের মুহূর্তে সে আমাকে ডেকে বলেছিল—শঙ্কর, শ্রীমতীকে ভালবেসে আমায় প্রাণ দিতে হল। শ্রীমতীর জন্যে আমাদের বন্ধু মণিও বিশ্বাসঘাতক হয়ে গেল!...সে

দিন সত্যর বুকে হাত দিয়ে আমি বলেছিলাম—আমি যদি বেঁচে থাকি সত্য, তবে মণি আর শ্রীমতীকে বুকের রক্ত দিয়ে তাদের এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—

মণিমোহন। তারপর?

শঙ্কর। তারপর!—জানবার আগ্রহ যে খুব বেশি দেখছি!

মণিমোহন। তার মানে?

শঙ্কর। ডোন্ট পোজ ইওরসেলফ টু বি এন ইনোসেন্ট ওয়ান,—আর সাধুতার ভান করতে হবে না। শুনে বোধহয় খুশি হবি—তোর ষড়যন্ত্রই জয়ী হল। তোর হোস্টেলের ঘরে ঢুকে তোর বইয়ের টেবিলের উপর দেখলাম সেই অভিশপ্ত রিভলবার। তোর যাতে কোনো বিপদ না ঘটে—তাই ওটা লুকিয়ে পকেটে পুরে নিয়েছিলাম। সত্য মারা যাবার সময়ও ওটা আমার পকেটেই ছিল। তারপর হাসপাতাল থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আসতেই ধরল পুলিশ।

মণিমোহন। এঁ্যা—

শঙ্কর। হ্যাঁ। তাই বলছিলাম—তোর ষড়যন্ত্রই জয়ী হল।...কি খুব অবাক লাগছে—না? ইয়েস্, ইয়েস্, মাই ফরচুনেট ফ্রেন্ড—ইওর প্লট ওয়াজ ফ্ল-লেস।

মণিমোহন। মাই প্লট!

শঙ্কর। ইয়েস; ইললিগ্যাল পজেশন অব আন-অথরাইজড ফায়ার আর্মস—অস্ত্র আইন—খুনের সহযোগিতা—প্রমাণ লোপ। একাধিক চার্জে আমার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়ে গেল।

মণিমোহন। বিশ্বাস কর—এ আমি জানতাম না। তোর এত বড় সাজা হয়েছে—আমি জানতাম না।

শঙ্কর। বিশ্বাস করেছি বই কি যে, এ তুই—এ তোরই চক্রান্ত। তাই পুরো সাজা খেটে জেল থেকে বেরিয়ে প্রতিশোধ নেবার বাসনা শুরু হল—একলব্যের অস্ত্র সাধনা। রিভলবারের লাইসেন্স চেয়ে অনুমতি পেলাম না। কিন্তু জেদ আমার ক্রমশ বাড়তেই লাগল। রাস্তায় ছিনিয়ে নিলাম এক পুলিশ সার্জেন্টের রিভলবার। আবার আর্মস অ্যাক্টে ধরবার জন্যে আমার নামে ওয়ারেন্ট বেরোল। কত চার্জ আমার বিরুদ্ধে—আর কত তার ধারা! কিন্তু এবার শঙ্কর রায় ধারাহীন নদীর মতো মাটির তলায় চলে গেল। এঞ্জিনিয়ার শঙ্কর রায় ধূর্জটি হয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড লাইফ লিড করতে লাগল।

মণিমোহন। কেন তুই এ কাজ করতে গেলি শঙ্কর! আজ তুই নিজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতিস, সুখে সংসার করতে পারতিস—কেন তুই একাজ করতে গেলি?

শঙ্কর [বিদ্রূপের হাসি-মিশ্রিত কণ্ঠে]। কেন করলাম!...সত্যের মুখে শুনেছিলাম—বিলেত যাওয়ার ঠিক আগের দিন শ্রীমতী তাকে জানায় যে, সে-দিন রাত্রি ন টায় তাদের বাড়িতে যখন কেউ থাকবে না—তখন যেন সত্য তার কাছে আসে।

মণিমোহন। শ্রীমতীর যুক্তি ছিল; বিলেত যাওয়ার আগেই সে সত্যকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।

শঙ্কর। কিন্তু সত্য বলেছিল যে, সে ফিরে এসে বিয়ে করবে, এখন তার বাবার মত নেই। আর বাবার মতের বিরুদ্ধতা করতে সত্য তখন রাজী ছিল না। কিন্তু তুই কি মনে করিস যে, সত্য বিলেত থেকে ফিরে এসে আর শ্রীমতীকে বিয়ে করত না?

মণিমোহন। নিশ্চয়ই করত, সমস্ত পৃথিবী তার বিপক্ষে গেলেও সে তার কথা রাখতই।

শঙ্কর। আর সে কথা বিশ্বাস করেই তো শ্রীমতীও তার কথায় রাজী হয়েছিল। তবে কেন সে-দিন ন টার সময় তাকে তাদের বাড়ি ডেকে নিয়ে গিয়ে নিজের বাবার রিভলবার নিয়ে এসে ছাদের চিলে-কোঠায় গিয়ে সত্যকে বলল—এস, এই রিভলবার দিয়ে আমরা দুজনেই আত্মহত্যা করি।

মণিমোহন। থাম—থাম—শঙ্কর।

শঙ্কর। থামব না। থামব কেন সেই—সেই বিশ্বাসঘাতকের কলঙ্কিত অধ্যায় আমি সারা পৃথিবীকে জানিয়ে যাব।...তার হাতে রিভলবারটি তুলে দিয়ে তাকে ভাববার একটুও অবসর দিল না। সত্য তার কথায় বিশ্বাস করল; তার মনের জোর ছিল অদম্য। রিভলবারের গুলিতে সত্যিই মৃত্যু হবে কিনা পরখ করার জন্যে সে প্রথমে দরজার দিকে একটা গুলি ছোঁড়ে। দরজা ফুটো হয়ে গুলি বেরিয়ে যায়! চারিদিকের বাড়িগুলো থেকে আওয়াজ ওঠে—কে! কে!! কে!!! পড়শিরা ওই বাড়ি লক্ষ্য করে এগোতে থাকে। তখন আর ফেরার উপায় ছিল না। শ্রীমতীকে নিশানা করে রিভলবার উঁচিয়ে সত্য বলে—এস শ্রীমতী, প্রথমে তোমাকেই গুলি করি।—বলতেই ভয় পেয়ে শ্রীমতী চিৎকার করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে থাকে। সেই অসহায় অভাবিত পরিস্থিতিতে সত্য বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে; শ্রীমতীকে লক্ষ্য করে চার-চার বার সে গুলি ছোঁড়ে। দুর্ভাগ্য যে—একটা গুলিও শ্রীমতীর গায়ে লাগল না।...দৌড়িয়ে, সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে, হামাগুড়ি দিয়ে সে নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু রিভলবারে আর একটি মাত্র গুলি অবশিষ্ট ছিল, তাই—সেটিকে সে হাতছাড়া করতে সাহস পায়নি। নিজের গলায় রিভলবারের নল ঠেকিয়ে সত্য আত্মহত্যা করে। অসম্মানের হাত এড়াতে চেষ্টা করে। বাদবাকিটা তুই ছাড়া আর কেউ জানে না।

মণিমোহন। তাহলে আমার কাছেই শোন।

শঙ্কর। কোনোও কথা শুনতে চাই না। চোখের ওপরই তো দেখছি—দিব্যি সুখে আছিস। সংসার পেতেছিস—সুন্দরী মেয়ে আছে—আনন্দের সংসার!

মণিমোহন। এই আনন্দের সংসারে তুইও আয় না ভাই!

শঙ্কর। আমি তো এসেছি এই আনন্দকে গুঁড়িয়ে দিতে। শঙ্কর রায় শুধু শুধু আন্ডারগ্রাউন্ডে যায়নি, শুধু শুধুই পাগল হয়নি; সেই সার্জেন্টের রিভলবার আজও

তার কাছেই আছে। নিজেকে বঞ্চিত করে প্রতিটি পয়সা বাঁচিয়ে তাই দিয়ে সে শুধু গুলি কিনেছে—আর তাই ছুঁড়ে ছুঁড়ে সে তার নিশানা ঠিক করেছে। আজ শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে—যেমন ভাবেই আমি গুলি ছুঁড়ি না কেন তা অব্যর্থ—তা লক্ষ্য ভেদ করবেই।

[এই বলিয়াই শঙ্কর রিভলবার বাহির করিল]

মণিমোহন। শঙ্কর!

শঙ্কর [রিভলবারের নল মণিমোহনের দিকে তুলিয়া ধরিয়া]। আমি সত্য নই যে, পর পর চার-চারটে গুলি ফস্কাবে। একটি তোমার জন্যে—আর একটি তোমার প্রণয়িনী শ্রীমতী দেবীর জন্যে নির্দিষ্ট।...নাও বন্ধু, তৈরি হয়ে নাও, আমার সময় নেই, আর—দুটি ছাড়া অতিরিক্ত গুলি কেনার মতো অর্থও আমার নেই। মিথ্যে কান্নাকাটি করে এই গুলিকে ভিজিয়ে দেবার চেষ্টা কোর না।

মণিমোহন। শঙ্কর! ইউ আর মিস-ইনফরমড—

শঙ্কর। নো। তাহলে তুমি আত্মগোপন করেছিলে কেন?...তুমি মণি মুখার্জ্জি—সোমেন রায় হয়েছ কেন? তুমি ডাক্তার—আজ তুমি কাচের ব্যবসায়ী হয়েছ কেন? নো, আই উইল নট বিলিভ এ সিংগল ওয়ার্ড অব ইওরস [মণিমোহনের দিকে লক্ষ্য স্থির করিয়া]...নাউ, রেডি—ওয়ান, টু—

[ঠিক এই মুহূর্তে ঘরের ভিতর দিক হইতে দরজায় করাঘাত হইতেই শঙ্কর সচকিত হইয়া তাহার হাতের রিভলবার কোটের পকেটে পুরিয়া ফেলিল। মণিমোহন অগ্রসর হইয়া দরজা খুলিয়া দিতেই দেখা গেল নিয়তি একটি ভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। ভৃত্যের হাতের ট্রেতে—প্লেটে সাজান জলখাবার ও চা। ট্রেটা টেবিলের উপর রাখিয়াই ভৃত্য প্রস্থান করিল]

নিয়তি। ধূর্জটি বাবু—আপনার চা আর জল খাবার! আপনি ততক্ষণ চা খান—আর আমার বাবাকে একটু ছুটি দিন, উনি ভেতরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে আসুন।

[অতঃপর মণিমোহন ভিতরে যাইবার জন্য প্রস্থানোদ্যত হইতেই শঙ্কর বলিল—]

শঙ্কর। আপনাকে আর একটু থাকতে হবে, সোমেন বাবু!

[মণিমোহন পিছন দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলে শঙ্কর নিয়তিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—]

শঙ্কর। তোমার বাবা আর দু-চার মিনিট পরে—আমার কথাটা শেষ হলেই ভেতরে যাবেন—

মণিমোহন। তাহলে দেখুন ধূর্জটি বাবু, আমি এখন ভেতরে যাই—পরেই না হয় কথা বলব' খন—

শঙ্কর। না, আমার কথা শেষ হয়নি।—আপনি থাকুন, আর নিয়তি চলে যাক।

মণিমোহন। ওঃ। আচ্ছা, আচ্ছা। নিয়তি মা—একটু ভেতরে যাও তো...

নিয়তি। কিন্তু কী এমন জরুরি কথা আপনার থাকতে পারে—যা দু মিনিটের জন্যেও আপনি থামিয়ে রাখতে পারেন না!

শঙ্কর। না—পারি না—

নিয়তি। আপনি তো বাবার সাথে দেখা না করেই চলে যাচ্ছিলেন—

শঙ্কর। ভুল করছিলাম, কিন্তু তুমি যখন সে ভুলটা শুধরে দিয়েছ তখন কথাটা আমার এখুনি শেষ করতে হবে।

নিয়তি। দেখছেন—সারারাত পরিশ্রমের পর বাবা শ্রান্ত হয়ে ফিরেছেন, তবু তাঁকে আটকে রেখে এমন কী জরুরি কাজের কথা আপনার হবে?

শঙ্কর। কাজের কথা নয়—এ ভাগ্যের কথা।

নিয়তি [বিস্মিত কণ্ঠে]। ভাগ্যের কথা! কার ভাগ্যের কথা?—বাবার?

ধূর্জটি। না—মণিমোহনের!...কি, বলব নিয়তিকে?

মণিমোহন। না, না, নিয়তিকে বলে কি লাভ? [নিয়তির উদ্দেশ্যে] তুমি যাও মা, ভেতরে যাও! আমি কথাটা শেষ করেই...

নিয়তি। কথাটা শেষ করেই চলে এস কিন্তু। দেরি কোর না বাবা, মা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন—

মণিমোহন [নিয়তির পিঠে হাত দিয়া]। না, দেরি হবে না...

নিয়তি [শঙ্করকে উদ্দেশ্য করিয়া]। বাবাকে একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন—কেমন?

শঙ্কর। নিশ্চয়ই—

[নিয়তি প্রস্থান করিবামাত্র শঙ্কর আগাইয়া গিয়া দরজাটা ভিতর দিক হইতে বন্ধ করিয়া দিলে মণিমোহন শঙ্করের উদ্দেশ্যে বলিল—]

মণিমোহন। ভাই শঙ্কর, আমাকে মারার আগে তুই একবার এই মেয়েটার কথা ভাব—ওর কত বড় ক্ষতি হবে একবার ভেবে দেখ—

শঙ্কর। তুই মরলে কারো কোনো ক্ষতি হবে না—

মণিমোহন। ক্ষতি হত না—যদি তুই অন্তত বেঁচে থেকে ওর দায়িত্ব নিতে পারতি। কিন্তু আমায় মারলে তুইও যে ধরা পড়বি—

শঙ্কর। আমি তো বাঁচতে চাই না—আমি ধরা দিতেই চাই।...কোর্টে দাঁড়িয়ে জোর গলায় স—ব ইতিহাস বলে যাব। এমন ঘৃণার সঙ্গে সে কথা বলে যাব যে, এরকম পাপ করবার আগে মানুষ যাতে তার পরিবারে কথা চিন্তা করে বার বার থমকে দাঁড়ায়। অন্তত ভয় পেয়েও যেন ভাবে যে, তাদের কপালেও এমনি দুর্গতি ঘটতে পারে!

মণিমোহন। তাতে তো নিরীহ মেয়েটাই সর্বনাশ হবে সবচেয়ে বেশি—

শঙ্কর। বিশ বছর ধরে রিভলবারের গুলি আমি বুকের আগুনে শুকিয়েছি, তোমার ওই মায়া-কান্নায় সেই গুলিতে ড্যাম্প লাগবে না—এতটুকু মিইয়ে যাবে না—।...তখন মনে ছিল না যে, শঙ্কর রায় বেঁচে থেকে এতবড় অন্যায় সহ্য করবে না—

মণিমোহন। কোনো অন্যায় করিনি—

শঙ্কর। বিশ্বাসঘাতকতা করিসনি?

মণিমোহন। না। তোর কাছে বা সত্যের কাছে লুকোবার মতো আমার কিছু নেই—

শঙ্কর। তা হলে শ্রীমতীদের সঙ্গে যে তোর পরিচয় ছিল—এ কথা তো সত্য বা আমি কেউই জানতাম না—

মণিমোহন। শ্রীমতীদের সঙ্গে আমার কোনো পরিচয়ই ছিল না—

শঙ্কর। যে—র মিথ্যে কথা? তাহলে শ্রীমতীদের বাড়ির চিলে কোঠায় তুই গিয়েছিলি কি করে?

মণিমোহন। যে পথে সত্য গিয়েছিল—সেই পথেই—

শঙ্কর। তার মানে?

মণিমোহন। মানে আর কি!...ওয়ার্ডের ডিউটি শেষ করে রাত প্রায় নটার সময় ওদের বাড়ি পৌঁছই। ওর মা বললেন, সত্য এই মাত্র ছাদে গিয়েছে। আমি ছাদে এসে অবাক হয়ে গেলাম। দুই ছাদের মাঝে একটা সরু তক্তা ফেলে তার উপর দিয়ে হেঁটে সত্য শ্রীমতীদের ছাদে চলে গেল।

শঙ্কর। অসম্ভব নয়—বরং সে ভাবেই যাওয়া সম্ভব।

মণিমোহন। একবার ভাবলাম ডাকি ওকে পেছন থেকে—পর-মুহূর্তেই আবার ভাবলাম, থাক—চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি, ফিরে এলে মজা করা যাবে—ওকে ঠাট্টা করা যাবে। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই পর পর কটা গুলির আওয়াজ শুনে—আমার দিকবিদিক জ্ঞান রইল না।...সেই সরু তক্তার উপর দিয়েই আমিও গিয়ে শ্রীমতীদের বাড়ির চিলে-কোঠায় উপস্থিত হলাম, ঢুকে দেখি—সালফারের ধোঁয়ার মধ্যে ছোট্ট চিলে-কোঠায়, রক্তাক্ত-দেহে হাতে রিভলবার নিয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে—আমাদের বন্ধু সত্য।

শঙ্কর। জানি—সে কথা—

মণিমোহন। ওর কাছে ছুটে গেলাম—দেখি, গলা আর চোয়ালের পাশ ফুঁড়ে গুলিটা বেরিয়ে গেছে—অথচ তখনও বেঁচে। আমায় ফুঁড়ে গুলিটা বেরিয়ে গেছে—অথচ তখনও সে বেঁচে, আমায় বলল—শ্রীমতী বিট্রে করেছে, ওকে শাস্তি দে—

শঙ্কর। তারপর—শাস্তি দিলি না?

মণিমোহন। পাগলের মত ছুটে নিচে নেবে গেলাম—বাড়িতে অন্য লোক-জনের কথা মনেও হয়নি। অবশ্যি ওদের বাড়ি সেদিন একদম খালি ছিল।...এ ঘর, ও ঘর, বারান্দা খুঁজতে খুঁজতে, একতলায় সিঁড়ির নিচে কয়লা-ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখি—ভীত, সন্ত্রস্ত দুটো চোখ।...হ্যাঁ গুহায় এসে ঢুকেছে বাঘিনী।...চুলের মুঠি ধরে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে তাকে তুলে নিয়ে এলাম—আবার তিন-তলার ছাদে। এনে মুমূর্ষ সত্যের সামনে ওকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললাম—দেখ সত্য, কাকে এনেছি—বল, কি ভাবে খুন করব? তাকিয়ে দেখি—সত্য জ্ঞান হারিয়েছে! আমি ডাক্তার মণিমোহন বুঝতে পারলাম যে, সত্যর সময় ঘনিয়ে এসেছে—

শঙ্কর। কি করলি তুই? কি করলি তারপর?

মণিমোহন। শ্রীমতীর দিকে এগিয়ে গেলাম—দুটো হাত ওর গলার দিকে—গলা টিপে ধরব—এমনি সময়ে ও বলল—আপনি কে?...শঙ্কর না মণি? আমি—আমি বললাম—মণি। ও বললে—ডাক্তার! আমাদের বাঁচান!...মনটায় নাড়া খেয়ে গেল—

শঙ্কর। অমনি ওকেই বাঁচাতে গেলি বুঝি?

মণিমোহন। আবার তাকালাম সত্যের দিকে—বাঁচার কোনো লক্ষণ দেখলাম না। তাকালাম মেয়েটার দিকে—ওর পায়ে গুলির চোট। বেচারা গুলি খেয়ে সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়েছিল। ওকে অন্তত বাঁচানো যায়—

শঙ্কর। ওকেই বাঁচানোর কথা ভাবলি?

মণিমোহন। নাঃ! ভাবলাম—ওকে তো খুনই করব—তবে আর এসব ভাবছি কেন?...রিভলবারের বাঁট দিয়ে মাথাটা ঠুকে ভেঙে দেব ভাবছি—এমন সময়—

শঙ্কর। এমন সময়—

[এমন সময়ে বাহির হইতে দরজায় খুব পুনঃ পুনঃ সজোর করাঘাত হইতে লাগিল]

শঙ্কর। কে—?

মণিমোহন। শ্রীমতী...নিয়তির মা।

[পরমুহূর্তেই স্ত্রী কণ্ঠে, 'দোর খোল, দোর খোল শিগগির ইত্যাদি শব্দ শুনা যাইতে লাগিল]

শঙ্কর [বিস্মিত কণ্ঠে]। ইজ্ ইট!—যাক তোদের দুজনকেই তাহলে এক সঙ্গে পেয়ে গেলাম—

[এই বলিয়াই শঙ্কর অগ্রসর হইয়া ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া দিতে যাইতেই মণিমোহন বলিল—]

মণিমোহন। না—না, ওকে ডাকিস না—ওকে ডাকিস না। আমাদের বন্ধুদের ব্যাপারে...ওকে ডাকিস না—

শঙ্কর। আমি কি করব। মৃত্যুই ওকে ডাকছে। এর একটা গুলি যে ওর জন্যেই রাখা হয়েছে—

[দরজায় পুনরায় সজোর করাঘাত হইতে লাগিল]

মণিমোহন। ভাই শঙ্কর, তুই জানিস না—এই বিশ বছর ধরে ও কত দুঃখ পেয়েছে। আজ কিছুদিন হল নিয়তির বিয়ের সম্বন্ধটা ঠিক হয়েছে। এই অবস্থায় ওর এতবড় আনন্দ আশ্বাসের মাঝে তুই এভাবে ছেদ টেনে দিস না—

শঙ্কর। এ কাজটার জন্যে তা আমার প্রয়োজন ছিল না মণি, যদি তুই-ই সেদিন এ কাজটা করতিস!

মণিমোহন। শঙ্কর, আজ বিশ বছর ধরে—কত চেষ্টা করে তবে আমি এ সুখের সংসার গড়ে তুলেছি! এ তুই ভেঙে দিস না। তোর সম্বন্ধে বড় মুখে অনেক বড় কথা ওকে বলেছি, কিন্তু তুই যদি এ-ভাবে—

শঙ্কর [গম্ভীর হইয়া]। থাম!—আসতে দে ওকে ভেতরে।

মণিমোহন। না, না—তার আগে—আমাকে তুই খুন কর। ওর সামনে সেই পুরোন স্মৃতি তুলে ধরে ওকে আর লজ্জা দিস না—

শঙ্কর [বিদ্রূপের স্বরে]। বড় মায়ায় পড়ে গেছ, না বন্ধু? বিশ বছরের সংসার, স্ত্রী কন্যা-পরিবার—আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠা! হাঃ হাঃ হাঃ—ওয়েল, হোয়াট ইজ ইয়োর লাস্ট উইস—শেষ প্রার্থনা কি?

মণিমোহন। হ্যাভ মারসি—দয়া কর।...প্রাণ ভিক্ষা চাইছি না, মরতে আমার ভয়

নেই।...আমাকে, শ্রীমতীকে খুন কর—তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু তুই কথা দে—শ্রীমতীর সামনে-এ প্রসঙ্গ তুই তুলবি না।

শঙ্কর। অল রাইট; আই উইল সিমপ্লি সুট ইউ ডাউন। বিচার করবেন ভগবান—আমি শুধু ঘাতকের কাজটুকু করে যাব।...নাউ, অ্যালাউ হার টু কাম ইনসাইড।

[মণিমোহন অতঃপর দরজা খুলিয়া দিতে অগ্রসর হইলেই শঙ্কর রিভলবার লুকাইয়া ফেলিল, এই দিকে মণিমোহন দরজা খুলিয়া দিতেই শ্রীমতী ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহার পরিধানে গরদের শাড়ি, কপালে উজ্জ্বল সিন্দুরের টিপ, কাঁচা পাকা চুল। সমস্ত মুখেই একটা দুঃখের ছাপ সুস্পষ্ট। শ্রীমতী ভিতরে পদার্পণ করিয়াই ধূর্জটি বাবুর চেহারা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, আর তাহা লক্ষ্য করিয়া মণিমোহন বলিল—]

মণিমোহন। ধূর্জটি বাবু... আর ইনি আমার স্ত্রী—আশা—

[পরস্পরের মধ্যে নমস্কার বিনিময়ের পর শ্রীমতী শঙ্করকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—]

আশা। আমি বলছিলাম....আপনি আমাদের এখানেই আতিথ্য নিন। থাকুন—তারপর আবার অবসর সময়ে আলাপ করবেন।...উনি সারারাত কারখানায় খেটে এই মাত্র বাড়ি ফিরলেন কিনা—

শঙ্কর [সহাস্য কণ্ঠে]। ওঃ! তাই বুঝি আমার হাত থেকে স্বামীকে উদ্ধার করতে ছুটে এসেছেন। বেশ তো, সোমেন বাবু ভেতরে যান—আমি বরং অপেক্ষা করছি—

মণিমোহন। না না—আপনার কথাটা সেরে নিন।...ওটার সম্বন্ধে একটা শেষ সিদ্ধান্ত করা যাক।

আশা। কিসের শেষ সিদ্ধান্ত?

মণিমোহন [অপ্রস্তুত হইয়া]। ভাগ্যের!

আশা। আপনি ভাগ্যবিচার করেন বুঝি?

শঙ্কর। হ্যাঁ।

আশা। তাহলে শুধু ওঁর ভাগ্য বিচার করলে তো হবে না, আমাদের ভাগ্যও বিচার করে দিতে হবে যে—

শঙ্কর। যখন এসেছি, আপনার ভাগ্যও বিচার করব বৈকি! কি বলেন—সোমেন বাবু!

মণিমোহন। হ্যাঁ—হ্যাঁ—নিশ্চয়ই। যখন দয়া করে এসেছেন তখন দুজনের ভাগ্যই বিচার করবেন বৈকি—

আশা। তাহলে আপনি আমার হাত দেখুন, ততক্ষণ উনি স্নান সেরে পোশাক পাল্টে আসুন; [হাসিয়া] মেয়েটা আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েছে—

মণিমোহন। ওঃ, আমি এখুনি আসছি।

[মণিমোহন প্রস্থান]

শঙ্কর। শুনুন—[মণিমোহনের উদ্দেশ্যে]

আশা। কই, আমার ভাগ্য বলুন!

শঙ্কর [সহাস্যে]। আপনার ভাগ্য তো দেখতেই পাচ্ছি।...সুন্দর সুপুরুষ স্বামী, শিক্ষিতা আধুনিকা মেয়ে, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য—আপনার ভাগ্য তো ভালই দেখছি—

আশা। তা ঠিক! তবু আর কিছু!

শঙ্কর। না, আর কিছু বলবার নেই—

[বলিয়াই শঙ্কর যেন অত্যন্ত ঘৃণাভরেই তাহার মুখ ফিরিইয়া লইল। একটু পরেই আবার বলিল—]

শঙ্কর। যতক্ষণ আপনার স্বামী ফিরে না আসেন—ততক্ষণ আপনি আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় পাপের কথা স্মরণ করে ভগবানের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন—

আশা। পাপ! পাপ তো আমি কখনও করি নি!....কোনো অন্যায় জীবনে করি নি।

শঙ্কর। মুখ দেখে অন্তত তাই মনে হয় বটে—আর এই মিথ্যে কথা বলে অপরকে ভোলানও যায়।....আচ্ছা, ঠিক করে বলুন তো, নিজের মনের দিকে তাকিয়ে বলুন তো—কোনো অন্যায় আপনি করেননি?

আশা। না।

শঙ্কর। যাক, বিচার আমি করব না। তবে আমি যে কর্তব্য করতে এসেছি তা থেকে সরেও যাব না।

[এই সময়ে আশা উঠিয়া দরজার দিকে যাইতেই—শঙ্কর তার উদ্দেশ্যে অস্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে প্রায় আদেশের সুরেই বলিল—]

শঙ্কর। দাঁড়ান শ্রীমতী দেবী।

[আশাদেবীও দরজা টানিয়া বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলিলেন—]

আশা। না, যাব না। এইবার বলুন, কি কথা আপনি জানতে চান—শঙ্কর বাবু!

শঙ্কর [চমকিয়া]। শঙ্কর বাবু!...আপনি কি করে জানলেন, যে আমি শঙ্কর!

শ্রীমতী। ঠিক যে ভাবে আপনি জানেন যে, আমি শ্রীমতী।..[হাসিয়া] বাংলা দেশের বাইরে এই পরিবেশ আপনি ছাড়া এমন কোনো লোক নেই, যে এসে সোমেন রায়কে মণিমোহন বলে খোঁজ করতে পারে।...কিন্তু কেনই বা আপনি এসেছেন, আর এসেছেনই যদি কেন যে এ রকম আচরণ করছেন—আমি বুঝে উঠতে পারছি না!

শঙ্কর [বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে]। তোমার মতো মেয়ের পক্ষে বোঝা সম্ভবও নয়!...তোমার মতো যারা স্বার্থান্বেষী, তোমার মতো যারা ভ্রষ্টা তারা আমার হঠাৎ এখানে আসার কারণ বুঝে উঠতে পারবে না।...শোন, তোমাকে স্পষ্ট করেই বলছি আমি, এসেছি মণিমোহনকে খুন করতে—

[বিস্মিত, আতঙ্কিত শ্রীমতী চিৎকার করিয়া উঠিল—]

শ্রীমতী। অ্যাঁ!

শঙ্কর। চিৎকার কোর না। ওতে কোনো লাভ হবে না।...মণি আমাদের বন্ধুত্বের অপমান করেছে—তাকে শাস্তি নিতেই হবে।

শ্রীমতী [প্রায় চিৎকার করিয়াই]। না, এ আমি কিছুতেই হতে দেব না, এ আমি

কিছুতেই হতে দেব না। আমাকে না মেরে কেউ তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না!

শঙ্কর। অলরাইট, আই অ্যাকসেপট ইয়োর অফার—বেশ, তাই হবে। তোমাকে খুন করব, মণিকেও খুন করব—

শ্রীমতী। আপনার পায়ে ধরছি [হতাশায় প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল]।

শঙ্কর। ওই কান্না দিয়ে মণিকে ভোলাতে পার, কিন্তু আমাকে ভোলাতে পারবে না।...আমি মণির মতো ক্লীব নই—

[শ্রীমতী হঠাৎ আত্মমর্যাদায় আঘাত খাইয়া আহত ফণিনীর মতোই বলিল—]

শ্রীমতী। কাকে আপনি ক্লীব বলছেন? মণিমোহন যদি ক্লীব হয়, তাহলে পৃথিবীতে কোনো পুরুষ নেই।...সে ক্লীব নয়—সে দেবতা—

শঙ্কর। তোমার কাছে, আমার চোখে সে নরকের কীট।

শ্রীমতী। আপনার দৃষ্টি নষ্ট হয়ে গেছে শঙ্কর বাবু। তা না হলে এই দেবতুল্য চরিত্রের কোনো গুণই আপনি দেখতে পেলেন না! দেখতে পেলেন না সমস্ত মুখে ওঁর করুণার প্রতিচ্ছবি!...সে ক্লীব নয় শঙ্কর বাবু। আপনি শুনুন, জীবনে আমি কোনো মহাপুরুষ প্রত্যক্ষ করিনি, কিন্তু মণিমোহন আমার সাক্ষাৎ দেবতা, সে ভগবান—সে মহাপুরুষ!

শঙ্কর। চমৎকার! পতি-প্রেমের কী অদ্ভুত অভিনয়!...এই অভিনয় করেই সত্যকে ভুলিয়েছিল, এই অভিনয় করেই তুমি মণিমোহনকে ভুলিয়েছ, আবার এই অভিনয় করেই তুমি আমাকেও ভোলাতে চাও! বাট ইট ইজ টু লেট, মাই ডিয়ার লেডি! বিশ বছর ধরে প্রতি মূহূর্তে লক্ষ্যভেদ অভ্যাস করেছি! ওই অভিনয়ে—বা ওই চোখের জলে সত্যের গুলির মতো আমার গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না, কিংবা মণির মতো আমার হাত তোমার গলা টিপে ধরতে গিয়েও প্রেয়সীর কণ্ঠ-লগ্ন হবে না। [বলিয়া রিভলবার উঁচাইয়া আগাইয়া আসিয়া]...মণিমোহন মহাপুরুষ! চমৎকার! মহাপুরুষই বটে, নইলে মৃত্যু পথযাত্রী বন্ধুকে ফেলে রেখে তারই প্রণয়িনী—না না...তার হত্যাকারিণীর কণ্ঠ-লগ্ন হয়ে রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিল!

শ্রীমতী। মিথ্যে কথা।

শঙ্কর। মিথ্যে? এই মাত্র মণিমোহন আমাকে নিজের মুখে বলে গেছে যে, সে-দিন রাত্রে—

শ্রীমতী। সে-দিন রাত্রে কি?

শঙ্কর। কি আবার! তাকে নিয়ে পালিয়ে গেলে। তার বন্ধুত্ব ভোলালে, তার পরিচয় ভোলালে, তার মনুষ্যত্ব ঘুচিয়ে দিলে—তারপর পরিচিত পৃথিবী থেকে পালিয়ে এখানে এসে সুখের ঘর বাঁধলে!

শ্রীমতী। সে তো অনেক পরের কথা। কিন্তু সেই রাত্রে পালালাম কি করে? বন্দুকের আওয়াজ পেয়ে সমস্ত পড়শিরা বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে,

পুলিস এসে আমাদের বাড়ির সদর দরজার তালা ভেঙে ঢুকছে। আমার পায়ে গুলির আঘাত—আর আমি মণিমোহনকে নিয়ে পালিয়ে গেলাম!

শঙ্কর। তাহলে কি বলতে চাও মণিমোহনই তোমাকে নিয়ে পালিয়ে গেল!

শ্রীমতী। মণিমোহন কাপুরুষ নয় যে পালাবে, সে আমাকে উদ্ধার করেছে।...মুহূর্তের মধ্যে একটা বস্তা সংগ্রহ করে তার মধ্যে আমাকে ভরে সেই সরু তক্তা বেয়ে সত্যদের বাড়ির ছাদে গিয়ে পৌঁছে সেই তক্তা সরিয়ে দেয়। সত্যদের বাড়ির সমস্ত লোকেরা ততক্ষণ আমাদের বাড়ি পৌঁছেছে; সেই সুযোগে ওদের ফাঁকা বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নেমে বস্তাবন্দী অবস্থায় রাস্তার ভিড়ের মধ্য দিয়েই আমাকে নিয়ে হোস্টেলে তার নিজের ঘরে এসে যখন পৌঁছয়, তখন সত্যদের বাড়িতে কান্নার রোল উঠেছে।

[কান্নায় শ্রীমতীর কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম করিল]

শঙ্কর। বেশ! বেশ!! ভালবাসলে একজনকে—তার হাতে রিভলবার তুলে দিলে; সে মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে তারই বন্ধুর ঘাড়ে চেপে নিরাপদ আশ্রয়ে এসে পৌঁছলে! অসীম ভাগ্যবতী তুমি! তোমার ভাগ্যকে ঈর্ষা করা উচিত।

শ্রীমতী। হ্যাঁ, ঈর্ষা করা উচিত। সত্যিই আমি ভাগ্যবতী যে, সেদিন শঙ্কর না গিয়ে মণিমোহন উপস্থিত হয়েছিল। তাই হোস্টেলের আশ্রয় নিরাপদ না হলেও সেই রাত্রে সে তার সমস্ত জ্ঞান, বুদ্ধি, শিক্ষার সাহায্যেই আমার পায়ে অস্ত্রোপচার করে গুলি বের করে ফেলে, আমি তখন অচৈতন্য আর সেই অবস্থায়ই সে আমাকে নিয়ে হোস্টেল থেকে বেরিয়েছিল। তারপর কি ভাবে যে পুলিশের হাত এড়িয়ে আমাকে বাঁচিয়েছিল, কি ভাবে যে তার সমস্ত ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দিয়ে আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল,—আর কেউ না জানুক, তা আমি জানি। দিনের পর দিন সে আপনাকে চিঠি দিয়েছে, আপনার সাহায্য চেয়েছে, সেদিন তাকে কোনো বন্ধু সাহায্য করতে আসেনি; আজ যখন বহু দুঃখের পর সে সমাজে এসে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তার স্বপ্নকে সফল করে তুলেছে—তখন আপনি এসেছেন তার কাজের বিচার করতে!

শঙ্কর। হ্যাঁ, তার কাজের বিচার করতে এসেছি—আর ঠিক সময়েই এসেছি; এমন ভাবে না এলে এত বড় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হত না। একজনের মুখে কলঙ্কের কালি দিয়ে আর একজন সুখে নিশ্চিন্তে ঘরকন্না করবে—তা আমি হতে দেব না। আর তা হতে দেব না বলেই আমার নিজের জীবনটাকে নষ্ট করতেও আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিনি। আমাদের দুই বন্ধুর জীবন নষ্ট হয়েছে—আর এক বন্ধুরও জীবন নষ্ট করে দেব। তাকে স্ত্রী-কন্যা প্রতিষ্ঠার মধ্যে থাকতে দেব না। তাকে সুখে থাকতে দেব না।

শ্রীমতী। সুখ! এ সুখ সে চায়নি।

শঙ্কর। সুখ না পাক, ঘর পেয়েছে—স্ত্রী পেয়েছে—

শ্রীমতী। থামুন! এসব কিছুই সে চায়নি। সে-রাতের পর থেকে আমাকে নিয়ে

পালিয়ে বেড়াবার সময় প্রতিমুহূর্তে লোকে তাকে অপমান করেছে। আমাকে সে বোন বলেছে—লোকে বিশ্বাস করেনি; আমাকে সে বন্ধু বলে পরিচয় দিয়েছে—লোকে তাকে বিদ্রূপ করেছে; আমাকে সে মৃত-বন্ধুর পত্নী বলে সম্মান দিতে চেয়েছে—লোকে তার দেব-চরিত্রে অহেতুক কলঙ্ক দিয়েছে।

শঙ্কর। তাই সে কলঙ্ক বাঁচাতে অবশেষে শ্রীমতী—সোমেন রায়ের স্ত্রী—আশা দেবী হয়েছেন। এ তো সেই পুরোন গল্প। এ গল্প আমার অনেক শোনা আছে।

শ্রীমতী। না—এ গল্প আপনি শোনেননি। এ সুখের গল্প নয়, এ আনন্দের গল্প নয়, এ দুঃখের, এ লজ্জার, এ কলঙ্কের ইতিহাস—

শঙ্কর। যাক। এ যে কলঙ্কের ইতিহাস বলে বুঝতে পেরেছ—তাই যথেষ্ট।

শ্রীমতী। আপনার মতো এত সহজ করে বুঝতে পারিনি।...অনেক দুঃখে, অনেক চোখের জলে, অনেক আত্ম-বঞ্চনার ফলে আজ বুঝতে পেরেছি। আরও বিশেষ করে বুঝতে পেরেছি আপনার ওই উদ্যত রিভলবারের সামনে দাঁড়িয়ে—যে, আমরা যতই কেন না ফুল দিয়ে ঢাকি, একটি গুলিতেই আপনি আবার সেই পুরোন কলঙ্ক জগতের সামনে প্রকাশ করে দেবেন। আপনাকে আমার অনুরোধ, আপনি মণিমোহনকে ভুল বুঝবেন না।....আপনার বন্ধুর মৃত্যুতে দোষ যদি কেউ করে থাকে, সে আপনার বন্ধু সত্য আর আমিই করেছি! আপনি আমার প্রাণ নিন, কিন্তু মণিমোহনকে বাঁচান।

শঙ্কর। না। আমার কাছে ক্ষমা নেই। আবেদন নিবেদনে কোনো লাভ হবে না। আমি তোমাদের খুন করে কোর্টে দাঁড়িয়ে সমস্ত জগৎকে এই কথা শুনিয়ে—তবে এ পাপ পৃথিবী থেকে বিদায় নেব।

শ্রীমতী। যদি পৃথিবীকে সব কথাই জানাতে চান—তাহলে শেষ কথাটুকু শুনে রাখুন।....আমি যাকে ভালবাসতাম—সে আপনাদের বন্ধু সত্য। কিন্তু সে আপনাকে সত্যি কথা বলেনি। কিংবা আমার কথা বিশ্বাস করেনি বলেই—একথা কাউকে জানায়নি।

শঙ্কর। চুপ! তোমার মতো পাপিষ্ঠাকে বিশ্বাস না করলে, তোমার ফাঁদে ধরা দিয়ে—নিজেকে শেষ করত না!

শ্রীমতী। হ্যাঁ, বিশ্বাস সে আমাকে করত, ভাল সে আমাকেই বাসত—আমাকে বিয়ে করবার জন্যে তার বাবার কাছে অনুমতিও চেয়ে ছিল। কিন্তু তার বাবা বলেছিলেন যে, বিলেত যাওয়ার আগে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার আগে যদি সে কাউকে বিয়ে করে—তবে তাঁর সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ থাকবে না, কিন্তু আপনার বন্ধু আমাকে লুকিয়ে বিয়ে করতে চেয়েছিল। আমি হেসে বলেছিলাম—গান্ধর্ব মতে বিয়ে তো আমাদের হয়েই গেছে, দেহ প্রাণ সবই তো তোমাকে দিয়েছি! ঢাক বাজিয়ে অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? তুমি বিলেতে থেকে ঘুরে এস, তখন যদি সবাই রাজী হন—অনুষ্ঠানের বিয়ে তখনই না হয় হবে।

শঙ্কর। তাই তো আমরা জানতাম।

শ্রীমতী। আমরাও তাই জানতাম যে, আপনার বন্ধু ফিরে এলেই আমাদের সামাজিক বিয়ে হবে। কিন্তু তার কয়েক দিন পর থেকেই আমার ঘুষঘুষে জ্বর আর কাশির মতো হতে থাকে। ডাক্তারের চিকিৎসায় হয়তো ভালও হয়ে যেতাম, কিন্তু ঠিক ওর বিলেত যাওয়ার আগের দিন দুপুর বেলায় ডাক্তার দেখে চলে যাওয়ার পরই আমার বাবা এসে গম্ভীর মুখে আমার ঘরে ঢুকলেন...

শঙ্কর। তারপর—

শ্রীমতী। বাবার সঙ্গে কি কথা হয়েছিল স্পষ্ট করে আজ সব মনে নেই, কিন্তু আপনাদের বন্ধুকে সব খুলে বলব বলেই সেদিন দেখা করতে বলেছিলাম। বিকেল, সন্ধে গড়িয়ে গেল—আপনার বন্ধুর দেখা পেলাম না! বিছানায় শুয়ে অধৈর্য হয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় রাত ন টায়—আপনার বন্ধু এসে আমার ঘরে ঢুকেই বলল—শ্রীমতী, তোমার বাবার সঙ্গে সন্ধে বেলায় আমার সব কথা হয়েছে। আমি চমকে বললাম—সব? সে বলল—হ্যাঁ। কিন্তু তোমার বাবা মিছেই আমার ওপর রেগে গিয়ে তোমাদের সদর দরজায় তালা লাগিয়ে গেলেন। তাই সন্ধের সময় তোমাদের বাড়িতে আমি ঢুকতে পারিনি। অনেক ভেবে রাত্রিবেলা ছাদের উপর দিয়ে তোমার ঘরে এসেছি। আচ্ছা, তোমার বাবা যা বললেন, তুমিও কি তা-ই বল? আমি উত্তরে বললাম—হ্যাঁ। শুনে সে চুপ করে বসে থাকল...

শঙ্কর [প্রায় অধৈর্য হওয়া]। চুপ করে থেক না—বল বল—

শ্রীমতী। খানিকক্ষণ সে কথা বলতে পারল না। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি অসুস্থ শরীরে তাকে অনুসরণ করে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম—সে বাবার ঘরের টেবিলের ড্রয়ার থেকে তাঁর গুলি-ভরা রিভলবার বার করে নিল।

শঙ্কর। আর তুমি?

শ্রীমতী। আমি তার হাত চেপে ধরে বললাম—এ তুমি কি ছেলেমানুষী করছ? সে বলল—এস আমার সঙ্গে। বলে হাত ধরে টেনে আমায় চিলে-কোঠায় নিয়ে গেল। আমি ভয় পেয়ে গিয়ে তাকে আবার বললাম—এ তুমি কি করছ? সে বলল—এ রিভলবারের গুলিতে মরা যায়? বলে সে ফাঁকা আওয়াজ করল। গুলিটা দরজা ফুটো হয়ে বেরিয়ে গেল। আমি আরও ভয় পেয়ে গেলাম। সে বলল—এ কলঙ্ক, এ অপমান আমি সহ্য করতে পারব না। শ্রীমতী, এস আমরা আত্মহত্যা করি। আমি বললাম—আত্মহত্যা করলে তো এ কলঙ্ক মুছবে না। সমস্ত পৃথিবী এ কথা জানবে! পোস্টমর্টেমের সব প্রকাশ হয়ে পড়বে। সে বললে, হোক! মৃত্যুর পর যা প্রকাশ হয় হোক। তবু বেঁচে থেকে এ কলঙ্কের বোঝা নিয়ে আমি চলতে পারব না শ্রীমতী! আমি বললাম এ কলঙ্ক নয়, এ কলঙ্ক নয়, এ আশীর্বাদ। তোমার আমার সন্তান কলঙ্ক হবে কেন? জীবন যদি দিতে হয়, সম্মান যদি দিতে হয়, তবে সন্তানকে বাঁচাবার জন্যেই দেব। তাকে মেরে ফেলবার জন্যে নয়।

শঙ্কর। তারপর ?

শ্রীমতী। সে আমায় বিশ্বাস করল না। সে বললে—তুমি ভয় পেয়ে গেছ, তাই তুমি আমাকে মিথ্যে স্তোক দিচ্ছ। যার জন্যে লজ্জা, ঘৃণা, ভয় স—ব ত্যাগ করেছি—সে আমায় অবিশ্বাস করছে মনে হওয়া মাত্র ঘৃণায় আমার সমস্ত শরীর রি-রি করে উঠল। চোখের জল লুকোতে আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলাম। হঠাৎ পায়ে গুলি লাগতেই গড়িয়ে দোতলায় পড়ে গেলাম; পিছন ফিরে দেখি—সে আমাকে তাক করে একের পর এক গুলি ছুঁড়ে যাচ্ছে। তখন খানিকটা ভয়ে, খানিকটা আত্মরক্ষার তাগিদে, খানিকটা তাকে স্ত্রী-হত্যার দায় থেকে বাঁচাতেই আমি ছুটতে সুরু করলাম।...কিছুক্ষণ জ্ঞান ছিল না।...তারপর যখন তাকালাম—দেখি, আপনাদের বন্ধু রক্তাক্তদেহে পড়ে আছে, আর সামনে মণিমোহন। আমি বললাম কে? সে বললে—ডাক্তার। আমি তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বললাম, ডাক্তার—ডাক্তার, আমি মা হতে যাচ্ছি—

শঙ্কর। তা হলে সে সন্তান কোথায় ?

শ্রীমতী। কেন—ঐ যে নিয়তি।

শঙ্কর। নিয়তি তা হলে মণিমোহনের মেয়ে নয় ?

শ্রীমতী। না, সে আপনাদের বন্ধু সত্যের মেয়ে। সবাই জানে নিয়তিও জানে—সে মণিমোহনেরই মেয়ে। কিন্তু মণিমোহন আর আমিই—শুধু জানি যে, সে আপনাদের বন্ধু সত্যের মেয়ে।

শঙ্কর। অদ্ভুত !

শ্রীমতী। সবচেয়ে অদ্ভুত ওই মণিমোহন। ও নিয়তির বাবার অভিনয় করেছে, আমার স্বামীর অভিনয় করেছে, মণিমোহন নাম মুছে দিয়ে সোমেনের অভিনয় করে যাচ্ছে! আমাদের সম্মান, সুখ-সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য—সব যুগিয়েছে, নিজের জন্যে কিছু চায়নি। নির্লিপ্ত সন্ন্যাসীর মতো বন্ধুর মেয়েকে পিতৃস্নেহে মানুষ করেছে। আর প্রতি রাতে সে তার ফ্যাক্টরির ঘরে বসে আমাদের কিসে ভাল হয় শুধু সেই চিন্তা করেছে। মণিমোহন আমার ভাই, আমার বন্ধু—ও তো আমার দেবতা। তার আসন অনেক উঁচুতে। তাকে শ্রদ্ধা করা যায়, তাকে ভয় করা চলে, কিন্তু তাকে ভালবেসে নিজের করার সাহস আমার কোনো দিন হয়নি।

শঙ্কর। তাহলে—তাহলে ?

শ্রীমতী। আমি বুঝতে পারছি—আমার জন্যেই আপনাদের বন্ধু সত্য মারা গেছে, মণিমোহন জীবন্মৃত হয়ে আছে, আপনি পাগল হয়ে গেছেন! আর—আমি তো সবই পেয়েছি! স্বামী পেয়েছি, মেয়ে পেয়েছি, সম্পদ, প্রাচুর্য—স—ব..[কাঁদিয়া ফেলিল]

শঙ্কর। থামো শ্রীমতী, থামো—

শ্রীমতী। এর পর আর থামা যায় না শঙ্কর বাবু। আপনি আমায় দয়া করুন—আমার

জীবনটা শেষ করে দিন [উদ্যত রিভলবার হস্তে দন্ডায়মান শঙ্করের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া—]

[ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার বাহিরের দিক হইতে পুনঃ পুনঃ কঠিন করাঘাতের ফলে দরজার ভিতরের দিকের খিল ভাঙিয়া গেল। দেখা গেল—একটা কাগজ হাতে লইয়া মণিমোহন ঘরে প্রবেশ করিতেছে। শ্রীমতীকে ঐ অবস্থায় শঙ্করের পায়ের কাছে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া মণিমোহন শঙ্করে উদ্দেশ্যে বলিল—]

মণিমোহন। শঙ্কর! ওকে খুন করার আগে তুই আমাকে খুন কর। এই নে—এই নে কাগজ, আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়—একথা লিখে নিয়ে এসেছি। এ খোলস নিয়ে আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না। তুই আমায় মুক্তি দে, নিজের নাম নিয়ে আমি বাঁচতে পারছি না—নিজের নাম নিয়ে আমায় অন্তত মরতে দে।

শঙ্কর। দাঁড়িয়ে থাক। এগোস না বলছি—

[এই বলিয়া শঙ্কর পুনরায় মণিমোহনের দিকে রিভলবার বাগাইয়া ধরিল।]

শ্রীমতী [মণিমোহনকে আগলাইয়া]। না—না—না, মণিদার আগে আমাকে মারুন।

মণিমোহন। না—না—না,...আগে আমাকে...

শঙ্কর [অপ্রকৃতিস্থের মতো]। বাট আই হ্যাভ গট টু বুলেটস ওনলি...আমার জন্যে একটা রেখে—আর একটা স্পেয়ার করতে পারি।...কিন্তু...তোরা দুজনেই যে মরতে চাইছিস! তিনটে গুলিতো নেই। তা হলে...কি করি বল তো মণি? বিশ বছর ধরে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সব কিছু এড়িয়ে শুধু বন্ধুর দাবী মেটাতেই তোদের এখানে এসে হাজির হয়েছিলাম।...ভেবেছিলাম—দুটো গুলিতেই বন্ধুর দাবী মিটবে, নিশানা আমার কিছুতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না। কিন্তু এখানে এসে যা দেখছি—তোদের জন্যে দুটো গুলিই খরচ করে ফেললে আমার জন্যে যে আর কিছুই বাকি থাকে না।...নো—নো—নো; আই ক্যান নট স্পেয়ার এনি বুলেট ফর ইউ...তোদের জন্য আমি গুলি খরচ করতে পারব না। এ আমার শেষ পুঁজি! এ পুঁজি যদি কখনও খরচ করি—তাহলে খরচ করব নিজের জন্যে—

[ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল]

মণিমোহন [বিহ্বলতা কাটাইয়া]। শঙ্কর! শঙ্কর!

[মণিমোহন শঙ্করের পিছন পিছন বাহির হইয়া গেল। অন্দরের দিক হইতে নিয়তি দ্রুত প্রবেশ করিল; শ্রীমতীকে দেখিয়া তাহার কাছে আসিয়া বলিল—]

নিয়তি। কি হয়েছে মা? বাবা ওভাবে ছুটে গেলেন কেন?

শ্রীমতী। ধূর্জটি বাবুকে ধরে আনতে।

নিয়তি [শ্রীমতীর চোখের দিকে তাকাইয়া]। তোমার চোখে জল কেন মা?

শ্রীমতী। এমনি—ওঃ...ধূর্জটি বাবুর বন্ধু মণির গল্প শুনছিলাম কি না, তাই...

নিয়তি। আচ্ছা, কি হয়েছে মণিমোহনের?

শ্রীমতী। না—কিছুই হয়নি মা—সে সন্ন্যাসী হয়ে গেছে।

নিয়তি। সন্ন্যাসী!!!.....

[ধীরে ধীরে মঞ্চে যবনিকা নামিয়া আসিল]

জ্বালা

ঋত্বিক ঘটক

চরিত্র

[মঞ্চে প্রবেশের ক্রমানুসারে]

বধূ [শেফালী]
খোকা
বুড়ো [পূর্ণচন্দ্র]
মজুর [ভোলানাথ]
পিওন
পাগল

[উঁচু-নীচু পিঙ্গল একটুকরো মালভূমি। আন্দোলিত প্রান্তরের শেষে নিঃসঙ্গ একটা পাতাহীন বাজে পোড়ো বাবলা গাছ অজস্র বাহু উদ্যত করে আকাশকে অভিসম্পাত দিচ্ছে। তার পিছনে ধোঁয়াটে পটভূমি নিঃস্বতার মধ্যে হারিয়ে গেছে।...সামনে পাশে এক আধটা কন্টিকারি ফণিমনসা আসশ্যাওড়ার ঝোপঝাড়। বাঁয়ে কালো-পচা স্থির জল একটা এঁদো বিলের মাঝখানে চিক্-চিক্ করছে। সেখান থেকে সূক্ষ্ম আস্তরণের মতো কুয়াশা উঠে কুন্ডলী পাকিয়ে স্থির হয়ে আছে শূন্যে!....

জনমানবহীন হতশ্রী রুক্ষ প্রান্তর অপার্থিব সর্বহারাত্ব ফুটে আছে তার সর্বাঙ্গে। নিথর, হাওয়া নেই যেন কোথাও।

পর্দা ওঠার পর সব নিশ্চুপ।...আচম্বিতে প্রচন্ড বাজ পড়ার শব্দ হয় রণিয়ে রণিয়ে। তীব্র ফ্যাকাশে ভূতুড়ে আলোয় সব কেমন মুহূর্তের জন্য বিবর্ণ লাগে।...একটা অবিরত—একটানা বিকৃত কণ্ঠস্বর শোনা যায়। গুমরে গুমরে মূর্ছে পড়তে থাকে এবার। বাবলা গাছটা ডালে ডালে পাতায় পাতায় থর থর করে কাঁপতে শুরু করে দেয়। এবড়ো খেবড়ো পাঁশুটে জমির উপর দিয়ে লম্বা লম্বা তির্যক ছায়া সব দ্রুতগতিতে চলে যেতে থাকে। যেন আলোর উৎস সূর্যকে আড়াল করে বহু মেঘ আকাশ পার হয়ে যাচ্ছে। অভিশপ্ত, দানোয় পাওয়া আবহাওয়া.....।

হঠাৎ বিলের ওধার দিয়ে অনেক দূর থেকে একটা কালো মূর্তির মতো দৌড়ে আসে। এঁকে বেঁকে এসে চুল ঢেউ খেলিয়ে ওড়া থেকে বোঝা যায় মূর্তিটি মেয়ে। দাঁড়ানোর আগে পর্যন্ত সে কানফাটা বীভৎস চিৎকার করতে করতে আসে।...সামনে আসার পর আবার বাজের অভিশাপ ঝিলিক দিয়ে ওঠে। উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ওর মুখ। শান্ত লক্ষ্মীশ্রী সম্পন্ন গেরস্থ ঘরের বধূ, কিন্তু মুখের অর্ধেকটা পুড়ে মাংস ঝুলে বীভৎস হয়ে গেছে। গায়ে-হাতেও সাদা-কালো চকরা-বকরা দাগ। শাড়িটা আধপোড়া। ডানহাতটা মুখের কাছে ভয়ের ভঙ্গিতে তোলা]

বধূ। মাগো!...কী জ্বালা...উঃ।

[হঠাৎ কোথা থেকে সরু কিশোর কণ্ঠ জেগে ওঠে]

কণ্ঠ। তারপর—

বধূ। এ্যাঁ?

[ঘুরে তাকায় এদিক ওদিক। ফিক ফিক করে কণ্ঠটি হেসে ওঠে]

কণ্ঠ। অবাক হইলা যে?

বধূ। হ্যাঁ—[খোঁজে এখনো। ওরি পায়ের কাছে জমি থেকে উঠে বসে একটি বছর চৌদ্দ পনেরর ছেলে। পরনে নোংরা একটুকরো কাপড়। এক মাথা গোল গোল চুল লেপটে চটচটে হয়ে গেছে রক্ত মেখে। সারা মুখময় রক্তের ধারা জমাট হয়ে আছে। চোখদুটো জ্বল জ্বল করছে তার মধ্যে থেকে। ছেলেটি হাত দুটো সুঠাম ভঙ্গিতে ছুঁড়ে আড়মোড়া ভাঙে হাই তোলে! তারপর ওর দিকে চায়]

খোকা। অখনই তো আইলা না?

বধূ [মাথা ঝাঁকায় আচ্ছন্নভাবে]। হ্যাঁ।

খোকা। কেডা তুমি?

বধূ। আমি? আমি শেফালী, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীঘাট স্টেশনের।

খোকা। হঃ। তা ভাল।

বধূ। এ কোন জায়গা? তুমি কে—

খোকা। আমি তো খোক-ন, হালে এইখানেই বা-স।

বধূ [চারদিক দেখে স্বপ্নোত্থিতের মতো]। এ কোথায় এলাম আমি? একি উঃ।

খোকা। জ্বলে? বস, গায়ের জ্বালা কইম্যা যাইব অখনি।

[গায়ে হাত বুলোয়]

বধূ। কি রকম যেন লাগছে।...আমি, আমি বোধহয়....

খোকা। মইর‍্যা গিছ! বুঝনা? যে সকল লোক নিজেরে মারে তারাই এখানে আ—সে।....আগুনে পুইড়্যাছিল্যা বুঝি? আমি কিন্তু তা করি নাই।

বধূ। সেই আগুন! কেমন পোড়া বিশ্রী গন্ধ!....উঃ, ঠিক পাগল হয়ে গিয়েছিলাম....সেই সকালে। কালীঘাট জান?

খোকা। হঃ। কইলকাতাওয়ালী কালীর থান। জানি।

বধূ। তোমাদের কালিদাসবাবু কালীঘাট স্টেশনে মাস্টারের কাজ করেন।...আশি টাকা মাইনে।

খোকা। তাই নিজেরে দগ্ধাইলা?

বধূ। না।...পাঁচটি ছেলেমেয়ে, আমরা দুজনা, আর আশি টাকা...সে বুঝবেনা তুমি। এর থেকে ভিখিরি হওয়া ভাল।

খোকা [বিচিত্রভাবে]। ভিখারি?

বধূ। এতো মান রাখার বালাই তো নেই তাতে!

খোকা। আচ্ছা কইয়া লও, তাপ্পর কমুঅনে!

বধূ। ছাপোষার ঘরে কী যে বলব খোকন, কী যে জ্বালা, তা বলব....তিল তিল করে বাছারা মরছে, শুকিয়ে শুকিয়ে মরছে। মরেও না, ধুক ধুক করে।...কোলেরটির দুধ...বুকের দুধ শুকিয়ে গেছে। মেজাজ হয়েছে খিটখিটে, চিন্তা...দিনরাত জট ধরে থাকত আমার মাথায়। আমার প্রাণের মধ্যে। [ছটফট করে ওঠে]

খোকা। কি, গা জ্বালা করে আবার?

বধূ। এ্যাঁ? না। না—নেই জ্বালা নেই। সেরে গেছে। চলে গেছে। কিন্তু, কিন্তু মনে—এসব কী আসছে? কিছু ভোলা যাচ্ছে না যে!

খোকা [মাথা ঝাঁকায়]। ওই তো! ...হবেনি ....তাপ্পর?

বধূ। সকাল বেলায়, ছোটটির জন্যে ধার করা দুধ গরম করতে গিয়েছিলাম। ওরা খায়নি সেই কাল থেকে। নুটু, আমার সেজটি গো, নুটু এসে দাঁড়াল। ...নুটু আমার খেতে একটু ভালবাসে, ভালমন্দ তো জিবেও ঠেকায়নি কোনোদিন! ...এসে বলল মা! [কাঁদ কাঁদ হয়ে যায়]

খোকা। অমন কর ক্যান?

বধূ। না। [সামলে নেয়] বলল মা, খাব। আমি খাব।—মাথায় রাগ চড়ে গেল।

দিলাম বসিয়ে এক ঘা। পাজি ছেলে।....কেমন যেন করতে শুরু করে দিল। খুকি চিৎকার দিয়ে উঠল, ওমা, নুটু ক্যামন করে, ওমা,—দিকবিদিক জ্ঞান ফেললাম হারিয়ে। দুম দুম করে মেরে বের করে দিলাম সব কটাকে।....না খেয়ে শুকিয়ে মরা ছেলেগুলোকে।...কান্না পেল। দোরে ঠেস দিয়ে বসে কাঁদলাম। আচ্ছা, কেউ আছে, যে এই কান্না বুঝতে পারে?

খোকা। কেউ আছিল? ঘরটাতে?

বধূ। জানি না।...কাঁদছিলাম। কত কাঁদলাম।...নিজের ওপর ঘেন্না, হয়েছে কোনো দিন তোমার?

খোকা। না।

বধূ। ঘেন্না আর সব অন্ধকার। সামনে একটা ঘুরঘুটি আঁধার...কেরোসিনের টিন ছিল ঘরে, আর....ক্যামন করে জানি—উনুনটা জ্বলছিল, কেমন করে একটা—

খোকা। হুঁ।...জ্বইল্ল্যা?

বধূ। নেভালাম জ্বালা। দিন নেই, রাত নেই ও জ্বালা একেবারে—ঠিক করেছি, ঠিকই করেছি।

খোকা। এই কথা!...হুঁ!

বধূ। এখানেও কিন্তু জ্বলছিল। এখন নেই অবশ্য। কমে গেছে। চলে গেছে। আঃ এই শান্তি না?

খোকা। কি?

বধূ। এই দুপুর বেলা দীঘির কালো জলে চান করতে যেমন লাগে। সব জ্বালা মিটে যায়।

খোকা। এখানে?

বধূ। হ্যাঁ। [সংশয় ঢোকে কথায়] তাই এলাম তো!

খোকা। জ্বালা কইম্যা গেছে, না?

বধূ। হ্যাঁ....কি জানি!

খোকা। তোমার জ্বালা কইল্যা তো? আমার কথা শুনব? শুন।

বধূ। বল।

খোকা। ভিখারির কথা কইল্যা না? আমি ভিখারিই আছিলাম।

বধূ। সেকি! যাঃ তবে তো—

খোকা। আরে শুন জ্বলনের বেত্তান্ত।...আমার একটা মা আছিল জান? দিদিও আছিল। পাকিস্থান থেইক্যা আইছিলাম সব। ভিক্ষা কইরতাম। অরায় পায় না, আমারে দিত লোকে। হাবড়াতে লাটফরমের বগলে এক চা দোকানে বইয়া তাই কইতে আছিলাম কথাগুলান। এই কথাই। তবে এখন তো কান্দিনা তখন কান্দতাম। উপ্যাস, নিরম্বু উপ্যাস—আর মাথা ঘুইরা পইড়া যাওন। দম আটকাইয়া ধরত। বাঁচন বাঁচন কও তোমরা,—হালায় বাঁচন যে কি—। পরানের মধ্যে উদলাইয়া

উঠছিল অনেক কিছু। কান্দছিলাম আমিও। এমুনি সময় র‍্যালের গাড়ি ঝকামঙ ঝকামঙ—শিঁ—এক্কেরে দিলাম ঝাঁপ। ঘটাং ঘটাং ঘটাস...ঘ্যাঁচ....তাপ্পর এই।

বধূ। এখানে—কেমন লাগে?

খোকা। পেত্থমটায় তোমারই মতন লাগছিল।

বধূ। এখন? [ব্যগ্রভাবে।] বলনা।

খোকা [স্তব্ধ থেকে।]। মা আর দিদি। আমাদের খুব ভালবাস্‌তই, সত্যি!....খালি মাকে মনে পড়ে জান। ঘুইরা ফিরা। কত্ত ভালবাইস্‌ত কত আ-দর। অরায় কি করে? কি হইছে হাল? কে কইব আমারে? তাই কাঠখোট্টা হইছি। ওই জ্বালা, তাই এই কাঠখোট্টা।

বধূ। কাঠখোট্টা?

খোকা। হ, কাঠখোট্টা। ও ছাড়া আর টিঁকবা না।...তোমার নুটুরে কনে রাইখ্যা আইছ? অ—রায়....হাপুস নয়নে কান্দে হয়ত তোমার কচিটা। কত কষ্ট তোমারে ছাইরা। আমার যেমন মারে ছাইরা করে...না, আরো বেশি, অত টুকটুক সব—।

বধূ। থাম...আমি মনে করব না ও সমস্ত কথা। কেন করব? আমাকে তো আর দেখতে হবে না।

খোকা। মনে তাই আরো বেশি কইরা জ্বালা ধইরব। তোমারও অ'গোও।....মন থিক্যা মুর্ছা যায় না। মন ভোলে না। দাদু বলে।

বধূ। মনে পড়বে? না। পালিয়েও নিস্তার নেই!

খোকা। হ

বধূ [বুকে হাত দেয়]। কী হল?...একি হচ্ছে...হঠাৎ!

খোকা। কী?

বধূ [চেঁচিয়ে ওঠে]। আমি ফিরে যাব। ফিরে যাব আমি। আমি যাব—

খোকা। শব্দ কইরো না।...আমারও হইছিল অমন। এই হইতেছে রোগ এইখানে।

বধূ। ওরা কাঁদছে। কোথায়...পৃথিবীর মধ্যে ওরা সবাই কাঁদছে!...আমায় যেতে হবে। কেউ রুখতে পারবে না আমাকে।...কেন পুড়লাম?

খোকা। পথ নাই। যাওয়া যায় না।....আমি থাকত্যাম?

[বধূর অধর কাঁপছে। ওর দিকে অপলকে একদন্ড চেয়ে থেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। পাথরটার উপর বসে। মুখ ঢাকে। খোকা কাছে যায়। গায়ে হাত দিতে গিয়ে থামে, ঘুরে কিছুদূরে গিয়ে বসে পড়ে]

বধূ [মুখ তুলে]। খোকন।

খোকা [দৃষ্টি দূরে সন্নিবদ্ধ।] । উঁ।

বধূ। কাছে এস, এস, এসনা! [খোকা উঠে আসে] আমি কী করব বলে দাও! কে বলে দেবে?...মাগো!

খোকা। আমি বলি। উঠ। আমার সাথে চল।—উপর দিকে চাও।

বধূ। কেন?

খোকা। চাওনা! কি দ্যাখ।

বধূ [অত্যন্ত উত্তেজিত]। আকাশ লাল।...এখানে আকাশ ডগ্-ডগে লাল....এত লাল কেন?

খোকা। বহু জ্বালা জইম্যা আছে থরে থরে! দাদু তাই কয়। হুই হোথা, জলার পিছনটাতে গিয়া দাঁড়াইলে দেখা যায় লালের মাঝে শেষ আছে। সেই খানে একফালি নীল আকাশ উঁকি মারে। আমি সেইখানে গিয়া দাঁড়াই। দূরে দেখতি পাই নীলটুক পইর‍্যা আছে চুপটি কইর‍্যা, দেখি।...ওই আকাশের তলে কনে বা পিরথিমি আছে, সেইখানে সবাই থাকে; সুখে থাকে, দুঃখে থাকে। অগো ছোঁয়াচ, বুঝি হুই নীলের পথ বাইয়া ক্যামনে বা চইল্যা আসে।....কেমুন যে লাগে!

বধূ। আমি...আমিও দেখব।

খোকা। চল। হ্যাঁ, এইসব করিয়াই বিস্মরণ হইব। মনটারে কাঠখোট্টা করিয়া লইতে হইব।...তাও কি যায়?

বধূ। কী বললে?

খোকা। নাঃ, চল।

[ওরা মঞ্চের গভীর দিকে যেতে থাকে। খানিক দূরে গিয়ে বধূ দাঁড়ায়, তারপর খোকার দিকে দেখে। সেও দাঁড়িয়ে পড়েছে]

বধূ। কী, যাবে না?

খোকা। একটা কথা।

বধূ। কী?

খোকা। তোমার না,...তোমারে....আচ্ছা চল।

বধূ। কী বল?

খোকা। না। মানে,—মনে পাক খায় কথাটা। ধর তোমার তো কেউ নাই, সব আছিল! আমারও তাই। সেই কথাই।

বধূ। হ্যাঁ, তা কী বলছ?

খোকা। নাঃ।

[বলে মুখ ঘুরিয়ে দুপা এগোয়, বধূ কিছু না বলে বিভ্রান্ত হয়ে এগোতে শুরু করে। হঠাৎ খোকা চাপা গলায় ডাকে]

খোকা। মা; মাগো দেখ, অই মা। দেখ আকাশ! নীল দেখ।

বধূ [চমকে]। কী বললে?

খোকা। ই থান থে ইট্টুখানি নজরে পড়ে। দেখনা

বধূ। কী বলে ডাকলে যেন? কী একটা যেন বললে?

খোকা। অ [ঘোরে, হাসে] তোমারে মা কইতে মন কয়! মা!

বধূ [অস্ফুট ভাবে]। 'মা...[জোরে] না!

খোকা। ক্যান?

বধূ। না!

খোকা। ক্যান?

বধূ। আমি মা না। আমি মা নই। মা হতে পারি না।

খোকা। মন উদাস করে? মা!

বধূ। তবু?

[খোকন মিটমিটি হাসে। হঠাৎ ছুটে গিয়ে কোল জাপটে ধরে—]

খোকা। মন ভারী কর ক্যান?

বধূ [ওর মাথায় হাত বুলায় তারপর তাকায় দূরে]। মরার পরেও বাঁচতে হবে, না নুটু? [খোকা অবাক ভাবে চায়। ও লজ্জিত হয়ে পড়ে]—ইয়ে খোকা।

খোকা। হ মা চল চল, নীল আকাশ পইরা আছে উদিকে।

[হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে যায় মঞ্চ ফাঁকা। দেখা যায় উঁচু ঢিবিটার ওধার থেকে একটা সাদা চুলওলা বুড়ো নির্বিকার মুখ করে এগিয়ে আসছে। ঢিবিটায় উঠে দাঁড়াতেই ওর মুখ ভাব পরির্তিত হয়ে যায়। মোহাচ্ছন্ন হয়ে গেছে যেন]

বুড়ো। ঐ যা; জানালাটা পেরিয়ে গেল যে! তিন, দুই, একতলা—রাস্তা উঠে আসছে, রাস্তা!...না না না না না না, না—না না।

[উত্তেজনা কমে আসে, ঢিবির উপর বসে। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে—দুফোঁটা জল। বছর চব্বিশ পঁচিশের একটি মজুর শ্রেণীর লোক এসে উজ্জ্বল চোখে কাঁদা লক্ষ করে। বুড়ো ওকে দেখতে পায়। লজ্জায় উঠে দাঁড়িয়ে কোঁচায় খুঁট দিয়ে চোখের জল মোছে]

মজুরটি। ঠিক ন্যায় পূর্ণচন্দর!...আর কোমর বান্ধ তৈয়ার হে—।

পূর্ণ। ভোলানাথ!...ও গানটা চেঁচাবে না এখানে। মানে বোঝ কথাগুলোর?

ভোলা। কেন য়্যাঁ? আমার ইচ্ছে আমি গাইব। নাইবা তার মানে হোক!...কাঁদছিলে কেন বুড়ো? নাতির মুখটা মনে পড়ে গেছিল বুঝি?

পূর্ণ। তুমি যাও।

ভোলা। ঠিক হ্যায়।...খুব বাতিক চাগাড় দিচ্ছে আজকাল? কেন অত ভাব বলত? ভীমরতি হবে।

[খোকা আর শেফালী ঢোকে]

খোকা। আর একজন থাকে এইখানে। পিওন। কী জানি কোন কলেজে বেয়ারার কাম করত। পড়া করতি চাছিল বলি মরতি হল। ঐ যে দাদু বইসা। দাদু, এইযে মা, মানে—

পূর্ণ [না দেখে]। পরে। সব শুনব। চিন্তা করতে দাও।...আচ্ছা, আত্মানং বিদ্ধি...নিজেকে জান।....ততদিন সংসার চলে কী করে? মানে আত্মা না হয় হল। কিন্তু সে সময় সংসারে কিংকরিস্যামি? অপরের চিন্তা—

খোকা। নাতির চিন্তা কর বুঝি? ব্যামো বাড়ছে?...মা, বললাম না, দাদু বলি যারে, সেই। পোস্টঅফিসে কী বা কাম ছিল। তা মরল আকাশ বিধান্যা বাড়ি থিকা ঝাঁপান দিয়া...। দশ বারোটি বুইল্যা পুন্যি আছিল।....খুব জানে, খুব।

বধূ। সব?

খোকা। একেরে সব।

পূর্ণ [বধূকে দেখে]। কে? কে তুমি? কে আবার এলে?

বধূ। আজ্ঞে আমি শেফালী।...জ্বলে জ্বলে আর পারছিলাম না! লেখাপড়া করিনি, কিছু জানি না, তাই আগুন—

পূর্ণ। তা পুড়ে মরতে গেলে কেন?

বধূ। কি জ্বালাতেই না জ্বলছিলাম। আশি টাকা মাইনে পান উনি, পাঁচটি আমার বাচ্চা। বাঙালির ঘরে।

পূর্ণ। আ-হা, তা বলিনি। জ্বলে পুড়ে মরার পথটি নিলে কেন বাপু! অন্য কিছু করলেই পারতে।

বধূ। আমি যে কিছু জানি না। বুঝতে পারিনা। কেউ বোঝায়ওনি। কি করব?

পূর্ণ। জলে ডুবতে পারতে। বাড়ি থেকে ঝাঁপ দিতে পারতে। গাড়ি চাপা পড়তে পারতে। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একদিন—

বধূ। সত্যি! আমারও তাই মনে হত...। রাস্তায় বিকেলে ধোপভাঙা শাড়ি পরে ভদ্র হয়ে যারা বেরোয়, তার মধ্যে যে কতজন আমার মতো কী জ্বালায় গুমরে গুমরে জ্বলছে; তার খবর রাখার কেউ নেই। বাইরের হাসিটুকু দেখা যায়; ভেতরের যে কান্নার সূক্ষ্ম একটা দাগ মুখে থাকে তা কেউ দেখে না।

পূর্ণ। হুঁ হুঁ ঠিক। এই দেখনা আমি—ওসব করিনি। চারতলা বাড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি—।

বধূ। উঃ—!

পূর্ণ। সোজা—রাস্তাটা উঠে আসতে থাকল। লক্ষ্যশক্তি এত বেড়ে যায় তখন। জানলাগুলো ঝপাং ঝপাং করে সরে যাচ্ছিল। তারপর অনেকগুলো—কীসব হয়ে গেল।...আমার পাঁজরা কটা নেই, চুরমার হয়ে গেছে।

বধূ। পুড়ে মরলে কিন্তু গন্ধ হয়, জানেন। আগুনের হলকাগুলো—

খোকা। পাকাইয়া পাকাইয়া উঠে। লাচ যেন, ঠিক না?

বধূ। হ্যাঁ। আর প্রচন্ড জ্বালা। প্রথমটায় ছুটতে ইচ্ছে করে, চিৎকার করতে ইচ্ছে করে।...তারপর যখন লতিয়ে লতিয়ে উঠে আসে,—কেমন শান্ত লাগে, কেমন অসাড় লাগে। অনেকদিনের অনেক কথা মনে পড়ে যায় তখন...অনেক কথা।

পূর্ণ। তোমার মনে হয়েছিল কিছু?

বধূ [সলজ্জ হাসে]। আশ্চর্য! একটা অত্যন্ত পুরোন কথা মনে পড়েছিল।

খোকা। কী মা?

বধূ। আমি যখন চার-পাঁচ বছরের, দেখতে বলে—ভারী ফুটফুটে ছিলাম তখন। আমার বাবা আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে—অন্ধকার রাতে—আমি কাঁদলে—কোলে করে পিঠ থাবড়াতে থাবড়াতে অতি মিষ্টি সুরে গান করে ঘুম পাড়াতেন। কেমন করে কোলে ধরতেন বাবা, তাঁর চওড়া বুকের মধ্যে একেবারে লেপটে যেতাম। আর সে সুর—! কথাগুলো মনে নেই, আবার যেন মনে আছেও। সব মিলিয়ে

মনে পড়ছিল।...আঁধার রাত, দুটো-একটা তারা; বাবার জড়িয়ে যাওয়া একটানা সুর,—আর ভীষণ ঘুম পাওয়া, খালি ঘুম পাওয়া...বাঁচা অবস্থায় এই আমার শেষ চিন্তা। অদ্ভুত না?

পূর্ণ। হ্যাঁ অদ্ভুত ভারী অদ্ভুত,...বস। একটা কথা শুনবে?

বধূ। বলুন।

পূর্ণ। এই দেখ ভোলাকে। কোন এক জুট মিলে কাজ করত। পাটের শোঁয়া বুকে ঢুকে যক্ষ্মা হয়ে যায়। মালিক তাড়িয়ে দেয়। দোরে দোরে ঘুরেছে। হাসপাতালে—হাসপাতালে। কোথাও একটা সিট পেলনা। তারপর...।

ভোলা। ভলভলিয়ে রক্ত উঠত মুখ থেকে।...গলায় পাথর বেঁধে দুপায়ে দড়ি বেঁধে খালের জলে ঝাঁপ দিলাম।....বুড়ো নাটক করবে, কাঁদবে। তাই আমিই বলে দিলাম। এর মধ্যে ন্যাকামির কোনো ব্যাপার নেই। ভাববারও কিছু নেই। আচ্ছা, সেলাম কর্তা, চলি—।

পূর্ণ। এখানে এসে তুমি কেমন বোধ করছ?

বধূ। আজ্ঞে?

পূর্ণ। মনের মধ্যে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছ?

বধূ। না, মোটেই না!

পূর্ণ। হুঁ। পার্থিব বন্ধন টেনে রেখেছে তোমাকে, ব্যথা দিচ্ছে। আমারও তাই।

বধূ। তবে কি কোথাও নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না?

পূর্ণ। ওকথা বোল না। হতেই হবে। কোথাও একটা থাকতেই হবে শান্তিকে।

খোকা। দাদু, তুমি যে এক দেশের কথা কইতা?

পূর্ণ। হুঁ।

বধূ। কী দেশ?

পূর্ণ। সে এক দেশ আছে। সুন্দর দেশ। তারি পথ খুঁজছি....সেখানে সব শান্তি সব তৃপ্তি। কোথাও একটা আছেই।

বধূ। কোথায় বলুন না!....আর যে পারছি না এখানে।

খোকা। কনে?

পূর্ণ। আমি জানি না।

খোকা। তাহলে নাই।

পূর্ণ। ওকথা বলতে হয় না। উপনিষদ সেই স্বপ্ন দেখেছেন প্রাচীন ভারতবর্ষ দেখেছিল; সেইকাল থেকে সব মানুষ দেখে আসছে। পথ খোঁজার আজো শেষ হয়নি, এই মাত্র...খুঁজে পেতেই হবে।...তোমরা যাও।

খোকা। ক্যান?

পূর্ণ। ভাবতে দাও আমাকে। বের করতে হবে পথ।

বধূ। আচ্ছা, দুটো কথা বলে নিয়ে আমরা যাচ্ছি।

পূর্ণ। কী বলবে?

বধূ। আমি মরলাম কেন? রেহাই পাবার জন্যে তো! তবে কেন পারছি না?
পূর্ণ। তুমিই বল।
বধূ। ছেলেগুলোকে তো ভোলা যায় না।
পূর্ণ। হুঁ। ভবিষ্যৎ চিন্তা তোমাকে এখনো ছাড়ছে না। মরণের মুহূর্তেই তুমি শেষ হয়ে যাওনি।
বধূ। তা হবে। আচ্ছা, জ্বালার হাত থেকে বাঁচার যদি—এই পথ হয়—
পূর্ণ। তোমার ছেলেরাও তো জ্বলছে, হুঁ।
বধূ। তাদেরও কী এইভাবে...উঃ।
খোকা। কী কইলি মা—রে?
বধূ। তোর মা, দিদি, আমার ছেলেগুলো, আপনার নাতি নাতনি—কী করে বাঁচব ওরা? কী করে বাঁচবে?
পূর্ণ। শুধু ওরা নয়, আরো লক্ষজন মানুষ ঠিক এররকম ভাবেই জ্বলছে। আমি নিজে দেখে এসেছি। তারাও ভাবছে, রেহাই পাবার আর কোনো পথ নেই। আমাদেরই মতো—।
বধূ। সবাইকে কোন পথ নিতে হবে বললেন?
পূর্ণ। আমাদের দেখানো পথ। আমরাই দেখিয়েছি।
বধূ। না।
পূর্ণ। না কী? জ্বালা মেটানর পথ নিজেকে শেষ করে দেওয়া, এইটাই তো বললাম আমরা পৃথিবীকে। তুমি, আমি, ভোলা, পিওন, খোকা, আমরা সবাই মিলে, জানালাম—কে আছ জ্বালা থেকে নিস্তার চাও কে আছ দগ্ধে মরা মানুষের ছেলেপুলে, নিজেকে মেরে ফেল, জীবনের শত্রু হও। আর লড়াই করতে হবে না, নিশ্চিন্ত আরাম তাহলে।
বধূ। আমার ছেলেরা কেন মরবে? ওদের মরা তো আমি চাইনি।
পূর্ণ। মিথ্যেবাদী। চাইনি কী, তাইতো চেয়েছ। আমরা পথ দেখিয়েছি, পথ শেষ হয়ে যাবার। বিনাশে সমাধা হবার। তবেই তো নির্বিকার নির্বিকল্প শান্তি।
বধূ। এ আমি চাইনি, আমায় বিশ্বাস করুন। আমি চাইনি এ। দম আটকে আসছিল, তাই পালিয়েছি। ওরা থাক; সুখে থাক, মানুষ বেঁচে থাক।
পূর্ণ। থাকবে না। মঙ্গল নেই। সব চূর্ণ হয়ে যাবে।
খোকা। যাই, আমি নীল আকাশটারে দেখিগা।
[পিওন ঢোকে বই পড়তে পড়তে]
খোকা। আরে পিওন, বই পড় অখনো?
পূর্ণ। কই, এই পিওন, শোন। আমার কি হল, যা জিজ্ঞেস করেছিলাম।
খোকা [পিওনকে]। ভাইবো না। মাঝে মাঝে অমন হয় দাদুর, তখন থাকতি হয় না কাছে। আমি ভোলাদাদার কাছে যাইগা।
পিওন। হ্যাঁ।

পূর্ণ। কথা বল!

পিওন। নিউটন বলেছেন ইচ অ্যান্ড এভরি অ্যাকশান হ্যাজ গট অ্যান ইকোয়াল অ্যান্ড অপোজিট রিঅ্যাকশান! থার্ড ল অফ মেকানিক্স। আর কোথায় যেন পড়েছিলাম,—চিন্তা বহু হয়েছে, পৃথিবীর সমস্যা নিয়ে ধ্যান বহু হয়েছে, আসলে দরকার কিন্তু পৃথিবীকে বদলানো। বুঝলেন, বদলানো!

পূর্ণ। আরে জবাব দিচ্ছ না কেন? তুমিও দেখছি ভোলা হলে।

পিওন। না। পড়লাম, অনেক। এইতো রঁলা পড়ছি, কিসস্যু হয় না। লড়াইয়ের দৃষ্টান্ত আমরা রেখে এলাম না। আমরা কাপুরুষ—।

পূর্ণ। কে বলে? কার বুকের পাটা আছে বলবে?

পিওন। তাইতো বলবে পৃথিবী। দরদ পর্যন্ত থাকবে না আমাদের উপরে।

পূর্ণ। No! we are martyrs! আমি বলছি তোমায়; তোমাদের ভাষায় আমরা শহিদ, পাথর দিয়ে দলে দলে পিষে পিষে আমাদের মারছ আর আবার আমাদেরই স্মৃতিকে ছুরি মারবে?

পিওন। যাক। ইনি বুঝি নতুন এসেছেন? আরো একটি ক্লান্ত নদী! Swinburne-এর Garden of proserpine মনে পড়ে, even the weariest river winds its way somehow to the sea.

পূর্ণ। এই যে, এই মেয়েটি আগুনে পুড়তে বাধ্য হয়েছিল, কী বলবে তুমি একে? ভিতু?

বধূ। কিন্তু বাবা, একটা কথা। ওরা মরবে, আমি কিন্তু চাইনি। ওরা ভাল থাকবে, আমি শেষ হয়ে যাই ক্ষতি নেই, এইতো ভেবেছিলাম।

পূর্ণ। তাই কি হল? উল্টোটাই হল না?

পিওন। কারা মরবে?

পূর্ণ। আমাদের উত্তরপুরুষ। যারা বেঁচে আছে। যারা জ্বালায় জ্বলছে।

পিওন। হুঁঃ। তাদের মনের মধ্যে ঠিক এই কথাই পাক খাচ্ছে, আমি জানি। ঠিক এখনই দেশের কতটা মানুষ ভাবছে, জ্বালা মেটানোর এই-ই পথ, ভাবুনতো! অদ্ভুত লাগবে ভাবতে। কত জায়গায় কত লোক বসে ভাবছে। আর আমরা অনেক খেটে ওদের পথ দেখিয়ে এলাম।

বধূ। কী করতে পারতাম আমরা? কী—

পিওন। আগুনের মতো তেতে উঠতে পারতাম। অত্যাচার কোথায়; সেটা ধরার চেষ্টা করতাম। তারপর জানিনা। মাঝে মাঝে, বুঝলেন বাবা—Hamlet-এর কথা আমার মনে পড়ে।—Time is out of joint, oh cursed spite. That I was ever born to set it right.—সমস্ত যুগটাই বীভৎস।

বধূ। কী জানি! আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন করছে—

পিওন। জানি দিদিমণি; ও ভাবটা জানি। আমারও করেছিল তো।

বধূ। তুমি ভাই, তুমি ভাই হয়ে করেছিলে কেন? কী হয়েছিল?

পিওন। পড়তে চেয়েছিলাম বলে মরতে হল। আমাকে পড়তে দেওয়া হয়নি। প্রেসিডেন্সি কলেজে পিওনগিরি করতাম। নিজের চেষ্টায় চাড় করে ম্যাট্রিক পাশ করি, কলেজে ভর্তি হই। ওদের সইল না। আমি পৃথিবীকে জানতে চেয়েছিলাম, সমস্ত রহস্যকে জানতে চেয়েছিলাম, অদম্য ইচ্ছে ছিল—হয়ত বুঝতে পারবেন না। আচ্ছা, ভাববার চেষ্টা করুন তো! কত জ্ঞান আছে, কত জানবার জিনিস আছে। বিজ্ঞান কতবড় একটা কবিতা! চার পাশে পাক খাচ্ছে। আমার চোখ বন্ধ, পড়ার দরজা আমাকে খুলে দেওয়া হয়নি। তাইতো বলি দাদু, হঠাৎ পাতা ওল্টাচ্ছিলাম একটা চটি বইয়ের, তার কথাটা কতবড় খাঁটি। মানুষের ইতিহাস কীসের ইতিহাস? Of class struggle.

পূর্ণ। তোমার কথা আজকাল কীরকম হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। অত ভেবোনা, আর পোড়োনা। মাথা উল্টো পাল্টা হয়ে যাবে।

পিওন। উহুঁ, উল্টো পাল্টাই আছে; ঠিক করতে হবে। যখন ভাবিনা, যত পড়ার ইচ্ছে—অত লোক পৃথিবীতে আছে, যত মানুষ জানার জন্য ক্ষেপে উঠেছে, এইভাবে মরে যাবে, আমার জাত লুপ্ত হয়ে যাবে—আঃ, চূর্ণ হবে না বাধাগুলো?

পূর্ণ। তা তুমি নিজে অমনটি করলে কেন বাবাজীবন? তখন মনে ছিল না?

পিওন। বিদ্রূপ নয়, ছিল। কিন্তু অসহায় বোধ হয়েছিল, একা, এক্কেবারে একা। কি করতে পারি আমি? পিশাচরা সব আঁকড়ে আছে, শিকড় গেড়ে বসে আছে—আমি অসম্ভব দুর্বল;—

পূর্ণ। তাই পিশাচদের হাতেই পৃথিবীটাকে সমর্পণ করে এলে বাবা?

পিওন। জীবনটা বইয়ের পাতা না। গল্প পড়তে বেশ লাগে, লড়াইয়ের গল্প। কিন্তু বাস্তবিক ভাবুন তো? কী করতে পারতাম আমি?

পূর্ণ। কী করতে পারতে? কেন, ইয়ে—

পিওন। The rest is silence!

খোকা। কেডা আসে, কেডা?

বধূ। আসছে কেউ?

[বাজের ডাক গুমরে গুমরে ওঠে]

পূর্ণ। লুকিয়ে পড় সব, লুকিয়ে পড়।

খোকা। ও মা, ঘুমা,—ঘুম, ঘুম, যাঃ।

[ওরা যেখানে ছিল, সবাই মাটিতে শুয়ে পড়ে। মঞ্চ ফাঁকা হয়ে যায়। বাজের আলোয় দেখা যায় হঠাৎ নিঃস্তব্ধ হয়ে আসা মঞ্চে শুধু কুয়াশাগুলো ধীর মন্থর গতিতে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। একটা উন্মাদ কৌপিন পরে জলার ধার দিয়ে দৌড়ে এসে উঁচু ঢিবিটার উপর দাঁড়ায়। ট্রাফিক পুলিশের মতো হাত নাড়তে থাকে সে। বধূ উঠতে যায়, খোকা বাধা দেয়]

খোকা। মানুষ, মা, মানুষ।

পাগল। বাঁয়ে চল হাট্রো—এ-ঠেলা, বুড়বাক কাঁহিকা। পী—প্!!! [পূর্ণ উঠে ওর

পেছনে দাঁড়ায়] আরে কিলিয়ার কর। তোম্ চল প্রাইভেট, এদিকে!— [ঘুরতেই পূর্ণর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়] আমি পাগল, কিছু ভাববেন না ভাই।

পূর্ণ। কেন?

পাগল। কী—

পূর্ণ। কেন পাগল?

পাগল। পাগল বলে পাগল, ছাগল বল্লে ছাগলও হতাম, মাদল বল্লে মাদল। মাদল কেমন বাজে —তাক ধিনি তা, ধিনিতা তাক ধিনিতা, তাক ধিনিতা—

[সবাই ওকে ঘিরে দাঁড়ায়]

পাগল। তোমরা কে?

খোকা। আমরা যারা মইর‍্যা গেছি। তুমি তো মর নাই।

পাগল। নাঃ। আমারে কেউ মারতি পারবে না। তোমরা অবশ্য বলতি পার,—পাগল বলে মরার বাড়া—।

পিওন। তাই বলছি। [পূর্ণকে] বুঝতে পারছেন?

পূর্ণ। হুঁ।

পিওন। ওর আত্মা মরে গেছে। ওর মস্তিষ্ক মরে গেছে। ওর দেহ আছে, কিন্তু অসহ্য চাপে পড়ে ওর মন আত্মহত্যা করেছে।

পূর্ণ। আমরা মরে গেছি বলে আমাদের আত্মহত্যার পেছনের জ্বালার কথা বলতে পারি না। আর ও বেঁচেও নেই। বলতে পারবে না একটি কথাও, তাই না?

পাগল। পাইরবো। তোমরা অবশ্য বলতি পার পাগল আবার বলবে কী? কিন্তু আমি হেদোর মোড়ে রোজ বসে থাকি। আজই যাও, দেখবে দেহটা আমার ফুটপাতের ছায়ায় পড়ে এখনও ঘুমাতি আছে। দুপুর তো এখন; হেদোর রেলিংগুলো তেরছা ছায়া ফেলছে, আর সামনে চায়ের দোকানটায় পরদা ফেলে দিয়ে চেয়ারগুলো টেবিলের ওপর চাপিয়ে বেজায় ঘুম দিচ্ছে ছোঁড়াগুলো। ওরা আমায় বড্ড জ্বালায় জান? ওই ছোঁড়ার দল।

খোকা। তাতে কি জ্বালার বৃত্তান্ত বলা হইল? ওই হেদোর মোড়ে বইয়া থাকাত্?

পাগল। হল না? আমি বসে আছি, ভিক্ষে চাচ্ছি। ন্যাংটো হয়ে নোংরা হয়ে ঘুরছি। আমি হাসছি, তার মানে—কত কাঁদছি।

পিওন। তুমি এখনও আছ; এই শহরগুলোর মধ্যে এটাই তো—

বধূ। আহা বাছারে। কোথায় বাড়ি তোমার?

পাগল। জানি না, কিস্স্যু জানি না। জানলেও বলব না। কেন বলব? তাহলে আমার আপন লোকদেরও তোমরা পাগল করে দেবে!

বধূ। আহা বাছারে! এত দুঃখ কেন, এত ব্যথা কেন?

পূর্ণ। কাকে বলছ?

বধূ। সবাইকে! এত দুঃখ কেন? বলতে পারে কেউ?

পিওন। একজন পারত। সে এখন কোথায় আছে জানি না রবীন্দ্রনাথ তাই বলতেন—'তিমির রাত্রি পোহায়ে'। আর রলাঁ—I Will not rest!

[বইটা পিওন তুলে ধরে]

পূর্ণ। রলাঁর রামকৃষ্ণ আমি পড়েছি। অপূর্ব!

পিওন। শুনবেন, রলাঁ কী বলেছেন! এই যে, সব দুঃখ কষ্ট পার হবার পর তিনি বললেন,—'সুমহান শান্তি। ঘুমাও, আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক। ঘুমাও, আমার রক্তাক্ত পদতল। তোমরা অনেক খেটেছ। পথ ছিল কঠিন, পথ ছিল বিপদসঙ্কুল; কিন্তু সেসব বাধা থাকা সত্ত্বেও পথ ছিল অপরূপ। সে পথের বাঁকে বাঁকে আমার সংগ্রামের পুরো দাম আমি চুকিয়ে দিয়েছি, এবং চুকিয়ে পেয়েছি 'তারপর হব ইতিহাস।' হলাম না। [হাসে] হো—হলাম না।

খোকা। কী যে সব বকে! মা, বাবা ওদিক পানে জলার ওধারে।

বধূ। না। কিছু ভাল লাগছে না আর আমার।

[পেছন ফিরেই বসে থাকে]

খোকা। আর একটা ধাক্কা আর কী অসুখের।

পাগলা। আমার কথা শোন। খালি ভ্যাজার ভ্যাজার। আমি তাই বলি, তোমরা অবশ্য বলতি পার, পাগল আবার বলবে কী, তবু বলি; বলি, পাগল হও। দুনিয়ার সবাই পাগল হও। মাথা খারাপ করে ফেল চটপট—দেখবে কী ঠান্ডা। কী মিষ্টি। ট্রাফিক থামিয়ে থামিয়ে রাস্তায় এই কথা বলি। ওরা শোনে জান?

পূর্ণ। পাগল হলে ঠান্ডা হয়?

পাগল। ভয়ে বলব না নির্ভয়ে বলব হুজুর?

বধূ। বলনা! কেমন লাগে পাগল হলে?

পাগল। বাঁয়ে হাটো। [বধূর কাছে যায়] চুপি চুপি বলছি, টক টক লাগে!

পূর্ণ। মানে?

পাগল। ঝালনুন দিয়ে খেতে মন্দ লাগে না, সাড়ে বত্রিশ ভাজা।

[ট্রাফিক কন্ট্রোল করতে আরম্ভ করে]

পূর্ণ। ও পাগলামি করছে। আত্মহত্যা করার পরও পাগল হতে হবে নাকি? [মাথা ঝাঁকায়] ওঃ, কোনো রকমে যদি হিরণ্যবর্ণম্ পুরুষম্ আদিত্যম্-এর খোঁজ পেতাম, টিঁকে যেতাম।

পিওন। আমাদের কথাটা অমর কবির ভাষায় বলি—

Tomorrow & to-morrow & to-morrow,
creeps into this petty pace from day to
day to the last syllable of recorded
time.
And all our yesterdays have lighted fools the
way to dusty death.

পাগল। জানলে মা, মাঝে মাঝে মনে পড়ে। কালো একটা পরদা তার ওধার থেকে ফাঁকে ফাঁকে এক আধটা কথা ফুটে চলি আসে। ধুর, ধুর, ধুর তাড়াতি যাই। যায় না। তখন কাঁদি, হ্যাঁ!

বধূ। তারপর?

[খোকা বধূর পেছনে হাত ধরে দাঁড়ায় আর পাগল উসখুস করতে থাকে]

পাগল। ভাগ্যিস ভাবতে পারি না বেশিক্ষণ। ভুলে যাই আবার আর ভাবতি আমি চাইও না। মা, অসম্ভব যন্ত্রণা হয় মাথায় ওই ভাবতি গেলে। ভীষণ! তোমরা অবশ্য বলতে পার—ওকি! আইব্বাপ।

[ভোলার গান শোনা যায়। 'অব্ কোমর বান্ধ তৈয়ার হো, লাখ কোটি ভাইয়ো, হো তৈয়ার'....পাগল পালাতে গেলে খোকা ওর কোমর জড়িয়ে ধরে]

পাগল। আঃ বাঁয়ে হাটো। বুড়বাক কাঁহিকা! দেখছনা কে আইছে?

খোকা। কেডা আবার?

পাগল। ও গান যারা করে না, তাদের তুমি চেন না। ইরিব্বাপস্ ছাড় মাইরি, ভাল হচ্ছে না। পাজি গাধা বদমাস, উল্লুক—[কেঁদে ফেলে]

খোকা। আমাগো ভোলা আইতাছে।

পাগল। ভোলা—টোলা বুঝি না বাবা। ওসব মনে রাখে ওরা। এসেই কাজ করতে বলবে, খাটাতে বলবে, লড়াই করতে বলবে।

পূর্ণ। বুঝেছি, ঘাবড়িও না। ও এক অক্ষরও বোঝে না ও গানের—

[ভোলা এসে এক কোণে চলে গেল]

ভোলা। আমাকে সবাই ভাবে কাঠ-খোট্টা। খুব দরকচা মেরে গেছি। কিন্তু গলা দিয়ে একদিন বুক জ্বলে জ্বলে ওঠে রক্ত—

পাগল। জানে না মানে?

[ভোলা ওকে আর বধূকে দেখে]

পূর্ণ। না, এই ধর, তুমি যেন গাইলে—যদি ভুল ভেঙে যায় কোনোদিন—

পাগল। না, ওটা আগে গাইতাম। এখন গাই 'প্রেম নহে মোর মৃদু ফুলহার'—

পূর্ণ। একই হল। মানেটা ভেবেছ ও গানের?

পাগল। ভাবিনি। কিন্তু অনেক ভেবে দেখেছি ওসব গান কিছুতেই মানে পাইনি।

পূর্ণ। ঠিক ঐভাবেই, 'অব্ কোমর বান্ধ তৈয়ার হো' গায় ভোলা। এক অক্ষরও বোঝে না।

ভোলা। এ কে?

পূর্ণ। নয়া বাসিন্দা। এখানেই থাকবে।

পাগল। আমি না। তোমরা অবশ্য বলতে পার, এলাম কেন তবে। বেড়াতে এলাম। ফিরে গিয়ে কলকাতা শহরে ট্রাফিক কনট্রোল করতে হবে তো। দেহটা যে পড়ে আছে এখনও হেদোর ধারে।

ভোলা। সে ভাল। যাক পিওন, তোমায় যা বলছিলাম শোন। বুকজ্বালা....গলাজ্বালা,

তারপর ভলভলিয়ে রক্ত ওঠা, সবখানি যেন বোধ করছিলাম ঐখানে বসে। তুমি আমার সর্বনাশ করেছ তো! ভাবতে বলছ, চিন্তা ধরিয়ে দিয়েছ।...দেখ, একা একা অনেক ঘুরেছি। একটা গোটা বছর ধরে। কারো খারাপ করিনি। না-খাওয়া আধ-খাওয়া, রোগ ধরে গেল।...আমি কি করেছিলাম? আচ্ছা, আমার কথা ছেড়ে দাও। যারা আছে, সেই বৌ, বাবা, গৌতম, ওরা কি আমার মতো ঝুলবে? হাওয়ায় গাটা দুলিয়ে যাবে, মুখের সামনে মাছি উড়বে, ওরা—

পিওন। আমাকে বলে লাভ কী? আমিও একা।

ভোলা। আর কীই বা করতে পারতাম আমি? ডাকাতি করতে পারতাম। লুঠতরাজ লাগিয়ে দিতাম। কিছুর পরোয়া নেই আমার কিছুর ওপর দরদ ও শ্রদ্ধাও নেই,—দুহাতে লন্ডভন্ড করতে পারতাম। মনে হয়নি আগে, বুঝলে? আগে মনে হয়নি।

পূর্ণ। ঐ সমস্ত বাজে তুমি বকবে না ভোলা, ওটা কোনো সুরাহার পথ হত? এখন দেখছি তুমি মরেই ভাল হয়েছে।

পিওন। ওটাও তোমার একা করা সম্ভব ছিল না।

ভোলা। ছোরা, একটা ভাল ছোরার দাম অনেক। অবিশ্যি তোমার মনোভাব আমি বুঝতে পারব না। তুমি মরেছ চরম হতাশা নিয়ে, আমি মরেছি অভিমানে। দারুণ অভিমানে। নইলে তোমার চিন্তা এদিকে কেন—

বধূ। একটা কতা বলব? তোমরা তো অনেক পড়েছ, অনেক দেখেছ—

পিওন। কী দিদিমণি?

বধূ। আমাদের ছেলেদের কী হবে?

ভোলা। কী জানি!

বধূ। আমাদের মতো একা একা তারাও কী জ্বলে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে?

ভোলা। পিওন এখুনি আবার সেই আগুন হয়ে ওঠার কথা বলবে। এই বুড়ো, কোনো মানে হয় এর এসব কথার?

পূর্ণ। তোমারও তো কোনো মানে হয় না। আগে মানেটা বুঝে নাও ভাল করে। ওটা হচ্ছে ডাকার গান। ডাকছে—এখন কোমর বেঁধে তৈরি হও, হে আমার লাখ কোটি ইয়ে। আমরা ক্ষিধেতেও মরব না। বুঝেছ বাবাজীবন? যা তুমি করে এসেছ পৃথিবীতে। তারপরে এই গান কি তোমার মুখে শোভা পায়?

ভোলা [চিবুকে হাত বুলিয়ে]। হ্যাঁ—

খোকা। এখনকার জ্বালার কথায় আসান নাই। এক্কেরে নাই, না দাদু?—

পিওন। কে বলে দেবে? রল্যাঁর সে দেশ কোথায়, যেখানে গেলে সব পাওয়া যাবে, সব জানা যাবে—

পূর্ণ। আছে সে দেশ। যাবার পথ নেই। জানিনে পথ। আমরা যেতে পারব না।

খোকা। ই পাট্টি কাইন্দাই গেলাম।

ভোলা। হে আমার লাখ কোটি ইয়ে। হুম।

পিওন। গ্যয়টে সাহেব বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন, পাগল ছিলেন। উনি বলেছিলেন, 'In the beginning there was action!'

[পাগল হঠাৎ ডুকরে চেঁচিয়ে গেয়ে ওঠে কান্নার সুরে]

পাগল [গেয়ে ওঠে]। —আমি একলা চলেছি এই ভবে,
আমায় পথের সন্ধান কে কবে।

ভোলা [হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে]। —এই। শোনো, সবাই মাঝখানে আস।

[সবাই মাঝখানে আসে। পাগলের গান থেমে যায়]

ভোলা। শোনো, একটা কথার জবাব দাও তো?

পূর্ণ। কি? হঠাৎ আবার এরকম করতে আরম্ভ করলে কেন?

পিওন। ভোলা, তোমার আবার কি হল?

ভোলা। আমি ভাবতে আরম্ভ করেছি। আমি ভাবছি।

বধূ। তোমার চোখে ও কিসের ভাব ভাই?

ভোলা। বুঝবে, বুঝবে। এই পাগল—[পাগলকে টেনে আনে] কি গাইছিলে, গাও তো!

পাগল। তাই বল মাইরি! পিলে চমকিয়ে দিয়েছিল!....জান আমাকে না কেউ গাইতে বলে না। তোমাকে আমার বড় ভাল লেগেছে।

ভোলা [ধমক দিয়ে ওঠে]। গাও।

পাগল [গায়]। —আমি একেলা চলেছি এই ভবে—

ভোলা। বাহ্বা উস্তাদ।

পূর্ণ। বল দেখিনি বাবাজীবন। কি বলতে চাইছ? গৌরচন্দ্রিকা না হয় পরেই কোর।

ভোলা। বুড়ো, তুমি মরার কথা ভেবেছিলে কখন?

পূর্ণ। যখন আর পারছিলাম না একা বোঝা টানতে—

ভোলা। হুঁ! পিওন?

পিওন। আমার উপর অত্যাচার দেখে দারুণ অভিমানে—

ভোলা। একা গলায় দড়ি দিলে। আপনি কি করেছ দিদিমণি?

বধূ। আগুন দিয়েছি গায়ে একলা ঘরে—

ভোলা। খোকা?

খোকা। জানই তো ভোলাদা, ঝাপান মারছি রেলের তলাতে—

ভোলা। আর আমি? গলায় পাথর বেঁধে খালের জলে ঝাঁপিয়েছি একা একা ঘুরে ঘুরে—। আবার গাও দিকিনি কর্তা!

পাগল। তোমরা অবশ্যি বলতে পার পাগল আবার বলবে কি? তবু বলছি, আমায় না এত গাইতি কেউ বলেনি—

ভোলা। গাও।

পাগল। রাগ কোরনা ভাই। আমি একেলা চলেছি এই ভবে।

ভোলা। ব্যস—চুপ কর। ঐটি গোড়ায় গলদ। আমরা সবাই একলা চলেছিলাম ওই ভবে।

পিওন। ঠিক। ঠিক। এই ভোলা, তুই একটা মজুর, তুই কি করে এটা ধরে ফেল্লি? আমরা এত পড়েও—

ভোলা। জানি না। হঠাৎ মাথায় ঝিলিক দিয়ে উঠল।

পূর্ণ। ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে আসছে এখন আমার কাছে। ওই ভুলটাই আমরা করেছিলাম। জোট বাঁধা দরকার। তবে এখন আর ভেবে কি হবে?

বধূ। কেন? আমাদের ছেলেপুলেরা তো আছে পৃথিবীতে—তারা জোট বাঁধলে বাঁচবে।

ভোলা। আলবত্।

বধূ। সত্যি বাঁচবে? জ্বালা থেকে বেরুনোর পথ পাবে?

ভোলা। জরুর!

বধূ। এখানে এসে বুঝলাম কেন? আমাদের মনের খবর পাবে কি করে পৃথিবী—?

খোকা। বাঃ। পাগলা আছে ক্যান। এই পাগলা, পৃথিবীতে ফিরা যাইবা না?

পাগল। নিশ্চয়।

খোকা। খবর লইয়া যাইতে পারবা?

পাগলা। নিশ্চয়।...তবে তোমরা অবশ্য বলতি পার আমি তো আর ভাবতি পারিনে—

ভোলা। ভেবে আমরা দেব।

পিওন। সব ভেবে দেব।

পূর্ণ। তুমি তোমার দেহ দাও।

বধূ। সব জ্বালাকে জ্বালিয়ে দেবার ভার তোমার। দাও!

খোকা। পাগল ভাই!

পূর্ণ। এই বিটকেল!

পাগল। তোমরা অবশ্য বলতি—দিলাম। জ্বালা আমারও কম নয়। ব্যথা আমারও আছে। ধোঁয়াচ্ছে! জানলে ধোঁয়াচ্ছে।

ভোলা। শোনো। ওই যে নীল দেখছ, ওখান দিয়ে চলে যাও পৃথিবীতে। চলে যাও সেখানে। যেখানে আমাদের বাবা—মা—ভাই—বোন—বউ বসে আছে। জ্বালা বুকে করে বসে আছে।

পাগল। শোঁ—ঝুপ করে গিয়ে হেদোর ধারে পড়ব।....কী বলব?

বধূ। বলবে—আগুনে পুড়ে আর কেউ মরবে না—আত্মহত্যা নেই।

খোকা। বলবা—জোট বান্ধ—যা থাকে কপালে বইলা জোট বান্ধ। একা একা নয়।

পূর্ণ। বলবে—বসে আর হবে না। ছাদ থেকে লাফিও না। নড় চড়, উঠে পড়।

ভোলা। বলবে—দগ্ধে দগ্ধে আর কেন? আর কতদিন? একা লুকিয়ে কাঁদা,

আর মানুষ হয়ে মানুষের বাইরে থাকা। অত্যাচারীরা নাকচ হয়ে যাবে, তার রাস্তা তৈরি। খালি মানুষের মধ্যে এস।

পিওন। বলবে—এই গুলো বলবে। আর বলবে—কে আছ ভাল মানুষ। শোন। অনেক জ্বালা আছে, অনেক দুঃখ আছে। পৃথিবীর কোণায় কোণায় জ্বালা জমে আছে। কত জ্বালা জমে আছে। কত জ্বালা কত বুকে। সে গুলোকে এক করে জড়ো কর। জড়ো কর আর এই, ছুঁড়ে মার।

পূর্ণ। পুরাণে আছে—সেই দধীচির পাঁজরের মতো।

বধূ। আমি কত কেঁদেছি—সেই সব কান্না—জমাট বাঁধা কান্নার মতো।

খোকা। একটা কিছু কইতি হয়—এক গাদা জ্বালার মতন—

ভোলা। যাও খবর নিয়ে যাও।

পাগল। যাব?...যাচ্ছি। আমি বলব, পাগল হয়ে মিলিয়ে যেও না। বুদ্ধি ফিরে আন ভাই সব। বুদ্ধি ফিরে আন।...এককাজ করব, বুঝলে। টাফিক কন্‌টোল করব। ঠিক চৌমাথার মোড়ে, ঠিক দুপুর বেলায়, প্রত্যেকটিকে দাঁড় করিয়ে বলব—হল্ট?...এই আছে খবর। বাঁয়ে হট!

পূর্ণ। যাও চলে যাও। মরার দেশে বাঁচার খবর নিয়ে যাও।

পাগল। এই চল্লাম। ওই নীলটা আকাশেরে ফুটো করে কইলকাতা শহরের মাঝখানে গিয়ে পইড়লাম। চলরে, মনুয়া—পিঁ—ঝুক ঝুক-ঝুক-ঝুক-বাঁয়ে হট।

[দুবার ঘুরপাক খেয়ে তীর বেগে বেরিয়ে যায়। পেছনের অভিশপ্ত বাবলা গাছটায় থরথরানি শিহরণ জাগে। একবার বিবর্ণ ফ্যাকাশে বিদ্যুৎ ঝিলিক মেরে উঠে। এরা সবাই একদম পেছন ফিরে হাত নাড়ে]

খোকা। মা, মানুষ হইল মানুষ।

বধূ। রাস্তা উঠে আসছে। রাস্তা, ভীষণ সুন্দর রাস্তা। বাবু—

ভোলা [বেসুরে গেয়ে ওঠে জোরে]। অব্ কোমর বান্ধ তৈয়ার হো লাখ-কোটি ভাই ও—

[এই গানটা নেপথ্যে বহু কণ্ঠ ধরে নেয়, সুরে ভোলার গলা মিলিয়ে যায় ওদের গলার সুরের তলায়। গান চলে—অব্ কোমর বান্ধ তৈয়ার হো লাখ-কোটি ভাই-ও। হম ভুখসে মরনে বালে। ও মৌতসে ডরনেবালে, আজাদী কা ডঙ্কা বাজাও, উঠাও অগ্নিধ্বজা। লোকযুদ্ধ কি পুকার আতি হ্যায় বারম্বার হো তৈয়ার। মজদুর হোঁশিয়ার, হো কিষাণ হোঁশিয়ার, তৈয়ার। হো তৈয়ার....। ধীরে পর্দা নেমে আসে]

তেলে-জলে

কিরণ মৈত্র

চরিত্রলিপি

ধরণীধর
ভবনাথ
বিনয়
সূত্রধার

[দীঘার কোনো রেস্ট হাউসের একটা ঘর। দুদিকে দুটো চৌকি পাতা। মাঝখানে একটা টেবিল। তাতে টুকিটাকি রকমারি জিনিস-পত্তর। দেওয়ালের দুদিকে টাঙানো দড়িতে আলাদাভাবে কিছু জামা-কাপড় রাখা। দুকোণে দুটো হাঁটবার লাঠি ও ছড়ি। দুটো খাটের তলায় দুটো টিনের সুটকেস। সামনে কয়েকটা বসার মোড়া বা টুল। দুটো খাটে দুজনকে আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে একজনের কাশি ও অন্যজনের আঃ আঃ ব্যথার যন্ত্রণার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। সূত্রধার প্রবেশ করে, গান গাইতে গাইতে]

সূত্রধার। তেলে জলে মিশ খায় না
এ তো সবাই জানে,
সোনার সাথে পাথর মেলে
এ কথা কে মানে?
মিলের চেয়ে অমিল বেশি
খাঁটির চেয়ে ভেজাল বেশি
এ তো সবাই জানে,
কাজের চেয়ে কথা বেশি
কান্নার চেয়ে হাসি বেশি
এ কথাটা কে মানে?
ভাবের চেয়ে ঝগড়া বেশি
বাসের চেয়ে যাত্রী বেশি
তবু অনেক কাছাকাছি।

[একজনকে চাদর ঢাকা অবস্থাতেই কাশতে কাশতে উঠে বসতে দেখা যায়। অপর জনও—'উরে বাবা মরে গেলাম' বলে মুখে চাদর ঢাকা অবস্থাতেই উঠে বসে। আবার শুয়ে পড়ে]

সূত্রধার। এলোমেলো করে দেমা
ভরে নেই নিজের ধামা,
সে সুযোগেতে আছি;
থাক না বাবা ও সব কথা
চল যাই দীঘার রাস্তা
এই যে দুজন বন্ধু, দুদিকেতে শুয়ে,
কইবে কথা বাত, কাশিটা নিয়ে
ওদের অমিলের চেয়ে মিল যে বেশি
বিবাদ থেকে মিলন বেশি
এতো সবাই জানে,

[ওরা আবার আগের মতে উঠে বসে, আবার শুয়ে পড়ে]

হাসির নাটক, জাতের নাটক,

মজার নাটক, বাজে নাটক,
কোন কথাটা কে মানে!
কোন কথাটা কে মানে!

[সূত্রধার চলে যায়। ওরা আগের মতো কাশতে কাশতে আর্তনাদ করতে করতে উঠে বসে। মুখের চাদর সরে যেতে ওদের দেখা গেল। একজন ধরণীধর। অপর জন ভবনাথ। বয়েস ষাট-এর কাছাকাছি। ধরণীর হাঁপ কাশি আছে। ভবনাথের বাত]

ভব। ঐ রকম বার বার উঠে আর খক্ খক্ করে না কেশে চল সমুদ্রের ধারে একটু বেড়িয়ে আসি।

ধরণী। নিজেও তো কোমর ধরে বারবার উঁহ্ উঁহ্ করে উঠে বসছ আর শুয়ে পড়ছ। নিজেরও তো ওঠবার নাম নেই।

ভব। আমি তো উঠেই দাঁড়ালাম। এই বার তুমি দাঁড়াও, দেখি কত মুরোদ।

[ভবনাথ বসে পড়ে]

ধরণী। ত্রিভঙ্গ মুরারি হয়ে দাঁড়িয়ে আছ। এক্ষুণি তো আবার বসে পড়বে। তোমার কেরামতি আমি জানি।

ভব। বেশ উঠতে যাচ্ছিলাম আর অমনি তুমি বসে পড়লে!

[ধরণী শুয়ে পড়ে]

ভব। তোমার মতো ঘুম-কাতরে মানুষের সঙ্গে কোথাও বেরুনো আহাম্মুকি।

ধরণী [উঠে বসে]। তোমার মতো খিট খিটে মানুষের সঙ্গে কোথাও বেরুনো আরও আহাম্মুকি।

ভব। তুমি শুধু ঘুম কাতুরে নও, শীত কাতুরে। গতবার তোমার সঙ্গে যখন ঘাটশিলায় গিয়েছিলাম, মনে আছে—সারাটা দিন লেপ গায়ে দিয়েও ঠকঠক করে কাঁপতে।

ধরণী [উঠে দাঁড়িয়ে]। তুমি শুধু খিট খিটে নও তুমি একটা পেটুক, তার আগের বারে যখন রাঁচী গিয়েছিলাম এমন খেতে শুরু করলে যে—দুদিনে ফতুর হয়ে ধড়মড়িয়ে পালিয়ে আসতে হল।

ভব [বহু কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে]। ঘাটশিলা থেকেই ঠিক করেছিলাম আর কখনো যদি তোমার সঙ্গে কোথাও যাই।—আঃ আঃ—

ভব। এবারও তো ল্যাং ল্যাং করে আমার সঙ্গে দীঘায় এলে...ওরে বাবা...

[কোমরে হাত দিয়ে মোড়ায় বসে পড়ে]

ধরণী। আমি তো আসব নাই বলেছিলাম...তুমি তো আমার হাতে-পায়ে ধরে নিয়ে এলে।

[হাঁপাতে আর কাশতে শুরু করে মোড়ায় বসে পড়ে]

ভব। এ্যাঃ, আমি হাতে পায়ে ধরতে গেলাম। হাতে-পায়ে ধরার লোকের অভাব কিনা!

ধরণী [রেগে উঠে দাঁড়িয়ে]। দেখো ভবনাথ, মিথ্যে কথা বোল না। তুমিই তো প্রথম দীঘা যাবার কথা তুললে।

ভব। এ্যাঃ, আমি তো তোলবার কোনো জিনিস পেলাম না। তোমার বাসায় গিয়ে কথাটা তুলতে গেলাম!

[সেও উঠে দাঁড়ায়]

ধরণী। দেখো ভবনাথ, মিথ্যে কথা বোল না। বুড়ো হয়ে মরতে চললে, এখন তোমার মুখে মিথ্যে কথা মানায় না।

ভব। আর তোমার মুখেই বুঝি মানায়! তুমি ষাট বছর বয়সে এখনও কচি খোকা হয়ে আছ।

ধরণী। আমি তো ষাটে পড়লুম, আর তুমি বুঝি এখনও বিশে পা ঘসছ।

ভব। তোমার চাইতে আমি পাঁচ বছরের ছোট...তোমাকে আমি ম্যাট্রিক পাশের সার্টিফিকেটে দেখাইনি? ওরে বাবা..

ধরণী। সার্টিফিকেট সবারই বয়েস কম দেখানো থাকে।

[হাঁপাতে থাকে]

ভব। তাহলে তুমি বলতে চাও...আমি মিথ্যে কথা বলছি।

ধরণী। তাহলে তুমিও বলতে চাও...আমি মিথ্যে কথা বলছি।

ভব [কি বলবে ভেবে না পেয়ে]। আর কোনোদিন যদি তোমার সঙ্গে কোথাও বেরোই।

[খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ে]

ধরণী। কোনোদিন কেন, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমি কোথাও বেরব না। শুয়ে পড়া হল। আমিও যেন শুতে পারি না।

[ধরণীধর শুয়ে পড়ল। দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকবে]

ধরণী। শুয়ে থাকবে না তো কি করবে? হাঁটবার মুরোদ নেই। বাত তো আষ্টে পৃষ্টে।

ভব। আর তোমার কী? নিজে তো একটু হাঁটলেই হাঁপাতে আর কাশতে শুরু কর। তোমার ঐ হাঁপানির চাইতে বাত আমার অনেক ভাল। বাত তো মাঝে মাঝে চাগাড় দেয়, আর তোমার তো হেঁপো-কাশি সব সময়েই লেগে থাকে। উঃ উঃ।

ধরণী। তোমার তো ওঁ-আঁর চোটে রাতে দুচোখ এক করবার উপায় নেই।

ভব। আর তোমার ঐ কাশির আওয়াজে তো পাড়ার লোকেরা দুচোখ বুজতে পারে না।

ধরণী। হাঁপানিতে তো আর হাঁটবার কষ্ট হয় না। কিন্তু তুমি তো বাতের বেদনায় পথ চলতে চলতে দশবার কোমর ধরে বসে পড়।

[হাঁপাতে আর কাশতে শুরু করে]

ভব [উঠে বসে]। আবার তুমি মিথ্যে কথা বলছ ভবনাথ। এই তো সাতদিন এখানে আছি, কবার আমি কোমর ধরে বসে পড়েছি শুনি।

ধরণী [উঠে বসে]। এই তো কাল সকালেই কোমর ধরে বালির ওপর শুয়ে পড়েছিলে, আবার কথা বলতে এসেছ?

ভব [রেগে উঠে]। বারবার মিথ্যে কথা বোল না ধরণী, জিভ তোমার টিকটিকির ল্যাজের মতো খসে পড়বে। তুমিই তো বললে—ভবনাথ, বালির ওপর একটু শুয়ে থাকো। বাতের ব্যথায় বালির তাপ নাকি উপকার দেয়।

ধরণী [উঠে দাঁড়িয়ে] । দেখলাম তুমি হাঁটতে পারছ না—তাই বলেছিলাম।

ভব [রেগে কাছে এসে]। বাতের ব্যথায় বালির তাপ তাহলে উপকার দেয় না?

ধরণী। না।

ভব। তুমি এতদিনের বন্ধু হয়ে আমার অসুখ নিয়ে ঠাট্টা করলে?

ধরণী। ঐ যে সেদিন তুমি বললে...ধরণী একটু করে সমুদ্রের জল খাও, হাঁপকাশিতে কাজে লাগবে। আমি সরলমতি মানুষ। তোমার কথায় বিশ্বাস করে তাই খেয়ে বমি করতে করতে প্রাণ যায় আর কী।

ভব। আর রোদের মধ্যে বালিতে গড়াগড়ি দিয়ে আমার কোমরে যে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল তার কি হয়?

ধরণী। থাক, তোমার সঙ্গে আর তর্ক করতে চাই না।

[বসে পড়ে]

ভব। আমিও চাই না। ইস্কুল মাস্টাররা ভয়ঙ্কর তার্কিক হয়।

[বসে পড়ে]

ধরণী। আর পোস্টমাস্টারগুলো এঁড়ে তক্ক করে।

ভব। ইস্কুল মাস্টারির চাইতে পোস্টমাস্টারি করা অনেক ভাল।

ধরণী। তা তো হবেই। তোমাদের মতো লোকগুলিই তো পোস্টাল ডিপার্টমেন্টকে ডুবিয়ে এসেছে। নইলে আজ চিঠি পোস্ট করলে লোকে দুমাস বাদে পায়।

ভব [উঠে দাঁড়িয়ে কাছে এসে ধরণীর মুখের কাছে হাত নাড়াতে নাড়াতে]। আর তোমরা কি করেছ? তোমরা হাজার হাজার ছেলের পরকাল ঝরঝরে করেছ। নইলে আজকালকার ছেলেগুলো চোঙা প্যান্ট পরে ইয়া ঝুলপি নিয়ে হিপি সেজে বেড়ায়। ছেলে কি মেয়ে বোঝা দায়।

ধরণী। দেখো, মাস্টারদের সম্বন্ধে এ-রকম হীন মন্তব্য তুমি করবে না। শিক্ষকরাই জাতির মেরুদন্ড।

ভব। তোমার মতো শিক্ষকরাই জাতির মেরুদন্ড ভেঙে দিয়েছে। নইলে দেশের এমন হাল হয়?

ধরণী। ঐ পোস্টমাস্টারগুলোকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। নচ্ছার।

ভব। তুমি একটা ছুঁচো কেশো রুগী।

ধরণী। বেতো ঘোড়া কোথাকার?

ভব। দেখো, তুমি আমাকে বেতো বেতো বলবে না।

ধরণী। তুমি আমাকে কেশো কেশো বললে কেন?

ভব। বেশ করব, বলব।

ধরণী। আমিও বেশ করব, বলব। বেতো বেতো বেতো।

ভব। কেশো কেশো কেশো।

[দুজনেই উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। ভবনাথ তার বিছানার বালিশটা তুলে ধরে ধরণীর দিকে ছোঁড়ার জন্যে। ধরণীও তাই করে। ঘন্টা বাজে। ওরা ফ্রিজ হয়ে যায়। সূত্রধার প্রবেশ করে, নাচতে নাচতে আবৃত্তির ঢং-এ বলে। তার হাতেই ঘন্টা]

সূত্রধার। হাঁস মোরগেতে বেঁধেছে লড়াই
বেতো আর কেশোতে করিছে বড়াই।
কেবা ভাল, কেবা মন্দ, মতি বোঝা ভার,
কেবা ভাঙে মেরুদন্ড, কোথা চিঠি কার।
বিনয় আসিছে হেথা, আলাপ করিতে,
নাটক করেছে শুরু বুঝি বা জমিতে।

[ঘন্টা বাজিয়ে সূত্রধার প্রস্থান করে। ওরা দু'একবার বালিশ ছোঁড়াছুড়ি করে। বাইরে থেকে বিনয়ের কণ্ঠস্বর শোনা যায়]

বিনয়। কাকাবাবু! কাকাবাবু!!

[ওরা বিনয়ের গলা শুনে বালিশ-যুদ্ধ বন্ধ করে। বালিশগুলো বিছানায় ঠিক রেখে ওরা বিছানায় বসে পরস্পরের দিকে দেঁতো হাসি হাসতে থাকে। বিনয় বলে একটি যুবক প্রবেশ করে]

বিনয়। কি! আপনারা যে এখনও বেরোননি!

ধরণী [দেঁতো হাসি হাসে]। এই বেরোব বেরোব করছি আর কী। ভবনাথের হঠাৎ বাতের বেদনাটা বেড়ে গেল।

ভব [কোমরে হাত দিয়ে, বাতের যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে]। বুঝলে বিনয়, আমার বাতের বেদনাটা বাড়ল, আর ধরণীর হাঁপ কাশিটাও বেড়ে গেল।

[ধরণী কাশতে লাগল]

বিনয়। ও, তাহলে না বেরিয়ে আপনারা ভালই করেছেন।

ধরণী। না হে, এখন বেশ সুস্থ বোধ হচ্ছে। ভাবছি এখন আমি একাই বেরোব।

বিনয়। দুজনে এক সঙ্গেই তো রোজ বেরোন। আজ হঠাৎ—

ধরণী। আমি তো ভাবছিলাম বেরিয়ে তোমাকে ডেকে নেব। ইয়াং ছেলে একা এসেছ বেড়াতে। তোমাকে একটু সঙ্গ না দিলে কী চলে?

বিনয়। তা বটে, তবে—একি? বালিশটা এরকম ফেটে গেল কী করে?

[দুজনে অপ্রস্তুত হয় যেন]

ধরণী। তাইত! বালিশটা ফাটল কী করে? ভবনাথ এটা তো তোমার বালিশ। কি করে বালিশ মাথায় দাও, তা তো বুঝি না। চুলে ব্লেড আছে নাকি?

ভব। বালিশটা আমার নয়। তোমার!!

ধরণী। কক্ষনো না। দেখছো না ওয়াড়টার কোণে কি লেখা আছে।

ভব। তাই নাকি? ওহো, মনে পড়েছে। বুঝলে বিনয়। ব্যাপারটা কী হয়েছে জান?

বিনয়। আমি বুঝতে পেরেছি। আর বলতে হবে না।

ভব। কচু বুঝেছ। কাল হঠাৎ ভুল করে বালিশটার ওপরে ও বসে পড়েছিস, তাতেই—

ধরণী। আমি আবার কখন—

ভব। থাক গে, তক্কা-তক্কিতে কাজ নেই। আমি চললুম। সমুদ্রে নাকি আজ দুতলা সমান ঢেউ উঠেছে। একটু দেখে আসি।

[ভবনাথ বাইরের দিকে পা বাড়াল]

ধরণী। লাঠিটা হাতে নিয়ে যাও। বাতে তো তোমার পা সোজা পড়ে না।

ভব। থাক, ওটা তুমিই নিয়ে যেও। আমার দরকার নেই।

বিনয়। কাকাবাবু যখন বলছেন, নিয়েই যান।

[ধরণী লাঠিটা নিয়ে এসে ওর হাতে দেয়]

ভব। বিনয়, তুমি বললে তাই—

[প্রস্থানোদ্যত]

ধরণী। এই দেখো, এত ভুলো মন তোমার! বলি এখন তো তোমার আমার ঐ কবরেজি বটিকাটি খাওয়ার সময়—বুঝলে বিনয়, কবরেজি চিকিৎসার মতো চিকিৎসা নেই—

ভব। না, ঐ সব আমি খাব না।

ধরণী। কেন? আবার রাগলে কেন? তোমার শরীরে আবার রাগ এল কোত্থেকে!

ভব। বলি তুমি হোমিওপ্যাথি পুরিয়াটা খেয়েছ? কখন তো খাবার সময় হয়ে গেছে?

ধরণী। ওহো তাই নাকি? দাও, দাও, ইস্‌ একদম ভুলে গেছি। বুঝলে বিনয়, এই ঘন্টাখানেক ধরে নিজেদের সুখ-দুঃখের গপ্পো করতে করতে—

[দুজনে ওষুধ খায়]

বিনয়। আপনাদের আবার দুঃখ কী? সব সময়ে তো সুখেই আছেন। আজকের দিনে এমন বন্ধুত্ব দেখা যায় না।

ভব। তা যা বলেছ। সেই ছোটবেলা থেকে শুরু করে মরণের দিকে পা বাড়িয়েছি। অথচ একদিনের জন্যে নিজেদের মধ্যে এতটুকু মনোমালিন্য হল না। এটা কি কম কথা?

ধরণী। তাতো বটেই। উভয়ে রাগ করে কখনো কথা বলেছি বলে তো মনে হয় না। সবাই বলে আমরা নাকি হরিহর আত্মা।

ভব। তা যা বলেছ। তাহলে আমি চললাম।

ধরণী। এই ভাবে একা একা যাবার কোনো মানে হয়?

ভব। একা যাচ্ছি কি আর সাধে? তোমার হাঁপ-কাশিটা বেড়েছে। সমুদ্রের হাওয়া লেগে সেটা আবার বেড়ে যেতে পারে। তাই বাধ্য হয়েই একা যেতে হচ্ছে। চলি।

[ভবনাথ চলে গেল]

ধরণী। বুঝলে বিনয়, ভাবছি, আজ রাতের বাসেই বাড়ি চলে যাব। শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না। তোমার বাড়িটা যেন কোথায়?

বিনয়। আমার বাড়ি! এই কাছেই। কোলাঘাটে।

ধরণী। কোলাঘাট। বুঝলে বিনয়, কোলাঘাট বেড়ানোর আমার অনেক দিনের সাধ। তোমার সঙ্গে কদিন কোলাঘাটে বেড়িয়ে এলে হয়!

বিনয়। বেশ তো, চলুন। তবে মুস্কিল কি জানেন? ছোট বাড়ি, দুজনের থাকবার জায়গা তো—

ধরণী। আহা, দুজনে কেন? আমি তো একা যাব।

বিনয় [বিস্ময়ে]। একা যাবেন? ভবকাকা তাহলে কোথায় যাবেন?

ধরণী। কোথায় আর যাবে? এইখানেই থাকবে। এ-জায়গাটা নাকি তার খুব ভাল লেগেছে। তুমি কবে কোলাঘাটে যাচ্ছ?

বিনয়। আমি তো আজই রাত দশটার বাসে চলে যাব।

ধরণী। তাই নাকি? তাহলে তোমার সঙ্গে আমিও যাচ্ছি।

বিনয়। কিন্তু ভবকাকা—

ধরণী। আহা, ভবর ভাবনা ভব ভাববে। আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। কটায় যেন বাস ছাড়বে বললে?

বিনয়। আজ্ঞে, রাত এগারটায়—

ধরণী। এই যে বললে, রাত দশটায়।

বিনয়। আজ্ঞে হ্যাঁ, রাত দশটায়।

ধরণী। ঠিক আছে, ও তখন ঘুমিয়ে পড়বে। আমিও চুপি-সাড়ে...কি যেন বলে—হ্যাঁ,...তোমার কটেজে গিয়ে হাজির হব।

বিনয়। ভাল কথা। কিন্তু মাঝরাতে যদি ভবকাকা আপনাকে দেখতে না পান, তাহলে—

ধরণী। বেশ তো, না হয় একটা চিঠি লিখে রেখে যাব। দেখো, তুমি যেন আবার ভবর কাছে ফাঁস করে দিও না। ও আবার আমাদের পিছু নেবে—

বিনয়। না-না...সে বান্দাই আমি নই।

[ভবনাথ প্রবেশ করে]

ভব। এরই মধ্যে বলছ কি? আমি তো সমুদ্রের এ-মাথা থেকে ও-মাথা চষে ফেললাম। বুঝলে, আজ একা একা বেড়াতে কি যে ভাল লাগল।

ধরণী। তাই নাকি? যাই, আমিও তাহলে একা একা একটু বেড়িয়ে আসি। ওহে বিনয়, চল, আমার সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসবে। সন্ধেবেলায় সমুদ্রের ধারে বেড়াতে—

ভব। আহা, বিনয়ের সঙ্গে গেলে তো আর একা একা বেড়ানো হবে না।

ধরণী। না হয় দোকাই হবে। চল তো।

ভব। না, না, বিনয় যাবে না। ও থাকবে। ওর সঙ্গে আমার কথা আছে।

[ভবনাথ বিনয়কে হাত ধরে টানতে লাগল। ধরণীও বিনয়ের হাত ধরে টানতে লাগল]

ধরণী। বিনয়কে ছেড়ে দাও ভবনাথ, ওর সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

ভব। তোমার সঙ্গে যদি একটা কথা থাকে ...তাহলে, ওর সঙ্গে আমার দশটা কথা আছে।

ধরণী। তোমার সঙ্গে যদি দশটা কথা থাকে, তাহলে আমার একশোটা কথা আছে।

ভব। আমার হাজারটা আছে।

ধরণী। আমার লাখটা আছে।

[ওরা দুজনে হাত টানতে থাকে। বিনয় একবার এর দিকে, আর একবার ওর দিকে টলে পড়তে থাকে]

বিনয়। দয়া করে হাত দুটো ছাড়ুন। আমার ধড় থেকে হাত দুটো খসে পড়তে পারে।

[ওরা হাত ছেড়ে দিল]

ভব। ঠিক আছে, লটারি হোক। বিনয় চোখ বোজো। [বিনয় চোখ বুজল] ঠিক বুজেছ তো হে!

বিনয়। আজ্ঞে হ্যাঁ। শুধু আপনাদের দুজনকে ছাড়া কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

ধরণী। তাহলে তো দেখতে পাচ্ছ। আরও জোরে চোখ বোজো।

বিনয়। বুজলাম।

ধরণী [দুটো আঙুল চোখের সামনে নাড়তে নাড়তে]। বল দেখি কটা আঙুল?

বিনয়। আজ্ঞে, তিনটে।

ধরণী [ধরণীকে]। আমার এই দুটো আঙুলের মধ্যে যদি এটা বিনয় ধরে, তাহলে বিনয় তোমার সঙ্গে যাবে। আর যদি এইটা ধরে....তাহলে ও আমার সঙ্গে থাকবে। ঠিক আছে। বিনয় এবার সামনে ফেরো। এই দুটো আঙুলের মধ্যে তুমি একটা ধর।

ধরণী। ভবনাথ, তুমি ইসারা করবে না।

ভব। ইসারা আমি করলুম, না তুমি করছ।

[বিনয় একটা আঙুল ধরল]

ভব [আনন্দে]। নাও, তুমি হেরে গেলে। তুমি একা একা যাও। বিনয় আমার সঙ্গে থাকবে।

[ধরণী মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল]

ধরণী। আমি আর বেড়াতে যাব না ভাবছি। সন্ধে হয়ে গেছে। ঢেউ দেখা যাবে না।

ভব। ঢেউ না দেখো, আকাশের তারা দেখবে। যেতে তোমাকে হবেই। ইউ মাস্ট। ওয়ার্ড ইজ ওয়ার্ড।

ধরণী [নিরুপায় ভাবে]। ঠিক আছে, যাচ্ছি।

ভব। চাদরটা কে নিয়ে যাবে? ঠান্ডা হাওয়ায় হাঁপ কাশিটা বাড়লে তোমাকে কে দেখবে?

[ভবনাথ সযত্নে ওর গায়ে চাদর মুড়ি দেয়]

ভব। এবার এস।

ধরণী। চললাম। [একটু আগিয়ে, থমকে দাঁড়িয়ে] বিনয় তাহলে ঐ কথাই রইল।

[ধরণী চলে গেল।]

ভব। বস, বস....

[বিনয় মোড়ায় বসল। অপর মোড়া এনে ভব তার কাছে বসল]

ভব। ধরণী, তোমার কাছে কোন কথাটা রেখে গেল হে!

বিনয়। এ্যাঁ মানে...ঐ আজই আমি দেশে, চলে যাচ্ছি, কোলাঘাটে, তাই উনি বলছিলেন—

ভব। কি বলছিলে?

বিনয়। বলছিলেন, খানিকটা গুড় আনতে।

ভব। গুড়! বল কী? সর্বনাশ! ও কাজ কোর না। কেশো রুগীকে মিষ্টি খেতে নেই।

বিনয়। না...না...গুড় তো নয়। বলছিলেন একঝুড়ি—

ভব। আম!

বিনয়। না, আমড়া!

ভব। সর্বনাশ! আমড়া! মানে টক! হেঁপো রুগি, আমড়া খেলে তো টক করে টেঁসে যাবে।

বিনয়। ঠিক আছে, তাহলে কিছুই পাঠাব না। আমি তাহলে এখন চলি?

[উঠে দাঁড়ায়। ভবনাথ তার হাত ধরে বসিয়ে দেয়]

ভব। আহা বোস। এখন কাজের কথাটাই হয়নি। আচ্ছা বিনয়, আমি যদি তোমাদের ওখানে...মানে কোলাঘাটে...কদিন বেড়িয়ে আসি, তাহলে কেমন হয়!

বিনয়। এ্যাঁ...তাহলে...তাহলে...

ভব। কী তাহলে তাহলে করছ?

বিনয়। না—মানে, তাহলে তো খুব ভাল হয়। আমার খুব আনন্দ হয়। বেশ তো, আপনারা না হয় দুজনে কদিনের জন্যে—

ভব। না...না...ওর সঙ্গে আমি কোথাও যাব না। এই দীঘায় এসে আমার খুব শিক্ষা হয়েছে। আমি একাই যাব। তুমি তো আজ কোলাঘাট যাচ্ছ? সেদিন তো তাই বলেছিলে।

বিনয়। আজ নয়। কাল—

ভব। না, না, তুমি আজ যাবে বলেছিলে!

বিনয়। আজ্ঞে হ্যাঁ। আজ।

ভব। দেখেছ ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিলাম।

বিনয়। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভব। কটার বাস ধরবে?

বিনয়। আজ্ঞে দশটার।

ভব। দশটা! তাহলে তো ভালই হল। ঠিক ঐ দশটার সময়েই ওর নাক ডাকতে শুরু করে, তখন আমি চুপিচুপি—

বিনয়। ধরুন, যদি না ডাকে!

ভব। রোজ ডাকছে। আর আজ ডাকবে না, একি একটা কথা হল?

বিনয়। কথার কথা বলছি।

ভব। তাহলে এখুনি চল। বাস তো সব সময়েই আছে। ও আসবার আগেই আমরা চলে যাই।

বিনয়। সেটা কী ঠিক হবে? বন্ধুকে না জানিয়ে—

ভব। বন্ধু! আমি ওর বন্ধু কবে হলাম হে! তবে হ্যাঁ, সঙ্গী বলতে পার। তুমি জিনিসপত্তর নিয়ে বাস-স্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়াও। একটু আড়াল হয়ে দাঁড়াবে, যাতে ওর নজরে না পড়ে—

বিনয়। আমার মনে হয় রাত দশটার সময়ে যাওয়া ভাল। এই খাওয়া-দাওয়া করে।

ভব। আমি তো হোটেল থেকে খেয়ে এসেছি হে!...ওহো, বাতের বেদনাটা—

বিনয়। আজ্ঞে...আপনি খেলে তো আমার পেট ভরবে না।

ভব। তা বটে। তা বটে।

বিনয়। তাছাড়া আপনি যা বললেন তাই ঠিক।

ভব। আমি আবার কি বললাম?

বিনয়। ঐ যে নাক ডাকার কথা...ধরণীকাকুর নাক যখন রোজ রাত দশটায় ডাকে, তাহলে আজও নিশ্চয়ই ডাকবে। মানুষ অভ্যেসের দাস।

ভব। আমিও সেই কথা বলছি হে।

বিনয়। আমিও সেই কথা মানছি। আমি তাহলে এখন চলি।

ভব। এস—

[বিনয় প্রস্থানোদ্যত হল]

ভব। হ্যাঁ শোন, পথে যদি ঐ কেশোটার সঙ্গে তোমার দেখা হয়, সব বলে ফেল না যেন। তোমার পেট তো ক্যাস্টর অয়েলে ভরা। কোনো কথা জিরোতে পারে না।

বিনয়। সে আপনি ভাববেন না। আমার পেট থেকে যাই বেরোক, কথা বেরোবে না।

[বিনয় চলে গেল। ভবনাথ আপন মনে বলতে লাগল]

ভব। এই আমি হাতে নাক খৎ দিলাম। আর কোনোদিন ঐ কেশোটার সঙ্গে—

[ভবনাথ নিজের ডান হাতের ওপর নাক ঘষতে থাকে। ধরণী প্রবেশ করে]

ধরণী। ওকি? অমন করছ কেন হে!

ভব। এই মানে...হোটেল থেকে পোলাও মাংস খেয়ে এলাম কি না! তাই—

ধরণী। তাই তার গন্ধ শুঁকছ? কেন? জীবনে পোলাও মাংস খাওনি নাকি?

[কাশতে থাকে, বসল]

ভব [রেগে]। না খাই নি, তুমি খেয়েছ তো?

ধরণী। এই তো আমিও হোটেল থেকে পোলাও, মাছ-মাংস খেয়ে এলাম। আমি কি তোমার মতো হাত শুঁকছি?

ভব। যা শোঁকবার তা আসবার পথেই শুঁকে শুঁকে নিশ্চয় এসেছ।

ধরণী। সে কথা তো—

ভব। যাক্‌গে, তোমার সঙ্গে কথা বলা মানেই তে ঝগড়া করা—ঝগড়া করতে আমার একদম ভাল লাগে না।

ধরণী। দিনরাত আমার সঙ্গে ঝগড়া করছ, আবার বলছ...ভাল লাগে না।

ভব। ঝগড়া আমি করছি, না, তুমি করছ?

ধরণী। বেশ বাবা, আমিই করছি। হল তো! দয়া করে এখন শুতে দাও! ঘুম পাচ্ছে।

ভব। শোও না। আমি কি তোমার পায়ে পেরেক মেরে বসিয়ে রেখেছি। ঘুম শুধু তোমার পাচ্ছে না। আমারও পাচ্ছে।

ধরণী। তুমি আর ঘুমিয়েছ? তোমার শরীরে আবার ঘুম বলে কিছু আছে নাকি?

ভব। বেশ তো, দেখো আজ রাতে আমি কেমন ঘুমোই।

ধরণী। তুমিও দেখো, আজ রাতে আমি কেমন ঘুমোই।

ভব। এই আমি শুয়ে পড়লাম।

ধরণী। এই আমিও শুয়ে পড়লাম।

[দুজনে মাথায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। তবে মাঝে মাঝে মুখের চাদর সরিয়ে একে অপরকে দেখতে লাগল। সূত্রধার এসে ঘন্টা বাজাল। ওরা ফ্রিজ হল]

সূত্রধার। [কীর্তনের সুরে]

আহা, ওরা ঘুমিয়ে যে পড়েছে,
চোখ, কান খোলা রেখে
ঘুমিয়ে যে পড়েছে।
সময় যে এদিকে, টিকটিকিয়ে
চলেছে, চলেছে।
ঘুমিয়ে যে পড়েছে।
একটি ঘন্টা এমনি করে
কেটে যে গিয়েছে।
কিন্তু নাটক কি জমেছে।
ঘুমিয়ে যে পড়েছে।-

[সূত্রধার ঘন্টা বাজিয়ে চলে যায়। ওরা ফ্রিজ ভেঙে নাক ডাকা শুরু করে। একটু পরে ভবনাথের নাক ডাকা বন্ধ হয়। সে চুপিসাড়ে উঠে সুটকেশে কয়েকটি জিনিস-পত্তর পুরে শুয়ে পড়ে, আবার নাক ডাকতে শুরু করে। এবার ধরণী চুপিসাড়ে ওঠে, সেও ভবনাথের মতো দু একটা জিনিস সুটকেসে পুরে শুয়ে নাক ডাকতে শুরু করে। এই ভাবে দু তিনবার চলে। একবার ধরণী উঠতে যাবে, ভবনাথ উঠে বসল]

ভব। আহা, এই ভাবে তুমি বারবার উঠছ আর শুচ্ছ কেন?

ধরণী [উঠে দাঁড়ায়]। সে খোঁজে তোমার কি দরকার। তোমার ঘুমোনর কথা তুমি ঘুমোও। আমি এখন পায়চারী করব।

[পায়চারি করতে থাকে ও হাঁপাতে কাশতে থাকে]

ভব। আমিও পায়চারি করতে জানি।

[সে পায়চারি করতে থাকে ও মাঝে মাঝে বাতের বেদনায় আঃ উঃ করতে থাকে]

ভব। একবার করে ওঠা হচ্ছে, আর সুটকেশে জামা-কাপড় ভরা হচ্ছে। বন্ধুকে একা ফেলে পালানোর মতলব।

ধরণী। তোমারও তো একই মতলব, কোথায় যাওয়া হচ্ছিল শুনি?

ভব। তোমার-টাই আগে শুনি।

ধরণী। বিনয়ের ওখানে যাচ্ছি।

ভব। বিনয়ের ওখানে তো আমার যাওয়ার কথা।

ধরণী। তোমার সঙ্গে কথা হবার আগেই আমার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে।

ভব। তাই নাকি? তোমার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। কই? বিনয় তো আমাকে কিছু বলেনি।

ধরণী। আমাকেও তো বলেনি।

ভব। ভারী ধড়িবাজ ছেলে হে!

ধরণী। এক কাজ করা যাক। আমাদের দুজনের সঙ্গে যখন কথা হয়ে গেছে, তখন চল, আমরা দুজনেই ওর ওখানে যাই।

ভব। ভাল কথা বলেছ। এ কথা তো আগে আমার মাথায় আসেনি! দাঁড়াও, বিনয়কে ডেকে নিয়ে আসি। বাকি জিনিসপত্তরগুলো সব গুছিয়ে ফেল।—আহা, আবার কাশতে শুরু করলে কেন?

ধরণী। তুমিও তো বাতের বেদনায় কোমর ধরে আছ...আরে ঐতো...ঐতো, বিনয় যাচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে—অন্ধকারে ঠিক...হ্যাঁ, বিনয়ই তো—ও বিনয়, শোনো, শোনো।

[ভবনাথ এই সময় বাতের বেদনায় আঃ করে উঠল]

ধরণী। হেঁপো রুগী কোথাকার।

ধরণী। বেতো রুগী কোথাকার।

ভব। খবরদার বলছি—তুমি আমাকে বেতো বলবে না।

ধরণী। বেশ করব বলব। বেতো...বেতো...বেতো..

ভব। হেঁপো...হেঁপো...হেঁপো..

ধরণী। তবে রে? কোথায় গেল আমার ছড়িটা—

ভব। কোথায় গেল আমার লাঠি গাছটা...

[উভয় উভয়কে ছড়ি আর লাঠি দিয়ে ক্রমাগত শাসাতে থাকে, কাশতে থাকে, আর বাতের বেদনায় আঃ উঃ করতে থাকে সমানে। বিনয়কে আসতে দেখেই ওরা লাঠি, ছড়ি ঘোরাতে থাকে]

বিনয়। একী? কী ব্যাপার?

ধরণী। এই সময়ে, বুঝলে বিনয়, আমরা ফ্রি-হ্যান্ড এক্সারসাইজ করি।

বিনয়। ফ্রি-হ্যান্ড আর কই? হাতে তো আপনাদের লাঠি ছড়ি আছে।

ধরণী। না, মানে...আমরা বাড়িতে ডাম্বেল একসারসাইজ করি। এখানে আর ডাম্বেল কোথায় পাব! থাকগে...বোস বোস, তোমার সঙ্গে আমাদের কথা আছে।

[বিনয়কে মাঝখানে রেখে ওরা দুদিকে বসল]

ধরণী। দেখো, ভেবে দেখলাম...আমাদের দুজনের সঙ্গেই যখন তোমার ওখানে যাবার কথা হয়ে গেছে, তখন আমরা দুজনেই তোমার ওখানে যাব!

বিনয়। না মানে...দুজনকে এক সঙ্গে নিয়ে গেলে...মানে...মা আবার ভীষণ রাগী তো! তার চাইতে বরঞ্চ আপনারা একজনে চলুন। বাস ছাড়তে আর আধঘন্টা দেরি—

ধরণী। তোমার মতো ঠান্ডা মাথার ছেলের মা—কখনই রাগী হতে পারে, এ-কথা তামা-তুলসী হাতে করে বললেও...আমরা বিশ্বাস করব না।

বিনয়। মানে, আপনারা দুজনেই অসুস্থ মানুষ তো! এক সঙ্গে দুজন রুগিকে নিয়ে যাওয়া—

ধরণী। আহা, রুগি বলেই তো আমরা দুজনে একসঙ্গে যেতে চাই। জানো তো ভবর বাতের ধাত। রোজ দুঘন্টা ধরে ওকে বাতের বালিশ না করে দিলে চলে না।

ভব। আর ওর হাঁপানির ধাত, কাশতে শুরু করলে আমাকে এক ঘন্টা ধরে মাথায় হাওয়া করতে হয়।

ধরণী। তাহলে বুঝতে পারছ আমাদের দুজনের একসঙ্গে না গেলে চলে না।

বিনয় [অসহায়ভাবে]। কিন্তু কাকাবাবু, আমাদের তো ছোট্ট ঘর। দুজনের তো এক ঘরে থাকবার জায়গা হবে না। তার চাইতে বরঞ্চ একজনেই—

ভব। ছোট ঘর! কত ছোট! এর আর্ধেক।

ধরণী। তার আর্ধেক! ও আমরা ঠিক ম্যানেজ—

বিনয় [আরও অসহায়ভাবে]। না কাকাবাবু। এবার না হয় আপনারা একজন চলুন—পরের বার—

[উঠে দাঁড়ায়]

ধরণী [উঠে দাঁড়িয়ে]। শাট আপ। ইংরেজদের কাছ থেকে বুঝি ঐ ডিভাইড অ্যান্ড রুল বিদ্যেটাই শুধু শিখেছ। যাও, আমরা যাব না।

বিনয়। আজ্ঞে, বলছিলাম যে...আমার খুব ইচ্ছে আপনারা একজন—

ভব। আর একটা কথা যদি বলেছ তাহলে এই লাঠি দিয়ে—

বিনয়। কথাটা শুনুন। মানে, আমাদের অবস্থা তত ভাল নয়। অথচ আপনাদের কাছ থেকে তো আর—

ধরণী। ও, এই কথা। বস বস...

[তিনজনে আবার বসল]

ধরণী। ঠিক আছে। আমরা না হয় পেয়িং গেস্ট থাকব। এখানে তো খরচা হচ্ছিলই। সেই খরচটা না হয় তোমার ওখানেই করব। কি বল ভব?

ভব। আলবাৎ। এখানকার চাইতে না হয় বেশিই করব। তবু তো একটা নতুন জায়গা দেখা হবে।

বিনয়। না মানে...টাকার কথা বলছি না। বলছি যে আপনারা তো আবার রুটি খান না; ওদিকে কোলাঘাটে এখন ভয়ঙ্কর চালের টানাটানি—

ভব। বল কি হে। মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট-এ চাল পাওয়া যায় না?

ধরণী। চালবাজির জায়গা পাওনি!

ভব। ঠিক আছে। আমরা আর কতটুকু খাই? যে কটা চাল যোগাড় করা যাবে, আমরা না হয় দুজনে মিলে ভাগ করে খাব।

ধরণী। এখান থেকে একমণ চাল না হয় কিনেই নিয়ে যাব...তাহলেই তো হল!

বিনয়। আজ্ঞে, চাল যা হোক করে জোগাড় হয়ে যাবে। কিন্তু মাছ—আপনারা তো আবার মাছ ছাড়া ভাত খেতে পারেন না—কিন্তু কোলাঘাটের মাছগুলো এমন চালাক হয়ে গেছে যে, জেলের জালে আর ধরা দিচ্ছে না।

ভব। আরে বাবা, আমরা তো সাতদিন থাকব। মাছ না হলেও চলবে—

বিনয়। তাহলেও মাছের বদলে একটু খাঁটি ঘি, দুধ—তার চাইতে বরং আপনাদের মধ্যে যে কেউ একজন—

ভব। এতো ভারী বিপদ হল দেখছি...কোথাও একা যাইনি। তুমি বললেই যাব? যেতে যদি হয়...তাহলে দুজনে একসঙ্গেই—

ধরণী। যে কোনো একজন। ফের যদি একজন কথাটা উচ্চারণ করেছ, তাহলে এই ছড়ি দিয়ে তোমার মাথা দুখানা করব। বেরোও।

বিনয়। যাচ্ছি! তবে আপনারা যদি একজন—

ধরণী। আবার কথা! বেরোও।

[দুজনে লাঠি উঁচিয়ে মারতে যায়। বিনয় পালায়। দুজনে লাঠি ছড়ি ঘরের কোণে রাখে]

ধরণী। আমরা খুব বেঁচে গেছি। কি বল?

ভব। যা বলেছ। আমাদের একজনকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে সব সম্পত্তি নিজেদের নামে লিখিয়ে নেবার মতলব ছিল।

[দুজনে বসল]

ধরণী। আর কিছু না হোক, সঙ্গে যা কিছু আছে, সব কেড়ে-কুড়ে নিয়ে রাস্তায় বসিয়ে ছাড়ত।

ভব। আরে কোলাঘাট একটা জায়গা! শুনেছি দিনের বেলায় মশাতে লোক টেনে নিয়ে যায়।

ধরণী। ওখানকার কোলাব্যাঙের ক্যাঁকড় ক্যাঁকড়ের জ্বালায় লোকে নাকি দিনে-রাতে ঘুমোতে পারে না। তোমার আমার মধ্যে অচ্ছেদ্যবন্ধন, তা কি কেউ ছিন্ন করতে পারে! এস একটু কোলাকুলি করি।

[উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হল]

ভব [আলিঙ্গন ছাড়িয়া বসতে বসতে]। যাই বল ধরণী, আমাকে ছেড়ে বিনয়ের সঙ্গে তোমার একার যাবার কথা ভাবা উচিত হয়নি।

ধরণী। আমাকে ফেলে তুমিও তো যাবার মতলব করছিলে? বলি বাতের ব্যথাটা চাগাড় দিলে কে মালিশ করে দিত?

ভব। আর তোমার হাঁপ-কাশি উঠলে কে মাথায় পাখার হাওয়া করত? হেঁপো রুগী কোথাকার।

ধরণী। খবরদার, হেঁপো বলবে না। বেতো কোথাকার...

ভব। আর তুমি—হেঁপো, হেঁপো।

ধরণী। তুমি হলে—বেতো, বেতো...

[ওরা আবার বালিশ ছুঁড়তে থাকে। বিনয় প্রবেশ করে। সে একটা বালিশ লুফে নেয়]

বিনয়। কাকাবাবু! বলছিলাম যে—

ভব। আবার তুমি এসেছ—আমাদের মধ্যে ডিভিশন করতে। আজ তোমাকে আমরা—

[ওরা লাঠি, ছড়ি তুলে ধরে। বিনয় নিজের মুখের সামনে বালিশ ধরে। ঘন্টা বাজাতে বাজাতে সূত্রধার মুখে একটা পোস্টার নিয়ে ঢোকে। ওরা ফ্রিজ হয়। পোস্টারে বড় বড় অক্ষরে লেখা- তেলে জলে মিশে গেল, আমাদের নাটক শেষ হল। নাটকের কলাকুশলী ও অন্যান্য কর্মীরা সূত্রধারের পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে দর্শকদের নমস্কার জানাল]

বীজ

বাদল সরকার

চরিত্রলিপি

মেয়ে
সে
দৈত্য
দৈত্যের সঙ্গী——তিনজন
কোরাস——চারজন

[একটি মেয়ে। তিন বা চারজনের 'কোরাস'। চারজনে মিলিতভাবে গঠিত দৈত্য। একটি তরুণ—'সে']

কোরাস। ওঠ। খাও। কাজে যাও। ফিরে এস। ঘুমোও।

[প্রতিটি কথার সঙ্গে উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গি]

মেয়ে [ফিসফিস করে]। বাঁচো।

কোরাস। ওঠো। খাও। কাজে যাও। ফিরে এস। ঘুমোও।

মেয়ে। [গলা তুলে] বাঁচো। বাঁচো।

কোরাস। ওঠ। খাও। কাজে যাও। ফিরে এস। ঘুমোও।

মেয়ে। [উচ্চস্বরে] বাঁচো! বাঁচো! বাঁচো!

[দৈত্য এল]

দৈত্য। বাঁচার উদ্দেশ্য সুখ।

মেয়ে। না।

দৈত্য। বাঁচার উদ্দেশ্য শান্তি।

মেয়ে। না।

দৈত্য। বাঁচার উদ্দেশ্য আরাম।

মেয়ে। না! না! না

দৈত্য। বাঁচার উদ্দেশ্য কি তবে?

মেয়ে। বাঁচা।

[দৈত্যের অট্টহাস্য। কোরাসের যান্ত্রিক হাসি]

দৈত্য। বাঁচা? ওরা তো বেঁচে আছে।

কোরাস। আমরা তো বেঁচে আছি।

মেয়ে। না, ওরা বেঁচে নেই।

দৈত্য। ওরা ওঠে।

কোরাস। আমরা উঠি।

দৈত্য। ওরা খায়।

কোরাস। আমরা খাই।

দৈত্য। ওরা কাজে যায়।

কোরাস। আমরা কাজে যাই।

দৈত্য। ওরা ফিরে আসে।

কোরাস। আমরা ফিরে আসি।

দৈত্য। ওরা ঘুমোয়।

[প্রতি কথায় উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গি]

দৈত্য। অতএব ওরা বেঁচে আছে।

কোরাস। অতএব আমরা বেঁচে আছি।

মেয়ে। না। বাঁচা ও নয়।

কোরাস। বাঁচা তবে কি?

মেয়ে। জানা।

দৈত্য। জানলে সুখ যায়, শান্তি যায়, আরাম যায়। মৃত্যু হয়।

মেয়ে। জানা মানে বাঁচা।

দৈত্য। কে বলেছে?

মেয়ে। সে।

দৈত্য। কে?

মেয়ে। সে।

দৈত্য। সে? কে সে? কোথায় সে? কেমন সে?

মেয়ে। সে বীজ। একটা বীজ। মাটির নিচে। বাইরে আসবে। একদিন আসবে।

দৈত্য। খোঁজ তাকে। খুঁজে বার কর। নষ্ট কর তাকে। ধ্বংস কর।

[দৈত্যের সঙ্গীরা, অর্থাৎ যারা তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়ে ছিল, তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে খুঁজতে লাগল, মাটি শুঁকে শুঁকে]

সঙ্গীরা। খোঁজ। বীজ খোঁজ। নষ্ট কর। ধ্বংস কর।

মেয়ে [চাপাস্বরে]। না। তাকে নষ্ট করা যাবে না। ধ্বংস করা যাবে না। না, অসম্ভব! তাকে খুঁজে পাবে না। নষ্ট করতে পারবে না। ধ্বংস করতে পারবে না।

দৈত্য। খোঁজ! খোঁজ! নষ্ট কর! ধ্বংস কর!

সঙ্গীরা। খোঁজ! নষ্ট কর! ধ্বংস কর!

মেয়ে [ফিস ফিস করে]। লুকোও! লুকোও! লুকিয়ে থাক! বেরিও না এখন! বাইরে এস না! ওরা খুঁজছে তোমায়! ওরা নষ্ট করবে! ধ্বংস করবে!

দৈত্য [চিৎকার করে কোরাসকে]। চালিয়ে যাও! কিছু হয়নি! কিছু বদলায়নি! সব ঠিক আছে! সব ঠিক থাকবে! চালিয়ে যাও!

কোরাস। ওঠ। খাও। কাজে যাও। ফিরে এস। ঘুমোও।

[কিন্তু অঙ্গভঙ্গি সব ভুলভাল। ছন্দপতন]

দৈত্য। কি হচ্ছে? কি হচ্ছে? কি হচ্ছে? কি হচ্ছে? ওরকম নয়! ঠিক করে কর!

[কিন্তু ভুল আরো বেশি]

দৈত্য। না না না! ওরকম নয়!—ওঠ! খাও! কাজে যাও! ফিরে এস ঘুমোও!

[দৈত্যের হুকুমে ছন্দ ফিরল, কিন্তু যান্ত্রিক মৃত ছন্দ]

দৈত্য হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক হচ্ছে? ওঠো! খাও! কাজে যাও! ফিরে এস! ঘুমোও!

মেয়ে [হঠাৎ উচ্চস্বরে]। বাঁচো-ও-ও-ও!

[সবাই স্থির। স্তব্ধতা]

দৈত্য। [ঠান্ডা মিষ্টি গলায়] হ্যাঁ। বাঁচো।

[দৈত্য মেয়ের দিকে এল। মেয়ের পিছনে]

দৈত্য। হ্যাঁ। বাঁচো। বাঁচো। তুমি বেঁচে আছ?

মেয়ে। না। চেষ্টা করছি বাঁচতে।

দৈত্য। হ্যাঁ হ্যাঁ, কর। চেষ্টা কর। খুব সোজা আমি শিখিয়ে দেব।

মেয়ে। না, তুমি শেখাতে পারবে না। সে শেখাবে।

দৈত্য। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। সে শেখাবে। কিন্তু সে তো এখন নেই? মাটির নিচে।

মেয়ে। সে আসবে। বাইরে আসবে।

দৈত্য। হ্যাঁ আসবে। নিশ্চয়ই আসবে। তোমার কাছে আসবে। না? তোমার কাছে আসবে।

মেয়ে। হ্যাঁ আমার কাছে আসবে।

দৈত্য। তাকে দেখতে চাও না?

মেয়ে। না। বিপদ আছে। এখন বিপদ আছে।

দৈত্য। চাও না? বল? বল? চাও না? দেখতে চাও না? ছুঁতে চাও না? ভালবাসতে চাও না?

মেয়ে। [দুর্বল হচ্ছে] হ্যাঁ। হ্যাঁ চাই। কিন্তু এখন না। এখন না।

দৈত্য [মেয়ের কথার উপরেই] । চাও না? চাও না? চাও না?

মেয়ে। না। বিপদ আছে। এখন না।

দৈত্য [সমান ভাবে]। চাও না? চাও না?

মেয়ে [আরো দুর্বল]। হ্যাঁ। না। বিপদ—না—হ্যাঁ—এখন না—হ্যাঁ—হ্যাঁ—না—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ চাই। চাই!

দৈত্য [সম্মোহনের সুরে]। ঘুমোও। ঘুমোও তাহলে। ঘুমোও। স্বপ্ন দেখো। স্বপ্ন। সে আসবে। সে আসছে। আসছে।

মেয়ে [সম্মোহিত]। এস। এস। এস।

সঙ্গীরা। খোঁজো। বীজ খোঁজো।

দৈত্য। শ্‌ শ্‌ শ্‌ শ্‌!

মেয়ে। শুনছ-ও-ও-ও।

সে [মাটির নিচ থেকে]। শুনছি।

মেয়ে। আমার কাছে এস।

সে। এখন না।

মেয়ে। আমার কাছে এস।

সে। পরে।

মেয়ে। এখন এস।

সে। যদি ডাক, যেতে হবে। কিন্তু সময় হয়নি।

মেয়ে। একবার এস। একবার। এ—ক—বা—র।

সে [দুঃখিত স্বরে]। একবার মানে শেষবার। একবার মানে বরাবর।

মেয়ে। না, না, একবার। শুধু একবার। এস। এস। এস।

[মাটির নিচ থেকে বেরিয়ে এল 'সে'। এল মেয়ের কাছে। দৈত্যের সঙ্গীরা নড়ে চড়ে উঠল। দৈত্য ইসারায় থামিয়ে দিল তাদের। মেয়েটি ও 'সে' মিলিত হল। পূর্ণ মিলনের আভাস। তারপর—]

সে। আমি যাই।

মেয়ে [হঠাৎ]। আমার ভয় করছে।

সে [স্মিত হাস্যে]। ভয় পেও না। বাঁচো।

মেয়ে। কিন্তু ওরা তোমায় দেখতে পাবে!

সে [একই হাসি]। হ্যাঁ।

মেয়ে [ভয়ে]। তোমায় ধরে ফেলবে!

সে [একই হাসি]। হ্যাঁ।

মেয়ে [অসহ্য ভয়ে]। তোমায় মেরে ফেলবে!

সে [একই হাসি]। না।

মেয়ে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মেরে ফেলবে তোমায়।

সে। পারবে না। এখন আর মারতে পারবে না আমায়।

মেয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ মারবে! মেরে ফেলবে!

সে। না। আর নয়। আমি বাঁচব।

মেয়ে। কি করে? কি করে?

সে। তোমার মধ্যে।

দৈত্য [হুঙ্কারে]। মারো!!

[দৈত্যের সঙ্গীরা লাফিয়ে পড়ল ঘাড়ে। টেনে নিয়ে গেল]

মেয়ে [আর্ত চীৎকারে]। মেরে ফেললাম—ওকে মেরে ফেললাম আমি!

[প্রচন্ড মিলিত গর্জনে দৈত্যের সঙ্গীদের হাতে ধ্বংস হল 'সে']

মেয়ে [আর্তনাদ]। আ—আ—আ—আ—আ!

দৈত্য। চালিয়ে যাও! সব ঠিক আছে। সব ঠিক থাকবে।

কোরাস। ওঠো। খাও। কাজে যাও। ফিরে এস। ঘুমোও।

[ছন্দ আবার আগের মতো নির্ভুল। সঙ্গীরা এসে আবার মিলিত দৈত্য বানিয়েছে। মেয়েটির আর্তনাদ এখন মৃদু গোঙানি। তারপর যন্ত্রণার কাতরানি। গর্ভযন্ত্রণা]

কোরাস। ওঠো। খাও। কাজে যাও। ফিরে এস। ঘুমোও।

[আবার ছন্দপতন। আবার ভুল]

দৈত্য। কি হচ্ছে? কি হচ্ছে কি হচ্ছে কি হচ্ছে?

মেয়ে [যন্ত্রণার মধ্যে]। বাঁচো! বাঁচো! বাঁচো! বাঁচো! আমার মধ্যে বাঁচো! ওদের মধ্যে বাঁচো! সবার মধ্যে বাঁচো!

দৈত্য [প্রায় আর্তস্বরে]। কি হচ্ছে কি হচ্ছে কি হচ্ছে?

মেয়ে [যন্ত্রণা আনন্দ একসঙ্গে]। বীজ। বী—জ। সে বীজ। সে আবার বীজ। আবার। সে আবার। বীজ আবার।

কোরাস। বীজ।

দৈত্য [আর্তনাদে]। বীজ!!

[সশব্দে ভেঙে পড়ে গেল দৈত্য। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিটিয়ে পড়ল চারিদিকে]

মেয়ে। বাঁচো।

কোরাস। বাঁচো।

মেয়ে। বাঁচো।

কোরাস। বাঁচো! বাঁচো! বাঁচো!

এক পশলা বৃষ্টি

ধনঞ্জয় বৈরাগী

চরিত্রলিপি

সরমা
খোকা
প্রশান্ত
কমল
খুকি

[সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাড়াবাড়ির বাইরের ঘর। লোক এলে এখানে বসানো হয়, আবার খোকা এখানে লেখাপড়াও করে। কোণের দিকে পড়ার টেবিল আছে। খোকার বয়স বছর পনের। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ, খোকা টেবিলের কাছে চুপ করে বসে আছে। সরমা ঘরে ঢোকে, বয়স তিরিশ বছর, সাধারণ করে শাড়ি পরা]

সরমা। ফের সেই দরজা-জানালা বন্ধ করে বসে আছিস, দিন দিন কি হচ্ছিস বল তো খোকা? আটটা বাজে, ঘরে অন্তত আলো একটু ঢুকুক।

[সরমা জানালা খুলতে যায়]

খোকা [বিরক্ত স্বরে]। না, না, জানালা খুলো না।

সরমা। কেন?

খোকা। ভাল লাগছে না।

সরমা। সেই একঘেয়ে কথা—ভাল লাগছে না, ভাল লাগছে না। আজকাল তো দেখছি কিছুই তোর ভাল লাগছে না। এইটুকু বয়েস—এখন কোথায় খেলাধুলো করবে, বন্ধুদের সঙ্গে হৈ-হৈ করবে, তা নয় সারাক্ষণ মুখ বুজে ঘরের মধ্যে বসে থাকবে। এমন করলে অসুখ করবে যে—

খোকা। আমার শরীর খারাপ হলে কার কি এসে যায়?

সরমা। তার মানে?

খোকা [রেগে উঠে দাঁড়িয়ে]। তার মানে, তার মানে। অত মানে আমি জানি না। আমায় একটু একলা থাকতে দেবে?

সরমা [আহত সুরে]। বাবা তোমার খোঁজ করছিলেন, তাই—

খোকা [বিদ্রূপ করে]। তাই আমার খবর নিতে এসেছ? তবে আর কি, এবার যাও, বাবাকে গিয়ে রিপোর্ট দিয়ে এস।

সরমা। রিপোর্ট?

খোকা। হ্যাঁ, আমার জন্যে সারাদিন কি কি করেছ তার ফিরিস্তি।

সরমা [কান্না চেপে কাছে এগিয়ে এসে]। এ রকম করে কেন কথা বলিস খোকা, আমার বুঝি কষ্ট হয় না?

খোকা। তোমার আবার কষ্ট কিসের! সবাই তো তোমার বাহবা দিচ্ছে। কত ভাল মা, কি সুন্দর ব্যবহার!

সরমা। জানি না কে তোমার মনে বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে।

[সরমা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, খোকা ডাকে]

খোকা। আর শোনো, বাবাকে বলে দিও এর পর আমি হোস্টেলে থেকে পড়াশুনো করব।

সরমা। নিজের বাড়িতে জায়গা হচ্ছে না বুঝি!

খোকা। পড়াশুনো হচ্ছে না, এত বিরক্ত করলে কেউ পড়তে পারে?

সরমা। মন থাকলেই পড়াশুনো করা যায়। আমাদের তো বাড়ির কত কাজ করতে হয়েছে, তারই মধ্যে বি.এ, এম.এ. পাস করেছি।

খোকা। আমি তো আর তোমার মতো জিনিয়াস নই।

সরমা। সে কথা হচ্ছে না, তোমার বন্ধুদের কথাই ভাব না—কত জনের বাড়িতে পড়ার একটা জায়গাও নেই। বাড়ির বাজার করা থেকে শুরু করে—

খোকা। ঐটেই তো বাকি আছে, এবার চাকরবাকর ছাড়িয়ে আমাকে কাজে লাগিয়ে দাও। তা হলেই তো তুমি খুশি হও!

সরমা [রেগে]। যত রাজ্যের পাকা পাকা কথা, দিন দিন একটা বাঁদর তৈরি হচ্ছ, বাবার আশকারা পেয়েই তো মাথায় উঠেছ কিনা, আমি হলে—

খোকা। চাবুক মারতে, ঘরে বন্ধ করে রাখতে। যা খুশি তাই কর না, লোক দেখিয়ে মিথ্যে ভড়ং কর কেন?

সরমা। মিথ্যে ভড়ং, এত বড় কথা?

খোকা। তা ছাড়া কি! পিসিমাকে এ বাড়ি থেকে তাড়িয়েছ, এবার আমাকে তাড়াও।

সরমা। পিসিমাকে! তোমার পিসিমাকে আমি যেতে বলিনি।

খোকা। তবে এতদিন বাদে হঠাৎ গেলেন কেন?

সরমা। সে তোমার বাবা জানেন।

খোকা। বাবাকে তো তুমি শিখিয়েছ, উনি এসবের কি জানেন? আমার হোস্টেলে থাকার বন্দোবস্ত করে দাও, আমি আর এক দিনও এ বাড়িতে থাকতে চাই না। যদি পয়সা খরচ হবে বলে হোস্টেলে রাখতে না চাও, বলে দাও, আমি আত্মহত্যা করব।

[খোকা বাড়ির ভেতর চলে যায়। সরমা চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে জানালা খুলে দেয়। ভেতর থেকে চেঁচামেচি শোনা যায়। সরমা রাগে দুঃখে হাঁপাচ্ছে। অফিসের জামা-কাপড় পরতে পরতে প্রশান্ত বাবুর প্রবেশ। বয়েস চল্লিশের কিছু ওপরে, ভারী শরীর]

প্রশান্ত। সকাল থেকেই তোমাদের ঝগড়াঝাঁটি শুরু হয়ে গেছে? কোথায় লোকে একটু সকালবেলা ঠাকুরদেবতাদের নাম করবে [একটু থেমে] কি হল সরমা, মুখটা তোলো হাঁড়ির মতো করে আছ কেন?

সরমা। আর রসিকতা করতে হবে না, আমি যে কি জ্বালায় মরছি! ঐটুকু দুধের ছেলে, আমায় যা নয় তাই বলবে?

প্রশান্ত। দুধের ছেলেই তো, ওর কথা গায়ে না মাখলেই হল।

সরমা। তুমি বুঝতে পারবে না, সারাদিন বাইরে বাইরে কাটাও, ঘরের খবর তো রাখ না।

প্রশান্ত। বাইরের খবর রাখব, ঘরেরও খবর রাখব, সব খবরই যদি আমি রাখব তা হলে তুমি কিসের খবর রাখবে সরমা?

সরমা। তা হলে ঘরের কথা নিয়ে মাথা ঘামাও কেন? কেন তুমি ছোড়দিকে

কাশী পাঠিয়ে দিলে? খোকা সব সময় মনে করে ওর পিসিমাকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি।

প্রশান্ত। যা সত্যি নয়, তা সে একদিন বুঝতে পারবে।

সরমা। আমি যে সব ধৈর্য হারিয়ে ফেলছি। ওর পিসি এ বাড়ি থেকে চলে যাবার পর ও যেন কি রকম খ্যাঁক-খ্যাঁকে হয়ে গেছে। আগের মতো মোটেই নেই, সারাক্ষণ আমার সঙ্গে ঝগড়া করছে।

প্রশান্ত। তালি তো আর এক হাতে বাজে না।

সরমা। তার মানে তুমি বলছ, আমিও ঝগড়া করি?

প্রশান্ত। তা বলিনি সরমা। তুমি যদি চুপ করে থাক, ও আর কতক্ষণ চেঁচাবে?

সরমা। তুমি জান না, কি বিশ্রী ধরনের কথাবার্তা আজকাল বলে। ওকে বুদ্ধি দেবার যে কত লোক হয়েছে। এখুনি কি বলছিল জান, ও আর এ বাড়িতে থাকবে না। হোস্টেলে পাঠিয়ে দিতে হবে।

প্রশান্ত। হোস্টেলে? পড়াশুনার পক্ষে অবশ্য হোস্টেল খারাপ জায়গা নয়। আমি তো হোস্টেলে থেকে পড়াশুনো করেছি।

সরমা। তুমি কলকাতায় পড়তে, বাবা মা ছিলেন বহরমপুরে। হোস্টেলে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু খোকা কোন দুঃখে নিজের বাড়ি ছেড়ে হোস্টেলে থাকতে যাবে?

প্রশান্ত। একটাই ভাববার কথা, হোস্টেলে খাওয়া-দাওয়াটা খুব সুবিধের নয়। তবে তাও অভ্যেস হয়ে যায়।

সরমা। তার মানে তুমি ওকে একলা হোস্টেলে যেতে দেবে?

প্রশান্ত। যখন জিদ ধরেছে, মত না দিলে তো আরও অশান্তি।

সরমা [ঝাঁঝের সঙ্গে]। তোমার যা ইচ্ছে কর, যেমনি বাবা তেমনি ছেলে। ছেলে বলেছে বলেই তাকে হোস্টেলে পাঠিয়ে দিতে হবে! [একটু থেমে] আমারই হয়েছে সবচেয়ে জ্বালা, ছেলে ভাবছে আমিই তার পিসিকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েছি, এবার খোকা হোস্টেলে গেলে সমাজের সবাই ভাববে, আমিই বুঝি তাকে আলাদা করে দিলাম। আজ বুঝতে পারছি, সৎমা হওয়া কত দুঃখের। নিজের ছেলেমেয়ে নিয়ে তো এত অশান্তি হয় না!

প্রশান্ত। অশান্তি যে কিসে বেশি, তা কে বলতে পারে সরমা? নিজের ছেলে পরের ছেলেতে কিছু এসে-যায় না। সব কিছু নির্ভর করে মনের ওপর। তোমার মন, খোকার মন—

সরমা। কিন্তু আমি যে শাসন করতে পারি না। সব সময় ভয় হয়, পাছে ও কিছু মনে করে। পাছে নিজের মার কথা ভেবে দুঃখ পায়।

প্রশান্ত। সরমা, একটা অনেক পুরোন কথা আছে জান তো—শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে। আমার মনে হয়—

সরমা। দোহাই তোমার, আর লেকচার দিও না। আজকাল তোমার বড় বড় কথা

শুনতে শুনতে প্রায়ই সেই লাইনটার কথা মনে পড়ে যায়: Don't talk big words, they mean so little.

প্রশান্ত [হেসে]। ইংরেজি জানার এই গুণ, ঠিক দরকারের সময় জুতসই কোটেশান দিয়ে দেওয়া যায়। কি বল?

সরমা। তোমার তো সব সময় ঠাট্টা! মনে পড়ে খুকির জন্মের পর থেকে কত দিন তোমায় সাবধান করেছি। ওকে নিয়ে অত আদিখ্যেতা কোর না, তখন কথা শুনেছিলে? নাওয়া খাওয়া ভুলে খুকিকে কোলে নিয়ে নাচতে লাগলে। তখন থেকে খোকা মনে মনে কষ্ট পেয়েছে। আমি ওর মুখ দেখে বুঝতে পারতাম। আশ্চর্য! বাবা হয়েও তুমি বুঝতে না।

প্রশান্ত। বোঝবার তো দরকার ছিল না। নতুন ভাইবোন হলে দাদা দিদির মন খারাপ হয়ই। এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কি ছিল? আমি নিজেই তো ছোটবেলায় আমার ছোট ভাইকে হিংসে করতাম—

[নেপথ্যে—'মা-মণি—কমল-কাকা এসেছে, বাপি—কমল-কাকা' বলে কমলকাকাকে টানতে টানতে খুকির প্রবেশ। কমল ত্রিশ বছরের যুবক। খুকির বয়স বছর সাত হবে, খুব ছটফটে]

খুকি। দেখছ মানি, কমলকাকা কতদিন বাদে এল, আর বলছ—কেন আমি তো রোজই আসি। [কমলকে] তুমি বুঝি invisible man হয়েছ, তাই আমরা দেখতে পাই না?

কমল। ওঃ, এই সাত দিনের কথা বলছিস, এমনি একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম।

খুকি। কোথায় গিয়েছিলে, আমাদের বলনি তো—

কমল। বড্ড তাড়া ছিল কিনা, বলে যাবার সময় পেলাম কই! এই Everest-এ ঘুরে এলাম চট করে। কদিন থেকেই তেনজিং ডাকাডাকি করছিল কি না—

খুকি। উঃ, কি চালিয়াৎ, জান কদিন আগে আমাদের বলেছে ও অ্যাটলান্টিক ওশ্যানের একেবারে নিচে থেকে একটা গোল্ডেন ফিশ এনেছে। কি মিথ্যে কথা বলতে পারে!

প্রশান্ত। সত্যি কমল, তোমার খোঁজ আমার ছেলেমেয়েরা রোজ করে। ওরা বোধ হয় তোমাকে ওদের সমবয়েসী মনে করে।

কমল। আমারও তো তাই মনে হয় দাদা। বাচ্চাদের সঙ্গে যতক্ষণ থাকি বেশ লাগে। এ কদিন ফ্লুতে পড়ে গিয়েছিলাম। তাই আসতে পারিনি।

সরমা। আমিও তাই ভাবছিলাম। তুমি সেদিন বলে গেলে খোকার রোল নম্বর নিয়ে যাবে।

কমল। সেই জন্যেই তো আজ আসা বউদি। ওর রোল নম্বরটা নিয়ে যাব। প্রমথকে ফোন করেছিলাম, রেজাল্ট আজ জানা যাবে।

সরমা। খোকা তো বলছে এর পর ও হোস্টেলে থেকে পড়াশুনো করবে।

প্রশান্ত। আহা, সে কথা আবার কেন! ওটা তুমি কমলের ওপর ছেড়ে দাও।

খোকার যা বলবার ওকে ঠিক বলবে। খুকি, যাও তো মা, একবার দাদাকে ডেকে দাও।

[খুকির প্রস্থান]

প্রশান্ত। ও যদি সত্যিই যেতে চায় আমার কোন আপত্তি নেই কমল, বাড়ি থেকে হোস্টেলে পড়াশুনো ঢের ভাল হয়।

সরমা। আমার কিন্তু যথেষ্ট আপত্তি আছে কমল ঠাকুরপো। তুমি খোকাকে বোঝাও ও যেন বাড়িতে থেকেই পড়াশুনো করে। আমি জানি ও একলা একেবারে থাকতে পারবে না, বড় ছেলেমানুষ।

কমল। দেখি না ও কি বলে, হোস্টেলে যাবার কথা আগে তো শুনিনি।

সরমা। আজকেই প্রথম বলল। কিন্তু ও determined, আমি বলছি এ নিয়ে খুব হাঙ্গামা করবে। আমি বরং ভেতরেই যাই। আমাকে দেখলেই তো ওর মেজাজ খারাপ!

[সরমার প্রস্থান]

প্রশান্ত। মেয়েরা এত অল্পে অস্থির হয়ে পড়ে!

কমল। না, দাদা, এ বিষয়ে আমি একমত হতে পারলাম না। বউদি যথেষ্ট ধীরস্থির। আমি তো সব সময় ওঁর প্রশংসা করি। কিন্তু খোকা ক্রমশই problem child হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ও যে আজকাল কি বলে আমিই বুঝতে পারি না।

প্রশান্ত। তুমিও ঐ কথা বলছ কমল?

কমল। আমি বলছি দাদা। এ খুব সিরিয়াস ব্যাপার। বিশেষ করে ছেলেদের এই বয়েসটা, চোদ্দ থেকে ষোল বছর properly guided না হলে, অনেক কিছু হতে পারে। এখন যা state of mind, এ সময় মেলানকোলিয়া হয়ে গেলেও আশ্চর্য হব না।

প্রশান্ত। যতক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলে, কিছু তো বুঝতে পারি না। একেবারে normal।

কমল। তা তো হবেই, ও খুব intelligent ছেলে। তোমার আমার সামনে তো দেখাবে না। কিন্তু অন্য সময়টা brood করে। ও নিজেকে মনে করে এ পৃথিবীতে সম্পূর্ণ একা, যার মা নেই, বাবা নেই, কেউ নেই।

প্রশান্ত। একা তো আমরা সকলেই কমল, কত সময় সেই কবির কথা মনে হয় যে লিখেছিল, চাঁদের মতই ক্লান্ত মধুর একলা আমি।

কমল। তুমি যে একা থাকার কথা বলছ তার মধ্যে মাধুর্য আছে। কিন্তু খোকা তো সেদিক দিয়ে ভাবে না। তার মধ্যে রয়েছে অসহায়তার কান্না। তা সত্যিই বড় করুণ। ওর তো কোনো দোষ নেই, সবাই ওকে বুঝিয়েছে ওর সৎমা, সৎমা কখনও ভাল হয় না। সে তার বাবাকে দূরে সড়িয়ে দিচ্ছে। ও নিজেকে মনে করে abnormal, এইখানেই তো ট্র্যাজেডি।

প্রশান্ত। হুঁ, চিন্তার কথা।

[খোকার প্রবেশ]

খোকা। কমলকাকা, তুমি রোল নম্বরটা চেয়েছ, এই কাগজে লিখে দিয়েছি।

কমল। তোকে বড় শুকনো দেখাচ্ছে, শরীর খারাপ হয়নি তো রে?

খোকা। না, আজ ঘুম থেকে উঠেছি একটু দেরিতে।

প্রশান্ত। কমল, আমি তা হলে চলি ভাই। অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে।

কমল। আমি তো সন্ধেবেলা আসছিই।

প্রশান্ত। খোকা, আজ খেলা দেখতে যাবি নাকি?

প্রশান্ত। মোহনবাগান ভারসেস এরিয়ানস, এটা বরাবরই খুব ক্রিটিকাল খেলা হয়।

খোকা। না, থাক, আমি আজ বেরব না।

প্রশান্ত। কেন?

খোকা। এমনি। [ম্লান হেসে] ভাল লাগছে না।

প্রশান্ত। ও। [খোকার দিকে তাকিয়ে] আচ্ছা, আমি যাই।

[প্রস্থান]

কমল। ফুটবল খেলার এত নেশা ছিল, চলে গেল?

খোকা। চলে তো সবই যায়, কি আর থাকে?

কমল। একেবারে বড়দের মতো কথা বলছিস।

খোকা। বড় হচ্ছি যে—

কমল। তোমার বাবা বলছিল, তুমি হোস্টেলে যেতে চাইছ—

খোকা। হ্যাঁ, তাই ঠিক করেছি।

কমল। হোস্টেলে যে পড়াশুনোর খুব সুবিধে হবে মনে কোর না। ছেলেরা বড় disturb করে।

খোকা। হতে পারে।

কমল। তা ছাড়া মনে কর বাড়িতে কোনো একটা পড়া বোঝবার দরকার হলে মা বাবা বুঝিয়ে দিতে পারেন।

খোকা। ওঁদের সময় কোথায়?

কমল। কেন?

খোকা। বাবা নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, আর মার social work। সকাল থেকে উঠে সেই সবই ভাবছেন। খুকিরই পড়া দেখে দিতে পারেন না, তো আমার!

কমল। হুঁ, এর পর কোন লাইনে যাবে ভাবছ?

খোকা। ইঞ্জিনিয়ার হবার ইচ্ছে আছে। তাই সায়েন্সই পড়ব। আর্টস পড়ে কি হবে, কোনো ফিউচার নেই।

কমল। ডাক্তারি পড়তে হলে বায়োলজি নিতে হবে।

খোকা। না, ডাক্তার হব না, বরং ইঞ্জিনিয়ার হওয়া ভাল। দূরে কোথাও কাজ নেওয়া যাবে। আচ্ছা কমলকাকা, বাইরে কোথাও এখন যাওয়া যায় না?

কমল। কোথায়?

খোকা। এ দেশের বাইরে। কত ছেলেরা ইউরোপে পড়তে যায়, তাদের কি মজা! আঃ, আমার যদি অনেক টাকা থাকত, আমি ঠিক চলে যেতাম।

কমল। একলা গিয়ে থাকতে পারবে?

খোকা। এখানেও তো আমি একা।

কমল। কারুর জন্যে মন কেমন করবে না?

খোকা। কি জানি! [একটু থেমে] জান কমলকাকা, আমার বন্ধু অবিনাশ, যার কথা তোমার বলতাম না, সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে।

কমল। পালিয়ে গেছে! কেন?

খোকা। ও তো জ্যাঠামশাইয়ের কাছে থাকত, উনি বড় রাগী লোক। ওকে ভারি কষ্ট দিতেন। সব সময় বকতেন। বেচারী রোজ খেতেও পেত না। অনেক দিন সহ্য করে ছিল, শেষকালে পালিয়ে গেছে।

কমল। এখন কোথায় আছে?

খোকা। আসানসোলে একটা প্রাইভেট ফার্মে কাজ পেয়েছে। আমাদের একজন ক্লাস-ফ্রেন্ডের দাদা ওখানকার ম্যানেজার কিনা, তিনিই ওকে কাজ দিয়েছেন।

কমল। বেচারী! এইটুকু বয়েসে চাকরি করা—

খোকা। সে কিন্তু খুব খুশি। কালই আমি তার একটা চিঠি পেয়েছি, কি সুন্দর লিখেছে শোন,—[চিঠি পড়ে] "এই মাত্র অফিসের কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরলাম। বাইরে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে, বেয়ারাটাকে চা দিতে বলেছি, আজ আর বেড়াতে বেরব না। বই পড়ব। কেউ বিরক্ত করবার নেই। একলা, ভাবতেই যে কি আনন্দ হচ্ছে! কলকাতার জীবনটা আমার কাছে কেমন যেন দমবন্ধ করা মনে হত। প্রাণভরে নিশ্বাস নিতেই পারতাম না। তোরা ঠিক আমার অবস্থা বুঝতে পারবি না। এখানে মনে হচ্ছে নতুন দুনিয়া, কত আশা, কত আলো, কত আনন্দ! কলেজে ভর্তি হবার আগে পারিস তো একবার আসিস। দেখবি, আমার কত পরিবর্তন হয়েছে। আমি আর সেই অবিনাশ নেই। ইতি তোদের অবিনাশ।" কি সুন্দর চিঠি, না কমলকাকা?

কমল। হুঁ। ওর পক্ষে ভালই হয়েছে, যার আপনার বলতে কেউ নেই।

খোকা। কত আশা, কত আলো, কত আনন্দ!

কমল। আমি ভেতরে যাই, বউদিকে একটা কথা বলে আসি। [প্রস্থান]

[খোকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে গিয়ে বসল, একটু পরে খুকির প্রবেশ]

খুকি। পাশ করলে আমায় কি দিবি?

খোকা। কি আবার দেব?

খুকি। বাঃ, আমায় বলছিলি না? একটা ছোট কুকুরের বাচ্চা, সন্তুদের বাড়ি থেকে—

খোকা। তোর মা কুকুর পুষতে দেবে কেন?

খুকি। কেন দেবে না? সকলের বাড়িতেই তো কুকুর থাকে, আমাদের বাড়িতেই বা থাকবে না কেন? মা বারণ করলেই বা শুনছে কে?

খোকা। সন্তুকে জিজ্ঞেস করব তা হলে, কুকুরের বাচ্চাগুলো কাউকে দিয়ে দিল কিনা কে জানে!

খুকি। এখনও দুটো আছে, স্কুল থেকে ফেরার সময় রোজ দেখি।

খোকা। হ্যাঁ রে, দরজি এসেছিল কেন রে?

খুকি। বাঃ, আমার জন্মদিন আসছে না, ফ্রকের কাপড় নিয়ে গেল যে! এবার কিন্তু আমি অনেক বন্ধুদের ডাকব, জানিস দাদা, সবাই কত জিনিস দেবে।

খোকা। তুই বুঝি প্রেজেন্ট পাবার জন্য জন্মদিন করিস?

খুকি। আহা-হা, তা ছাড়া আর কিসের জন্য লোকে জন্মদিন করে? প্রেজেন্ট যদি না পাবে, তা হলে এমনি নেমতন্ন করলেই হয়। তাকে আর জন্মদিন বলা কেন?

খোকা। আমি কিন্তু ছোটবেলা থেকে কখনও জন্মদিন করিনি।

খুকি। করলেও কিছু পেতে না।

খোকা। কেন?

খুকি। তোমার তো সব ছেঁড়া শার্ট-পরা বন্ধু, তারা আবার কি প্রেজেন্ট আনবে?

খোকা [হেসে]। আমার বন্ধুদের ছেঁড়া শার্ট হলে কি হবে, তোদের স্কুলের মেয়েদের মতো গায়ে গন্ধ নেই।

খুকি [রেগে]। আহা-হা, গায়ে গন্ধ! আমার বন্ধুরা কেউ হেঁটে আসে না স্কুলে, সবাই-এর গাড়ি আছে।

খোকা। দুঃখের বিষয়, তোরই যা নেই।

খুকি। কি বোকার মতো কথা বলিস তুই? আমি তো বাসে যাই, তোর মতো হেঁটে তো আর যাই না।

খোকা [ঠাট্টা করে]। স্বীকার করলাম তোর বন্ধুদের গাড়ি আছে, কিন্তু আমার বন্ধুদের কি আছে, জানিস?

খুকি। কি?

খোকা। বাড়ি, মস্ত মস্ত বাড়ি।

খুকি [হেসে]। সে তো ভাড়া বাড়ি, কিংবা মামার বাড়ি। কেন, তোমার সেই ক্লাস-ফ্রেন্ড অবিনাশ না কি নাম, মস্ত বড় বাড়িতে থাকে, মামার বাড়ি না জ্যাঠার বাড়ি, আর গায়ে কি গন্ধ—মা গো! তুই কি করে যে বসে ওর সঙ্গে গল্প করিস—

খোকা [হঠাৎ গম্ভীর হয়ে]। আঃ, কারুর নাম করে এভাবে কথা বলতে নেই খুকি।

খুকি। কেন বলব না, একশো বার বলব।

খোকা। স্কুলে বুঝি এই শিক্ষা দিচ্ছে?

খুকি। তুমিই বা আমাদের স্কুলের মেয়েদের নামে যা-তা বলবে কেন?

খোকা। আমি কারুর নাম করে তো বলিনি।

খুকি। সে একই কথা।

খোকা। বেশ, আর বক বক করতে হবে না, ভেতরে যাও—

খুকি। না, যাব না।

খোকা। তবে চুপ করে বসে থাক, কথা বল না—

খুকি। কেন চুপ করে বসে থাকব? আমি মাকে বলে দেব তুমি আমায় এমন করে বকছ।

[খুকি টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে চিঠি তুলে নেয়]

খোকা। বেশ, বলিস না তোর মাকে, আমি ভয় করি নাকি? [চিঠিটা দেখে] চিঠিটা রেখে দাও, ওটা আমার চিঠি।

খুকি। ভারি তো পোস্ট কার্ডে লেখা—

খোকা। খুকি, চিঠি পোড় না বলছি।

খুকি। হ্যাঁ, পড়ব। [ভয়ে ভয়ে চিঠিটা পড়ে] "জীবনটা আমার কাছে কেমন যেন দমবন্ধ করা মনে হত।"

খোকা। ফের?

খুকি। "প্রাণভরে নিশ্বাস নিতেই পারতাম না।"

খোকা [এগিয়ে গিয়ে]। দিয়ে দাও বলছি—

খুকি। হেঁপো রুগি।

খোকা। দিন দিন একটা বাঁদর হচ্ছ তুমি।

[খুকি চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে, সরমার প্রবেশ]

সরমা। কি হয়েছে, কাঁদছ কেন?

খুকি। দাদা আমায় বকছে।

সরমা। কেন?

খুকি। আমি দাদার এই চিঠিটা দেখছিলাম, তাই মিছিমিছি বকছে।

সরমা। দাদার চিঠি দাদাকে দিয়ে দাও। বড়দের সঙ্গে সব সময় লাগতে যাও কেন?

খুকি। দাদাই তো আমার সঙ্গে ঝগড়া করে, খালি বকে আর তোমাদের কাছে আমার নামে মিথ্যে কথা বলে।

সরমা [খুকিকে চড় মারে]। তোমাকে একশো বার বারণ করেছি না, অমন ভাবে কথা বলবে না। যাও এখান থেকে।

[খুকির কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান]

খোকা। ও কি, ওকে মারলে কেন?

সরমা। দুষ্টুমি করলে তাকে শাসন করতে হয়।

খোকা। শুধু চড় মারলেই বুঝি শাসন হয়! ছি-ছি, নিজের মেয়েটাকে পর্যন্ত ভালবাসতে পার না! তুমি কি মা?

[খোকার দ্রুত প্রস্থান। সরমা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, একটু পরে কমলের প্রবেশ]

কমল। বউদি!

সরমা। যাচ্ছ! বিকেলে এস।

কমল। খোকাটা যেন কি রকম হয়ে গেছে।

সরমা। আমার সব অভিমান ভেঙে দিয়েছে ঠাকুরপো, সাইকোলজিতে এম.এ. পাস করে ভেবেছিলাম আমার সতীনের ছেলেকে নিশ্চয় সুখী করতে পারব। তার মায়ের অভাব আমি বুঝতে দেব না। অথচ কি হয়ে গেল!

কমল। কিন্তু আগে তো এ রকম ছিল না।

সরমা। আমার যখন বিয়ে হয় খোকার বয়স তখন দুবছর। জান তো তোমার দাদার আমি ছাত্রী ছিলাম। দেখতাম স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে মানুষটা কি ভীষণ একলা, ছেলের জন্যে ভেবে ভেবে অস্থির। আমি তখন বিয়ে করতে চাই।

কমল। সে কথা আমি জানি।

সরমা। তোমার দাদা আমাকে বারণ করেছিলেন। কিন্তু আমি শুনিনি। বলেছিলাম, এত লেখাপড়া শিখেও যদি সৎমার বদনাম কাটাতে না পারি তবে মিছেই লেখাপড়া করা। বিয়ে হল, এ বাড়িতে এসে থেকেই খোকাকে কাছে টেনে নিলাম। প্রথম প্রথম ও একটু আড়ষ্ট হয়ে থাকত, কিন্তু ক্রমশ আমাকে ছাড়া ওর দিন কাটত না।

কমল। তা তো আমরা দেখেছি, আপনি স্কুলে নিয়ে যেতেন, আবার বিকেলে ফিরিয়ে নিয়ে আসতেন, তা ছাড়া পড়া দেখা—

সরমা। উনি বলতেন, তুমি আমায় নিশ্চিন্ত করেছ সরমা, কিন্তু আস্তে আস্তে সব যেন বদলে গেল। খোকা যত বড় হতে লাগল, ওর আত্মীয়স্বজনে ওকে বোঝাল, আমি ওর সৎমা—

কমল। আপনি কি করে বুঝলেন?

সরমা। ও এসে এসে আমাকে অদ্ভুত সব প্রশ্ন করত। বুঝলাম কেউ ওকে এ সব শিখিয়েছে। ও নিজে থেকে এ ধরনের প্রশ্ন করতেই পারে না। তখন তোমার দাদাকে অনেক বার বলেছি, উনি গা দিতেন না। তারই ফলভোগ করছি এখন।

কমল। কারা ওকে বোঝাত?

সরমা। অনেকেই। ওর পিসি তো এমন করতে শুরু করল যে, এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় রইল না। আমি দিতে চাইনি, তোমার দাদাই জোর করে পাঠিয়ে দিলেন। সেই থেকে ছেলেটা একেবারে ক্ষেপে গেছে!

কমল। আশ্চর্য!

সরমা। পাছে খুকির সঙ্গে কোনো রকম তফাত ও অনুভব করে তাই মা হয়েও মেয়েটাকে দূরে দূরে রাখলাম। সব সময় পাঠিয়ে দিতাম খোকার কাছে, যাতে

ওদের ভাইবোনের মধ্যে ভালবাসাটা গড়ে ওঠে। উঠেও ছিল ঠিক, কিন্তু কি যে হয়ে গেল!

কমল। ও কিন্তু আপনাকে ভালবাসে বউদি। আমি তো দেখেছি, আপনার অসুখ হলে ও কতখানি উদবিগ্ন হয়। মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়ায়, খেতে পর্যন্ত চায় না।

সরমা। কি জানি ঠাকুরপো, ঠিক বুঝতে পারি না।

কমল। আমি দেখেছি, কিছু করতে হলে সব সময় ও ভাবে আপনি তা পছন্দ করবেন কিনা।

[নেপথ্যে খোকার চিৎকার]

খোকা। সকালবেলা আমি ডিমভাজা খাই; হতভাগা বাঁদর!

চাকর। মা বললেন ডিম পোচ করে দিতে।

খোকা। তো মাকেই দাওগে যাও, মোহনভোগ হয়নি কেন? রাত্রের ক্ষীর ছিল না? সারাক্ষণ বকর বকর করলে কি আর বাড়ির কাজ হয়। দুদিন বাদে তো হোস্টেলে যাবই। এখন থেকে না হয় হোস্টেলেই খাব।

[কথা শুনে সরমা কান্নায় ভেঙে পড়ে, কমল দ্রুত দরজার কাছে এগিয়ে যায়]

কমল। আঃ, খোকা চুপ কর।

[কমল ভেতরে চলে যায়। একটু পরে অন্য দরজা দিয়ে সরমারও প্রস্থান। আলো নিবে আসে, ক্রমে বিকেল দেখানো হয়। প্রশান্তবাবু অফিস থেকে ফিরে কোট খুলতে খুলতে সরমার সঙ্গে কথা বলছেন]

প্রশান্ত। সব ঠিক করে এলাম সরমা।

সরমা। কিসের?

প্রশান্ত। খোকা কদিন বেলাদের সঙ্গে বেড়িয়ে আসুক। ওরা পুরীতে যাচ্ছে। খুব সুন্দর বাড়ি পেয়েছে। আমার মনে হয় দিন কয়েক ঘুরে এলে মন-টন সব ভাল হয়ে যাবে।

সরমা। সে তো খুব ভাল কথা। বেলারা কবে যাচ্ছে?

প্রশান্ত। সামনের সপ্তাহে। বেলা শুনে খুব খুশি, জানই তো ও খোকাকে কি রকম ভালবাসে। ও অবশ্য বলছিল আমাদের সবাইকে যেতে—

সরমা। খোকা একলাই ঘুরে আসুক, সেইটাই ভাল হবে। দাদা যাচ্ছে শুনলে খুকির অবশ্য একটু মন খারাপ হবে।

প্রশান্ত। ও কি আর তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে?

সরমা। দুজনে চলে গেলে আমিই বা একলা থাকব কি করে?

প্রশান্ত। খোকাকে বরং ডেকেই বলি। দেখি ও কি বলে। [জোরে] খোকা, খোকা। আজকালকার ছেলে তো, আমরা যেটা বলব সেইটাই পছন্দ নয়।

সরমা। তোমার কথা ঠিকই শুনবে, আমি কিছু না বললেই হল।

[খোকার প্রবেশ]

খোকা। বাবা, আমায় ডাকছিলে?

প্রশান্ত। বেলারা পুরীতে যাচ্ছে বেড়াতে। তুমি ইচ্ছে করলে ওদের সঙ্গে ঘুরে আসতে পার।

খোকা। পুরীর সমুদ্রে—

প্রশান্ত। হ্যাঁ।

খোকা। বেলাদি, জামাইবাবু, লালটু—ওরা সবাই যাচ্ছে?

প্রশান্ত। হ্যাঁ, লালটু বলছিল—খোকাদা গেলে খুব ভাল হয়, সবাই মিলে হৈ হৈ করা যাবে।

খোকা। আমি যাব।

প্রশান্ত। ওরা বোধ হয় সোমবার রওনা হবে।

[খুকির প্রবেশ]

খোকা। কাল তা হলে আমি বেলাদিদের সঙ্গে দেখা করব।

খুকি। কোথায় যাবি রে দাদা?

খোকা। পুরী।

খুকি। সে কি, সমুদ্রে চান করতে! আমিও যাব।

সরমা। তুমি একলা কি করে যাবে?

খুকি। একলা কেন, দাদা যাচ্ছে তো, বেলাদিরাও থাকবে।

সরমা। দাদা এখন ঘুরে আসুক, তুমি পরে যাবে।

খুকি। না মা, আমি যাব। একলা আমি এখানে থাকব না।

খোকা। ও চলুক না আমার সঙ্গে। লালটুর মামাতো বোনরাও হয়ত যাবে।

খুকি। হ্যাঁ দাদাভাই, রাকা, রাধা, গেলে খুব ভাল হয়। রাকাটা তো খালি চাল মারে, আজকাল নাকি খুব সাঁতার কাটতে শিখেছে, সমুদ্রে নামলেই ধরা পড়ে যাবে, কি বড় বড় ঢেউ!

প্রশান্ত। খুকি, তুমি একা যেতে পারবে না, মা সঙ্গে না থাকলে মন কেমন করবে।

খুকি। না না, বাপি, আমি ঠিক যেতে পারব। মামার বাড়িতে আমি আর দাদা থাকি না?

প্রশান্ত। সেখানে তোমার দিদিমা থাকেন, সে অন্য কথা। সমুদ্র কি যে-সে জায়গা! কি তার গর্জন! আমি যখন ছোটবেলা গিয়েছিলাম মনে আছে রাত্রিবেলা ভয় করত।

খুকি। তা হলে আমি দাদাকেও যেতে দেব না। ও বেশ ঘুরে আসবে, আর আমি পড়ে থাকব!

সরমা। দাদা তোমার চেয়ে কত বড়, যাও এখন দুষ্টুমি কোর না। বাপি এই অফিস থেকে ফিরেছে, মুখ হাত পা ধুতে তো দাও।

খুকি। না না, আমি তোমার কথা শুনব না। আমার আর তা হলে পুরীতে যাওয়াই হবে না। তোমরা তো আগেই ঘুরে এসেছ, এখন দাদা যাবে—

সরমা। তোমার সঙ্গে আর বকর বকর করতে পারছি না বাবা, আমি চা নিয়ে আসি।

খুকি। বকর বকর কর আর নাই কর আমি বলে রাখছি, কারুর কথা শুনব না। পুরীতে আমি যাবই, যাবই, যাবই—

[সরমার পিছু পিছু খুকির প্রস্থান]

খোকা। খুকি বরং আমার সঙ্গেই চলুক।

প্রশান্ত। কেন?

খোকা। আমি না থাকলে ও সত্যিই একা পড়ে যাবে।

প্রশান্ত। আমরা তো আছি।

খোকা [অন্যমনস্ক সুরে]। মা ওকে ঠিক বুঝতে পারে না, খুকি আবদেরে হলেও ওর মনটা ভাল।

প্রশান্ত। সে আমি ভাবব এখন। তুমি কিন্তু খুব সাবধানে যাবে। বেলাদি যে রকম বলবে, ঠিক সেরকম করবে। সমুদ্রে সকলের সঙ্গে চান করতে যাবে, একলা কখনও নয়। খাওয়াদাওয়ার ওপর খুব নজর রাখবে। পুরীতে সব সী ফিশ, নোনা মাছ, খেলে পেট খারাপ করে।

খোকা। আমাকে বলতে হবে না।

প্রশান্ত। দু তিন দিন অন্তর একটা করে চিঠি দেবে, সাধারণ পোস্টকার্ডে দু লাইন চিঠি।

খোকা। বেশিদিন কি আর থাকা যাবে, রেজাল্ট বেরুচ্ছে।

প্রশান্ত। সে আমি আছি, তোমায় ভাবতে হবে না। দরকার পড়লে ডেকে পাঠাব।

[ভেতর থেকে কমলের ডাক শোনা যায়—বউদি, কই মিষ্টি খাওয়াও ছেলে পাশ করেছে]

প্রশান্ত। ঐ যে এসেছে। কমল, এঘরে এস, এই যে এ ঘরে।

[কমলের সঙ্গে সরমার হাসিমুখে প্রবেশ]

কমল। খোকা ভাল ভাবে পাশ করেছে দাদা। তাই তো বউদিকে বলছিলাম মিষ্টি খাওয়াতে।

সরমা। শুধু মিষ্টি নয় ঠাকুরপো, আজ তুমি এখানেই খেয়ে যাবে। আমি তো জানিই খোকা পাস করবে, তাই আগে থেকে তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছি।

প্রশান্ত। সরমা, তুমি সবাইকে খবর পাঠিয়ে দিও। কাল বরং একবার সুশীলদের বাড়ি যেও। ওখান থেকে ফোনে অনেককে জানিয়ে দিতে পারবে। বিশেষ করে অনুকূলদের বল, ওরা সত্যিই খুশি হবে।

খোকা। আমিও একবার অনুকূল মামার কাছে যাব।

প্রশান্ত। খোকা, তোমার কমল কাকাকে প্রণাম করলে না, উনি এই শুভসংবাদ নিয়ে এলেন!

[খোকা কমলকে প্রণাম করতে গেলে সে থামিয়ে দেয়]

কমল। বোকা ছেলে, আগে বাবা মাকে প্রণাম কর, তারপর তো কাকা।

[খোকা প্রশান্তবাবুকে প্রণাম করে, উনি কি আশীর্বাদ করেন শোনা যায় না। তারপর কমলকে প্রণাম করে]

কমল। জীবনের সব পরীক্ষায় এমনি হাসিমুখে পাস কর। আমরাও তাহলে খুব আনন্দ করে লুচি পোলাও খাব।

[খোকা সরমার দিকে যাবার আগেই খুকি ঢুকে চেঁচামেচি করে]

খুকি। দাদা, কই, আমার কুকুর দে।

প্রশান্ত ও কমল [বিস্ময়ে]। কুকুর!

খুকি। হ্যাঁ, দাদা বলেছিল পাশ করলে একটা কুকুর প্রেজেন্ট করবে। সন্তুদের কুকুরটার অনেকগুলো ছানা হয়েছে যে।

খোকা। কালকে একটা এনে দেব।

খুকি। সেই সঙ্গে একটা ভাল বকলস আনবে, আর একটা চামড়ার চেন। আমি পাপিটাকে নিয়ে রোজ বেড়াতে যাব।

কমল। স্কুলেও নিয়ে যেতে পারিস।

খুকি। হ্যাঁ, তোমার যেরকম বুদ্ধি, স্কুলে নিয়ে গেলে হয়েছে আর কি! মিসেস হালদারকে তো আর চেন না।

কমল। কেন চিনব না, আমাদের হালদার-গিন্নী তো?

খুকি। ফের তুমি টিচারদের নিয়ে ঠাট্টা করছ? বেশ, আমি তোমার সঙ্গে আর কথা বলব না।

কমল। আহা, আমি ঠাট্টা করব কেন! সত্যি কথাই তো বলছি।

খুকি। ঠিক আছে, আমার কাছে ডিটেকটিভ বই আর চেও না। দাদা, সেই বইটা?

খোকা। কোনটা রে?

খুকি। সেই যে কালো মলাটের ওপর বাদুড়ের ছবি। কমলকাকাকে ওটা দেবই না।

কমল। আমি চাইবই না।

[খুকি ও কমল পরস্পরকে জিভ ভ্যাঙায়]

সরমা। বাবা, বাবা! ঠাকুরপো তুমি এত পারও বটে! যাই মিষ্টিগুলো সাজাই।

খুকি। মা, দাদা পাশ করেছে, আজ আইসক্রিম আসবে না?

সরমা। বাবাকে জিজ্ঞেস কর। [প্রস্থান]

খুকি। বাবা, আইসক্রিম, দাদা খেতে খুব ভালবাসে।

প্রশান্ত। আর তুমি বুঝি ভালবাস না?

খুকি। আমিও বাসি। বল না, আইসক্রিম আনাবে না?

প্রশান্ত। মাকে বল আনিয়ে দিতে।

খুকি। ম্যাগ্নোলিয়া তো। মা, মা, বাবা বলেছে আইসক্রিম— [প্রস্থান]

প্রশান্ত। খোকাটা যেমনি ধীরস্থির, এ মেয়েটা তেমনি হুড়ে। আজ আইসক্রিম না আনালে কি আর রক্ষে থাকত!

কমল। বাচ্চারা ঐ রকমই হয়।

প্রশান্ত। তোমাকে ঠিক সমান বয়সী মনে করে এমন আড্ডা মারে।

কমল। আমারও যে তাই। বাড়িতে কাচ্চা-বাচ্চা নেই, আমি পারতপক্ষে সেখানে যাই না।

প্রশান্ত। আমার ঠিক উলটো, সহজে বাচ্চারা কেউ কাছেই ঘেঁষে না।

[খুকি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে]

খুকি। টাকা কোথায় রেখেছ বাবা? পকেটে তো নেই।

প্রশান্ত। তা হলে বোধ হয় সব দেরাজেই তুলে রেখেছি।

খুকি। চাবি!

প্রশান্ত। আমি খুলে দিচ্ছি।

[প্রশান্ত ও খুকির প্রস্থান]

খোকা। কমলকাকা, আমি পুরী যাচ্ছি।

কমল। কার সঙ্গে?

খোকা। বেলাদিরা যাচ্ছে, বাবা সব ঠিক করে দিয়েছেন।

কমল। খুব ভাল জায়গা, আমি বার তিনেক গেছি।

খোকা। এই প্রথম সমুদ্র দেখব।

কমল। সে তো দেখবেই, তাছাড়া পুরীর স্থানমাহাত্ম্য কতখানি! জান তো, চৈতন্যদেব তাঁর শেষ জীবনটা ঐখানেই কাটিয়েছিলেন। রাখাল মহারাজ, স্বামী ব্রহ্মানন্দর কথা শুনেছি, মাসীর বাড়িতে গেলেই তাঁর ভাবসমাধি হত, তিনি যেন চৈতন্যদেবের দেবস্পর্শ অনুভব করতেন।

খোকা। তুমিও চল না কমলকাকা।

কমল। আমার ছুটি কোথায়? তুমি বরং ওখান থেকে চিঠি লিখ, যদি পারি কোনো শনি-রবিবার ঘুরে আসব।

খোকা। তোমার কাছ থেকে ঠাকুরের কথা শুনতে বড় ভাল লাগে।

কমল। বেশ তো, পুরী যাবার সময় ঠাকুরের 'কথামৃতম্' দেব, পড়।

[প্রশান্ত ভেতর থেকে ডাকে—কমল এস, চা দেওয়া হয়েছে।]

কমল [সাড়া দিয়ে]। যাই।

[উঠে দরজার কাছে গিয়ে]

কমল। খোকা, তুমি তো মাকে প্রণাম করলে না?

খোকা। করব।

কমল। একটা কথা সব সময় স্মরণ রেখ কারুর মনে অযথা কষ্ট দিতে নেই।

[কমলের প্রস্থান। খোকা চিন্তান্বিত মুখে টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়। অল্পক্ষণ চুপ করে বসে। পরে নিজের মায়ের ছবি নিয়ে এসে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। টেবিলের ওপর রেখে চারদিক তাকিয়ে প্রণাম করে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সরমার প্রবেশ]

সরমা। খোকা আয়, চা মিষ্টি সব টেবিলে দিয়েছি।

খোকা [তাড়াতাড়ি ছবিটা লুকিয়ে]। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

সরমা। সবাই তোর জন্যে বসে আছে যে। এ ঘরে একা একা কি করছিস?

খোকা। মার কথা মনে পড়ছে।

সরমা। ও!

খোকা। তুমি তো মাকে দেখনি, না?

সরমা। না।

খোকা। আমারও মার কথা কিছুই মনে পড়ে না।

সরমা। কি করে পড়বে, তোমার তখন দুবছর বয়স।

খোকা। পিসিমা বলেন, মা খুব ফরসা ছিলেন, সাদা ফুলের মতন।

সরমা। আমিও তাই শুনেছি। সকলেই তাঁর খুব প্রশংসা করে।

খোকা। আজ মা থাকলে কি করতেন?

সরমা। আনন্দ করতেন, কত খুশি হতেন। ছেলে ভাল করে পাস করলে মায়ের যে তাতে কত আনন্দ সে কি আর কথায় বোঝানো যায়?

খোকা [হঠাৎ]। তোমার আনন্দ হয়েছে?

সরমা [বিস্ময়ে]। কি?

খোকা [বিদ্রূপ করে] ।তোমার তো চোখে খালি জল!

সরমা [চোখ মুছে]। না, না, জল আবার কোথায়।

খোকা। আমি জানি তুমি খুশি হওনি।

সরমা। কি বলছিস তুই!

খোকা। তুমি খুশি হবে যেদিন তোমার মেয়ে পাশ করবে। তখন আর চোখে জল আসবে না। শুধু হাসবে। সেই তো মায়ের আনন্দ।

সরমা। ফের সেই কথা?

খোকা। আমি জানি যে, এ কথা সত্যি। তুমি চেয়েছিলে আমি ফেল করি। একটা মুখ্যু বাঁদর তৈরি হই।

সরমা [রেগে]। একটা বাঁদরই তৈরি হয়েছ তুমি। [খোকার দু গালে সজোরে চড় মেরে] ভদ্রভাবে যতদিন না কথা বলতে শিখবে, কথা বল না, যাও।

[ভয়ে, বিস্ময়ে, চোখের জল সামলাতে সামলাতে খোকার প্রস্থান। দুঃখে, অভিমানে সরমা ভেঙে পড়ে। চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর মাথা নামিয়ে দেয়। একটু পরে প্রশান্ত ঘরে ঢোকে। ভাল করে সরমাকে দেখে নিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে]

প্রশান্ত। ছেলে বড় হচ্ছে তো, তার গায়ে হাত দেওয়াটা উচিত নয়। [একটু থেমে] বিশেষ করে আজকের দিনে, প্রথম পাশের খবর।

সরমা। তুমি চুপ করবে?

প্রশান্ত। ছেলেটা ও ঘরে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে। কোন বাবার সে দৃশ্য দেখতে ভাল লাগে বল? তাই দেখে খুকিটাও কাঁদছে।

সরমা। কাঁদুক।

প্রশান্ত। হুঁ। বেচারা কমল, তোমাদের রাগারাগির মধ্যে পড়ে তার অস্বস্তির শেষ নেই। একটা ভাল খবর নিয়ে এল। কোথায় সবাই মিলে আনন্দ করবে তা নয়—

সরমা। হৈ-হৈ আনন্দ কর না, কে বারণ করছে?

প্রশান্ত। তুমি তার বাইরেই থাকবে?

সরমা। তাছাড়া উপায় কি? তোমার ছেলে আমাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না। আমি তো তার মা নই, ঝি-চাকর কি মনে করে ভগবান জানেন।

প্রশান্ত। কিন্তু কেন এ রকম হল?

সরমা। কেন আবার, তোমার জন্যে। শুধু আদর দিয়ে তো ছেলে মানুষ হয় না, তাকে শিক্ষা দিতে হয়। কতদিন তোমাকে বলেছি। এখন তো একটা বাঁদর তৈরি হয়েছে। তার কথাবার্তা শুনলে কে বলবে যে একটা ভদ্রলোকের ছেলে। উঃ, জীবনে কারুর কাছে যা শুনতে হয়নি, তোমার ছেলে আমায় তাই বলে। কারণ তার মায়ের বাড়া হয়ে আমি তাকে মানুষ করেছি।

প্রশান্ত। তুমি ভুল করছ সরমা—

সরমা। ভুল মোটেই নয়। তোমার ছেলের জন্যে আমি কি না করেছি। মাতৃত্বের সবটুকু রস আমি নিংড়ে তারই মাথায় দিয়েছি। খুকিটাকে তো কিছুই দিইনি। যাতে খোকা সুখী হয়, যাতে সে বড় হয়, যাতে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করার জন্যে তোমাকে কেউ খোঁটা দিতে না পারে। কিন্তু আজ বুঝেছি সেসব মিথ্যে হয়ে গেছে, আবার জিজ্ঞেস করছ—কার জন্যে? তোমার জন্যে, তোমার আত্মীয়-স্বজনের জন্যে যারা আমাকে দু চক্ষে দেখতে পারে না। সারাক্ষণ ওর কানে বিষ ঢেলেছে।

প্রশান্ত। তাহলে এখন কি করা যায়, আমি বরং—

সরমা। একটা ট্যাক্সি ডাকতে বল।

প্রশান্ত। কেন?

সরমা। আমি মার কাছে যাব।

প্রশান্ত। আজই?

সরমা। এখুনি।

প্রশান্ত [দীর্ঘশ্বাস ফেলে]। হুঁ।

সরমা। খুকি যদি যেতে চায় তো চলুক। খোকা পুরী চলে গেলে তারপর আমি আসব।

[সরমার প্রস্থান। একটু পরে কমলের প্রবেশ]

কমল। কি হল দাদা?

প্রশান্ত। আর বল না ভাই; আমি তো আর পারছি না। সরমার যেন কি হয়েছে। ভাল করে কোনো কথাই শোনে না, সব তাতে বিরক্তি।

কমল। শুধু বউদির দোষ দিলে চলে না, খোকাটাও আজকাল বড় যা-তা বলে।

প্রশান্ত। হুঁ। এ রকম হবে আমি কখনও ভাবিনি। খোকার মাকে তুমি দেখনি কমল। সে ছিল খুব সুন্দরী। কিন্তু আশ্চর্য রকমের স্বার্থপর। এখন ভেবে দেখলে মনে হয় বিয়ের পর যে কটা বছর আমরা ঘর করেছি আমি এতটুকু সুখী

হইনি। আমার আত্মীয়-স্বজন কাউকে সে সহ্য করতে পারত না। বিশেষ করে আমার মাকে, বলতে গেলে সেই দুঃখেই তো মা মারা গেলেন।

কমল। একথা তুমি একদিন আমায় বলেছিলে।

প্রশান্ত। সরমার সঙ্গে আলাপ হবার পর দেখলাম তার মন কত উদার। কত পরিষ্কার। তাকে বিয়ে করে ভেবেছিলাম খোকাকে সত্যিই মানুষ করতে পারব ভাল করে। সরমা তার মায়ের অভাব পুরিয়ে দেবে, কিন্তু একি হল?

কমল। আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। বউদিকে একটু বুঝিয়ে বললে—

প্রশান্ত। তোমার বউদি তো এক্ষুনি বাপের বাড়ি যেতে চাইছেন।

কমল। ওঃ, তা বরং ঘুরে আসাই ভাল। খোকারও তো পুরী যাবার কথা শুনলাম।

প্রশান্ত। হুঁ। তুমি তাই একটা ট্যাক্সি ডেকে এনে, সরমাকে পৌঁছে দিয়ে এস।

কমল। তাই যাই। দেখ, আর চেঁচামেচি কোর না।

[কমলের প্রস্থান। বাক্স নিয়ে খুকির প্রবেশ। টেবিলের ওপর রেখে গোছায়]

প্রশান্ত। তুমি কি মার সঙ্গে যাচ্ছ?

খুকি। হ্যাঁ।

প্রশান্ত। মা কোথায়?

খুকি। ঘরে কি কচ্ছেন।

প্রশান্ত। হুঁ। [থেমে] দাদা?

খুকি। দেখিনি!

প্রশান্ত। অ।

[দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রস্থান। খোকার প্রবেশ। খুকির বাক্স গোছান লক্ষ্য করে]

খোকা। কি কচ্ছিস?

খুকি। দেখতেই তো পাচ্ছ।

খোকা। বাক্স গোছাচ্ছিস কেন?

খুকি। মামার বাড়ি যাচ্ছি।

খোকা। একা?

খুকি। মা আর আমি।

খোকা। ওঃ। [টেবিলের দিকে সরে যায়]

খুকি। তুমি তো মার সঙ্গে ঝগড়া করেছ।

খোকা। থাক, থাক—তোকে আর পাকামি করতে হবে না।

খুকি। তুমি আজকাল ভারি ঝগড়াটে হয়েছ।

খোকা। চুপ কর বলছি।

খুকি। আমাকেও বকছ। দাঁড়াও বাবাকে গিয়ে বলে দিচ্ছি।

[খুকির প্রস্থানের পর খোকা চুপ করে কি ভাবে। হঠাৎ বাক্সটা টেনে নিয়ে গোছাতে শুরু করে। নিজের বাক্স থেকে জামা-কাপড় নিয়ে ভরে। ভেতর থেকে সরমার গলা শোনা যায়, বাক্সটা কোথায় রেখেছিস খুকি—]

খুকি। দাদার ঘরে।

[একটু পরে বাক্স খুঁজতে সরমার প্রবেশ]

সরমা [জোরে যেন খুকিকে বলছে]। কই বাক্স নেই তো এখানে।

খোকা। আমার কাছে।

সরমা। দাও এখানে, গুছিয়ে ফেলি, দাও।

[খোকা মাথা নিচু করে বাক্স এগিয়ে দেয়। সরমা তার মধ্যে থেকে খোকার শার্ট বার করে]

সরমা। এগুলো এর ভেতর পুরেছে কেন? যত রাজ্যের বাজে জিনিস! কোনটা নেবে না-নেবে ঠিক নেই।

খোকা। ওগুলো আমার জামা-কাপড়।

সরমা। কেন?

খোকা। আমিও যাব।

সরমা। কোথায়?

খোকা। তোমার সঙ্গে।

সরমা। আমার সঙ্গে যাবি, আমার সঙ্গে?

খোকা। আমি তো কষ্ট দিতে চাই না। তবু যে কি রকম হয়, আমার মাথার ঠিক থাকে না, কথার ঠিক থাকে না, কি যে পাগলের মতো বলি, তুমি হয়ত ভাবছ—

সরমা। আমি কিছু ভাবিনি খোকা, দোষ তোর নয়রে দোষ আমার। আমি তো তোর মায়ের অভাব পুরিয়ে দিতে পারিনি, সত্যিকারের মা হতে পারিনি—

খোকা। মা, মাগো।

[খোকা কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করে সরমাকে। ইতিমধ্যে প্রশান্তবাবু খুকিকে নিয়ে পেছনে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেন মা ও ছেলেকে]

সরমা [নিচু হয়ে খোকাকে টেনে নিয়ে]। খোকা।

খোকা। আমি হোস্টেলে যাব না মা—

সরমা। তোকে যেতে দিচ্ছে কে! এরপর আমার কথা না শুনলে ঠাস্ ঠাস্ করে চড় মারব, মনে থাকে যেন।

[নেপথ্যে গাড়ির হর্ন বাজে। কমল বাইরে থেকে চেঁচিয়ে বলে, দাদা ট্যাক্সি এসে গেছে]

প্রশান্তবাবু [তৃপ্তির হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে]। ট্যাক্সির আর দরকার নেই কমল, তুমি ওপরেই চলে এস।

[কথা শুনে সরমা ও খোকা ফিরে তাকায়। তাদেরও চোখে জল, মুখে লজ্জার চাপা হাসি। এক পশলা বৃষ্টির পর তাদের আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে]

ঘুম নেই

উৎপল দত্ত

চরিত্রলিপি

উদ্ধব	বাক্যবাগীশ বৃদ্ধ
এককড়ি	চায়ের দোকানের মালিক
কন্‌স্টেবল	
সত্যেন	টোল-আদায়ী কর্মচারী
ইন্দ্র	বেকার বিকৃতমস্তিষ্ক ড্রাইভার
জনৈক ভদ্রলোক [প্রবীর]	খবরের কাগজের রিপোর্টার
নির্মল	খবরের কাগজের রিপোর্টার
রাধানাথ	ড্রাইভার
কেষ্ট—	সহকারী ড্রাইভার
নকুল—	ড্রাইভার
হাজরা—	”
সোনা—	”
ভবানী—	”
চিত্রকূট—	”
অশোক	লরির মালিক
জগু	কাল্পনিক লরি চালিয়ে, উন্মাদ
দারোগা	

[কলকাতা—মুর্শিদাবাদ রাস্তার উপর পাগলাচণ্ডী ফেরী ঘাট। বড় রাস্তার পাশে একটি চায়ের দোকান; দোকানের সামনে নড়বড়ে ভ্যানেস্তার চেয়ার কতকগুলি এবং একটি বেঞ্চ, দুটি টেবিল। লণ্ঠন জ্বলছে গোটা-তিনেক। অপর পাশে টেবিল সাজিয়ে দুজন লোক বসে; পাগলাচণ্ডী অতিক্রম করতে গেলে এঁরা টোল আদায় করেন। চায়ের দোকানের মালিক দোকানের সামনে ক্যাশবাক্সের ভর দিয়ে বিশ্রাম করছেন; একজন মাত্র খদ্দের—উদ্ধব ঘোষ; প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় উপনীত—বাইরে বসে হ্যারিকেনের আলোয় খবরের কাগজ পড়ছেন]

উদ্ধব। আর এক কাপ চা দ্যাও দেহি, এককড়ি।

এক। ওরে বাসু!—অত চা খাওয়া কি ভাল?—বাসু!

উদ্ধব। প্যাচাল পাইড়ো না!

[বাসু নামক ভৃত্য দেখা দেয়]

এক। উদ্ধবদাকে আর এক কাপ!

উদ্ধব। আইজকালকার পোলাপান কয়েক কাপ চা খাইয়া বিছ্না লয়; আমারে অমন প্যাটরোগা পাও নাই! [চায়ে চুমুক দেন] দ্যাহো দ্যাহো, কান্ডডা দ্যাখছ?

এক। কি?

উদ্ধব। কি আর কমু? হালা চোরে চোরে দ্যাশডা শ্মশান হইয়া গেল গা! মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অমন তীব্র কটুক্তি কইর‍্যা গেল সিদ্ধার্থ রায়; হালা সব-কয়ডা মন্ত্রীর মুখে চুণকালি মাখাইয়া দিয়া গেল গা, হালা এক ব্যাটারও নি লজ্জা আছে! কইয়া দিলাম এককড়ি, বক্তৃতায় কাজ হইব না। এখনে দরকার এক সূর্য স্যানের, হাতে যার ধূম-উদগীরণকারী পিস্তল! বুঝলা, হেই একদিন আছিল। উনিশ শয় বত্রিশ সালের ৪ঠা জানুয়ারি, রাত্র এগারো ঘটিকায় যখন আমারে ঢাকায় গ্রেপ্তার করবার লাইগ্যা আসছিস—

এক। বটেই তো, বটেই তো!

উদ্ধব। তাই কই, এখনে সব মেড়া, নইলে বাংলার মানুষ গর্জন কইরা উঠত।

[জনৈক কনস্টেবল-এর প্রবেশ; শীর্ণ দেহে পাগড়ি-আদি একটু বেমানান দেখাচ্ছে]

কন। ও সত্যেন, পুল বন্ধ নাকি?

[টোল আদায়ি ব্যক্তি নড়েচড়ে বসলেও কথায় ঘুমের আমেজ থেকে যায়]

সত্যেন। হুঁ।

কন। কি ব্যাপার?

সত্যেন। পুল নাকি ভাঙা।

কন। সেকি? এ্যাদ্দিন ভাঙল না, হঠাৎ কে আবিষ্কার করল?

সত্যেন। ইউনিয়ন বোর্ড। কলকাতা থেকে ইঞ্জিনিয়ার আনিয়েছিল। মেরামত হচ্ছে। আজ সারাদিন ধরে একটা থাম ভেঙেছে।

কন। কদ্দিন লাগবে মেরামত হতে?

সত্যেন। কে জানে? বলে কাঠের থাম পাগলাচণ্ডীর জলে খেয়ে যাচ্ছে। ইঁটের গাঁথনি দেবে।

কন। গাড়িটাড়ি সব কি নাকাশিপাড়া ঘুরে যাচ্ছে।

সত্যেন। হ্যাঁঃ।

কন। ভালই হয়েছে। দেখে নেব—[দোকানের দিকে এগোয়; উদ্ধববাবু কথাবার্তা শুনছিলেন; স্থির অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তিনি কনস্টেবলকে দেখতে থাকেন] কই গো এককড়ি, চা দাও।

[এককড়ি হন্তদন্ত হয়ে নিজেই চা তৈরি করতে থাকে]

উদ্ধব। কথাটা বোঝলাম না। [কনস্টেবল শুনতেই পায়নি, সে আয়েস করে জাঁকিয়ে বসে] শুনতে আছেন? কথাডা বোঝালাম না।

কন [অবাক]। আমায় বলছেন? কি কথা?

উদ্ধব। পুল বন্ধ থাকায় কইলেন ভালই হইছে। তাৎপর্যটা বোঝালাম না।

কন। সে অনেক কথা। [পা তুলে জুতো খুলতে থাকে]

উদ্ধব [একটু নীরব থেকে]। বড় দার্শনিক তত্ত্বকথা বুঝি! আমাগো মতন দরিদ্র ব্যক্তির মাথায় ঢুকব না!

কন। না না, কি যে বলেন। মানে ঐ ড্রাইভারগুলোর কথা বলছিলাম। পাট নিয়ে যায় কলকাতায়। তা কি বলব মশাই, প্রত্যেকটা লরি overload, তিন টনের লরিতে ছ টন চাপিয়ে নিয়ে যায়। আর একেই তো অন্ধকার রাস্তা, তার ওপর ব্যাটারা এমন খচ্চর, নম্বর প্লেটের ওপর কাদা মাখিয়ে রাখে। আজ পর্যন্ত এক শালারও নম্বর নিতে পারিনি। তাই বলছিলাম, আজ বাগে পেয়েছি—এখানে আটকাব; সুড় সুড় করে সব হতভাগা এসে জড়ো হবে। পুল ভাঙা, যাবে কোথায়! দেখে নেব, প্রত্যেকটাকে রিপোর্ট করব!

[এককড়ি এক কাপ চা এবং রেকাবিতে নিমকি এনে রাখে]

কন। না, না, ও আবার কি এনেছ? আমি তো খেতে পারব না এককড়ি...

এক। সামান্য দুটো নিমকি, খালি পেটে চা খাওয়া কি ভাল হবে?

কন। তবে দাও খাই।

উদ্ধব। তা ছয় টন সাত টন মাল লইলে ক্ষতিটা কার?

কন। গাড়ি ভেঙে যাবে যে!

উদ্ধব। গাড়ি ভাঙলেই বা কার বাপের কি? নিজের গাড়ি নিজে ভাঙব, তা আপনি অমন ফাল দিয়া উঠেন ক্যান্?

কন। আর রাস্তা বসে যাবে না? একেই তো বর্ষাকালে তল্লাটে গাড়ি চলতে পারে না। তার ওপর অমন এক একখানা ইস্টিমরোলারের মতন লরি যাতায়াত করলে রাস্তা আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

উদ্ধব। তার লাইগ্যা রাস্তা পাকা করেন। গাড়ি ফাঁকা কইরা কি হইব? কোনদিন কইবেন মানষের মোটা হওয়া চলব না, রাস্তা বইস্যা যাইব। পায়ে ধূলা লাগে তো সারা দেশটা চামড়ায় মুইড়া লন নাকি? না, জুতা পরেন?—কন তো?

কন [কিয়ৎকাল হতভম্ব]। ওসব জানি না। আমাকে চাকরি করে খেতে হয়, চাকরি খোয়ালে চলবে না। আসুক ব্যাটারা, দেখে নেব।

উদ্ধব। হ, আর কি কইবেন। কওনের আর আছে কি? অত্যাচারীর ভাষাই ঐরূপ! যে সকল অত্যাচারীর উপদ্রবে বাংলা দ্যাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা আপনি তাগোর দাস। উনিশ শয় বত্রিশ সালের ৪ঠা জানুয়ারি ঢাকায় এই উদ্ধব ঘোষরে যে পুলিশ কয়টা গ্রেপ্তার করবার লাইগ্যা আসছিল তারাও—

এক। আঃ, উদ্ধবদা, থামুন না, কি আশ্চর্য! চা দেব আর একটু!

উদ্ধব [গোমড়া মুখে]। দেও!

[কাগজে তুলে মুখ ঢাকেন; এককড়ি ইসারায় কনস্টেবলকে জানায় উদ্ধববাবুর নিশ্চয়ই মাথার দোষ আছে। নদীর ধার দিয়ে একটি যুবক, শীর্ণ দেহ, উদাস দৃষ্টি নিয়ে অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে আসে]

এক। ও ইন্দ্র! এস দাদা এদিকে! [ইন্দ্র দাঁড়িয়ে পড়ে, তারপর বিহ্বলভাবে এগিয়ে আসে] চা খেয়েছ? [ইন্দ্র মাথা নেড়ে জানায়—খায়নি] বৌমা চা করে দেয়নি বুঝি? [ইন্দ্র জবাব দেয় না] এই নাও, খাও।

[ইন্দ্র গেলাস নিয়ে নদীর ধারে গিয়ে বসে]

কন। তোমার দোকানের পাট চুকল বলে, এককড়ি! দানছত্র খুলেছ যে! যে আসে সেই বেশ চুটিয়ে চা সিঙাড়া মেরে যায় বুঝি?

এক। আজ্ঞে ওরা সব আমার ভায়ের মতন। রাতের পর রাত ওরাই আমার খদ্দের ছিল। আজ না হয় ওর কিনে খাওয়ার পয়সা নেই; তবু ধর্ম আছেন তো!—

কন। কে ছেলেটা?

এক। ইন্দ্রচন্দ্র সাউ। এ গাঁয়েরই ছেলে। বে থা করে জাঁকিয়ে বসেছিল। লরি ড্রাইভার ছিল। এখন চাকরি নেই; তাই অমনধারা হয়ে গেছে। [একটু থেমে] বউকে বড় ভালবাসে। তাই সব্বাই ওর পেছনে লাগে।

[একটা আগন্তুক মোটরের শব্দে কনস্টেবল উঠে পড়ে]

কন। আসছে। এক ব্যাটা আসছে।

[হেডলাইটের আলো এসে পড়ে, তারপর ব্রেক কষার শব্দ; পা টিপে টিপে কনস্টেবল বেরিয়ে যায়। কয়েক মুহূর্ত, তারপর পা টিপে টিপে কনস্টেবল ফিরে আসে। নিজের জায়গায় বসে পড়ে। সকলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে বলে]

কন। সুট পরা লোক।

এক। সে কি? লরি নয়।

কন। না হে। বিরাট ঝকঝকে গাড়ি। আরেকটু হলেই গেসলাম।

এক। কেমন?

কন। ঘাড় চেপে ধরতে গেসলাম।

উদ্ধব। হ, আর কি হইব? মাথাটা ত্যালা দ্যাখছেন, তাই আরও ত্যাল ঢালবার লাগবেন; রুক্ষ মাথা হইলে ব্যাল ফাটাতেন।

[সুটপরা এক ছিমছাম ভদ্রলোক প্রবেশ করেন]

ভদ্র। ব্রিজ বন্ধ নাকি?

[উদ্ধব আঙুল তুলে অপর দিকের কর্মচারীর প্রতি আগন্তুকের দৃষ্টি চালিত করে দিয়ে আবার পাঠমগ্ন হন]

ভদ্র। ও দাদা, শুনছেন? পোল বন্ধ নাকি?

সত্যেন [ঝিমুতে ঝিমুতে]। হুঁ।

ভদ্র। কি মুস্কিল! তবে কি করব? কলকাতা যাব যে!

সত্যেন। পিছিয়ে গিয়ে বিরাটপুর থেকে পশ্চিমের রাস্তা ধরে মাইল বারো পথ গেলে আসবে পাথুরি। পাথুরি থেকে উত্তুরে রাস্তায় আট মাইল গেলে নাকাশিপাড়া খেয়াঘাট; নৌকোয় গাড়ি তুলে নদী পার হয়ে যাবেন।

ভদ্র। সে কি মশাই! কলকাতা পৌঁছুতে রাত কাবার হয়ে যাবে যে!

সত্যেন। দুপুর গড়িয়ে যেতে পারে। কি আর করবেন। পোল বন্ধ।

ভদ্র [নেপথ্যে তাকিয়ে]। নির্মল! নির্মল! এস এদিকে, মহা ফ্যাসাদ!

[আর একজন সুটপরা ভদ্রলোক আসেন]

ভদ্র। গাড়ি লক করে এসেছ তো?

নির্মল। হুঁ। কি ব্যাপার?

ভদ্র। ব্যাপার সঙীন, চা খেয়ে নেয়া যাক, বুদ্ধি খেলতে পারে। পোল বন্ধ! কোথা দিয়ে যাওয়া যায় বলল—সকাল হয়ে যাবে।

নির্মল। সর্বনাশ!

[কথা বলতে বলতে দুজনে এসে চেয়ার অধিকার করেন]

ভদ্র। বোঝো! ট্রেনের আগে যাব ভাবলাম।

নির্মল [এককড়িকে]। গরম চা খাওয়াও ভাই।

ভদ্র। কেলেঙ্কারি! দাবড়ানি যা খাব না!

নির্মল। আরে চেপে যাও না। উড়ে তো যেতে পারব না; পোল ভাঙা তো কি করব? Scoop news চাইলেই পাওয়া যায় না। আর সব কাগজে পরশু বেরুবে, আমাদেরও তাই বেরুলেই চলবে। আর বেশি ফড়ফড় করে কাজ নেই।

উদ্ধব। আপনারা?

[এক মুহূর্তের নীরবতা; দুজনেই অবাক হয়ে উদ্ধবের দিকে তাকান]

নির্মল। কি বলছেন?

উদ্ধব। জিগাই, আপনারা?

ভদ্র। আমরা খবরের কাগজের লোক।

উদ্ধব [তৎক্ষণাৎ]। কোন কাগজ?

ভদ্র। ট্রিবিউন।

উদ্ধব। কি কাজ করেন?

নির্মল। আরে! এ আবার কি? আমরা রিপোর্টার মশাই—

উদ্ধব। এই দিকে কি উদ্দেশ্যে আগমন?

নির্মল। নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাতে আপনার কি?

ভদ্র। আঃ, কি হচ্ছে! আমরা বহরমপুর গিয়েছিলাম—আজ কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ওখানে একটা agricultural college open করলেন না, তারই রিপোর্ট লিখতে, বুঝলেন?

[চা এসে যায়, দুজনে চুমুক দেন]

উদ্ধব। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী কয় ফুট মোটা এই লিইখ্যাই বুঝি রোজগার?

ভদ্র [অবাক]। আজ্ঞে?

উদ্ধব। তা অনুগ্রহ কইরা যখন পদধূলি দিছেন, তখন অন্য রিপোর্ট লিইখ্যা লইবেন, কমু?

নির্মল [ঈষৎ রাগত]। তার মানে?

উদ্ধব। কলিকাতার সংবাদপত্রে যে রিপোর্টের স্থান হয় না, তাই লইয়া যান না! কাছেই নেতাজীনগর রিফিউজি কলোনি, আমার লগে চলেন, দেখাইয়া দিতাছি মানুষে শেয়ালে কেমনে একত্র বাস করে। নিজেরে যদি মনুষ্য পদবাচ্য মনে করেন, তবে একবার নাকে রুমাল দিয়া উৎকা মাইরা দেইখ্যা আসেন। হাসতে আছেন? বড়ই মিষ্ট লাগতাছে? দশ বৎসর ধইরা আপনাগো মুখ্যমন্ত্রী নিরঙ্কুশ রাজইত্য করতে আছেন, এই দশ বৎসরে আমাগো অবস্থা কি হইছে তা চক্ষে দেখনেরো সাহস নাই? কার কাছে কাঁদি? আমি কার কাছে কাঁদি? বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শোষকের সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজি দৈনিকের আপনারা দাস! দেশমাতার কাতর ক্রন্দন আপনাগো......

নির্মল। আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই, গায়ে পড়ে ঝগড়া করেন!

উদ্ধব। আমি বলুম! বলুমই! অখনে প্রয়োজন সূর্য স্যান! আপনাগো মতন বিশ্বাসঘাতকতা তবেই কাবু হইব! উনিশ শয় বত্রিশ সালের ৪ঠা জানুয়ারি রাত্র এগারো ঘটিকায় ঢাকার আমারে গ্রেপ্তার কইরবার লাইগ্যা আইল, তখন এই আপনাগো ন্যায় দ্যাশের শত্রুরা...

এক। কি আপদ! ও উদ্ধবদা! আপনার জ্বালায় কি এখান থেকে দোকান তুলে দিতে হবে? খদ্দেরদের খামোকা অপমান করছেন?

উদ্ধব। সত্য কথা আমি কমুই।

ভদ্র। আহা, কি মুস্কিল! কাগজটা তো আমাদের বাপের সম্পত্তি নয়। চাকরি করছি, হুকুম মেনে চলতে হবে না?

উদ্ধভ। ঐ লাল পাগড়ি পরা মুখ্যমন্ত্রীর পোলাও একোই কথা কয়! চাকরির দোহাই দিলে যত মিথ্যাচার সকলেই বুঝি নির্মল পবিত্র হইয়া যায় গা! অখনে প্রয়োজন—

এক [ধমকাইয়া]। থামুন! [উদ্ধব বসে পড়েন; এককড়ি একটু দুঃখিত হয়] চা দেব?

উদ্ধব [গোড়ামুখে]। দেও!

[আবার মোটরের গর্জন শুনে কনস্টেবল উঠে দাঁড়ায়; ঠাহর করে দেখে]

কন। এবার তো লরিই মনে হচ্ছে!....হ্যাঁ, যা আওয়াজ!

এক। ব্যস্ত কেন? বসুন না! এখানেই তো ওরা একটু খেয়ে যান। একটু বাদেই সব হুড়মুড় করে এসে পড়বে।

কন। হ্যাঁ, লরি। দাঁড়াও, দেখি।

[টর্চ বের করে প্রস্থান করে। ক্ষণপরে রাধানাথ মজুমদার এবং কেষ্ট—অন্তরালবর্তী লরির ড্রাইভার ও সহকারী শিক্ষার্থী—প্রবেশ করে। রাধানাথ খুব তেজের সঙ্গে কেষ্টকে কিছু শিক্ষাদান করতে করতে আসে]

রাধা। আরে না না, বাঁদিকে ইস্টিয়ারিং ঘুরিয়ে জায়গাটা কভার করে তবেই না টার্নিং নিবি! নইলে পড়বি উল্টে খানার মধ্যে। তোকে নিয়ে আর পারলাম না কেষ্ট—এককড়ি দা, রুটিফুটি হয়েছে তৈরি? নিয়ে এস গো!—কি ঘোরান ঘোরালি ভাই!—নমস্কার উদ্ধবদা!—ভাগ্যে আমি ছিলাম পাশে!

কেষ্ট। হ্যাঁ, কেমন গোলমাল হয়ে গেল।

রাধা। ইস্পিডের মাথায় টার্নিং নিতে গিয়ে গোলমাল হলে চলবে না চাঁদ। কি শিখলি অ্যাদ্দিন! আচ্ছা ধর, ৩৫-৪০-এ চলেছিস, খালি লরি, কালভার্ট এল; কি করবি?

কেষ্ট। ৪০-এ চলেছি?

রাধা। হুঁ।

কেষ্ট [বিশেষ ভাবিত]। কালভার্ট?

রাধা। হ্যাঁ।

[কেষ্ট ভাবছে]

উদ্ধব। ওই পোলাডা কেডা? আমাগো কলোনির পোলা না?

রাধা। আজ্ঞা হাঁ, উদ্ধবদা। মাস্টারমশাই ছেলেটাকে দিয়েছেন ড্রাইভিং শিখতে।

উদ্ধব। ব্রজেন্দ্র মাস্টার ছাড়া অমন আহাম্মুকি আর করব কেডা? [রাধানাথ বিস্মিত প্রশ্ন মুখে নিয়ে তাকায়।] হ, আহাম্মুক! কলোনির মইধ্যে এক ইস্কুল কইরা ভাবতে আছে কি হনু রে?

রাধা। কেন উদ্ধবদা? কেষ্ট ম্যাট্রিক পাশ করেছে, চাকরি জুটিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন মাস্টারমশাই—এতে....

উদ্ধব। চাকরিরও রকম আছে। কেষ্ট বামুনের পোলা। কুমিল্লায় মুখুটি কুলীন হারাধন মুখুজ্যের পোলা! তারে দিছে ড্রাইভিং শিখবার লাইগ্যা! কোনদিন দেখুম এ্যানে বামুন কায়েতের পোলারা দল বাঁইধ্যা মেথর হইয়া গ্যাছে গা।

রাধা [বিমর্ষ]। তা তো ঠিকই। ছত্রিশ জাতের মধ্যে—

উদ্ধব। দ্যাশটার কালে কালে হইল কি?

[রাধানাথ নীরবে সায় দিয়ে চুপ করে বসে থাকে; তারপর হঠাৎ দেখে কেষ্ট ঢুলছে]

রাধা। কেষ্ট! ঘুমুচ্ছিস! বাটাচ্ছেলে! এই ঘুমই তোর বারোটা বাজাবে; তোরও, আমারও। তোকে না জিজ্ঞেস করলাম কালভার্ট এলে কি করবি?

কেষ্ট। তাই তো ভাবছি। খালি লরি?

রাধা। আর ভেবেছিস! মাস্টারমশাইকে বা কি যে ঘোড়ার ডিম জবাব দেব জানি না। অ্যাদ্দিনে তুই কিছুই শিখলি না?

কেষ্ট। কালভার্ট এলে ব্রেক কষে ইস্পিড কমাব তারপর....

রাধা। ব্রেক কষে ইস্পিড কমায় সখের ড্রাইভাররা! টাইম যাদের অফুরন্ত! কম করে এক হাজার বার বলিনি ক্লাচ টিপে কাজ চালাবি!

কেষ্ট। হ্যাঁ, আমার কেমন গোলমাল হয়ে গেস্‌ল।

রাধা। গোলমাল হয়ে গেল না ঘুমিয়ে পড়েছিলি? জপ কর ক্লাচ-ক্লাচ-ক্লাচ-ক্লাচ! বুঝলেন উদ্ধবদা, ছেলেটা চলন্ত গাড়ির ইস্টিয়ারিং ধরে ঘুমোয়! খানায় পড়ে মরবে একদিন।

উদ্ধব। যার বা কাজ! বামুনের পোলা হইয়া মিস্তিরিগিরি করবার লাগছে, অপঘাতে মৃত্যু অবধারিত!

[এককড়ি খাবার নিয়ে আসে]

এক। দেখ তো ভাই, তরকারিটায় ঝাল বেশি পড়ে গেল কি না!

রাধা। নে, কেষ্ট খা! তারপর লরিতে গাদার ওপর পড়ে ঘুমো, প্রাণের মায়া ছেড়ে ঘুম দে। আজ রাতে তো ছুটি পেয়ে গেলি! [দুজনে খেতে থাকে] আচ্ছা বলতো ডানদিকে টার্নিং নিচ্ছিস, কি করবি? মনে কর ৩০ মাইল ইস্পিডে আসছিল।

[তন্দ্রাতুর কেষ্টর গ্রাসই ঠিকমতো মুখে পৌঁছচ্ছে না, গাড়ি চালাবার সূক্ষ্ম সমস্যা মাথায় ঢোকে বলেই মনে হয় না। কনস্টেবল ফিরে আসে, মুখভাব অত্যন্ত গম্ভীর]

কন। WBQ 2142 কার গাড়ি?

[রাধানাথ তখন টেবিলের ওপর জল দিয়ে নক্সা এঁকে টার্নিং বোঝাচ্ছে, শুনতে পায়নি]

রাধা। এই ধর রাস্তা, তুই এমনি আসছিস—৩০ এম,পি,এইচ।

কন। বলি WBQ 2142 কার লরি?

রাধা। আজ্ঞে, এই যে, আমার।

কন [গম্ভীর]। মাল overload হয়েছে, লরি আটক করতে বাধ্য হব।

রাধা [সলজ্জ হেসে]। আজ্ঞে আটক তো হয়েই আছে, সামনে পোল ভাঙা।

কন। বেশি চালাকি কর না, বুঝলে? দেখে নেব! দেখি লাইসেন্স দেখি! [রাধানাথ হাত ধুয়ে এ পকেট ও পকেট খুঁজে লাইসেন্স বার করে] হুঁ। রাধানাথ মজুমদার! হুঁ।

[টর্চের সাহায্যে লাইসেন্সের ছবির সঙ্গে রাধানাথের মুখ মিলিয়ে দেখতে থাকে, মস্তক ডাইনে বাঁয়ে আন্দোলিত করে]

রাধা। আজ্ঞে, ও আমারই ছবি, অমন বেয়াড়া মুখ আর কার হবে?

কন। হ্যাঁ তা বটে। রাত্তিরে দেখলে আঁতকে ওঠার মতন। রিপোর্ট করব, লরি এখানেই আটক থাকবে। দেখে নেব! [নোটবুকে কি সব লিখে নিতে থাকে] ফাইন হবে। জরিমানা। যা পাটের গাঁট চাপিয়েছ না, পঞ্চাশ টাকা ফাইন হবে। হ্যাঁ।

[নোটবুক পকেটে পুরে রওনা হয়; পেছনে রাধানাথ ছোটে]

রাধা। স্যার! ও স্যার! ও কনেস্টবলদা! একটু শুনুন! অত ফাইন কোথায় পাব? গরীব মানুষ!

কন। তার আমি কি জানি? ফাইন না দিতে পার, স্বচ্ছন্দে জেল খাট! সস্তা পড়বে, বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, না?

রাধা। না দাদা এই প্রথম! সত্যি বলছি, স্যার! এই প্রথম! আর প্রতিবারেই আপনারা দয়া করেন, আজকে হঠাৎ এত—মানে—বলছিলাম, একটা মিউচুয়্যাল ফ্রেন্ডশিপে জিনিসটা....

কন। তোমাকে আমি ঘানি টানাবই! আইনের ঠ্যালা এখনো টের পাওনি না? আজ ধরেছি। দেখে নেব। কত ধানে কত চাল বুঝবে এখন।

[কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাতটা নেমে আসে নাচের ভঙ্গিতে, রাধানাথ একটা টাকা বার করে; সজোরে দু আঙুল নাচিয়ে কনস্টেবল দেয় দুটাকা দিতে হবে। রাধানাথ হতাশার ভঙ্গি করে তাই দেয়। কনস্টেবল টাকা পকেটস্থ করেই প্রস্থান করে। রাধানাথ ফিরে আসে, মুখে বোকাটে হাসি]

রাধা। দুটো টাকা গচ্চা গেল।

কেষ্ট। কি হল?

রাধা। তোকে যা জিজ্ঞেস করেছিলাম, তার জবাব দে। ডানদিকে টার্নিং at থার্ট্রি!

কেষ্ট। ঐতো, বাঁ দিকে আগে চেপে, তারপর ডানদিকে কাটানো।

রাধা। আর ইস্পিড বুঝি তিরিশই থাকবে! ক্লাচ কোথায় গেল, হতভাগা। জপ কর, ওরে গায়ত্রী জপ কর—ক্লাচ, ক্লাচ, ক্লাচ, ক্লাচ!

কেষ্ট। করছি করছি!

[ইতিমধ্যে আরেকখানা লরির আগমনের যান্ত্রিক শব্দ শোনা গেছে; নকুল মিশ্র ঢোকে; চক্ষু কোটরাগত, মাঝে মাঝে কাশছে। সে এসে রাধানাথের পাশে বসে]

রাধা। এই যে নকুল! আরো রোগা হয়ে গেছ! ব্যাটা, তুমি কি শেষ পর্যন্ত হাওয়ায় মিশিয়ে যাবে?

নকুল [জবাব না দিয়ে]। পাঁউরুটি আছে?

এক। কেন, হাতে গড়া রুটি চলবে না?

নকুল। নাঃ, পেটে সয় না। রুটি আর মাখন দাও, খাই। একটু হাত চালিয়ে।

এক। তাড়া কিসের? সারা রাত্তিরই তো এখানে বসে থাকতে হবে। পুল ভেঙে গেছে গো!

নকুল। জানি। কিন্তু খেয়ে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না, ঘুমোতে হবে। [একটু থেমে] সময় পেলেই ঘুমোনো উচিত।

রাধা। তুই আর বলিসনে মাইরি! কক্ষনো তোকে দু-চোখের পাতা এক করতে দেখলাম না।

নকুল। হুঁ।

রাধা। অত খাটিস কেন? মরে যাবি রে!

নকুল। কোথায় খাটি?

রাধা। কেন গুল দিচ্ছিস? সারারাত্তিরে পাটের খামাল করে, আবার দিনের বেলায় কলকাতার খুচরো কাজ ধরিস। তোকে কি বলব!

নকুল। দিনের বেলায় ঘুম আসে না বলেই ধরি।

রাধা। তা বলে রাতেও ঘুমোবি না, দিনেও ঘুমোবি না? পটল তুলবি বলে।

নকুল। দিনের বেলায় ঘুম হয়? [নীরবতা] আমারো তাই মনে হয়!

রাধা। কি?

নকুল। পটল তুললাম বলে। ডাক্তার দেখালাম, বললে অনিদ্রা রোগ ধরেছে, রাতের কাজ ছাড়তে হবে। কখনো সম্ভব? তার ওপর পেটের গোলমাল। কিছু খেলে হয়েছে আর কি! [এককড়ি পাঁউরুটি দিয়ে যায়] নাঃ, খিদে নেই!

রাধা। দিনের খুচরো ট্রিপগুলো ছেড়ে দে ভাই!

[নীরবতা]

নকুল। কি যে বল! রাবণের সংসার, সাতটি ছেলেমেয়ে। [ট্রিবিউনের রিপোর্টারদ্বয় হাসি চাপতে পারেন না] উপরন্তু আমার গৃহিণী পুনরায় অন্তঃসত্ত্বা। [এবার রিপোর্টাররা জোরে হেসে ওঠেন] হাসলেন যে বড়?

ভদ্র। কিছু মনে করবেন না ভাই, হাসি এসে গেল।

নকুল। কেন?

নির্মল। এই প্রবীর, চেপে যা না!

প্রবীর। না, মানে, দেখুন, অতগুলো ছেলেপুলে যে হয়ে চলেছে, সামাল দেবেন কি করে?

নকুল। আমিও তো তাই ভাবছি। কিন্তু কই, আমার তো হাসি পায় না।

প্রবীর। সামাল দেয়া সম্ভব। একটু সংযম, একটু জন্ম নিয়ন্ত্রণ না করলে দেশটার যে সর্বনাশ হবে। Family planning চাই তো। নইলে যত খাদ্য বাড়ুক না কেন, দেশের.....

নকুল। হ্যাঁ। [নীরবতা] নিয়ন্ত্রণ করা যায় বটে।...কিন্তু তবে কি নিয়ে থাকব?

নির্মল [হেসে]। কি নিয়ে থাকবে! আর কিছু করার নেই, তাই ছেলে পয়দা করবে?

নকুল। তা ধরুন মদ খেয়েও তো লোকে বিপদে পড়ে; ঠ্যালা সামলাতে প্রাণান্ত হয়। এও ধরুন কতকটা তাই।....শুধু একটু ঘুমোবার সময় পেলেই, সব ঠিক হয়ে যেত!

[এককড়ি আসে]

এক। একটু তরকারি দেব?

নকুল। পাগল! পেট জ্বলবে।

এক। রুটিকটা খেয়ে নাও। পিত্তি পড়ে অসুখ করবে যে! তোমাকে আর কিছু দেব?

রাধা। দাও, আর দুটো রুটি।

এক। তোমায় ?

কেষ্ট। আর একটু ক্লাচ।

এক। এ্যাঁঃ ?

কেষ্ট। মানে, একটু তরকারি—ওঃ ঘুমখানা যা পেয়েছে না!

[আরেকখানা লরি এসে থামে; একটু পরে ড্রাইভার হাজরা প্রবেশ করে; মুখখানা কুঞ্চিত হয়ে আছে]

হাজরা। এ্যাঁঃ, থু থু!

রাধা। কি হল, হাজরা ?

হাজরা। পেট্রল সিফন করতে গিয়ে এক ঢোক পেটে গেল! ও এককড়ি, চট করে পাঁইটের বোতলটা চালান কর দিকিনি।

এককড়ি। এখন নয়।

[আঙুল দিয়ে উদ্ধবকে দেখায়]

হাজরা। ও বানচোৎ!—বেশ, তবে—তরকা টরকা কিছু কিনে নিয়ে এস দিকি! বমি আসছে।

উদ্ধব। অর্থাৎ ?

হাজরা। পেট্রোল পেটে চলে গেছে।

উদ্ধব। কেমনে ?

হাজরা। ও আপনি বুঝবেন না।

[এককড়ি তরকা রুটি ও গেলাস স্থাপন করতে সে জল নিয়ে কুলকুচি করে]

উদ্ধব। ত্যাল খাও নাকি ?

হাজরা [খেতে খেতে]। সখ করে কি আর খেয়েছি? রবারের নল দিয়ে এ টিন থেকে ও টিনে ঢালছিলাম। প্রথমটা একটু মুখ দিয়ে চুষে নিতে হয়। কিছুতেই তেল আসে না দেখে মারলাম চোঁ করে একটান। হড়াক করে মুখের মধ্যে একেবারে তেলের বান ডেকে গেল! এ্যাঁঃ! দুস সালা তরকাটা কি বিচ্ছিরি, এককড়ি, ভাল লাগে না! বোতল ছাড়ো!

এক। একটু সবুর কর ভাই। এক্ষুণি—

[কনস্টেবল-এর প্রবেশ]

কন। WBQ 1087 কার লরি

[নকুল ততক্ষণে টেবিলের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে]

কন [চেঁচিয়ে]। বলি, WBQ 1087 কার লরি ?

[ধড়মড় করে জেগে উঠেই নকুল রওনা হয়, মৃদুস্বরে বলে]

নকুল। যাচ্ছি যাচ্ছি—

[চোখের সামনে দিয়ে লোকটা বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে কনস্টেবল প্রথমটা বিস্মিত হয়েছিল; এবার ধমকে ওঠে]

কন। বলি, কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?

[নকুল দাঁড়িয়ে পড়ে; চোখ রগড়ায়]

নকুল। ও, আপনি? আমি ভাবলাম—

কন। হ্যাঁ, আমি তোমার বাবা! লরির ওপর গন্ধমাদন চাপিয়েছ কেন? হ্যাঁ, আবার কাদা মাখিয়ে নম্বর প্লেট কালো করে রেখেছ! দেখি, লাইসেন্স দেখি—[নকুল লাইসেন্সের বদলে টাকা বার করে] জরিমানা হবে, জান! দেখে নেব, দেখে নেব!

নকুল। কেন মিছে ঝামেলা করছেন, দাদা!

কন [উৎকোচ গ্রহণ করতে করতে]। ব্যাটাদের বড্ড বাড় বেড়েছে, বড্ড বাড় বেড়েছে।

নকুল। আপনার নম্বরটিও আমার মনে রইল দাদা। এরপরও যদি রিপোর্ট করেন, আপনাকে নিয়ে ডুবব।

[কনস্টেবল-এর কিয়ৎকাল বাকস্ফূর্তি হয় না, তারপর হঠাৎ—]

কন। দেখে নেব—[বলেই সে রণে ভঙ্গ দেয়। নকুল স্বস্থানে ফিরে আসে]

হাজরা। খেয়েছ! আমাকেও ধরল বলে। দেখি, দুটো টাকা আছে তো....[পকেট হাতড়ায়]

রাধা। এই শালা ঘুষের টাকা দিতে দিতে হালে নাজেহাল হয়ে গেলাম। ইস্টেটিক চেক পয়েন্টই তো হল গিয়ে তোমার চারটে। তার ওপর এখানে ওখানে যখন তখন.....ছিঃ—

উদ্ধব। ঘুষ যে গ্রহণ করে, হে অপরাধী, আর যে দেয় হে অপরাধী নয়?

হাজরা। আজ্ঞে?

উদ্ধব। কইতে আছি—পকেট তো খুইল্যাই রাখছেন! একবার ভাইব্যা দেখছেন কামটা ভাল হইল কি মন্দ হইল?

হাজরা। মানে? বুঝতে পারলাম না।

উদ্ধব। হ, আর কি কইবেন? কেমনে বোঝবেন কি কইতে আছি। এই তো দ্যাশের অবস্থা; ভাল আর মন্দ, সাদা আর কালোর পার্থক্যই চক্ষে পড়ে না। কই বলে বেশি মাল চাপানো যখন বে-আইনী জানেন, তখন জাইন্যা শুইন্যা হিমালয় পর্বতের ন্যায় পাটের গাদা টাল কইরা লন ক্যান?

হাজরা। পাটের গাদা টাল করা কি আমাদের হাতে? বেথুয়াডহরিতে মালিক নিজে দাঁড়িয়ে থেকে চাপিয়ে দেয়, আমরা কি করব? আর তা ছাড়া যত বেশি মাল নেব তত বেশি কমিশন।

উদ্ধব। হায়, আমারে দাঁড়াইয়া শুনতে হইল কমিশনের লাইগ্যা অধর্ম করি, আর নাকি করনের কিছু নাই। ক্যান, বুকের পাটা নাই? বুক ফুলাইয়া কইতে পারেন না, অধর্ম করুম না মশাই?

হাজরা [ঈষৎ ঘাবড়াইয়া]। অধর্ম করব না তো বুঝলাম, কিন্তু চাকরি তো করতে হবে। মাস গেলে নব্বইটা টাকা দেবে, সংসার চলবে।

উদ্ধব। কয়েকটা টাকার লাইগ্যা বিবেক ধর্ম সকলই বেইচ্যা দিবেন? আর রোজ পুলিশের ঘুষ দিয়া নব্বই টাকার কয় টাকা বাকি থাকে কন দেহি।

হাজরা। না, ঘুষের টাকা তো কোম্পানি দেয়। যেসব ফাঁড়িগুলো রাস্তায় পড়ে,

সেখানকার ঘুষ কোম্পানি দেয়। এই হঠাৎ এক আধটা লাল পাগড়ি এসে পড়লে তখন....

উদ্ধব। তখন যে দামে ধর্ম ব্যাচছেন, হেই নব্বই টাকা হইতেই গুনাগার দেন।

হাজরা। হ্যাঁ, এসব জেনে শুনেই তো চাকরি নিয়েছি।

উদ্ধব। জাইন্যা শুইন্যাই নিছেন! আমার সামনে বইস্যা কইতে আছেন জাইন্যা শুইন্যা নিছেন! অখনে প্রয়োজন ভৈরবমূর্তি সূর্য স্যানের, নাইলে আপনাগো ন্যায় হীন চন্ডালগণের চেতনা হইব না!

[এক মুহূর্ত নীরবতা; উদ্ধববাবু একটা সরোষ প্রত্যুত্তরের অপেক্ষার দন্ডায়মান। কিন্তু হাজরা হঠাৎ বলে ওঠে]

হাজরা। দুস্ সালা, কিস্‌সু ভাল লাগে না!

এক [উচ্চ হেসে]। হল তো উদ্ধবদা বক্তিমের ফলটা দেখলেন তো? এখন চা দেব?

উদ্ধব [বসিয়া, গোমড়ামুখে]। দ্যাও।

নকুল। ব্যাটা পুলিশ ঘুমটা ভেঙে দিয়ে গেল। এককড়ি, পাঁইট ছাড় না বাবা!

এক। পরে!

রাধা। দাঁড়াও, একটু মজা করি।....ও ইন্দ্র!

ইন্দ্র। উঁ?

রাধা। লরি ড্রাইভার নিচ্ছে। চাকরি নেবে?

ইন্দ্র। না।

রাধা। কেন গো? ৭৫ গ্রেডে ঢুকতে পারবে, কারণ তুমি আগে চালাতে, আপত্তি কিসের?

ইন্দ্র। রাত্তিরবেলা কাজ করতে পারব না।

রাধা। কেন?

ইন্দ্র। সে অনেক কথা।

রাধা। কি কথা? ও বুঝেছি, বউ বুঝি রাগ করবে? [সবাই হেসে ওঠে] তা বেশ তো! বউকে শুদ্ধ লরিতে নিয়ে যেও এখন, কি বল!

[সবাই হাসে]

ইন্দ্র [হঠাৎ রেগে]। লরির কাজ নিতে আমার বয়ে গেছে! আমার কলা হয়েছে! লরিতে চড়তে আমার বয়ে গেছে! আমার বউয়েরও বয়ে গেছে!

[সবাই হাসে; হঠাৎ হাজরা সজোরে খেদোক্তি করে]

হাজরা। দুস সালা, কিস্‌সু ভাল লাগে না!

[ইন্দ্র নদীর বাঁধের উপর গিয়ে বসে; হুড়মুড় করে পরপর দুটো লরি এসে থামে। সোনা দত্ত ঢোকে, পেছনে ভবানী মোদক]

সোনা। ঐ ভবানী শালার জন্যে আমার আবার এক্সিডেন্ট হবে। হবেই। এমনভাবে overtake করল হঠাৎ—ইশ! উঃ!

ভবানী। এই সোনা, তোর পেছনের বাঁ চাকায় পাম্প কম আছে রে! উল্টে যাবে!

সোনা। এ্যা? সে কি?

ভবানী। সেই আকবরনগর থেকে দেখতে দেখতে আসছি,—শালা হঠাৎ উঠছে, নামছে, দেবে যাচ্ছে, বেঁকে যাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে ওপরে পাটের গাদার বল ড্যান্স!

সোনা। উঃ। বেঁচে গেছি তাহলে, খুব বেঁচে গেছি। এককড়ি জল দাওগো! দেখতে দেখতে আসছ তো এতক্ষণ ঝেড়ে কাশনি কেন?

ভবানী। কি করে বলব? শালা হাওয়ার বেগে তেপান্তরের ওপর দিয়ে পক্ষীরাজের মতন উড়ে চললি যেন রাজপুত্তুর চলেছে রাজকন্যার জন্যে, ব্যাঙ্গমা চলেছে ব্যাঙ্গমির—!

সোনা [জল খেয়ে]। উঃ, কি ভয়ানক। [উঠে পড়ে]

এক। একি? কোথায় চললে আবার?

সোনা। দেখি, আবার চাকার পাম্প কম বলছে। শালার চোখ শকুনের মতন ভুল হয় না।

[হন হন করে বেরিয়ে যায়। ভবানী হেসে ফেলে]

ভবানী। শালা সত্যিই ছুটেছে! মেরেছি ধাপ্পা! তাই বলে কি প্রেম দেব না!

এক। তা পাম্প কম থাকলেই বা কি? আজ রাত্তিরে তো আর যেতে হচ্ছে না, পোল ভেঙে আছে!

ভবানী। এ্যা? যা বাব্বা! ঝড়ের মতো ধুলো উড়িয়ে, পৃথিবী কাঁপিয়ে, দৈত্য দানা, ভূত প্রেতের মতন শালা ছুটে এলাম কি করতে? ভাবছিলাম আজকেও লেট হলে শালা চাকরি টিঁকবে না; এখন দেখছি শতদ্রু নদীর কূলে সেকেন্দর সা হতাশ হচ্ছেন! তার উপর শালা তাড়াতাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট করে এলাম!

সকলে। সে কি? কোথায়? কেমন করে?

ভবানী। ঐ তো, বেগমপাড়া ছাড়িয়ে যে বাঁশবনের মোড়টা আছে সেখানে।

রাধা। কি হল? কি?

ভবানী। এক শালা পন্টিয়্যাক গাড়ি সামনে চলেছে যেন ময়ূরপঙ্খী হেলতে দুলতে আহ্লাদ করতে করতে শালা যেন ছাঁদনাতলা চলেছে, টোপর পরে বিয়ে করতে। এক মাইল ধরে হর্ণ দিচ্ছি, শালা সর, সময় নেই। জানিসই তো, আমি লেট যাচ্ছি, সর না! তারপর ঐ মোড়টায় এসে শালা একটুখানি ফাঁকা পেয়েছি, আর বিদ্যুতের মতন শালা আমি সেই ফাঁকের মধ্যে! ময়ূরপঙ্খী ড্রাইভার শালা নার্ভাস—দেখি শালা বেতালা নাচছে, বেসুরো গাইছে। ঘ্যাঁচ করে ডানদিকে ঘুরিয়ে আমার গাদার ওপর দিয়ে লরি নিয়ে গেলাম—সে কি capacity! শালাকে ঠিক দশ হাত জায়গা ছেড়ে দিয়ে গেছি; তবু শালা capacity করতে পারল না, দেখি রাস্তা ছেড়ে বাঁশবনে গড়াগড়ি যাচ্ছেন টোপর পরা বর!

[রিপোর্টারদ্বয় উঠে পড়েছেন]

প্রবীর। তারপর!

ভবানী। তারপর চলে এলাম।

প্রবীর। না, বলছি ও গাড়িখানার কি হল?

ভবানী। কে জানে?

প্রবীর। ভেতরে সব যদি মরে থাকে?

ভবানী। মনে তো হয় না। অমন গদাইলস্করি গড়াগড়ি জীবনে দেখিনি মাইরি। কেন জানি না, পাড়ার সাধনবাবুর কথা মনে হয়ে গেল। সাধনবাবু লিচ্চয় ঐ রকম করে দুপুরে বিছানায় গড়াগড়ি খায়!

[সবাই হাসে]

প্রবীর। নির্মল চল, চট করে একবার আসি। এরা যা heartless, কিছুই বলবে না।

[নির্মলকে আর বলতে হয় না, সে লাফিয়ে ওঠে]

নির্মল। বাঁশবনটা কদ্দুরে?

ভবানী। বড়জোর দু মাইল! Artless না কি ইংরাজি গালাগাল দিলেন মশাই, কেন গো? [দুজনেই বেরিয়ে যায়] গালাগালটা কি দিল?

উদ্ধব। কইল heartless, অর্থাৎ হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর।

ভবানী। ও।

উদ্ধব। এবং আমি agree করি!

ভবানী। ও।

[সোনা ফিরে আসে]

সোনা। হতভাগা রাস্কেল, ইয়ার্কি মারিস! জানিস না আমার হার্ট উইক, ঘাবড়ে দিস অমন করে!

ভবানী। কি ব্যাপার? ম্যাটারটা কি?

সোনা। পাম্প কম দেখিছিলি হতভাগা?

ভবানী [হেসে]। তাই তো মনে হয়েছিল রে! কই হে, এতক্ষণে এসে ওয়েট করছি, পাঁইট কি হল। [এককড়ি উদ্ধবকে দেখিয়ে দেয় সবাই হাসে] ও! তাহলে মাংস টাংস আন দিকি! আমাকে ভাত, বুঝলে, ও তোমাদের শক্তটক্ত কর্কশ টর্কশ hard রুটি আমার মুখে রোচে না মাইরি। সোনাকেও ভাত দাও। মনে strong পাবে।

সোনা। থাক, নিজে গেল, আমার কথা ভাবতে হবে না। জল দাও দিকি, এককড়ি! শিগগির! উঃ, কি ভয়ানক!

[এককড়ি জল আনে। সোনা শিশি বার করে দুটো বড়ি খেয়ে ফেলে। ভবানীরা একদৃষ্টে লক্ষ্য করে। নকুল এবং কেষ্ট ঘুমিয়ে পড়েছে]

ভবানী। ওটা কি হল?

সোনা। ওষুধ।

ভবানী। কিসের?

সোনা। স্নায়ু। বোঝ? স্নায়বিক দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার ওষুধ। চা আর গোলমরিচ দেয়া টোস্ট দাও, এককড়ি। গোলমরিচ বেশ পুরু করে দিও। তা ছাড়া এ ওষুধ খেলে ঘুম পায় না।

হাজরা। তাই নাকি? কি ওষুধ রে?

সোনা। ডাক্তার দিয়েছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবা! অন্তত কয়েক ঘণ্টা একেবারে পাথরের মতন শক্ত হয়ে ইস্টিয়ারিং ধরে থাকি!

হাজরা। আমায় একটা দিবি?

সোনা। এঃ, ইল্লি! কুড়িটা বড়ির দাম সাড়ে পাঁচ টাকা, হরির লুট হয় না! [এককড়ি খাবার দিয়ে যায়] তা ছাড়া, এ বড় ভীষণ জিনিস। ধরলে আর ছাড়া যায় না।—উঃ!

[মাংসের পাত্রটা সজোরে ভবানী টেবিলে রেখেছিল, তাতেই সোনা চমকে উঠেছিল]

সোনা। জিনিসগুলো একটু আস্তে নাড়াচাড়া করতে পার না?

ভবানী। তার চেয়ে বাংলা খা না, সস্তা হবে। এককড়ি, পেঁয়াজ দিয়ে যাও গো, মাংসটা বেশ হয়েছে।

উদ্ধব। গলা দিয়া গলব?

ভবানী। এ্যাঁ?

উদ্ধব। কইতে আছি, গলা দিয়া গলব?

ভবানী। হ, গলব।

সোনা। কথাটার অর্থ?

উদ্ধব। অখনো আপনাগো ব্যাপার স্যাপার বুইঝ্যা উঠবার পারি নাই। এক গাড়ি মানষের প্রাণনাশ কইর‍্যা আইস্যা, দিব্য মাংস খাইতে আছেন?

ভবানী। হ, খাইতে আছি।

উদ্ধব। আবার ভ্যাঙাইতে আছেন? ঐ যে কইয়্যা গ্যাছে heartless, ঠিকই কইছে। মাথা ফাইট্যা, হাত পা ভাইঙা হয়তো তালগোল পাকাইয়া সব পইড়া আছে, আর খুনী এইখানে বইস্যা আমাগো লগে মস্করা করবার লাগছে।

ভবানী। তালগোল পাকিয়ে গেছে তো আমি কি করব মশাই?

উদ্ধব। ধাক্কা মাইরা রাস্তা হইতে ডোবার মইধ্যে নিক্ষেপ তো করবার পারছিলেন!

ভবানী। ধাক্কা কে মেরেছে মশাই?

উদ্ধব। ঐ একোই হইল, উনিশ আর বিশ!

ভবানী। একোই মোটেই নয়। উনিশ হলে ও আমার দোষ, বিশ হলে ওর নিজের। নিজের পাপে রাবণ সোনার লঙ্কা পুড়িয়ে ফেলল, আর ময়ূরপঙ্খীর সখের নাগররা তো শুধু কাদায় চান করছেন।

উদ্ধব। আপনি গাড়ি থামাইয়া দেখছিলেন?

ভবানী। আজ্ঞে না।

উদ্ধব। ক্যান?

ভবানী। সময় কোথা? পাঁচ মিনিট লেট হলে আট আনা জরিমানা। আপনি দেবেন?

উদ্ধব। আবারো সেই একোই কথা শুনি; তুচ্ছ টাকার লাইগ্যা ধর্ম বির্সজন দিয়া আসছে।

ভবানী। ধর্ম বিসর্জন কোথায় দিলাম মশাই? মনে করুন আমি তিনদিনে আট টাকা জরিমানা দিয়েছি। তার ওপর আজ এস্টার্ট করতেই দেরি হয়ে গেল, কারণ বাংলার দোকানটার সামনে এক ব্যাটা বেজন্মা লাল পাগড়ি টহল মারছিল। শালার মহা কড়া look!

উদ্দব। আপনার লজ্জা নাই?

[উদ্ধব টেবিলে এক প্রচন্ড চড় কষেন; চমকে ওঠে সোনা]

সোনা। উঃ! দেখুন, স্যার, ঐ চড় চাপড়গুলো না মারলে হয় না?

উদ্ধব। আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেছি! মদ্যপানের লাইগ্যা আপনার দেরি হইছে, তাই ঘন্টায় ত্রিশ মাইল গতিতে—

ভবানী। চল্লিশ—

উদ্ধব। একোই হইল। চল্লিশ মাইল গতিতে জগন্নাথের রথ চালাইয়া দিলেন। কয় হতভাগা রথের তলায় চ্যাপ্টা হইয়া গেল গা, তা দেখনেরও প্রয়োজন নাই!

ভবানী। দেখনের জন্য সময় চাই, মশাই! আমাদের ঐ সময় জিনিসটারই বড় অভাব, বুঝলেন? গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডে সব বড় বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়—আমরা তো চুনোপুঁটি—সবই তো সময়ের অভাব! জরিমানা দেব কেন?

উদ্ধব। মানষের প্রাণ বাঁচাইবার লাইগ্যা দিবেন, আর ক্যান?

ভবানী। আর আমাদের পরিবার কটাকে আপনার বাবা এসে উপপত্নী করে রেখে খেতে পরতে দেবেন না? [সবাই হাসে] ভোরের আলো ফুটে গেলে যে কলকাতার পাঁচ মাথার মোড়ে লরি আটকে ফেলবে, আর সঙ্গে সঙ্গে চাকরিটি বুলবুলির মতন ধানটি খেয়ে ফুড়ুৎ করে হাওয়া হয়ে যাবে, আপনার বাবা এসে ছাড়াবেন না?

[সবাই হাসে]

উদ্ধব [ক্ষিপ্তপ্রায়]। বাপ তুইল্যা গালাগাল দিতে আছেন? ছোটলোকের পোলার আর কি জ্ঞান হইব? এইতো দ্যাশের হাল! সূর্য স্যান কোথা? উনিশ শয় বত্রিশ সালের ৪ঠা জানুয়ারি রাত্র এগারো ঘটিকায় যখন ঢাকায় উদ্ধব ঘোষেরে গ্রেপ্তার করবার লাইগ্যা আইছিল, তখন—

এক। আঃ, কি হচ্ছে, উদ্ধবদা, আবার লাগিয়েছেন?

উদ্ধব। আমার বাপ তুলছে!

এক। আরে ওসব ছোটলোকের কথায় কান দেন কেন? চা দেব আর একটু?

উদ্ধব [গোমড়ামুখে]। দ্যাও!

হাজরা [হঠাৎ]। দুস সালা, কিস্‌সু ভাল লাগে না!

[ইন্দ্র নেমে এসে ভবানীর কাছে দাঁড়ায়]

ইন্দ্র। বেথুয়াডহরিতে লোক নিচ্ছে ভবানীদা, আড়ৎ-এর কাজে?

ভবানী। না রে ভাই। ছাঁটাই করছে। বোস্। [ইন্দ্র মাথা নেড়ে জানায় সে বসবে না] বউ ভাল আছে? [ইন্দ্র মাথা নেড়ে জানায় সে ভালই আছে] চা খাবি?

ইন্দ্র। খেয়েছি।.....চাকরি নেই?

ভবানী। নাঃ, কই আর? দেখব, কলকাতার হয়তো....তা তুই তো কলকাতায় গিয়ে থাকতে পারবি না।......রাতদিন কি ভাবিস রে, ইন্দ্র? আগে কেমন গান করতিস, কব্‌তে বাঁধতিস, যাত্রা করতিস! গান টান বাঁধ না একটা, শুনি।

ইন্দ্র [বিষন্ন হেসে]। গান আসে না। [একটু পরে] ভোরের আলো ফুটে গেলে চাকরি যায়। আর গান তো ভোরের শোভা নিয়েই লেখে। ভোর এখন বড় ভয়ানক!

[আবার গিয়ে নদীর ধারে বসে। কনস্টেবল পুনঃ প্রবেশ করে]

কন। WBQ 3600 কার লরি? [সোনা উঠে দাঁড়ায়] লাইসেন্স দেখি। Overload! দেখে নেব! সব কটাকে দেখে নেব। দেখি লাইসেন্স!

[সোনা বিষম চমকে ওঠে]

সোনা। দেখুন স্যার, কথাগুলো একটু আস্তে বলুন তো। আমার পিলে শুদ্ধ চমকে উঠছে।

কন। বেশি ইয়ে করতে হবে না। দেখে নেব! রিপোর্ট করলে কত ফাইন হবে, জান? লাইসেন্স দেখি?

সোনা। আসুন।

[লাইসেন্সর মধ্যে টাকা পুরে দিয়ে দেয়; টাকাটি কৌশলে বার করে নিয়ে কনস্টেবল লাইসেন্স ফেরৎ দেয়]

কন। এবারকার মতো ছেড়ে দিলাম। আচ্ছা, WBQ 2211 কার গাড়ি? দেখে নেব....[হাজরা দু টাকা বাড়িয়েই রাখে; সেটা পকেটস্থ করতে গিয়ে কনস্টেবল-এর বাক্য অসমাপ্তই থেকে যায়। সে বেশ উল্লসিত হয়ে উঠেছে।] আচ্ছা, এবার WBQ 1009!...WBQ 1009!.....ও, জবাব দেবে না বুঝি? আচ্ছা, দেখে নেব! [পায়ে পায়ে ভবানীর দিকে এগিয়ে আসে] এ্যাই you! তোমার লরির নম্বর কত?

ভবানী। WBQ 1009!

কন। জবাব দিচ্ছ না যে!

ভবানী। শেষ পর্যন্ত সাত ঘাটের জল খেয়ে আমার কাছে তো আসবেই। তাই গন্ডগোল করলাম না।

কন। ও, ইয়ে হয়েছ, না! লাইসেন্স দেখি?

ভবানী। এই লিন!

কন। তোমার লরি আটক করা হল।

ভবানী। কেন?

কন। Overload হয়েছে।

ভবানী। অসম্ভব।

কন। তার মানে।

কন। ওজন করে দেখেছেন?

কন। চোখে দেখলেই বোঝা যায়।

ভবানী। আজ্ঞে না, হিসেব করে দেখিয়ে দিতে পারি এক ছটাকও বেশি মাল নেই।

কন। ফের তর্ক! দেখে নেব। ব্যাটা, তুমি যাও ডালে ডালে আমি যাই পাতায়! লরি আটক!

[লাইসেন্সটা সজোরে টেবিলে ফেলে, সোনা চমকে ওঠে]

ভবানী [লাইসেন্স পকেটে পুরতে পুরতে]। বেশ, তা কি আর করা যাবে!

কন। রিপোর্ট করব। হ্যাঁ। [ডায়েরি বার করে] কড়া রিপোর্ট। কত জরিমানা হবে জান?

ভবানী। হ্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ। পঞ্চাশ টাকা।

কন। চুল বিকিয়ে যাবে!

ভবানী। তবু দেব। লিখুন রিপোর্ট।

[কনস্টেবল মুস্কিলে পড়ে; পেনসিল থেমে যায়]

কন। দেখ, ভবানী মোদক, এ রিপোর্ট দাখিল করলে তোমার সর্বনাশ হবে। তোমার জেল হবে।

ভবানী [শাসিয়ে ওঠে]। বলছি রিপোর্ট লিখে এখান থেকে কেটে পড়ুন মশাই, নইলে কালকে পাগলাচন্ডীতে আপনার শবদেহ ভাসবে, লখিন্দরের মতন। খুব সাবধান!

[বিষম ঘাবড়ে কনস্টেবল দু-পা পিছিয়ে যায়; তারপর ডায়েরি পকেটে পোরে]

কন [অস্ফুটকণ্ঠে]। দেখে নেব। [উধাও হয়]

ভবানী। শালা, ঘুষ চাইতে এসেছিল! তোরা সক্কলে দিয়ে দিয়ে ব্যাটাদের মাথায় তুলেছিস। এক থাপ্পড় মারলে গর্তে সেঁধোয়।

সোনা। আস্তে, আস্তে! বুক ধড়ফড় করছে।

ভবানী। তোর দেহে আর কিছু নেই জানিস? গাড়ি চালাস কি করে?

সোনা। কালীঘাটের কালীকে ভাবতে ভাবতে, রামকেষ্ট ঠাকুরকে স্মরণ করতে করতে। একটা করে ট্রিপ করি, আর মাথার চুল কয়েকগাছা সাদা হয়ে যায়।

হাজরা। কিসের এত ভয়?

সোনা। কি জানি?....আবার শুধু ভয় নয়, কাঁপুনি! ইস্টিয়ারিং ঠিক রাখা দায়। ওদিক থেকে গাড়ির হেডলাইট আসছে দেখলেই কেমন দাঁত কপাটি লেগে যায়। ব্রেক কষে ফেলি।

হাজরা। দুস শালা, মেয়েমানুষের অধম!

সোনা। তাই হবে!

রাধা। সেইজন্যোই রোজ লেট হোস, না?

সোনা। হ্যাঁ।.....রাত্রে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি, একসেলেটর চেপেছি, আর উঠছে না। অথবা, পাহাড়ে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে উঠছি হঠাৎ ইস্টিয়ারিং আর ঘোরে না। উঃ, ঘেমে নেয়ে উঠি!

হাজরা। তোর কোনো রোগ হয়েছে, চিকিচ্ছে করা।

ভবানী। আরে না রে, সেই একসিডেন্টের পর থেকে ব্যাটা সেক করে গেছে। না কি, বল?

সোনা। তা হবে! উঃ, সে কি একসিডেন্ট করেছিলাম, না?

রাধা। কোথায়? কবে?

সোনা। আস্তে, আস্তে, উঃ। তখন আমি বনগাঁ লাইনে। আরিব্বাস! একটা বাস, মোড় ঘুরেই সামনে বাস ভর্তি লোক! চট করে চিন্তা করলাম আমি একা ওরা অতজন। মরলে আমারই মরা উচিত। ইস্টিয়ারিং পুরো ঘুরিয়ে দিলাম বাঁয়ে; হুমড়ি খেয়ে...উঃ, কাঁচ ভেঙে! এই দ্যাখ, ইস্টিচ! মাথায় চারটে ইস্টিচ, মুখে দুটো! উঃ....

[আবার একটা লরির গর্জন শোনা যায়; কনস্টেবল ইতিমধ্যে ফিরে এসেছিল, লরির শব্দে উৎকর্ণ হয়ে সে এগিয়ে যায়। প্রবেশ করেন জনৈক সুবেশ ভদ্রলোক ও চিত্রকূট সিং। ভদ্রলোক প্রবেশ করেই ছোটেন গুমটির দিকে; কনস্টেবল চিত্রকূটকে নিয়ে পড়ে]

কন। তোমার গাড়ির নম্বর?

চিত্র। WBQ 2121।

কন। লাইসেন্স দেখি?

চিত্র। লেন।

কন। হুম, চিত্রকূট সিং! দেখে নেব রিপোর্ট করব।

চিত্র। কেনো মোশা? হামি কি করল?

কন। ও, চেপে ধরলে চিহি করো, ছেড়ে দিলে লাফ মারো। ফাইন হবে, জরিমানা! তোমার লরি আটক করা হল।

চিত্র। আরে ভাই কসুরটা কি তো বোলেন!

কন। আহা, জানেন না যেন! Overload! Overload! হয়েছে, বুঝেছ?

চিত্র। ও, সোহি বোলেন! হামি ভাবছি কি কোথায় একসিডেন্ট করে এসেছি, ইয়াদ নেহি।

কন। বেশি চালাকি কোর না, বুঝলে চিত্রকূট? পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হবে জান?

চিত্র। কেনো হোবে? হামার খালি তো লোরি!

কন। এই রিপোর্টটা দাখিল করা মাত্র....এ্যাঁ? খালি? তো এতক্ষণ ওগড়াচ্ছ না কেন? মুখ ফোটেনি?

[প্রস্থান। চিত্রকূট একগাল হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ইতিমধ্যে গুমটির মুখে বচসা বেধে উঠেছে]

সত্যেন। তা আমি কি করব মশাই? পোল কি আমি বন্ধ করেছি?

সুবেশ। আর আমার যে loss হবে তার জন্যে কে দায়ী হবে?

সত্যেন। যেই হোক, মোটের ওপর আমি নই।

সুবেশ। দেখুন মশাই, আমার নাম অশোক সান্যাল, ভারত সিমেন্ট আমারই কারখানা। শ্যামনগরে আমার তিন টন সিমেন্ট পড়ে আছে। ভোরবেলায় কলকাতায় delivery দিতে হবে। অনেক হাজার টাকা মামলা বুঝেছেন? যদি lose হয় তো ক্ষতিপূরণ দেবে কে?

[শেষাংশে অশোকবাবু ক্ষিপ্ত চিৎকার করে ওঠেন। সত্যেন একটু তাকিয়ে দেখে, তারপর উঠে পড়ে]

অশোক। কি? কোথায় চললেন?

সত্যেন। বাড়ি যাচ্ছি, ঘুমোতে। মাঝ-রাত্রে পাগলের প্রলাপ শুনতে রাজী নই।

অশোক। দেখুন মশাই, আমার তিন টনের খালি লরি। হুস করে বেরিয়ে যাবে। পোলের কোনো ক্ষতি হবে না।

সত্যেন। আঃ, কি জ্বালা! আইন কি আমার হাতে নাকি? আমাকে জ্বালাচ্ছেন কেন বলুন তো!

অশোক। দেখুন, এর জন্যে যদি কিছু.....মানে....

সত্যেন। আঃ। আপনার জন্যে কি জেল খাটব নাকি মশাই? এ্যাঁ?

অশোক। আমি কি করব? কিছু বলুন, উপদেশ দিন, সাহায্য করুন।

সত্যেন। ঐ যে আলো জ্বলছে, ওটা রোড ইঞ্জিনিয়ারের ক্যাম্প; সেখান থেকে নাকাশিপাড়া খেয়াঘাটে টেলিফোন করুন, বার্জ পাঠাতে পারে। লরি পার করে দেবে এখন।

[অশোক তৎপর হয়ে পড়েন]

অশোক। এই চিত্রকুট, তুম হিঁয়াপর বৈঠো, হাম নৌকাকা বন্দোবস্ত করনে যাতা। না হয় তুম চা-টা খা লেও, বুঝা?

চিত্র। জি।

[চিত্রকুটকে আনা চারেক পয়সা দিয়ে অশোক এক রকম ছুটে বেরিয়ে যান। চিত্রকুট দোকানের দিকে এগিয়ে আসে]

চিত্র। বোতল দো ভাই!

এক। পরে ভাই, একটু পরে। বুঝতে পারছ না?

[উদ্ধবের প্রতি মস্তক হেলনে বুঝিয়ে দেয়—ঐ বৃদ্ধের সামনে মদ্যপান বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে]

এক। চা দেব?

চিত্র। অরে ধৎ। রাতের বেলায় চা খায় থোরি।

ভবানী। এ চিত্রকূট—পরিবার কেমন?

চিত্র। হাসপাতালে।

ভবাণী। ভাল হবে, না ট্রাবল্ দেবে?

চিত্র। ভাল হোবে, লেকিন পোয়সা কিছু খরচা হবে।

হাজরা। রোগটা কি?

চিত্র [হেসে]। পেট। [সকলেই হাসে] তোবে হামার খেয়াল কি লড়কা হামার নয়।

হাজরা। সে কি রে?

চিত্র। হাঁ।

নকুল। ব্যাটা বলে কি? তবে কার লড়কা রে?

চিত্র। অরে ভাই রাতভর গাড়ি চালাই, আউরৎ অকেলাই ঘোরে থাকে। এক শালা গাড়ির মিস্তিরি হামার ঘোরের পাসে থাকে। হামার খেয়াল কি ওহি কুছু কোরেছে।

হাজরা [হেসে]। তবে কিছু একটা কর?

চিত্র। কি কোরবো? কছু পরমান আছে থোরি? পরমান পেলে শালাকে—অউর শালিকে—ডান্ডা মেরে খতম কোরে দিব। লেকিন পরমান?

[হাজরা, সোনা ও রাধানাথ খুব হাসে]

ভবানী। ওঃ, হাসি যে ধরে না আর? খুঁজে দেখগে না নিজেদের ঘরে। ইঁদুরের গর্তগুলো ভাল করে দেখিস। এক একটা কেচ্ছা বেরিয়ে পড়বে এখন।

হাজরা। হেট!

ভবানী। ওরে বানচোৎ, সারা রাত তো গাড়িতে বসে থাকিস, আর ইস্ত্রি বুঝি বেউলার মতন ওয়েট করে করে শুকিয়ে যাচ্ছে? এক আধটা চুটকি কারবার বউ নিচ্চয় চালিয়েছে।

হাজরা। তোর বউ চালিয়েছে বুঝি?

ভবানী। প্রায়।

হাজরা। মানে?

ভবানী। আমার বউ বাবা সতী। এক শালা বানচোৎ রাত্তিরে ঘরের আশে পাশে ঘুরঘুর করত। বউ আমাকে বলে দিল। তারপর শালা ইস্টার্টার দিয়ে কাঁধে এক ঘা দড়াম করে বসাতেই হাওয়া হয়ে গেল।

উদ্ধব। এই সমস্ত অভদ্রোচিত রসালাপের ল্যাইগা অন্য স্থানে গেলে হয় না?

ভবানী। না হয় না। আপনি বরং কানে তুলো দিন।

উদ্ধব। নিতান্তই অভদ্র!

[একটু সরে বসেন; সবাই হেসে ওঠে]

হাজরা। আমার বাবা ওসব ভয় নেই। ঘর ভরতি লোক। বাপ, পিসে, মামা, দুই দাদা, বৌদি—বাপ্‌স! কিন্তু এর আবার অন্য বিপদ। আমার ঐ বানচোৎ বড়দা কোনো কাজ কম্ম করবে না, বসে বসে খাবে। আর তারপর বানচোৎ মামা—পেন্সনের টাকা পায় পঞ্চাশটা, একটা আধলা বাড়িতে দেয় না, ধেনো খেয়ে ওড়ায়। আর বানচোৎ পিসে, ভিমরতি ধরেছে, বুড়ো বয়সে বাড়ি পালিয়ে নার্গিসের ছবি দেখতে ছোটে; দরকার হলে পয়সা চুরি করে। আর ঐ বানচোৎ বাবা, কি বলব তোমাদের.....

[উদ্ধব আর সহ্য করতে পারেন না, দাঁড়িয়ে ওঠেন]

উদ্ধব। অশিষ্ট! ছোটলোক!

হাজরা। ওকি বুড়োদা! দুটো প্রাণের কথা বলছি, বানচোৎ পরিবারের কথা, আর....

[দ্রুতপদে উদ্ধব গিয়ে গুমটির ধারে বসেন]

চিত্র। এ এককৌড়ি, বুড্ঢা তো সোরে গেছে, এই পাঁইট ছাড়।

এক। আরে বাবা, একটু সবুর করো না, বুড়ো এক্ষুনি শুতে যাবে, তখন কসে-

ভবানী। আরে দুত্তোর বুড়োর ইয়ে করেছে! বার কর বোতল।

হাজরা। সেই তখন থেকে দিচ্ছি দিচ্ছি—দুস্ শালা, কিস্সু ভাল লাগে না!

[এককড়ি গুটি চারেক বোতল আর ভাঁড় বার করে টেবিলের উপর স্থাপন করে। সকলে আক্রমণ করে। কেষ্টও উঠে পড়ে]

রাধা। তুই ওদিকে গিয়ে বোস!

[কেষ্ট এসে উদ্ধবের পরিত্যক্ত জায়গায় বসে; কাগজটা নাড়ে চাড়ে]

হাজরা। আঃ, শালা, প্রাণ ঠান্ডা হল!

ভবানী। দু ঢোঁক পেটে গেলেই মনে হয় ষাট সত্তরের কম ইস্পিডে গেলে জীবন বৃথা। শুনছি শালা কোম্পানি নতুন গাড়ি কিনবে—মার্চিডিজ—হ্যাঃ। ঝড় ওড়াব! লজ্‌ঝড় ফোর্ড নিয়ে আর চলছে না।

সোনা। আমার মার্চিডিজ!

ভবানী। তোর হাতে কি মার্চিডিজ কি চেব্রোলেট! চলিস তো গরুর গাড়ির মতন টিকরিয়ে টিকরিয়ে যেন বুড়ো বুড়ি বৃন্দাবন চলল।

[কেষ্ট কাগজটা ছিঁড়তে আরম্ভ করে]

নকুল। ও কি রে? কাগজ ছিঁড়ছিস কেন?

রাধা। আরে, তাও বোঝো না? ফ্লিম ইস্টারের ছবি কেটে গাড়ির কাঁচে সাঁটবে। নার্গিসের ছবি পেয়েছে আর কি!

কেষ্ট। না, মধুবালা।

রাধা। একবার আমার উইন্ডশিল্ডখানা দেখো না। অর্ধেকটা ছবিতে ঢেকে গেছে।

ভবানী। এই কেষ্ট, মধুবালাটা কোনটা? নেই নাক খ্যাঁদাটা না?

কেষ্ট। মোটেই নয়। কি যে বলেন ভবানীদা! এই দেখুন।

ভবানী [ছবি দেখে]। হ্যাঁ, নাক খ্যাঁদাটাই তো। ছুঁড়িকে বেশ লাগে আমার। নতুন গাড়িটা যদি পাই তো তার নাম রাখব মধুবালা।

নকুল। হ্যাঁ, যা বলেছিস! আমাদের গাড়িগুলোর নাম এক একটা যা হয় না—ছোঃ—সরস্বতী, জয় মা তারা; আর কালী নামের তো শেষ নেই; মা কালী, জয় কালী, ওঁ কালী—

হাজরা [ভেঙিয়ে]। শ্রী শ্রী কালী!

[অশোকবাবু ছুটে প্রবেশ করেন। করেই সত্যেনের সঙ্গে বচসায় লিপ্ত হন]

অশোক। নাকাশিপাড়ায় ট্রাফিক বেড়ে গেছে, বার্জ আসবে না। কি করব বলুন?

সত্যেন। কি বলব বলুন!

অশোক। বা, আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে বসে আছেন, আর কিছু বলার নেই?

সত্যেন। আবার সেই কথা? আরে দাদা, পোল কি আমি বন্ধ করেছি?

অশোক। তবে কে করেছে? কেন করেছে?

সত্যেন। করেছে ইঞ্জিনিয়ার, কারণ পোল বিপজ্জনক।

অশোক। আজ সকাল পর্যন্ত ঠিক ছিল, এখন হঠাৎ বিপজ্জনক? চালাকি নাকি?

সত্যেন। দেখুন মশাই আপনি কে? আপনাকে আমি কোনো কৈফিয়ৎ দেব না। যা খুশি করতে পারেন।

[অশোকবাবু হতাশ হয়ে পড়েন; সুর পাল্টে আবেদনের ঢং ধরেন]

অশোক। দেখুন, আমার হাজার ছয়েক টাকা ক্ষতি হয়ে যাবে। দয়া করে একটা পথ টথ বাৎলান দাদা। একেবারে মরে যাব!

সত্যেন [নরম হয়ে]। এত রাত্তিরে কিই বা আর করা যাবে? দেখুন, যদি আশে পাশে কোনো বড়সড় নৌকো টৌকো পান। খালি লরি তো, পার করে দিতে পারে।

অশোক [আবার তৎপর]। হ্যাঁ, তাই করি। চিত্রকূট সিং!

চিত্র। হজৌর!

অশোক। ঢুঁরো। নৌকো ঢুরো। আশে পাশে বড়া নৌকা হ্যায় কিনা দেখো। লরি পার করেগা। [চিত্রকূট বাঁধ অভিমুখে অগ্রসর হয়।] বোলেগা মোটা বকশিশ দেগা।

চিত্র। মোটা বকশিশ? জি!

[চিত্রকূট প্রস্থান করে। অন্য ড্রাইভাররা একবার আড়চোখে অশোক বাবুকে দেখে নিয়ে আবার অনুচ্চস্বরে গল্প আরম্ভ করে; অশোক ভেবে পান না কি করবেন; উনি মালিক স্থানীয়; ড্রাইভারদের সঙ্গে এক টেবিলে বসাটা কি উচিত হবে]

ভবানী। তারপর? তারপর?

নকুল। হ্যাঁ, বর্ধমানের কাছে এসে শালারা গাড়ির হুডটা নামালে। ও হরি! ভেবেছিলাম একটা মেয়ে মানুষ, দেখি দুদিকে দুটো, মাঝখানে লোকটা; আর পোশাক আশাকের যে অবস্থা, কি আর বলব! বাঁদিকের মেয়েছেলেটা এমন ফর্সা যে আমি তেতে গেলাম—হঠাৎ দিলাম হর্ণ টিপে—প্যাঁক প্যাঁ এ্যাঁ এ্যাঁক! আর চমকে উঠে....

[গল্পটা যে নেহাতই আদিরসাত্মক সেটা বুঝে অশোকবাবু কিছু দূরে বসাই স্থির করেন]

অশোক। ও দোকানী। দোকানদার কে?

[এককড়ি কোনো কাজে ভেতরে গিয়েছিলেন; হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে আসে]

এক। আজ্ঞে, হুকুম করুন।

অশোক। চা হবে?

এক। আজ্ঞে নিশ্চয়ই।

অশোক। দাও। ভাঁড়ে নয় ভাই, শুধু মাটি ওঠে। গেলাসে দিও, কেমন?

এক। আজ্ঞে কাপ আছে, কাপে দেব? তো আপনি বসবেন না?

অশোক। হ্যাঁ দাও একটা চেয়ার; এই দিকটায় বসি। ওখানে—মানে—বুঝলে না? ঐ গন্ধটা ঠিক সহ্য হয় না।

এক। বটেই তো। [ছুটে গিয়ে এককড়ি চেয়ার আনে। অশোক বসেন] চায়ের সঙ্গে আর কিছু দেব?

অশোক। আর কিছু? না, আর কিছু তো এখন....কি? আছে কি?

এক। চপ হবে, কাটলেট হবে, সিঙাড়া, নিমকি, ঘুগনি। রুটি মাংসও খেতে পারেন স্যার, এক্ষুণি নামিয়েছি।

অশোক। না না, তুমি বরং চপই দাও গোটাদুয়েক।

[এককড়ি প্রস্থান করে; এদিকে নকুলেরর গল্প শেষ হয়; হাজরা সুরু করে]

হাজরা। আর আমি যা দেখেছি না, তোরা বাপের জন্মে দেখিসনি!

অশোক [গলা খাঁকারি দিয়ে]। তোমরা সব ড্রাইভার বুঝি?

[সবাই অবাক হয়ে চুপ করে; ভবানী একবার শূন্যে তাকায়, একবার দোকানের অভ্যন্তরে, একবার টেবিলের তলায়—কোত্থেকে শব্দটা এল যেন বুঝতে পারছে না। অবশেষে সে অশোকবাবুর দিকে তাকায়]

ভবানী। কিছু বললেন?

অশোক। তোমরা সব ড্রাইভার বুঝি?

নকুল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অশোক। কোন কোম্পানি?

নকুল। আমরা তিনজন গর্ডে এরা সিংহানিয়া।

অশোক। ও, সবাই পাট নিয়ে যাও? তা তো হবেই, রাস্তাটা তো বলতে গেলে পার্ট চালানের প্রধান নাড়ি। তা পোল তো বন্ধ; কি করবে?

হাজরা। আঃ, বাদ দাও না; কথা বলছি, মাঝখানে থেকেই......

নকুল। আজ্ঞে, একটু বাদে বাবু টাবু দু চারজন এসে পড়বে; তারপর সকাল বেলায় বার্জ টার্জ এলে নদী পার হয়ে যাব।

অশোক। হুম্। [নীরবতা] কিন্তু আমার যে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলবে না! বড় মুস্কিলে পড়লাম। [ইন্দ্র ইতিমধ্যে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে] শ্যামনগরে কয়েক টন সিমেন্ট পড়ে রয়েছে, সকাল বেলায়ই কলকাতা পৌঁছুনো চাই। নইলে বুঝলে না, বহু টাকার ক্ষতি। সাহেব কোম্পানী টকাটক অর্ডার ক্যানসেল করে দেবে। আবার সব শেয়ালের এক রা; যতকটা সাহেব কোম্পানীর সঙ্গে কারবার আছে, প্রত্যেকটা অর্ডার ক্যান্সেল করবে। [ইন্দ্রের স্থির দৃষ্টি লক্ষ্য করে] কি চাই?

ইন্দ্র। বাবু, আপনার কারখানায় বা ডিপোয় চাকরি বাকরি এক আধটা পাওয়া যাবে?

অশোক। দূর চাকরি! চাকরি কোথায়? ব্যবসা করার সাধ মিটে গেছে বাবা, লোক কমিয়েও সামাল দিতে পারছি না, নতুন লোক নেব কি করে? আরে কি আপদ! এমনি দুশ্চিন্তায় আমার পেট গুলিয়ে উঠেছে, তার উপর আবার—যাও, ভাগো!

ভবানী। ইন্দ্র, এদিকে আয়রে! [ইন্দ্র সরে আসে] যাস কেন ওদের কাছে? বোস। [ইন্দ্র বসে] অমন রাস্তায় ঘাটে হাত পেতে চাকরি পাওয়া যায়?

ইন্দ্র। কিন্তু চাকরি যে পেতেই হবে!

ভবানী। তা তো হবে, তা বলে.....

ইন্দ্র। না, না, আজই পেতে হবে।

ভবানী। হঠাৎ এত তাড়া? দুদিন সবুর সইবে না?

ইন্দ্র। না।

ভবানী। সে কি রে? কেন?

ইন্দ্র। এদিকে সরে এস, বলছি। [ভবানী অবাক হয়ে ইন্দ্রর কাছে এসে উবু হয়ে বসে] ওরা শুনলে হাসবে। ক্ষেপাবে আমাকে। শোনো, ভবানীদা, আমি একটা কাজ জোগাড় করতে না পারলে, রেবা আমাকে ছেড়ে চলে যাবে।

ভবানী [হেসে]। দূর শালা, পাগল নাকি তুই?

ইন্দ্র। আস্তে, পায়ে পড়ি, আস্তে!

ভবানী [গম্ভীর হয়ে]। এ সব পাগলামি ছাড় দিকি, ইন্দ্র!

ইন্দ্র। না না, রেবা বলেছে।

ভবানী। বলতে পারে। রাগের মাথায় লোকে কত কি বলে!

ইন্দ্র। রেবা বাজে কথা বলে না।

ভবানী [একটু থেমে]। কি বলেছে?

ইন্দ্র। বলেছে, খাওয়াবার মুরোদ না থাকলে বউকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। [নীরবতা] এমনিতেই আমার—আমার অপমান হয়। দিনে রাতে অপমান হয়।

ভবানী। কেন?

ইন্দ্র। আমি পুরুষ, কাজ নেই। বউয়ের টাকায় খাই। হ্যাঁ। ঝি-গিরি করছে। আমি বউয়ের টাকায় খাই। তাই রেবা বলেছে, আমি রোজগার করতে না পারলে, যে রোজগার করতে পারে তার কাছে গিয়ে থাকবে। [একটু থেমে] আমার অপমান হয়েছে। রেবার ভাই, দাদা, আত্মীয়স্বজন সবাই আমাকে—মানে—আমার গায়ে থুথু দেয়। তাই—

[কাল্পনিক এক লরি চালিয়ে জগু প্রবেশ করে; সে উন্মাদ; মুখেই সে গাড়ি সংক্রান্ত নানা শব্দ করে, হর্ন বাজায়, ব্রেক কষে; তারপর কাল্পনিক ফুটবোর্ডে পা দিয়ে নেমে আসে। কেউ তাকে বড় একটা গ্রাহ্য করে না। এককড়ি তখন অশোকবাবুর খাবার সাজাচ্ছে; জগু এসে পিছনে দাঁড়ায়]

জগু। এককড়িদা। আমি না—তিন টন লরি আর চালাব না।

এক। হ্যাঁ।

জগু। আমি না—বেলডাঙা থেকে আসছি, বুঝলে?

এক। হ্যাঁ, এবার চুপটি করে বস তো।

অশোক। কে ও?

এক। ও জগু। মাথা খারাপ। লরি চালাত।

[অশোকবাবু খেতে আরম্ভ করেন; একমাত্র একদৃষ্টে জগুকে লক্ষ্য করেন। জগু একধারে বসেছিল, আবার উঠে পড়ে। এককড়ির পেছন পেছন দোকান পর্যন্ত আসে]

জগু। এককড়িদা। আমি না—আজকে খুউব জোরে চালিয়েছি, বুঝলে?

এক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বোসো তো, লোকে নিন্দে করবে!

জগু। বসলে কি করবে?

এক। আদর করবে, চা খেতে দেবে, ভাল বলবে।

[জগু চুপ করে বসে থাকে, মুখে হাসি। দেখতে দেখতে হঠাৎ এক সময়ে মাথা নামিয়ে নেয়। ইন্দ্র মৃদুকণ্ঠে বলে]

ইন্দ্র। ভবানীদা, আমার মাথার দোষ দেখছ?

ভবানী। ধ্যেৎ!

ইন্দ্র [একটু থেমে]। কিছুদিন পর আমি কি ঐ জগুর মতন হয়ে যাব?

[ভবানী কোনো জবাব দেয়ার আগেই আলোর ঢেউ তুলে রিপোর্টারদ্বয় প্রত্যাবর্তন করেন]

নির্মল। পেট্রলের পেট্রল গেল, সময় নষ্ট, energy—মাঝ রাত্তিরে ছুটোছুটি করছি বনে বাদাড়ে।

প্রবীর। কই হে, তুমি না বললে এক গাড়ি লোক বাঁশ বনে শুইয়ে দিয়ে এসেছ?

ভবানী। কেন, পাননি?

প্রবীর। গাড়িখানা চুরমার হয়ে পড়ে আছে দেখলাম, কিন্তু লোক কোথায়? গাড়ির যা অবস্থা হয়েছে তাতে ওরা যে বেরিয়ে হেঁটে চলে গেছে তা তো মনে হয় না।

ভবানী। তা দাদা গল্পের শেষটা তো আর শুনলেন না—ইংরিজি গালাগাল দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। লোক কটাকে আমি লরিতে তুলে পাথুরি হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এসেছি। আজকে এই পুল ভাঙা না থাকলে ঐ ব্যাটাদের জন্য আমার একঘন্টা লেট হত।

[কিছুক্ষণ রিপোর্টারদের বাক্যস্ফূর্তি হয় না]

নির্মল। বোঝো ঠ্যালা! মিছিমিছি ঘোড়দৌড় করালেন?

[ড্রাইভাররা হেসে ওঠে]

প্রবীর। মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল। ভেবেছিলাম রাতটা বেশ useful হবে, একটা সুন্দর accident এর story নিয়ে; মাঠে মারা গেল!

নির্মল। আমরা গাড়ির মধ্যে ঘুমোতে চললাম।

প্রবীর। তার চেয়ে চল না, নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে আসি।

অশোক। মশাইরা মনে হচ্ছে newspaper-এর লোক।

প্রবীর। আজ্ঞে হ্যাঁ। Tribune।

অশোক। এই যে দেখছেন পোল বন্ধ করে রেখেছে, এ বিষয়ে আপাদের কাগজে কিছু লেখালেখি হওয়া উচিত। এই দেখুন না আমার অত্যন্ত urgent consignment of cement আটকে যাচ্ছে। আর cement-এর প্রতি পাউন্ডই তো Second

Five Year Plan-এর জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। অতএব এ রকম ব্রিজ বন্ধ করে দেয়া একদিকে থেকে আমাদের Five Year Plan-কেই আঘাত করছে, কেমন কিনা?

প্রবীর। মানে এ ভাবে জিনিসটা ভেবে দেখিনি, তবে এখন তো মনে হচ্ছে ঠিকই বলেছেন।

অশোক। আলবাৎ ঠিক বলছি। তাই বলছি কাগজে লেখা দরকার।

প্রবীর। দেখুন এ ধরনের লেখা—মানে আমরা একটা কিছু sensational, একটা accident বা riot এসব ছাড়া আর কিছু—মানে—

[চিত্রকূট ঢোকে]

অশোক। দাঁড়ান, এক মিনিট। কেয়া হুয়া?

চিত্র। গাড়ি লেনে কো কোই তৈয়ার নহি হ্যায়। কহতা হ্যায় কি নাও হালকা হ্যায়, ইস লিয়ে—

অশোক। মোটা রকম বকশিস কা বাৎ বোলা থা?

চিত্র। জি।

অশোক। তবভি গররাজী?

চিত্র। জি।

অশোক। মরা হায়! [গুমটির দিকে ছোটেন] ও মশাই, শুনছেন! দয়া করে ঘুমটা একটু কমাবেন?

সত্যেন [বিরক্ত]। আবার কি হল?

অশোক। নৌকো যাবে না।

সত্যেন। তা আমি কি করব? জাহাজ আনাব?

অশোক। মেজাজ দিয়ে কথা বলবেন না, বলে দিলাম! ব্রিজ খুলে দিন!

সত্যেন। আরে, এ তো মহা বিপদে পড়লাম! কানে কম শোনেন মশাই? বললাম না, পুল...

অশোক। ওসব কিছু জানি না, ব্রিজ খুলবেন কি না?

সত্যেন [সজোরে]। খুলব না।

অশোক। খুলবেন না?

সত্যেন। না।

অশোক। বেশ। দেখি। দেখি খোলেন কি না। আপনার উপরওয়ালা কে?

সত্যেন। দিনের বেলায় রোড ইঞ্জিনিয়ার, রাতের বেলায় দারোগা!

অশোক। কোথায় দারোগা?

সত্যেন। ঐ যে বাড়ি। যান, ওখানেই যান, খানিকক্ষণ হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

অশোক। আপনি ব্রিজ খেলেন কি না দেখব।

[দ্রুত প্রস্থান]

উদ্ধব। হালায় টাকার জোর দেখাইতাছে। দারোগারে ঘুষ দিব। দ্যাশটার কি হইল! টাকা দিয়া দিনরে রাত কইরা দিবার ভয় দেখায়!

[রিপোর্টাররা একটু হাসেন; বাঁধের উপর গিয়ে দাঁড়ান]

জগু। এককড়ি দা। আমি না—এখন যাই কেমন?

এক। যেও এখন।

জগু। আমাকে অনেক দূর যেতে হবে। তাই চলি, কেমন?

এক। বোসো, নিন্দে করবে, লোকে নিন্দে করবে।

জগু বসে পড়ে, প্রায় লাফাতে লাফাতে অশোক প্রবেশ করেন, পেছনে আলোয়ান গায়ে এক ভদ্রলোক এবং কনস্টেবল]

অশোক। এইবার? খুলবে না মানে? পোল খুলবে না?

সত্যেন [আলোয়ানধারীকে]। এ কি? দারোগাবাবু নিজে!

দারোগা। হ্যাঁ সত্যেন। কি ব্যাপার? পোল না খুললে এ ভদ্রলোক তো ভারী বিপদে পড়ে যাবেন।

সত্যেন। কি করব বলুন?

দারোগা। আরে পোল বিপজ্জনক অবস্থায় আছে, এ তো বোধ হয় বছর খানেক ধরে শুনছি। কখনো তো ভাঙেনি; আজ হঠাৎ ভেঙে পড়বে?

সত্যেন। কি জানি স্যার! মানে যদি কিছু হয়ে যায়?

দারোগা। হুঁ।

অশোক। No. sir, it is an empty lorry, Nothing will happen.

দারোগা। চলুন, একবার দেখা যাক গিয়ে। [কনস্টেবলকে] টর্চ দেখাও। [অশোক, দারোগা, কনস্টেবল-এর প্রস্থান। এইবার ড্রাইভাররা ব্যাপারটা সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হয়]

সত্যেন [উদ্ধবকে]। দেখলেন? দেখলেন? খেয়েছে, মোটা রকম খেয়েছে!

হাজরা। কি বলছে? গাড়ি নিয়ে যেতে হবে?

চিত্র। হাঁ।

নকুল। কি করবি? চালাকি?

চিত্র। ভবানী বোলো। যাব?

ভবানী। না।

চিত্র। কেনো?

ভবানী। আরে বাবা প্রত্যেক দিন ঐ শালা ব্রিজের উপর দম বন্ধ হয়ে আসত। আর দুলত কি! যেন এরোপ্লেন চালাচ্ছি! তার উপর আজ সকালবেলায় কি সব থাম টাম কেটেছে শুনেছি। আর ওর উপরে....

চিত্র। ঠিক আছে। হামি সোচ কোরছিলাম কি খালি লোরি আছে, নিকলে যাব।

ভবানী। ব্যাটা, তোর মরার পালক উঠেছে। খালি লোরি বলে কি উড়ে যাবি নাকি, হতভাগা?

রাধা। আরে দাঁড়াও; আগে দারোগা পারমিশন দিক।

হাজরা। ও দেবেই। বুঝলি না, বানচোৎ......

[ইসারায় দেখায় যে দারোগা উৎকোচ গ্রহণ করছেন। এমন সময়ে দারোগাদের প্রত্যাবর্তন; অশোক প্রায় নৃত্যরত]

দারোগা। ও সত্যেন, আমি তো বার বার হেঁটে দেখলাম। কিছু খারাপ তো মনে হল না। তুমি বরং ছেড়ে দাও।

সত্যেন। হুকুম করছেন, দিচ্ছি স্যার।

দারোগা। হাঁ, তাই দাও। কারণ বেচারার অনেক টাকা loss হয়ে যাবে। ওই 'Caution, Bridge Weak' অনেক দিন থেকে দেখছি। কিস্সু হবে না।

সত্যেন। ঠিক আছে, স্যার। গেট খুলে দিচ্ছি।

[গেট খুলতে চলে যায়: অশোকের আনন্দবিহ্বল অবস্থা]

দারোগা। ঠিক আছে, মিস্টার সান্যাল? এখন যেতে পারি?

অশোক। নিশ্চয়ই যাবেন। আপাকে বিরক্ত করলাম। কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাব!

দারোগা। No, no, glad to have been of service। এই টর্চ দেখাও!

[কনস্টেবল সহ প্রস্থান করেন। অশোক বিজয়োল্লাসে ফেরে]

অশোক। চিত্রকূট সিং। চল, লরিতে উঠো, আভি হামলোক যায়গা!

চিত্র। জি নেহি, ম্যয় নই যাউঙ্গা।

[নীরবতা]

অশোক। কেয়া বোলা? নেই যায়গা? কাঁহে নেই যায়গা?

চিত্র। পুল টুটা হ্যায়।

অশোক। আরে না! নেই! দারোগাবাবু নিজে বোল গিয়া পোল ঠিক হ্যায়, শুনা নেই?

চিত্র। দারোগাবাবুনে সচ বাত নহি কহা।

অশোক। আর হাম যে পুলের উপর লাফাকে লাফাকে লাফাকে লাফাকে দেখকে আয়া!

চিত্র। শুনেন বাবু, আপনার নমক খেয়েছি: এর লিয়ে বেইমানি হামি কোরবো না। হামি যাবে—

অশোক। যাবে?

চিত্র। হাঁ, যাব: লেকিন হাপনাকেও গাড়িতে হামার পাশে বৈঠতে হোবে।

অশোক। এ্যাঁ?

চিত্র। হাঁ।

অশোক। তোমকো হাম মাইনে দেতা হায়, হাম যো বলেগা ওই তোমাকে করনে হোগা।

চিত্র। ওতো চিল্লিয়ে কোনো ফয়দা হবে না, স্রেফ একটা কোথা বোলেন—আপনি হামার সাথে বোসবেন কি না?

অশোক। না, বসব না। তোমাকেই গাড়ি নিয়ে যেতে হবে।

[সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে, ভবানী ছাড়া]

চিত্র। তব হামি যাব ।

অশোক। আচ্ছা বেশ, চল, আমি যাব না। চল।

[চিত্রকূট অবাক হয়ে মালিককে একবার আপাদ মস্তক দেখে নেয়; তারপর ওঠে, হাসে]

চিত্র। চলিয়ে।

[দুজনে পরস্পরের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি হানতে হানতে এগোয়—চিত্রকূট বেরিয়ে যায়, পেছনে অশোক। সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে জিনিসটা দেখে। সত্যেন ফিরে এসে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে আবার বেরিয়ে যায়। বাইরে গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ—প্রথমবার, দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার সেলফ স্টার্টার আর্তনাদ করে, ইঞ্জিন নীরব থাকে। চতুর্থবারে ইঞ্জিন গর্জন করে ওঠে—কিছুক্ষণ একটানা গর্জনের পর, গিয়ারের শব্দ পরিষ্কার শোনা যায়। সত্যেনের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে]

সত্যেন [নেপথ্যে]। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে, বাঁ দিক কাটিয়ে, হ্যাঁ, ঠিক আছে—

[হঠাৎ ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়। তারপরই অশোক ছুটে প্রবেশ করেন, ভয়ে চুল দাঁড়িয়ে উঠেছে, পিছনে চিত্রকূট। তারপর লণ্ঠনহাতে সত্যেন। ড্রাইভারদের মধ্যে গুঞ্জন]

চিত্র। বেইমান!

[অশোক গুমটির মুখে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে থাকেন]

অশোক। হাম তোমকা নোকরি খায়গা! হাম তোমকা মনিব হায়, হাম হুকুম দেতা হায়! আস্পর্ধা হায়। হামকা মুখমে মুখমে তর্ক করতা হায়!

[চিত্রকূট গিয়ে তাঁর জামার কলার ধরে; চট করে হাজরা গিয়ে চিত্রকূটের হাতে একটা বড় রেঞ্জ গছিয়ে আসে]

চিত্র [শান্তস্বরে]। ভাগতে কেঁও?

অশোক। দেখ, গায়ে হাত নেই দেও! হাম মনিব হায়, হাম কোম্পানী হায়—

চিত্র [বজ্রকণ্ঠে]। ম্যয়নে পুছা, ভাগ রহেথে কেঁও?

অশোক। হাম—হাম ভয় পায়া—হঠাৎ ভয় পায়া—

চিত্র [একটু হেসে]। কয়েক হাজার রুপেয়ার জোন্যে হামার জান কোরবান কোরতে তৈয়ার আছ, আর আপনা জান নয়!

অশোক। না না, পোল ভাল আছে, কোনো ভয় নেই, তোমার কোনো ভয় নেই।

[এক ঝাঁকুনি মেরে অশোককে ঠেলে দিয়ে চিত্রকূট রুমালে হাত মোছে; তারপর ফেরে]

অশোক [সামলে নিয়ে]। হামকা গায়ে হাত দিয়া? তোমকা সাহস তো বড্ড বাড় গিয়া!

[দারোগা ও কনস্টেবল ছুটে আসেন। দারোগা দেখেন—বিস্রস্ত বেশ, এলোচুল অশোকবাবু চেঁচাচ্ছেন। তিনি হাঁক পাড়েন]

দারোগা। এই কি হচ্ছে এখানে?

[অশোক ছুটে তাঁর কাছে যান]

অশোক। ঐ লোকটা! ড্রাইভারটা আমাকে মেরেছে! ভীষণ মেরেছে!
দারোগা। কেন?
অশোক। আমি গাড়ি চালাতে বলেছিলাম, তাই। এখানে মেরেছে—মুখে—দু ঘা মেরেছে!
দারোগা [চিত্রকূটকে]। এঁকে মেরেছ?
চিত্র। না।
অশোক। ব্যাটা মিথ্যাবাদী হারামজাদা বেইমান?
দারোগা। তুমি লরি চালাবে না বলেছ?
চিত্র। জী, হাঁ।
দারোগা। কেন চালাবে না?
চিত্র। পুল ভাঙা আছে।
দারোগা না নেই। আমি নিজে দেখেছি নেই।
চিত্র। আছে, হজৌর। হামরা ড্রাইবর, দেখেই সমঝে যাই।
দারোগা। তুমি জান তুমি এ বাবুর চাকর?
চিত্র। জী হাঁ।
দারোগা। তবে এঁর কথা শুনছ না কেন?
চিত্র। এর নোকর বলে কি জান কোরবান করতে হোবে?
দারোগা [ধমকে]। ওসব বড় বড় কথা রেখে দাও। জান, গাড়ি আজ রাত্রেই শ্যামনগর না পৌছুলে এঁর অনেক হাজার টাকা লোকসান হবে
চিত্র। জানি।
দারোগা। তবু যাবে না?
চিত্র। জী নহি।
দারোগা [অশোককে]। অ্যারেস্ট করব মিস্টার সান্যাল, assault charge-এ!
অশোক। দুত্তোর মশাই! অ্যারেস্ট? ড্রাইভার পাব কোথা?
দারোগা। তাও তো। দেখি দাঁড়ান। I shall threaten him! দেখ, আমি বলছি শক্ত আছে। তুমি যাবে কি না?
চিত্র। জী নহি।
দারোগা [সজোরে]। সাবধান।
অশোক। খবরদার! ফল বড় ভাল হবেনা! তুমি যাবে কি না?
অশোক। যেতেই হবে!
ভবানী [চাপাস্বরে]। ইস্টারটাঁর!
[ড্রাইভাররা সকলের অলক্ষিতে বেরিয়ে যায় এবং একটু পরেই লরির স্টার্টারগুলো নিয়ে ফিরে আসে]
চিত্র। বোলেছি কি—যাব না। যাব না।
অশোক। যেতেই হবে, যেতেই হবে!

দারোগা। ও, বদমাইশি করছ এ্যাঁ? scoundrel! [কনস্টেবলের হাত থেকে লাঠিটা গ্রহণ করে চিত্রকুটের কলার ধরেন] যাবে কি না?

ভবানী [অত্যন্ত শান্তস্বরে]। গায়ে হাতটা না দিয়ে বললেই ভাল হয়।

দারোগা। কি? কি বললি?

ভবানী। গায়ে হাতটা না দিলেই ভাল হয়।

অশোক। মদ খেয়েছে!

দারোগা। ও! সব কটা মিলে মদ খেয়ে গুণ্ডামি করার সাধ হয়েছে না? আচ্ছা! আমি গায়ে হাত দেব, কি করবি তুই?

অশোক। হ্যাঁ, দেব হাত, কি করবি?

ভবানী। হাত দিলেই দেখবেন।

[দারোগা আবার চিত্রকুটের কলার ধরেন, সঙ্গে সঙ্গে ভবানী দারোগাকে এক ঘুঁষি মেরে বসে। মুহূর্তের মধ্যে এক তুমুল অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়। —'মারো শালাদের'! বলে ড্রাইভাররা এগিয়ে আসে। ধাক্কাধাক্কি, ধস্তাধস্তির প্রথম ঢেউটা কেটে যেতে দেখা যায়—অশোক, দারোগা ও কনস্টেবল চায়ের দোকানের মধ্যে, এককড়ি হাত তুলে উত্তেজিত ড্রাইভারদের পথরোধ করেছে]

এক। ভাই! ছেড়ে দাও, মাপ করে দাও।

[এককড়ির পেছন থেকে দারোগা আবার একটু আস্ফালন করলে; সঙ্গে সঙ্গে—তুমুল হট্টগোল শুরু হয়। 'শালা বেরিয়ে নেমে আয়, বানচোৎ বেরিয়ে এসে বলনা?' অকস্মাৎ ওপাশ থেকে উদ্ধববাবুর কণ্ঠ শোনা যায়; সকলেই স্তব্ধ হয়ে বিজ্ঞের বাণীটা শোনে]

উদ্ধব। হু, আর কি হইব! আর কিছু করার মুরোদ নি আছে? দশজনে মিইল্যা একজনেরে পিটাইতে পারেন?

হাজরা। কি?

উদ্ধব। এই তো দ্যাশের নূতন বীরপুরুষ! সূর্য স্যান কোথা? উনিশ শয় বত্রিশ সালের জানুয়ারি রাত্র এগারো ঘটিকায় ঢাকায় আমারে যখন গ্রেপ্তার করবার লাইগ্যা আইছিল....

ভবানী। এবার ঐ বুড়ো বানচোৎকেও মারো, শালা! [আর বলতে হয় না, ভীমবেগে সকলে উদ্ধবকে ধরে মঞ্চের মাঝখানে নিয়ে আসে] শালা, ঢের জ্বালিয়েছিস তুই! সন্ধের পর সন্ধে এখানে বসে ফোড়ন কেটেছিস আর বক্তিমে করেছিস। আজ তোকে মারব!

উদ্ধব। না না! আমি তো কেবল বিগত দিনের ইতিহাস কইতে আছিলাম—কইতেছিলাম ১৯৩২ সালের ৪ঠা জানুয়ারি মাত্র রাত্র এগারো ঘটিকায় যখন আমারে গ্রেপ্তার করবার লাইগ্যা আইছিল তখন—

একাধিক কণ্ঠে। তখন কি?

কি?

কি?

উদ্ধব। তখন—

কণ্ঠ। তখন কি বল্ না?

উদ্ধব। তখন—

ভবানী [ধমকে]। তখন কি করলি?

উদ্ধব। তখন পলাইয়া গেছিলাম।

[সবাই হেসে ওঠে; উদ্ধব ছোটেন, সবাই পেছন পেছন কয়েক পা গিয়ে দাঁড়িয়ে জল্পনা করে; চিত্রকূট মধ্যমণি]

দারোগা। আমি Armed Police আনতে চললাম। riotous assembly! এককড়ি পেছনের দরজাটা খোল তো?

অশোক। আরে দুত্তোর মশাই, Armed Police-এর নিকুচি করেছে! আমার সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে! [দারোগা দোকান অভ্যন্তরে পলায়ন করেন; কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় অশোক বেরিয়ে এসে টেবিলের উপর দাঁড়ান। চেঁচিয়ে বলেন] আমার সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে! প্রতি মিনিটে সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে! শুনুন, আমি নেহাৎই নির্লজ্জ না? চড় খেয়ে আবার এসেছি! কি করব বলুন; হাজার হাজার টাকার মামলা! [বিদ্রূপাত্মক হাসি উত্থিত হয়] হাসতে পারেন! তবু শুনুন! আর আমি ঠকাবার চেষ্টা করব না! সত্যি কথাই বলছি—ও পোল ভাঙতেও পারে, থাকতেও পারে। তবু একজন ড্রাইভার চাইছি। আগে থাকতেই বলে দিচ্ছি, আমি পাশে বসব না। শুধু এই নদীটা পার করে দেবে—এ জন্য আমি পঞ্চাশ টাকা দিতে রাজী আছি! কেউ এগিয়ে আসবে না? বড় জোর পঞ্চাশ গজ লরিটা চালাতে হবে। তার জন্যে পঞ্চাশ টাকা!

নকুল। আর মরে গেলে?

[বিদ্রূপাত্মক হাসি। এমন সময়ে হঠাৎ এক সুসজ্জিতা মহিলার আর্বিভাব হয়; নেপথ্যে গাড়ি-মধ্যস্থ বান্ধবীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন]

মেয়ে। এই, নীতা! খোলা আছে রে! কি আনব?

নেপথ্যে কণ্ঠে। যা পাস। তাড়াতাড়ি। জিমিদা তাড়া দিচ্ছে।

[মেয়েটি ছুটে এককড়ির সামনে]

মেয়ে [এক নিঃশ্বাসে]। দেখি চপ ছটা, কাটলেট ছটা, আর আট আনার ফুলুরি! তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি!

[নেপথ্যে হর্ন; মেয়েটি চাঙাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়; পরক্ষণেই গাড়ির শব্দ। এতক্ষণ অশোকবাবু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন]

হাজরা। আই বাপ! কি মালরে!

অশোক। শুনুন—একশ টাকা—এক শো টাকা কে যাবে—মাত্র নদীটা পার করে দেবে।—আচ্ছা দেড়শ—দুশো! দুশোও কেউ নেবে না?

ইন্দ্র [হঠাৎ এগিয়ে আসে]। আগে দেবেন তো?

অশোক [হর্ষোৎফুল্ল]। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

ইন্দ্র। আমি যাব।

রাধা। এই ইন্দ্র, কি হচ্ছে?

[আরো অনেক বাধা দেয়; ইন্দ্র হাত তোলে]

ইন্দ্র। শোনে ভবানীদা বলে বোঝাবে কেন আমাকে যেতেই হবে। জানে সব।

[সবাই ভবানীর দিকে তাকায়; ভবানী মুস্কিলে পড়ে, তারপর]

ভবানী। ভাল করে ভেবে দেখেছিস?

ইন্দ্র। এ কি? তুমি আবার ব্যাক মারছ?

ভবানী। তুই হাসছিস? [গুঞ্জন] অনেকদিন পরে রে। যা তবে।

ইন্দ্র [smart]। Thank you! কই স্যার, টাকা দিন। [অশোক টাকা দেয়—হাসি আর ধরে না। টাকা নিয়ে ইন্দ্র এককড়ির কাছে আসে] এককড়িদা! এ টাকাটা রেবাকে দিও; কেমন? মানে যদি আমি—। চলি। কালকেই দিও।

[এককড়ির চোখে জল। দৃঢ়পদে পা ফেলে ইন্দ্র এগিয়ে চলে। চিত্রকূট চাবি দেয়]

চিত্র। এই লেও চাবি। সিকন্ড গিয়ার খুব জোর লাগে, বুঝলে?

ইন্দ্র। O. K.

রাধা। ব্রেকের ওপর পা রাখিস ভাই!

ইন্দ্র। নিশ্চয়ই!

ভবানী। তবে যাবি বেশ ইস্পিডে।

ইন্দ্র। আচ্ছা!

হাজরা। আর দ্যাখ, দরজাটা খুলে রাখিস—মানে লাফিয়ে পড়তে হলে ....

ইন্দ্র [খুব জোরে হেসে ওঠে]। তোমরা সব আমার দাদা মানুষ, ঘাবড়ে যাচ্ছ? দেখা যাবে!

প্রবীর। তোমার নামটা ঠিক কি? পুরো নাম?

ইন্দ্র। ইন্দ্রচন্দ্র সাউ। ছবি নেবেন? নেবেন না?

[হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়]

জগু। আমি ইন্দ্রদার সঙ্গে যাব? এককড়িদা ইন্দ্রদার সঙ্গে যাব?

এক। না, নিন্দে করবে! নিন্দে করবে!

[পেছনে সত্যেন ও অশোক; বাকি সকলে হুড়মুড় করে বাঁধের ওপর গিয়ে ওঠে; রিপোর্টাররা কলম বাগিয়েই আছেন। গাড়ি স্টার্ট নেয়, তারপর গিয়ারের শব্দ, তারপর কাঁকরের ওপর টায়ারের শব্দ শ্রুতিগোচর হয়]

সত্যেন [নেপথ্যে]। ঠিক আছে! ঠিক আছে! ডাইনে চাপুন! হ্যাঁ! ঠিক আছে! সোজা! এবার যান।

[গম্ভীর ধাতব একটা শব্দে বোঝা যায় লরি পোলের উপর উঠেছে; দর্শকদের মধ্যে উদ্বেগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে]

রাধা। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ব্রেকের ওপর পা আছে, হ্যাঁ!

ভবানী। বড্ড আস্তে যাচ্ছে! [বিড়বিড় করে] একটু জোরে।

হাজরা। বাঁয়ে কাটাচ্ছে না কেন? বাঁয়ে কাটাচ্ছে না কেন?

[নেপথ্যে একটা হুড়মুড় শব্দ হয়]

চিত্র। আধা রাস্তা চোলে গেছে। আর বাকি আধা—জয় রামজী জয় রামজী!

ভবানী। অত আস্তে যাচ্ছে কেন? একটু জোরে যাওয়া দরকার!

[সকলের কণ্ঠনিঃসৃত অস্ফুট আর্তনাদ]

নকুল। শালা পুল দুলছে কেমন দেখ!

রাধা। ঐ থামটা মড় মড় করেছে! ঐ!!

[নেপথ্যে একটা বিষম শব্দ হয়, সঙ্গে সঙ্গে সকলে চিৎকার করে ওঠে। তারপরই আবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে]

ভবানী। কিছু না, কিছু না, একটা তক্তা খসে গেছে!

হাজরা। খুব বেঁচে গেছে!

ভবানী। আর দশগজ, কি বল?

হাজরা। হ্যাঁ।

ভবানী। টেনে বেরিয়ে যাচ্ছে না কেন?

রাধা। দাঁড়িয়ে পড়েছে। হাত নাড়ছে, না? হ্যাঁ।

ভবানী। শালা স্টাইল মারছে।

চিত্র। জয় রামজী—জয় রামজী!

রাধা। আবার চলেছে। পাঁচ গজ!

[এক মুহূর্ত! তারপর ভবানীর অবিশ্বাসপূর্ণ কণ্ঠ—]

ভবানী। পৌঁছে গেছে! [চিৎকার করে] পৌঁছে গেছে!

[পরমুহূর্তে সকলে মিলে চিৎকার করতে করতে আনন্দে লাফাতে থাকে। পরস্পরকে আলিঙ্গন করে]

ভবানী। চল, ওদিকে চল!

[সবাই দৌড়ে বেরিয়ে যায়। রিপোর্টারদ্বয় শুধু বিরসবদনে বসে থাকেন। অশোকবাবু ঢুকে অর্ধ সমাপ্ত চপটা মুখে দেন]

অশোক। এখন মনে হচ্ছে দুশো টাকা একটু বেশি হয়ে গেছে! [প্রস্থান]

প্রবীর। দূর, কপালটাই মন্দ! স্টোরি আর পেলাম না!

শত্রুদমন

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

চরিত্রলিপি

অমল
সুলতা
নরেন
মা
লীনা
বিকাশ
বীরেন

[শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাড়ির বৈঠকখানা ঘর। নেপথ্যে দ্রুত লয়ের খুশির মিউজিক। নেপথ্যে একটি ছেলে ও মেয়ের হাসির শব্দ। ঢোকে অমল ও সুলতা। দুজনেই পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটের ছাত্র। চিবোচ্ছে বাদাম, হাসছে অজস্র, বকছে অনর্গল]

অমল। ছবিটা দারুণ কিন্তু।

সুলতা। সব-পেয়েছির দেশ।

অমল। হ্যাঁ, প্রেম থেকে পেঁয়াজি সব কিছু আছে।

সুলতা। এই যাঃ! বাড়ি এসে গেলাম।

অমল। তাতে কী? নিজের বাড়িই তো।

সুলতা। নিজের বাড়িতেই তো ভয়। শত্রুপুরী।

অমল। ভয়? কিসের?

সুলতা। গার্জেনদের ভয়। বাবা, মা, কাকা, দাদা, মায় বৌদি পর্যন্ত শত্রু হয়ে গেছে।

অমল। এটা যে তোমাদের বাড়ি। নইলে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় করে—

সুলতা [অমলের ভঙ্গিতে]। সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে—বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে।

অমল। ঠিক তাই তবে—

সুলতা। তবে?

অমল। একটা উপায় আছে।

সুলতা। কী উপায়।

অমল। বি—বা—হ।

সুলতা। অ—স—ম্ভ—ব।

অমল। ভেবে দেখ। আমি পালাই।

[দরজার দিকে এগোয়। তাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ঢোকেন নরেন্দ্রনাথ—সুলতার কাকা। একটি অখণ্ড অধ্যাপক]

নরেন [চশমা তুলে]। কে? বিমল না?

অমল। আজ্ঞে না—আমি অমল।

নরেন। ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, অমল। তারপর? কী খবর?

অমল। আজ্ঞে আপনার কাছেই এসেছিলাম?

নরেন। আমার কাছে! কেন বল তো।

অমল। ঐ বইটা। ফেনোমেনালিজমের ওপর একটা বই দেবেন বলেছিলেন।

নরেন। বলেছিলাম নাকি? আচ্ছা দাঁড়াও। নিয়ে আসি বইখানা। [প্রস্থান]

সুলতা। চমৎকার।

অমল। কী চমৎকার?

সুলতা। তোমার ম্যানেজ করার—

অমল। ক্ষমতা

সুলতা। শঠতা। মিথ্যে কথার চূড়ামণি।

অমল। দেখ সুলতা, সত্য-মিথ্যে সবই আপেক্ষিক। মিথ্যে যেখানে মহৎ সত্যের আশ্রয়, সেখানে—

সুলতা। সেখানে মিথ্যা বলাই শ্রেয় কিন্তু তোমার সেই মহৎ সত্যটা কী?

অমল [বুক ঠুকে]। সে সত্য এইখানে —একেবারে বুকের মধ্যে—

[সুলতার মার প্রবেশ]

মা [উদ্বিগ্ন]। অ্যাঁ? ঐখানে? বুকে তোমার কী হল?

অমল। ঐ—ইয়ে—একটা—মানে—

মা। ব্যথা?

অমল। হ্যাঁ, ঐ ব্যথার মতো।

মা। কী সর্বনাশ! ডাক্তার দেখিয়েছ? দাঁড়াও বিকাশ আছে কিনা দেখি।

অমল [অপ্রস্তুত ভাবটা সামলে নিয়ে]। আমি ডাক্তার দেখাব কেন? ব্যথাটা আমার নয়।

মা। তবে?

অমল। আমাদের ক্লাসের একটা ছেলের। সেই কথাটা বলছিলাম সুলতাকে।

মা। তবু ভাল। হ্যাঁরে সুলতা, ফিরতে এত দেরি হল কেন রে?

সুলতা। ইউনিভার্সিটির—ঐ লাইব্রেরিতে—ওখানেই—

মা। তোকে তো বলেছি, অত পড়াশুনোর দরকার নেই, শরীরটা আগে।

সুলতা। মেয়েরা বুঝি মুখ্যু হয়ে থাকবে।

মা। লেখাপড়া যথেষ্ট হয়েছে। চোখে-কালি কোল-কুঁজো হবার কোনো দরকার নেই। মেয়েদের চেহারাটা আগে। দিনরাত বইয়ের অক্ষর গিললে হাড়গিলে হয়ে উঠবে যে। দেখ তো বাবা, এ মেয়েকে নিয়ে আমি কী করি।

অমল [গম্ভীরভাবে]। বিয়ে টিয়ে একটা—

সুলতা। তুমিই বরং একটা বিয়ে করে ফেল।

মা। অমল তো ঠিকই বলেছে। তোমার চেনা কোনো ভাল ছেলে আছে?

অমল। আজকাল ভাল ছেলে পাওয়া খুবই শক্ত।

মা। হ্যাঁ সব উড়নচণ্ডী।

সুলতা। ঠিক বলেছ।

অমল। সব ছেলেই অমন নয়। খুঁজলে ভাল ছেলে আজও পাওয়া যায়।

মা। তুমি তাহলে একটু খোঁজে থেক বাবা।

অমল। আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

মা। তোমার মাকেও আমি বলেছি। তোমরা এ পাড়া থেকে উঠে যাবার পর তোমার মার সঙ্গে দেখাই হয় কম।

অমল। মা প্রায়ই বলেন আপনাদের খবর নিতে। আজ সেইজন্যেই—

মা। বেশ বাবা, বেশ। বস। আমি তোমাদের জলখাবার নিয়ে আসি। এ মেয়েটা তো সেই দশটায় খেয়েছে।

সুলতা। আমি মধ্যে একবার খেয়েছি।

মা। কী খেয়েছিস?

সুলতা। ইউনিভারসিটির ক্যান্টিনে—

মা। অখাদ্যগুলো না খেলে চলে না? অমল, তুমিও কি খেয়ে এসেছ নাকি?

অমল। না, মাসিমা, আমি বাইরে একদম খাই না।

সুলতা। পেটরোগা।

অমল। মা বারণ করেন তাই।

মা। শোন, সুলতা শোন।

সুলতা। বাধ্য ছেলে।

মা। অমল, এতক্ষণ লাইব্রেরিতে ছিলে—কিছু খাওনি?

অমল। আমি তো লাইব্রেরিতে ছিলাম না, মাসিমা। ক্লাসের পর আমি সোজা বাড়ি গিয়ে খেয়ে নিয়ে যাই খেলতে। সন্ধেয় ফেরার পথে বেড়াতে এখানে।

সুলতা। সুবোধ বালক।

মা। ওরে শোন। পড়ার আগে শরীর, বুঝলি! ও তো তবু ছেলে।

সুলতা। হ্যাঁ, ছেলেগুলো মেয়েলি হয়ে যাচ্ছে।

অমল। আর মেয়েগুলো?

সুলতা। সত্যিকার মানুষ হচ্ছে।

মা। থাক, থাক, আর মানুষ হয়ে কাজ নেই। কী সব মানুষের ছিরি! হাড়গিলে বিদ্যেধরী। তুমি বাবা বস আমি চা আনি। [প্রস্থান]

সুলতা। বেরোও।

অমল। বেরোই কী করে? তোমার মা বসতে বলেছেন।

সুলতা। বিশ্বাসঘাতক। ষড়যন্ত্রকারী।

অমল। মাসিমার সঙ্গে একটু তাল মিলিয়েছি। এই তো—?

সুলতা। এবং সেটা আমার বিরুদ্ধে।

অমল। বারে! তোমার জন্যে ছেলে দেখছি—সেটা হল তোমার বিরুদ্ধে?

সুলতা। হ্যাঁ। এবং একরাশ মিথ্যে কথা বলেছ।

অমল। মিথ্যা যেখানে মহৎ সত্যের আশ্রয়, [নাটকীয় সুরে] সেখানে আমি মিথ্যা বলিয়া থাকি।

সুলতা [অমলের সুরের নকলে]। বলিয়া থাক? বাঃ!

অমল। ক্ষতি কী?

সুলতা। আমাকেও তাহলে মিথ্যে কথা বলেছ—আমায় খুশি করার জন্য।

অমল। খুশি যদি হয়ে থাক, তাহলে সেটা আর মিথ্যে নেই। সত্যি হয়ে গেছে।

সুলতা। বল, কী কী মিথ্যে কথা বলেছ।

অমল। তুমি মেয়েটা-ঝাল। আমি বলেছি—মিষ্টি। এটা মিথ্যে?

সুলতা। না, তা ঠিক নয়, তবে তোমার আগের কাল—ধারণাটা মিথ্যে।

অমল। তাহলে আগে আমার জানা দরকার—সত্য বলতে তুমি কী বোঝ?

[নরেন্দ্রনাথ একটি বই হাতে ঢোকেন]

নরেন। খুব বড় কথা তুলেছ আজ, বিমল।

অমল। আজ্ঞে আমি অমল।

নরেন। হ্যাঁ, অমল। খুব বড় কথা—সত্য বলতে কী বোঝ?

অমল। হ্যাঁ, কাকাবাবু এই নিয়েই কথা হচ্ছিল সুলতার সঙ্গে।

নরেন। বেশ, বেশ, তোমার মতটা শুনি।

অমল। আমি বলছিলাম, অ্যাবসলিউট ট্রুথ বলে কিছু নেই।

নরেন। ইয়েস ইয়েস।

অমল। অন্তত জাগতিক ক্ষেত্রে রিলেটিভ ট্রুথকে মানতেই হয়।

সুলতা। ট্রুথ আবার রিলেটিভ!

নরেন। হোয়াই নট? অল রাইট, বুঝিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, সুলতা, তুই আমার সামনে দাঁড়া। অমল, তুমি আমার পেছন দিকে দাঁড়াও। [ওরা ঐ ভাবে দাঁড়ায়। হঠাৎ অন্য সুরে] দেখ সুলতা, তোর এই আগ্রহটা দেখে আমার ভারী আনন্দ হয়—এই জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ। এই আগ্রহ যার মধ্যে একবার এসেছে তাকে আর দেখতে হবে না। সে শাইন করবেই।

অমল। সুলতাকে প্রফেসররা খুব শাইনিং বলেন।

নরেন। বলতেই হবে। দেখ সুলতা, যখন যেটা বুঝতে পারবি না, অমনি চলে আসবি আমার কাছে। এম. এ.-তে ফার্স্ট ক্লাস, তারপরে রিসার্চ, ডক্টরেট....কোনো অসুবিধেই হত না। অসুবিধে তো মাকে নিয়ে। বৌদি তোর বিয়ে দিতে পারলেই বাঁচেন।

অমল। অল্প বয়সে সংসারের জোয়ালে পিষে ফেললে মেয়েরা আর পড়বে কখন?

নরেন। একরত্তি ছেলে, তুমি বুঝতে পারছ। কিন্তু বৌদিকে বল—কিছুতেই মানবেন না। যাকগে, রিলেটিভ ট্রুথ সম্পর্কে যা বলছিলাম—

সুলতা। কাকাবাবু, আজ তোমার সেই টুইশনিটা আছে না?

নরেন। না, না, সেটা তো বুধবারে।

সুলতা। আজই তো বুধবার।

নরেন। আর ইউ শুওর।

সুলতা। দাঁড়াও। তোমার চাদর আর ব্যাগ গিয়ে আসি।

নরেন। উঁহু—উঁহু। নো চেঞ্জ অব পজিশন। একদম নড়বে না। আমি এখুনি আসছি। এসে ওটা বোঝাব। [প্রস্থান]

অমল। এবার? এবার কিছু বল।

সুলতা। কী বলব?

অমল। যখন মাসিমার তালে তাল দিলাম, তখন—বেরোও। এখন তো বলা উচিত—এস, আধ আঁচরে বোসো। পড়ার পক্ষে কাকাবাবুর সঙ্গে কী জোর কণ্ঠ মেলালাম!

সুলতা। কে চায় পড়তে?

অমল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবী এবং অবশ্যম্ভাবী ডক্টর—সুলতা মিত্র।

সুলতা। ডক্টরেট ভূত ছাড়া কেউ পায় না।

অমল। ভূত!

সুলতা। ভূত চেন না?

অমল। শুনি, কিন্তু চিনি না।

সুলতা। ভূতের মতো খাটতে না পারলে কেউ ডক্টরেট পায় না। সে খাটুনি কোনো মহিলার খাটা উচিত নয়।

অমল। মহিলাদের তাহলে কী করা উচিত?

সুলতা। সিনেমা দেখতে পারে। বেড়াতে যেতে পারে। সাজবে তো নিশ্চয়ই। 'চিত্রহার', 'চিত্রমালা' দেখবে। টক-মিষ্টি আচার খাবে। ঘুগনিও খেতে পারে।

[চা নিয়ে লীনার প্রবেশ]

লীনা। ঘুগনি! কোথায়?

সুলতা। ওঃ। বৌদি!

অমল। বেশি পরিমাণে মহিলা!

লীনা। আমার জিভে জল এসে গেছে।

সুলতা। ঘুগনি নয়, বৌদি। ঘুগনির আলোচনা।

লীনা। আলোচনা! ঘুগনি নিয়ে! তোমাদের এই অধঃপতন। নাও ভাই অমল, ঘুগনির আলোচনা করতে করতে এই চা-টা খাও।

অমল [চা নেয়]। দিন। সুলতা খাবে না?

লীনা। না, সুলতার এটা দুধ খাবার সময়। এক বাটি দুধ নিয়ে মা আসছেন।

সুলতা। হ্যাঁ, দুধ গিলতে হবে। নইলে হাড়গিলে হয়ে উঠব যে।

লীনা। সত্যি, মা ওকে একটা কচি মেয়ে করে রাখতে চান। এখন যদি একটু স্বাধীনতা না পায়, তবে আর কবে পাবে বল তো।

অমল। এটা স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগ। এ যুগে মেয়েদের পশুর মতো বেঁধে রাখার কোনো মানে নেই।

লীনা। এখন মেয়েদের সোশাল হতে হবে। পাঁচটা লোকের সঙ্গে মিশতে হবে। আদব কায়দা শিখতে হবে। হতে হবে চটপটে, স্মার্ট।

অমল। দশ পাঁচ না হোক—দু-একজন বন্ধুর সঙ্গে মেলামেশা করা উচিত সুলতার। দু দণ্ড বসে গল্প করতে পারে। কি হয়তো একদিন সিনেমায় গেল।

লীনা। বসে একটু গানবাজনাও করতে পারে। ওটা তো কালচারের একটা বড় অঙ্গ। কিন্তু এ মেয়ে ও সব শিকেয় তুলে রেখেছে। ওর গীটারের হাল দেখেছ তো? আলখাল্লা পরে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। ওটা বাজাতে পারে, গলা

সাধতে পারে, তা নয়। অথচ সেদিন আমার পিসতুতো বোন—শুধু একটা গান গেয়ে বিরাট কয়লাখনির মালিককে বিয়ে করে ফেললে।

অমল। শুধু একখানা গান গেয়ে!

লীনা। একখানা। বিশ্বাস কর অমল, মাত্র একখানা। এক বন্ধুর বাড়িতে বসে গাইছিল। এর—মানে তখনও বর হয়নি—পাশের বাড়ি থেকে সেই গান শুনে, ব্যাস একেবারে—

অমল। পপাত!

লীনা। ঠিক তাই।

অমল। আমি তো সুলতাকে কত দিন বলেছি—গানের চর্চা-টা রাখ।

সুলতা। তাহলে কয়লা-খনি পাব একটা?

অমল। তোমার গলা তো খুবই মিষ্টি।

সুলতা। মিষ্টি? না তেতো?

লীনা [এতক্ষণে সুলতার অবস্থানটি দ্যাখে]। এখন কি তেতোর পালা নাকি! অত দূরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে? অমলের কাছে এত সংকোচ কিসের? লোকের সঙ্গে না মিশে এই দশা তোমার। এগিয়ে এস। এখানে একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে, আর তুমি দুমাইল দূরে—ঐ রকম কাঠের মতো—

সুলতা। এখানে ভদ্রলোক কেউ আছেন নাকি?

লীনা। ছিঃ! এদিকে এস।

সুলতা। তোমার কথা রাখতে পারলাম না বৌদি। দুঃখিত।

লীনা। দেখছ অমল, কী অসামাজিক!

সুলতা। ক্ষমা কর বৌদি, আমি এখান থেকে নড়তে পারব না।

লীনা। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি?

সুলতা। এখনো হইনি।

লীনা। ঐ জায়গাটায় কী আছে? সোনা?

সুলতা। গুরুজনের আদেশ শোনা আমার কর্তব্য।

লীনা। ওখানে দাঁড়িয়ে, থাকতে আদেশ দিলেন কোন গুরুজন? নিশ্চয়ই মা। মা মেয়েটাকে একেবারে ঘরকুনো করে ফেললেন।

[দুধ নিয়ে মা-র প্রবেশ]

মা। ঘরকুনো কিসের বৌমা? মেয়ে এম. এ. পড়ছে। সন্ধে অবধি এল কলেজ ঠেঙিয়ে। আবার কী চাই! [সুলতাকে] নে, দুধটুকু খেয়ে ফেল।

সুলতা [আবদারের সুরে]। উঁ উঁ দুধ খেতে ভাল লাগে না।

মা। নে, লক্ষ্মী মেয়ে, এটুকু দুধ না খেলে শরীর থাকবে কী করে?

অমল। মাসীমা, এ কালের মেয়েরা দুধ খায় না, খায় চা। পিপে পিপে।

মা। যা বলেছ।

সুলতা [বৃহৎ বাটির দুধ খেতে খেতে]। উঃ, আর পারছি না।

মা। খেয়ে নে, খেয়ে নে। আর একটুখানি। [খাওয়া শেষ] লক্ষ্মী মেয়ে। নে, চাঁচি-টা খেয়ে ফেল।

সুলতা। শ্যামলীদের বাড়ি একটু যাই? যাব আর আসব।

মা। না, না। এই তো এলে এতক্ষণ ঘুরে।

লীনা। যাক না মা। একটু ঘোরাফেরা তো ভাল। নইলে শরীরও খারাপ করে।

[সুলতার দাদা বিকাশ ঢোকে। ডাক্তার। হাতে ব্যাগ ও স্টেথস্কোপ। সদা ব্যস্ত]

বিকাশ। কার শরীর খারাপ করল? তোমার না কি?

লীনা। আঃ! কী জ্বালা!

অমল। বিকাশদা কেমন আছেন?

বিকাশ। তোমার শরীর খারাপ?

অমল। এখনও হয়নি।

লীনা। সুলতার কথা হচ্ছিল।

সুলতা। আমার কিছু হয়নি দাদা, প্লিজ।

বিকাশ। না, না, লজ্জা করবি না। কী হয়েছে? মাথা ধরেছে? ভাল কথা নয়। একটা পালভ্ এ.পি.সি. একটা দিচ্ছি।

সুলতা। মাথা আমায় ধরেনি। তোমরা আমায় ধরেছ।

মা। মাথা ধরা নয়। ঠিক মতো খায় না। এখন জলখাবার খেল না। দুধ খায় না।

বিকাশ। খিদে নেই! অরুচি! ভেরি ব্যাড। এই বয়সে অরুচি।

মা। ভীষণ অনিয়ম করছে যে।

বিকাশ। নো, নো, দিস ওন্ট ডু। কেন, খেতে চাস না কেন? বলতো ঠিক করে। দেখি তোর জিভ। আরো—আরো—। মা, আপাতত একটা টনিক দিয়ে দিচ্ছি। আমি নিয়ে আসব। সুলতা যা শুয়ে পড়। একটু বিশ্রাম কর। আগে স্বাস্থ্য, পরে অন্য সব।

লীনা। এই বিকেল বেলা শুয়ে থাকবে!

বিকাশ। ক্ষতি কী ? জান শুধু বিশ্রাম অনেক ক্ষেত্রে রোগ সারিয়ে তোলে—ওষুধের কাজ করে। ডক্টর ফ্রীম্যান এ সম্পর্কে কী বলেছেন জান?

লীনা। জানি না। জানবার ইচ্ছেও নেই।

বিকাশ। সেটি না জেনে এ ব্যাপারে কথা বলতে এস না। ডক্টর ফ্রিম্যান হচ্ছেন এ কালের সবচেয়ে বিশ্রাম-বিশেষজ্ঞ।

লীনা। উনি সব সময় বিশ্রাম করেন বুঝি?

বিকাশ। হোপলেস। উনি সর্বক্ষণ খাটেন। দিনরাত পরিশ্রম করে বিশ্রামের ওপর গবেষণা করেন।

লীনা। তাহলে যাও সুলতা। তুমি বিশ্রাম করতে করতে পরিশ্রমের ওপর গবেষণা করগে। অদ্ভুত সব ব্যাপার। জন্মে শুনিনি।

বিকাশ। শোনোনি! শুনতে পাচ্ছ না! তোমার কানে আবার কী হল? দেখি কানটা। [হাত বাড়ায়]

লীনা। ধেৎ। [দ্রুত প্রস্থান]

বিকাশ। কান থাকতে কেউ কানের মর্যাদা বোঝে না, পুওর লেডি। যা সুলতা, শুগে যা। জানলে অমল দেহের জীবকোষের পক্ষে বিশ্রামটা খুব জরুরি।

অমল। আমার তো মনে হয়, বিকাশদা, জীবনে বিশ্রামটাই একমাত্র দরকার।

বিকাশ। বিশ্রাম। এবং ব্যায়াম। সুলতা, তুই ব্যায়াম করিস না কেন?

সুলতা। কাল থেকে করব। ডন, বৈঠক, মুগুর।

বিকাশ। নো, নো, আই ডোনট্ মীন দ্যাট। তোকে আমি যোগাসন শিখিয়েছিলাম—

সুলতা। আসন করব কাল থেকে।

বিকাশ। হোয়াই কাল? আজ থেকেই আরম্ভ কর না।

সুলতা। এক্ষুণি?

বিকাশ। এখন একটু বিশ্রাম করে নে। সারা দিন খাটুনি কলেজে গেছে। খানিকটা বাদে করিস। অমল, বেরোবে নাকি? আমি তোমাদের ওদিকেই একটা 'কলে' যাব।

[মা সুলতা ভেতর দিকে, বিকাশ অমল বাইরের দিকে পা বাড়ায়। ঢোকেন নরেন্দ্র]

নরেন। আহা-হা-হা সব মাটি করলে। নড়াচ্ছ কেন ওদের জায়গা থেকে? ওদের নড়াচ্ছ কেন ওদের জায়গা থেকে! Alas! Both of you have moved away from your position! বিকাশ, বিমলকে নড়াচ্ছ কেন? ওকে যে আমার দরকার।

বিকাশ [কৌতুকের হাসি হেসে]। আচ্ছা বিমল, তুমি তাহলে থাক। আমি চলি।

[প্রস্থান]

নরেন। আচ্ছা, once again, দাঁড়াও ঠিক করে। সুলতা, তুই এখানে—হ্যাঁ এই সামনের দিকে। বিমল, তুমি পেছনের দিকে। সুলতা, তুই আমার নাক-মুখ-চোখ দেখতে পাচ্ছিস?

[অমল—'বিমল' শুনে প্রতিবারই কিছু বলতে চায় পারে না]

সুলতা। হ্যাঁ।

নরেন। এগুলো তাহলে তোর কাছে সত্য। বিমল, তুমি আমার নাক-মুখ-চোখ দেখতে পাচ্ছ?

অমল। আজ্ঞে, আমি অমল।

নরেন। আঃ! অমল বিমলের কথা হচ্ছে না। দেখতে পাচ্ছ কিনা? আমার নাক-মুখ-চোখ?

অমল। আজ্ঞে না।

নরেন। অতএব এগুলো আপাতত তোমার কাছে মিথ্যে। বরং তোমার কাছে সত্য

আমার টাক-টা, Isn't? আসলে তাহলে সবটাই নির্ভর করছে perspective-এর ওপর। তাই না?

মা [আশ্চর্য হয়ে]। এ সব কী হচ্ছে ঠাকুরপো?

নরেন। এ তোমাকে বোঝানো মুস্কিল। এ হচ্ছে সত্যের কথা।

মা। সত্য! ঘোড়ার ডিম! মেয়েটার মাথা আর খেয়ো না। বরং একটা ছেলে দেখ।

নরেন। একটা ছেলে! হোয়াট ডু ইউ মীন? সপ্তাহে আমি কতকগুলো ছেলে দেখি জান, সাত হাজার। সাত হাজার ছাত্র আমি প্রত্যেক সপ্তাহে মীট করি—আমাদের কলেজে—

মা। সাত হাজার নয়। একটা ছেলে দরকার—সুলতার জন্যে।

নরেন [হতাশভাবে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে]। বুঝলে বি—ইয়ে—অমল, বৌদির হচ্ছে মধ্যযুগীয় পার্সপেকটিভ। বৌদি তোমায় এই ওলড আইডিয়াগুলো ছাড়তে হবে। তোমায় মনে রাখতে হবে, তুমি বিংশ শতাব্দীর মানুষ। হোয়াই বিংশ, প্রায় একবিংশ শতাব্দীর মানুষ। আমি চেষ্টা করছি সুলতার ফার্স্ট ক্লাস, ডক্টরেট, আর তুমি কি না—একটা ছেলে—নাঃ হোপলেস।

মা। অতশত বুঝি না বাপু। আমরা বুঝি, মেয়ে মানুষ বিয়ে-থা করে—

নরেন। সুলতা ইজ নট মেয়েমানুষ—

মা। সে কি!

নরেন। ইয়েস। শী ইজ নট মেয়েমানুষ। শী ইজ মেয়ে, এমনি মেয়ে। বিয়েটা মেয়েদের মোক্ষ নয়। নারী তার নিজ মহিমাতেই ভাস্বর।

মা। ও মা! সে কী কথা! মেয়েছেলে বিয়ে করবে না?

নরেন। এগেইন মেয়েছেলে! মেয়ে, মেয়ে! বিয়ে করবে না তা তো বলিনি। কিন্তু বিয়েটাকে জীবনের সব কিছু ভাবলে ভুল হবে। দু দিন জগৎ-টা দেখুক। লেখাপড়া করুক। জ্ঞান বাড়ুক। তারপরে বিয়ে। বিয়ে তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।

মা। হ্যাঁ, পালিয়ে যাচ্ছে। পালিয়ে যায়। বিয়ে বসে থাকে না। বয়স যায়, বিয়েও যায়

নরেন। বি-বি—অমল, তুমি কী বল?

অমল। না। আজ্ঞে, আমি আর এ ব্যাপারে কী বলব?

নরেন। নিশ্চয়ই বলবে। শিক্ষিত ছেলে। একালের ছেলে। তোমার মতটা জানা দরকার।

অমল। না—হ্যাঁ—আমার মত—একালের মত—মানে ভাবা দরকার—জটিল ব্যাপার তো—ভেবে-চিন্তে ঠিক করা দরকার।

নরেন। আচ্ছা, ভাব তুমি। ভেবেই চল।

মা। অমল আর ভাববে কী? ও তো একটু আগেই বলছিল—

নরেন। কী বলছিল?

অমল। হ্যাঁ, বলছিলাম যে—সবার ক্ষেত্রে সব জিনিস প্রযোজ্য নয়।

নরেন। ঠিক। ব্যাপারটা রিলেটিভ। সুলতার ক্ষেত্রে এখন বিয়েটা প্রযোজ্য নয়।

মা। না, না। অমল বলেছে—সুলতার এখন আর লেখাপড়ার দরকার নেই। ওকে তো আর চাকরি করতে যেতে হবে না।

নরেন। হ্যাঁ,অমল, তাই নাকি? একালের মত-টা আমার জানা দরকার।

মা। হ্যাঁ, বল না অমল।

অমল। বিয়ে আর পড়া, মানে পড়া আর বিয়ে—এই দুটো তো জিনিস। এর মধ্যে আমাদের দেখতে হবে—মানে গোড়ায় দেখতে হবে—[ঘড়ি দেখে] এই যাঃ।

মা। কী হল?

অমল। দেরি হয়ে গেছে। মাকে নিয়ে একটা দোকানে যাবার কথা ছিল। ইস্, মা আমার জন্যে নির্ঘাৎ বসে আছেন। কথায় কথায় এক্কেবারে ভুলে গেছি—

নরেন। না, না। এই বয়সে ভুলে যাওয়া-টা ভাল কথা নয়।

সুলতা। তুমি কিন্তু টুইশনির কথা ভুলে গিয়েছ।

নরেন। একদম ভুলিনি। আই উইল্ স্টার্ট রাইট নাউ। [একটু গিয়ে] বাবা —অমল, তোমায় যে বইটি দিলাম ওটা ফেরত দিতে ভুলো না যেন। চলি। [প্রস্থান]

মা। সুলতা, যা একটু শুয়ে থাক। বিকাশ যখন বলল—[সুলতার প্রস্থান] অমল, যা বলছিলাম তখন—ভাল ছেলে আছে খোঁজে?

অমল। দেখি একটু খুঁজে। আপনিও একটু চোখ রাখবেন। দেখবেন হয়তো হাতের কাছেই রয়েছে।

মা। তা অবিশ্যি অনেক সময় হয়।

অমল। এখন আমি আসি মাসিমা।

মা। এস বাবা। [অমলের প্রস্থান] হে মা দুর্গা, একটু মুখ তুলে চাও মা। [ঘন ঘন প্রণাম] দেখছ তো ঘরের লোকদের—এক একটি পাগল। খুব ভাল চাই না মা। কিন্তু একটু ভাল নাহলে মেয়ের মনে ধরবে কেন! তুমি তো সবই বোঝ মা। একটা ডাক্তার পাত্তর দাও মা। আমাদের বুড়ো বয়সে দেখতে পারবে। ডাক্তার না হলে ইঞ্জিনিয়ার দিতে পার। যাকেই দাও, সে যেন সুলতার খুব কথা শোনে।

[সুলতার বাবা বীরেন্দ্রনাথ ঢোকেন। একহাতে মোটা বই। অন্য হাতে রোগা ছড়ি]

বীরেন। কী গো,কাকে কথা শোনাচ্ছ?

মা। আহা, কথার কী ছিরি! আমি যেন সব সময় কথাই শোনাই।

বীরেন। আহা, সব সময় কেন মাঝে মাঝে। এই যেমন এখন। তা তোমার রাগটা কার ওপর?

মা। তোমার ওপর।

বীরেন। গোবিন্দ, গোবিন্দ। অধমের অপরাধ?

মা। বলি, ধর্ম নিয়ে থাকলেই সব হবে?

বীরেন। সব আর কী করে হবে?

মা। সংসার তাহলে করা কেন?

বীরেন। সংসারের জন্যে তো তুমিই রয়েছ। আমি সেখানে আর নাক গলাই কেন?

মা। মেয়ের পাত্র আমি ঠিক করব?

বীরেন। ও। এই কথা!

মা। কথাটা একবারও ভাবতে নেই

বীরেন। একবার নিশ্চয়ই ভাবতে আছে। তুমি বহুবার ভাবছ।

মা। মেয়ে গলার কাঁটা—তাই ভাবতেই হয়।

বীরেন। কিছু ভেব না। ভগবান সব ঠিক করে দেবে।

মা [খুশি]। ভগবান ঘটককে তাহলে খবর পাঠিয়েছ?

বীরেন। এ ঘটককে খবর পাঠাতে হয় না। সময় হলে নিজেই খবর দেয়।

মা। অ, ধম্মকথা! তাহলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাক। সকালে উঠে যার মুখ দেখবে, তাকেই মেয়ে দিয়ো।

বীরেন। তাও দিতে পারি—যদি তাঁর ইচ্ছে হয়। কিন্তু যাকে দেব সে কোথায়?

মা। একটু শুয়েছে।

বীরেন। এখন অসময়ে?

মা। বিকাশ বলছিল একটু বিশ্রাম করতে, তাই।

বীরেন। না, না। এই সন্ধেবেলায় শোয়াটা ঠিক নয়।এখন বরং [হাতের মোটা বইটা দেখিয়ে] এই বইটা একটু পড়তে পারে।

মা। খুব হয়েছে। সারাদিন এল কলেজের বই পড়ে। এখন বাড়িতে পরবে পুরাণ। মেয়েকে মেরে ফেলবে না সন্ন্যাসী করবে? শুয়ে আছে থাক।

বীরেন। না, না। অসময়ে শোয়া ভাল নয়। ডাক।

মা। তুমি ডাক। আমি পারব না। [প্রস্থান]

বীরেন। সুলতা, সুলতা।

[সুলতার প্রবেশ]

সুলতা। কী বাবা?

বীরেন। এই বইখানা পড়িস। বড় ভাল বই।

সুলতা। কী বই, বাবা?

বীরেন। বৃহদ্ধর্মপুরাণ। তোদের ফিলসফি পড়ানোর ধরন-টা ঠিক নয়, মা।

সুলতা। কেন বাবা?

বীরেন। ও একেবারে শুকনো ব্যাপার। ওর সঙ্গে একটু ধর্ম শিক্ষা দেওয়া উচিত। ধর্মবোধ আর আধ্যাত্মিক শক্তি জাগ্রত নাহলে দর্শন পড়া বৃথা। এই সোজাকথা-টা আজকালকার পণ্ডিতেরা ভুলতে বসেছেন। আমাদের নরেনও ঐ দলে। মুখে খালি বুলি—সায়েন্টিফিক অ্যাপ্রোচ। বিজ্ঞান কি মানুষের মনের সবটুকু তৃষ্ণা

মেটাতে পারে? পারে না। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে একটু ধর্মগ্রন্থ নাড়াচাড়া করিস—তাতে ফিলসফি পড়া-টা সত্যিকার পড়া হবে।

সুলতা। পড়ব বাবা।

বীরেন। হ্যাঁ, পড়িস। তবে শুধু বুদ্ধি দিয়ে নয় বিশ্বাস চাই। আচ্ছা তুই দেখ বই-টা আমি একটু ঘুরে আসি। গোবিন্দ, গোবিন্দ। [প্রস্থান]

সুলতা। বৃহদ্ধর্মপুরাণ! বাব্বা! শুধু ধর্ম নয়, বৃহদ্ধর্ম। আকারে বৃহৎ বটে। বৃহৎকে দূরে রেখে আপাতত পড়ি ক্ষুদ্র 'ছায়াছবি' পত্রিকা। [পত্রিকা তুলে পাতা ওলটাতে থাকে] এ ছবিটা কার? নতুন মেয়ে। বেশ চেহারা—এই রে কাকাবাবু আসছেন। খুলে বসি—এগজিস্টেনশিয়ালিজম অ্যাণ্ড হিউম্যানিজম।

[নরেন ঢোকেন]

নরেন [খুশি]। পড়তে বসে গেছিস? বাঃ বেশ।

সুলতা। হ্যাঁ। তুমি এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে?

নরেন। আমার ছাত্রী আমায় ছুটি দিয়েছে। তার মা বললেন, পড়ার চাপে ছাত্রীটি বিধ্বস্ত। তাই আজ পড়বে না। আদুরে মেয়ে। যাকগে, তুই কী পড়ছিস?

সুলতা। এগজিস্টেনশিয়ালিজম অ্যাণ্ড হিউম্যানিজম—তুমি দিয়েছিলে।

নরেন। কী রকম লাগছে।

সুলতা। ভাল, তবে একটু শক্ত।

নরেন। মোটেই শক্ত নয়। আমি তোকে বুঝিয়ে দেব। হ্যাঁ রে, ঐ বইখানা কী?

সুলতা। ঐ—ইয়ে— বৃহদ্ধর্মপুরাণ!

নরেন। ওটা এখানে কেন! দাদা দিয়েছেন। নাঃ, মেয়েটার মাথা না চিবিয়ে ছাড়বেন না। আরে, এটা অতি অর্বাচীন পুরাণ। এইটিনথ সেনচুরির শেষ দিকে লেখা। একেবারে জাল পুরাণ। দেখ সুলতা, কোনটা প্রাচীন, কোনটা অর্বাচীন, কোনটা জাল—এ বোঝবার মতো বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি চাই সবার আগে। আমি হাত-মুখটা ধুয়ে এখুনি আসছি। সব বুঝিয়ে দেব। [প্রস্থান]

সুলতা। 'ছায়াছবি', তোমায় কোথায় রাখি। সামনে নয়। একটু আড়ালে থাক তুমি। এই যে, বৌদি আসছে। তাহলে একটু অ্যাকমপ্লিশড হই।

[গান গায়। লীনা ঢোকে]

লীনা। বাঃ বেশ, না, না, থামতে হবে না। গেয়ে যাও। আচ্ছা, তানপুরা কই?

সুলতা। ও ঘরে রয়েছে। আনা হয়নি।

লীনা। তানপুরা ছাড়া কি গান হয়? বোসো আমি নিয়ে আসছি। [প্রস্থান]

সুলতা। আমি গান গাই। আর 'ছায়াছবি' দেখি। [তাই করে] এই রে, দাদা আসছে। ব্যায়াম, শিগগির আমার শরীরে ভর কর। যোগাসন।

[টান হয়ে পা ছড়িয়ে বসে। তারপর সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দুই হাত দুই পায়ের বুড়ো আঙুলে ঠেকায়। বিকাশ ঢোকে]

বিকাশ। গুড, ভেরি গুড।

সুলতা [মাথা তুলে]। আসনটা হয়েছে?

বিকাশ। হ্যাঁ, আরো কয়েকটা আসন তোকে শেখাব। তার আগে এই নে ধর তোর টনিক। দিনে দুবার খাওয়ার পর তিন চামচ করে—দুধ বা জল দিয়ে খাবি। দুইই ভাল—পুষ্টিকর। এই টনিকটায় আয়রন ফসফেট ক্যালসিয়াম—

সুলতা। ওগুলো মুখস্ত করে আমার কী হবে দাদা?

বিকাশ। আচ্ছা। থাক। এখন কেমন ফিল করছিস্?

সুলতা। ভাল।

বিকাশ। বিশ্রাম আর ব্যায়াম—এ দুটোই হল আসল। তোর জন্য এই বইটা এনেছি—হাইজিন ফর লেম্যান। নে। মন দিয়ে পড়বি। [সুলতা বই নিয়ে খুলে পড়তে শুরু করে] না, না, এখন নয়। এখন আসন কর। আমি ব্যাগটা রেখে এখুনি আসছি। আর কয়েকটা আসন আজ শেখাব। [প্রস্থান]

সুলতা। যোগাসন, আপাতত তুমি গা থেকে নামো। 'ছায়াছবি' তুমি এস। ['ছায়াছবি' পত্রিকা তুলে নেয়] নাঃ, বুড়ো বুড়ো নায়ক আর ভাল লাগে না। [নেপথ্যে বীরেন 'গোবিন্দ গোবিন্দ'।] ও ববাবা! স্বয়ং বাবা। অতি বৃদ্ধ—নায়ক। ['ছায়াছবি' লুকোয়] বৃহদ্ধর্মপুরাণ তুমিং এসোং। [বইটা খোলে। বীরেন্দ্রনাথের প্রবেশ]

বীরেন। বইটা কী রকম দেখছিস?

সুলতা। ভাল। একটু শক্ত লাগছে।

বীরেন। শক্ত ঐ শুরু তে। বেল-ফলের মতো। ভেতরে ঢুকলেই দেখবি রসাল। দাঁড়া, আমি তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। পৃথিবীতে শক্ত বলে কিছু নেই।

[নরেন্দ্রনাথের প্রবেশ]

নরেন। ঠিক। শক্ত মনে করলেই শক্ত। এগজিস্টেনশিয়ালিজ্‌ম্ অ্যান্ড হিউম্যানিজম—বইটা তে সার্ত্র্ বলতে চেয়েছেন—এ কী, এ যে বৃহদ্ধর্মপুরাণ।

বীরেন। বইটাকে ঘেন্না করবার কিছু নেই নরেন।

[সুলতা অন্য হাতে তুলে নিয়েছে 'এগজিস্টেনশিয়ালিজম...অ্যান্ড হিউম্যানিজম।' দ্রুত ঢোকে বিকাশ]

বিকাশ। সুলতা, চেয়ারে কেন? চেয়ারে বসে আসন হয় না। মেজেতে—কী বই পড়ছিস।

সুলতা। হাইজিন ফর লেম্যান।

[তুলে নিয়েছে ভুলক্রমে, 'ছায়াছবি']

সুলতা। ওঃ। সরি।

[পত্রিকাটা ফেলে 'হাইজিন' তোলে। তানপুরা নিয়ে ঢোকে লীনা]

লীনা। এই নাও। তানপুরা ছাড়া গান হয় না।

[থমকে দাঁড়ায়। মা ঢোকেন। বাটি চামচ নিয়ে]

মা। কী ব্যাপার! তোমরা সবাই—কী করছ? কোনো পাত্রের খোঁজ পেয়েছ? টনিকের শিশিটা কোথায় গেল? এই তো, নে দুধ এনেছি। দুধে গুলে তিন চামচ—কী ব্যাপার?

বীরেন। ব্যাপার আর কী? মা আমার দশভূজা। দশ প্রহরণধারিণীম্ তানপুরা, গান, যোগাসন, পুরাণ, দর্শন, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, ছায়াছবি, টনিক, চামচ, দুধের বাটি। নরেন, এখন কী কর্তব্য?

নরেন। কর্তব্য! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

বীরেন। আমাদের তো না বুঝলে চলবে না। বুঝতেই হবে।

নরেন। তাহলে একটা মিটিং করা দরকার।

বীরেন। কী বললে? মিটিং! মিটিং করে কী হবে? মিটিং করে কিস্সু হয় না। দেখছি তো রাজনৈতিক দলগুলোকে।

নরেন। সুলতার জন্যে সর্বসম্মত একটা রুটিন তৈরি করতে হবে।

বীরেন। মিটিং। তারপরে রুটিন। বেশ কর।

মা। সুলতা, তুমি ও ঘরে যাও। আমরা পাঁচ জনে—

সুলতা। মা নে, আমি—আমারই রুটিন—আমি না থাকলে—

বীরেন। বড়দের কথার মধ্যে তোমার থাকাটা ঠিক নয় মা।

সুলতা। কিন্তু কথাটা তো—

নরেন। তোমাকে নিয়ে। ঠিক। তোমার যাতে ভাল হয়—

বিকাশ। সেটাই আমরা সবাই মিলে দেখব।

লীনা। ও যখন এ ঘরে থাকতে চাইছে, থাক না। বরং আমরা ও ঘরে যাই।

বিকাশ। হ্যাঁ, বেশ তো।

[সুলতা ছাড়া সবাই চলে যায়। সুলতা তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে]

সুলতা। দশভুজা! হে মা দশভুজা, দশখানা হাতেও কি তুই পাঁচজনকে ঠেকাতে পারতিস? বল মা তারা দাঁড়াই কোথা! [গায়] বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা? পঞ্চরিপু টানে মোরে হেথা হোথা। বল্ মা তারা—

[অমলের প্রবেশ। একটা বই হতে]

অমল। ব্যাপার কী! তোমার মুখে ভক্তি-নীতি!

সুলতা। হ্যাঁ, কাদের মুখে যেন রাম-নাম মানায় না?

অমল। হ্যাঁ, তুমি তো ভূত নও। কারণ তুমি ডক্টরেট করছ না।

সুলতা। ভূত নই, তাও মুখে ভক্তি-গীতি এসে গেছে। একই বলে ঠেলার নাম—

অমল। বাবাজী।

সুলতা। না, ঠেলার নাম বাবাজীবন।

অমল। বাবাজীবন! বুঝতে পারছি না।

সুলতা। বুঝবে পরে বুঝবে বাবাজীবন।

অমল। পরে! অগত্যা। কিন্তু এখন একটা জিনিস বুঝিয়ে দাও। রিপু তো যত দূর জানি—ছটা। তুমি পঞ্চরিপু গাইছ কেন?

সুলতা। ছ' নম্বরটাকে খুঁজে পাচ্ছি না বলে।

অমল। তোমার কথা একদম বুঝতে পারছি না। খুঁজে পাচ্ছ না মানে কী?

সুলতা। মানে? খুঁজে পাচ্ছি না মানে একটু একটু খুঁজে পাচ্ছি মনে হচ্ছে—

অমল। আবার হেঁয়ালী। এই খুঁজে পাচ্ছি না, এখন খুঁজে পাচ্ছি—এর মানে কী?

সুলতা। মানে, খুঁজে পেয়েছি।

অমল। এই ছিল 'খুঁজে পাচ্ছি', এখন হল 'খুঁজে পেয়েছি'।

সুলতা। এই মাত্তর পেয়েছি—মনে হচ্ছে।

অমল। ঠিক আছে। তোমার ছ' নম্বর রিপুটি কে?

সুলতা। তার নাম অমলকুমার বাবাজীবন।

অমল। আমি তোমার রিপু, মানে শত্রু?

সুলতা। ছ নম্বর শত্রু।

অমল। ছ নম্বর।

সুলতা। এই সব শত্রু নিধনের জন্যে আমি—

অমল। তুমি—?

সুলতা। আমি লড়ব।

অমল। লড়বে? কী ভাবে?

সুলতা। আমি গড়ব।

অমল। গড়বে? কী গড়বে?

সুলতা। সম্পর্ক গড়ব।

অমল। সম্পর্ক? কী সম্পর্ক?

সুলতা। সেরা সম্পর্ক— লোকে বলে।

অমল। অর্থাৎ—?

সুলতা। সেরা সম্পর্ক কী জান না?

অমল। না।

সুলতা। নাবালক। বিয়ে—বিয়ে। বিয়ে করে ফেলব।

অমল। এতক্ষণে সুস্থ হলে।

সুলতা। অথবা প্রবল অসুস্থ।

অমল। তাহলে দিন ঠিক করে ফেলি?

সুলতা। ফেল। [অমল দৌড় লাগায়] এই, এই, কোথায় পালাচ্ছ?

অমল। পালাব কেন?

সুলতা। তবে?

অমল। দিন ঠিক করতে যাচ্ছি।

সুলতা। সে তো পঞ্জিকা আছে।

অমল। পঞ্জিকা পরে। আগে ম্যারেজ রেজ্রিস্ট্রার। নোটিশ দিতে হবে।

সুলতা। নোটিশে তো দুটো নাম লিখতে হবে। পাত্র এবং পাত্রী। সে দুটো নাম জান?

অমল। আলবাৎ জানি।

সুলতা। হায় রে আত্মম্ভরী পুরুষ!

অমল। পুরুষ-টা আবার কী করল?

সুলতা। অর্থাৎ তুমি ধরেই নিচ্ছ যে বিয়েটা তোমার সঙ্গে হচ্ছে।

অমল। সে কী! হচ্ছে না?

সুলতা। হতে পারে।

অমল। আমিও তো তাই বলি।

সুলতা। আবার নাও হতে পারে।

অমল। মানে?

সুলতা। সব নির্ভর করছে তোমার একটা কথার ওপর।

অমল। মাত্র?

সুলতা। হ্যাঁ, মাত্র একটা

অমল। কী কথা?

সুলতা। ধর বিয়ে হল।

অমল। ব্যাস, মিটে গেল।

সুলতা। মেটেনি অধীর পুরুষ। বিয়ে যদি হয়—

অমল। আবার যদি—!

সুলতা। যদি হয় তাহলে তুমি আমার ওপর কতটা গার্জেনি ফলাবে?

অমল। পুরো-টা। সেন্ট পারসেন্ট।

সুলতা। হল না।

অমল। বিয়ে।

অমল। কেন?

সুলতা। ঐ যে—গার্জেনি।

অমল। বা রে! আমার বৌর ওপর আমি গার্জেনি ফলাব না, তাহলে ফলাবে কে? ও পাড়ার গজানন? 'স্বামী' কথাটার মানে জান? প্রভু।

সুলতা। ঐ প্রভুত্বটা ছাড়তে হবে।

অমল। পুরো-টা?

সুলতা। পুরো-টা। সেন্ট পারসেন্ট।

অমল। অসম্ভব।

সুলতা। অসম্ভব কেন?

অমল। তাহলে আর আমি স্বামী রইলাম কোথায়?

সুলতা। ছিঃ! আমার জন্যে তুমি এইটুকু স্যাক্রিফাইস করতে পার না?

অমল। এইটুকু! এ গেলে আমার রইল কী?

সুলতা। মাঝামাঝি একটা রফা করা যাক। ঠিক মাঝামাঝি। এইট্রি পারসেন্ট আমার স্বাধীনতা, টোয়েন্টি পারসেন্ট তোমার গার্জেনি, রাজী?

অমল। মোটেই না। বরং ঠিক উলটো। টোয়েন্টি পারসেন্ট তোমার স্বাধীনতা, এইট্টি পারসেন্ট আমার গার্জেনি।

সুলতা। দর কষাকষি আমার ভাল লাগে না। বিশেষত প্রেমের ব্যাপারে। আমার সিকসটি, তোমার ফর্টি।

অমল। আমার সিকসটি, তোমার ফর্টি।

সুলতা। মাছের বাজার করে ফেললে, ফিফটি ফিফটি।

অমল। অগত্যা।

সুলতা। আমিও অগত্যা। বেশ জানি, বিয়ের পরই তুমি চুক্তি লঙ্ঘন করে সেন্ট পারসেন্টে পৌঁছবে।

অমল। এ তুমি কী বলছ, সুলতা!

সুলতা। থাক, থাক, ইনিয়ে বিনিয়ে মিষ্টি কথা শোনাতে হবে না। আমি জানি, তুমি লোককে খুশি করবার জন্যে মিথ্যে মিষ্টি কথা বলে থাক।

অমল। তোমাকে মিথ্যে কথা— ?

সুলতা। চুপ কর। ও সব মিষ্টি কথা ছাড়াই আমি তোমায় বিয়ে করব।

অমল। আমার মিথ্যে কথাটা বিশ্বাস করবে না, অথচ আমাকে বিয়ে করবে! আশ্চর্য!

সুলতা। আশ্চর্যের কিছুই নেই। শত্রু কমাচ্ছি। পাঁচজন শত্রুর চেয়ে একজন শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা সহজ। বুঝেছ, বাবাজীবন, এটা নেহাৎ-ই একটা স্ট্র্যাটেজি। আত্মরক্ষার জন্যে। ঐ—কাকা আসছেন।

[নরেন্দ্রনাথের প্রবেশ। তাঁর হাতে লম্বা একটা ফর্দের কাগজ। অমল তাঁকে হাতের বইটা দেয়। বইটা হাতে নিয়েও তিনি যেন বিভ্রান্ত]

অমল। কাকাবাবু, বইটা—

নরেন। বই! কী বই? কিসের বই?

অমল। কাল সকালে দেওয়ার কথা ছিল।

নরেন। কাল সকালের বই—এখন কেন? টু-উ আর্লি। কাল সকালে ভুলে যেতে পারো তাই এখন কাজ চুকিয়ে রাখলে! একালের ছেলেরা এত ভুলো মনের হয়েছ তোমরা।

অমল। না কাকাবাবু, তা নয়, আপনি ভুলে অন্য একটা বই দিয়েছেন—ফেনোমেনালিজমের বদলে লজিক্যাল পজিটিভিজম্।

নরেন [বই দেখে]। তাই তো। বইটা তোমায় পরে খুঁজে দেব। দেখ অমল—

অমল। বলুন, কাকাবাবু।

নরেন। ওঃ, সরি। বলেই মনে পড়েছে যে তোমার নাম বিমল।

অমল। না, মানে—

নরেন। বিমল, বলেছি তো সরি। দেখ বিমল, আমরা মস্ত একটা কাজ করে ফেলেছি।

অমল। কী কাজ?

নরেন [হাতের লম্বা কাগজ দেখিয়ে]। সুলতার রোজকার কাজের একটা চার্ট করে ফেললাম। শোনো তো কেমন হয়েছে।

অমল। বলুন।

সুলতা। আমি কি শুনতে পারি?

নরেন। তুই—?

সুলতা। আমার ব্যাপার তো—

নরেন। আমার তোর সব দিক ভেবে করেছি। তোর না শুনলেও চলে, তবে যদি নেহাৎ—

অমল। বলুন, কাকাবাবু।

নরেন। হ্যাঁ, সকাল পাঁচটায় শয্যাত্যাগ।

সুলতা। পাঁচটা! তখন তো অন্ধকার।

নরেন। অন্ধকার থেকেই তো আমাদের আলোয় যেতে হবে যা। আধঘন্টা যোগাসন। সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে ছটা—গান। তারপর আধ সের দুধ সহ জলযোগ সেরে পড়াশুনো—সাড়ে নটা পর্যন্ত। তারপর স্নানাহার। বিকাশ পরে একটা ব্যালান্সড্ ডায়েটের চার্ট করে দেবে।

অমল। সুলতা কলেজে যাবে না?

নরেন। হ্যাঁ, দুপুরে কলেজ। চারটের মধ্যে কলেজ থেকে প্রত্যাবর্তন।

অমল। চারটের মধ্যে?

নরেন। কোনো অসুবিধে হবে?

অমল। ট্রাম-বাসে যা ভিড়। তাছাড়া দু দিন তো চারটে অব্দি ক্লাসই থাকে।

নরেন। সে দু দিন সাড়ে চারটেয় আসবে।

অমল। লাইব্রেরিতে যাবে না?

নরেন। আমার যা বই আছে—তাই ওর লাইব্রেরি। বাইরে কিছু খাওয়া বারণ। বাড়িতে এসে আধ সের দুধ সহ জলযোগ। তারপর আদব কায়দা শিক্ষা- বৌমার কাছে। তারপরে মেয়ে দেখানো।

অমল। বুঝতে পারলাম না।

নরেন। কোনখানটায়? বল বল। আমি বুঝিয়ে দেব।

অমল। মেয়ে দেখানো।

নরেন। বৌদি সুলতার বিয়ের জন্য ক্ষেপে উঠেছেন। প্রতি সপ্তাহে একটি বা দুটি পাত্র পক্ষকে হাজির করতে হবে। ক্লিয়ার, বিমল?

অমল। হ্যাঁ, কাকাবাবু।

নরেন। সন্ধেতেও আবার সঙ্গীত-চর্চা। তারপরে পড়াশুনো। নৈশাহার সেরে টনিক খেয়ে শয্যাগ্রহণ—মাত্র দশটায়। এত তাড়াতাড়ি শুলে ফার্স্ট ক্লাস বা ডক্টরেট কিছুই হয় না। আমার ভাগটাই কম পড়ল, জানলে বিমল?

অমল। আপনার ভাগ?

নরেন। ঠিক মতো পড়তে গেলে যে সময়-টা পাওয়া দরকার, তা এ রুটিনে নেই। তা এঁরা বুঝবেন না। আমি যে সুলতাকে ভাল করে পড়াতে চাই—কেন? বিমল, তোমার কী মনে হয়? কেন আমি এত করে চাই?

অমল। আপনার ভাইঝি, তাই।

নরেন। নো। নো, নো। সুলতা ভাল ছাত্রী, ওর মাথা আছে। ভাল একটা চারা গাছ- তাকে বাড়িয়ে তুলতে ইচ্ছে করে না। তার ভেতরকার শক্তি আর সৌন্দর্য ফুলের মতো ফুটে উঠুক—একজন মালী তো তা চাইবেই। মাস্টার একজন মালীই তো। কিন্তু নিজের ছেলে মেয়ে ছাড়া কারো ওপর অধিকার থাকে না।

সুলতা। কাকাবাবু!

নরেন। আই নো; আই নো, মাই চাইল্ড, তুই পড়াশুনো করতে চাস। কিন্তু—

অমল। কাকাবাবু, আমি সুলতার মতো অত ভাল ছাত্র নই। কিন্তু আপনি দেখিয়ে দিলে আমি চেষ্টা করতে পারি।

নরেন। পড়বে তুমি আমার কাছে? হাউ নাইস। তোমার ঐ মাথাতেই আমার চলবে। আমার মাথাই বা কী এমন রাধাকৃষ্ণন। তুমি আমায় বাঁচালে। এত পড়াশুনো করি, একজন ভাল কাউকে তার ভাগ না দিতে পারলে ভেতরটা টনটন করে। কাল থেকেই এস তুমি।

অমল। নিশ্চয়ই আসব।

সুলতা। বা রে, আমি কি বানের জলে ভেসে এসেছি নাকি?

নরেন। তোর দুঃখ আমি বুঝি, মা। কিন্তু আমি কী করব বল। আমার কথায় তো কিছু হবে না।

সুলতা। কাকাবাবু!

নরেন। আমি কী করব বল।

সুলতা। তুমি তাহলে ওকেও পড়াতে পারবে না।

অমল। কী হিংসুটে!

নরেন। কাকে পড়াতে পারব না?

সুলতা। ওকে—অমলকে।

নরেন। অমল! আই সি! তুমি তো আচ্ছা ছেলে হে। আমি এতক্ষণ তোমায় বিমল বলেছি, আর তুমিও সাড়া দিয়ে যাচ্ছ।

অমল। না, মানে ঠিক খেয়াল করিনি।

নরেন। নিজের নাম খেয়াল থাকে না। এত ভুলো মন নিয়ে—

সুলতা। ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া সম্ভব নয়।

অমল। তুমি থামো।

সুলতা। তুমি পড়বে না, ব্যাস।

অমল। তোমার কথায় হবে না। কাকাবাবু যা বলবেন তাই হবে।

নরেন। আমি একটু ঘুরে আসি। আমার মনটা খারাপ হয়ে গেছে। মাথাটা কেমন করছে। [প্রস্থান]

[নরেনের গতিপথের দিকে ওরা দুজন তাকিয়ে থাকে। দুজনেই কিছুক্ষণ নীরব। তারপরে কথা বলে। কথার লঘুতার আড়ালে একটা গভীরতাও কাজ করে]

সুলতা। ছ' নম্বর শত্রু, কী ভাবছ?

অমল। এক নম্বর মিত্র, আমি তোমায় দিলাম একশো ভাগ স্বাধীনতা।

সুলতা। আমার পরম শত্রু, তোমায় আমি কী দিই? আমিও তোমায় দিলাম এক শো ভাগ স্বাধীনতা।

অমল। আমাদের দুজনের স্বাধীনতা ভালবাসায় দাঁড়াতে—

সুলতা। নয়তো ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

অমল। তোমার ভয় করছে না?

সুলতা। না, হালকা লাগছে।

অমল। তাহলে তোমার হাতের রুটিন-টা—

সুলতা। কুচিকুচি করি।

[কুচিকুচি করে]

অমল। উড়িয়ে দাও।

[সুলতা উড়িয়ে দেয়]

সুলতা। কী সুন্দর দেখতে লাগছে। আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে।

অমল। গাও। নির্ভয়ে, মুক্তকণ্ঠে।

সুলতা [গায়]। বল মা তারা দাঁড়াই কোথা?

অমল। সে কী?

সুলতা [গায়]। এক শত্রু বলে আমায়—পাকা কথা, বল মা তারা দাঁড়াই কোথা?

অমল [গায়]। এক শত্রু বলে তারে—স্বাধীনতা। জয় মা তারা, দাঁড়াও হেথা।

সুলতা। পাঁচ শত্রু নিধন হল, এক মিনিট তাই নীরবতা।

অমল। আর ছ নম্বর?

সুলতা [গায়]। ছ নম্বর পালের গোদা, তারে ছেড়ে যাই বা কোথা?

অমল [গায়]। জয় মা তারা, দাঁড়াও হেথা। না হয় আছে ভাল মাথা। তাই কি যাবে যথা তথা? জয় মা তারা, দাঁড়াও হেথা।

সুলতা। মাথা খারাপ লোক কপালে থাকলে কী আর করব? [গায়] ভাগ্যে আছে খারাপ মাথা, তারে ছেড়ে যাই বা কোথা। জয় মা তারা, দাঁড়াই হেথা। জয় মা তারা—দাঁড়াই হেথা।

সুলতা ও অমল। জয় মা তারা দাঁড়াই হেথা। [পর্দা]

মনোবিকলন

রমেন লাহিড়ী

চরিত্রলিপি

রঘু
বিনতা
নিশীথ
দিব্যেন্দু

[মানসিক রোগের চিকিৎসক নিশীথনাথের বাড়ির বৈঠকখানা। সাজসজ্জার বাহুল্য নেই—সুরুচির ছাপ স্পষ্ট। আসবাবের মধ্যে একটি ছোট গোল টেবিলকে ঘিরে তিনটি চেয়ার। পেছনে একটা বই-এর র‍্যাক। তাতে ফুলদানি। ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটি সোফা। পেছনের দেওয়ালে নিশীথ ও তার স্ত্রী বিনতার দুটি ছবি। মাঝবরাবর একটি দেওয়ালে ঘড়ি। নিশীথ যুবক, সুপুরুষ। সদাহাস্যময়। বিনতা বিদুষী ও সুন্দরী। সুগৃহিণী।....এক শনিবার সন্ধ্যার ঘটনা। বড় ঘড়িতে পৌনে সাতটা বাজে। বাপের আমলের ভৃত্য রঘুদা ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে রাখছিল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল ঘড়িটা বন্ধ হয়ে আছে। তারপর...]

রঘুদা। ঐ যাঃ, ঘড়িটা তো বন্ধ হয়ে গেছে! [অন্দরের উদ্দেশ্যে] বৌদি, ও ঘরের ঘড়িতে কটা বাজে দেখ তো? বড় ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। [নেপথ্যে থেকে বিনতা উত্তর দিল—সাতটা বেজে সাতাশ]—সাতটা বেজে সাতাশ?—[ঘড়িতে দম দিল। কাঁটা ঘোরাল] এই হল সাতটা [কাঁটা ঘোরানো থামল না]। আর এই হল পাঁচ, দশ, পনেরো, বিশ, পঁচিশ, সাতাশ। ঐ যাঃ দুমিনিট ফাস্ট হয়ে গেল। যাকগে। [পেন্ডুলামটা দুলিয়ে দিল]। যতবারই চালাই কেবলি বলে টক টক, টক টক। কেনরে বাপু, ভুলেও কি একবার মিষ্টি মিষ্টি বলতে নেই।

[বিনতার প্রবেশ]

বিনতা। কি বকছ রঘুদা আপন মনে?

রঘুদা। বকছি এই ঘড়িটাকে। যতবারই চালাই—

বিনতা [ঘড়ি দেখে]। সাড়ে সাতটা বাজতে চলল—এখনও তোমার দাদাবাবুর দেখা নেই। সিনেমায় যেতে ঠিক দেরি হয়ে যাবে।

রঘুদা। এসে পড়বেনখন সময় মতো। সিনেমা তো সেই রাত নটায়।

বিনতা। তা হোক। তুমি একটু ঘুরে এস দেখি শংকরবাবুদের বাড়ি থেকে। নিশ্চয়ই সেখানে তাসের আড্ডায় জমেছেন।

রঘুদা। আর খানিক দেখে গেলে হয় না?

বিনতা। উঃ কি কুঁড়ে তুমি! কাজের নাম শুনলেই কুঁকড়ে যাও! যাকগে, বাইরে যেতে হবে না। উনুন ধরে গেছে—ভাতের জলটা চাপিয়ে দাও।

রঘুদা। একেবারে খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে সিনেমায় গেলেই তো পারতে!

বিনতা। বাপরে বাপ! তোমার কর্তামির জ্বালায় অস্থির! [ঘড়িতে সাড়ে সাতটার ঘরে সাতটা বাজল]। একি! সাড়ে সাতটার ঘরে সাতটা বাজল কেন?

রঘুদা [মাথা চুলকে]। —তাইতো।

বিনতা। ঘড়িতে ঠিক দম দিয়েছিলে তো?

রঘুদা। হ্যাঁ। বেশ ভাল করে দম দিয়ে চালিয়েছি।

বিনতা। কটা বেজে বন্ধ হয়েছিল দেখনি?

রঘুদা। দেখেছিলাম তো?—সাড়ে ছটা বেজে—

বিনতা। থামো। থামো। যেদিকটা আমি নিজে না দেখব, সেদিকটাই বেচাল হয়ে যাবে! তুমি আর ঘড়িতে দম দেবে না।

রঘুদা। সেকি বৌদি! গিন্নিমা সগ্‌গে যাবার পর থেকে ঐ ঘড়িটাকে আর দাদাবাবুকে আমিই তো চালিয়ে এসেছি।

বিনতা। কেমন যে চালিয়ে এসেছ, তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। সময়জ্ঞান যদি কারো থাকে!

রঘুদা। তা যন্তরই বল, আর মানুষই বল—কারো কথা কি জোর দিয়ে বলা যায়। কখন যে ঠিক থাকে, কখন যে—

বিনতা। দোহাই তোমার—একটু থাম। কান ঝালাপালা হয়ে গেল।

[নেপথ্যে নিশীথের ডাক শোনা গেল—রঘুদা—]

রঘুদা। ঐ তো নাম করতে করতেই আসছে। [নিশীথের প্রবেশ]—তুমি অনেকদিন বাঁচবে দাদাবাবু।

নিশীথ। এক কাপ কড়া চা না পেলে আর এক মুহূর্তও বাঁচব না।

বিনতা। না, না—এত রাতে আর চা খেতে হবে না। এই তো সাড়ে পাঁচটায় চা খেয়ে বেরুলে!

নিশীথ। হ্যাঁ। আর এখন সাড়ে সাতটা বাজে। ইস, দুঘন্টা চা না খেয়ে আছি!—আর এদিকে, ডাক্তারে ঘন্টায় ঘন্টায় চা খেতে বলেছে! রঘুদা—তুমি এখনও দাঁড়িয়ে!

রঘুদা। যাচ্ছি। যাচ্ছি। বৌদি, তুমিও খাবে তো?

নিশীথ। নিশ্চয়ই। এক যাত্রায় পৃথক ফল হওয়া ভাল নয়। যাও—বেশি দেরি কোর না।

[রঘু চলে গেল। নিশীথ বসল]

বিনতা। নাঃ, চা খেয়ে খেয়ে লিভারটাকে নষ্ট করে ছাড়বে।

নিশীথ। দূর। চায়ে কত উপকার হয় জান? চায়ের লিকারে ক্যাফিন আছে, চিনিতে কার্বোহাইড্রেট আছে, আর দুধ তো আর্দশ খাদ্য!

বিনতা। খুব হয়েছে, থামো। কটা বাজে খেয়া আছে? সিনেমায় যেতে হবে না?

নিশীথ। তা এর মধ্যে কি? মোটে তো সাড়ে সাতটা বাজে।

বিনতা। তা হোক। জামা কাপড় পরতেই পরতেই সময় হয়ে যাবে।

নিশীথ [পাজামা পাঞ্জাবি পরেছিল, পোশাকটা একনজর দেখে বলল]। —আমি এই পরেই যাব।

বিনতা। অমনি সং-এর মত সেজে!

নিশীথ। পুরুষ মানুষের অত সাজের ঘটা করে কি হবে?—তোমার পরী সাজবার ইচ্ছে হয়ে থাকে—যাও, যাজগে।

বিনতা [অভিমানে]। —কথায় কথায় অমন যা তা বল কেন বল তো? গায়ের রংটা না হয় কালোই—

নিশীথ [অভিমান ভাঙতে কথা ঘোরাল]। না, না আমি বলছি মানে—ঐ আকাশী রং এর শাড়িটায় তোমাকে মানিয়েছে কিন্তু ভারী চমৎকার! মনে হচ্ছে—

বিনতা [মুখ ভার করে চলে যাচ্ছিল]। —থাক, থাক। আমি বুঝি সব।

নিশীথ [কাছে গেল]। এই। ঠাট্টা বোঝ না!

বিনতা। কথায় কথায় অমন ঠাট্টা কর কেন? আমার ভাল লাগে না।

নিশীথ। আচ্ছা বেশ। ঠাট্টা থাক। আমাদের মেন্টাল হসপিটালে আজ একটি ভারী ইন্টারেস্টিং কেস এসেছে—তার কথা বলি। বোস।

বিনতা। থাক, তোমার পাগলা গারদের গল্প আর শুনতে চাই না। মন খারাপ হয়ে যায়।

নিশীথ [হেসে]। মনোবিজ্ঞানীরা কি বলেন জান?

বিনতা। কি বলেন?

নিশীথ। বলেন, প্রত্যেক মানুষই কোনো না কোনো এক ধরনের মানসিক রোগে ভুগছে। যার মধ্যে এই রোগের প্রকোপ বেশি তাকেই আমরা বলি পাগল।

বিনতা। তাই নাকি! তাহলে আমি? আমিও পাগল!

নিশীথ। ঠিক পাগল না হলেও—ছিটগ্রস্ত।

বিনতা। ছিটগ্রস্ত!—কেমন করে বুঝলে?

নিশীথ। এমনিতে তোমার কথাবার্তা শুনে বা তোমার কাজের বাঁধুনি দেখে তোমাকে ছিটগ্রস্ত ভাবা অবশ্য কঠিন। তবে তোমার পাগলামিটা কখন প্রকাশ পায় জান?—সিনেমা যাবার বেলা। যে কোনো কারণেই হোক, শো আরম্ভ হবার আধঘন্টা আগে থেকে তুমি সিনেমায় গিয়ে হাজির হবেই।

বিনতা। বাঃ—এর মধ্যে আবার পাগলামির কি আছে? ছবি আরম্ভ হয়ে যাবার পর সিনেমায় যাওয়ার কোনো মানে হয় নাকি?

নিশীথ। তাই বলে আধঘন্টা আগে থাকতে সিনেমায় গিয়ে বসে থাকারও কোনো মানে হয় না! আসলে, এটা একটা বাতিক।—আর কেমন করে এই বাতিক জন্মেছে তাও আমি বলে দিতে পারি।

বিনতা। বল তো দেখি?

নিশীথ [বিনতার কাছে এসে]। ছোট বেলায় তুমি হয়তো সিনেমা দেখতে খুব ভালবাসতে। কিন্তু গুরুজনদের ভয়ে হয়তো সিনেমায় যেতে পেতে না। যদিও বা কখনো সখনো যাওয়ার সুযোগ ঘটত—তাহলেও হয়তো একা যেতে পেতে না; বড়দের কারো সঙ্গে যেতে হত—অথচ বড়দের ঢিলেমির জন্য হয়তো সিনেমায় যেতে দেরি হয়ে যেত। তাই বড় হয়ে যখন একা একা সিনেমায় যেতে শিখলে—তখন হয়তো দেরি হয়ে যাবার ভয়ে শো আরম্ভ হবার অনেক আগে গিয়ে বসে থাকতে। ক্রমশ সেই অভ্যাসটাই আজ স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে!

বিনতা [তার অপরূপ ব্যাখ্যা শুনে। ব্যঙ্গ করে বলল]। —বাঃ বেশ বললে তো!—আচ্ছা, লোকের মনের কথা তোমরা এত সহজে টের পাও কি করে?

নিশীথ। আমরা যে মনোবিজ্ঞানী!

বিনতা। ওঃ—তাই! আচ্ছা, এ রোগ সারানোর কোনো চিকিৎসা নেই?

নিশীথ। আছে বৈকি। এক রকমের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া আছে—তাকে বলে মনোবিকলন। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রথমে মানসিক রুগির রোগের প্রকৃতিটা জেনে নেওয়া হয়, তারপর উপযুক্ত চিকিৎসা করে রোগ সারানো হয়।

বিনতা [নিশীথের কাছে এসে]। আমার একটা কথা রাখবে?

নিশীথ। কি কথা?

বিনতা। রাখবে কিনা বল আগে।

নিশীথ। নিতান্ত দুঃসাধ্য না হলে নিশ্চয়ই রাখব।

বিনতা [তার হাত ধরে]। মনোবিকলন করে তোমার পাগলামিটাও সারিয়ে নাও না গো।

নিশীথ। কি?—আমি পাগলামি করি! কক্ষনো না।

বিনতা। এ্যাঁ!—হ্যাঁ। তা ঠিক।—তবে—। আচ্ছা বেশ, আমার মধ্যে পাগলামির কি লক্ষণ দেখছ বল?

বিনতা। দুনিয়া শুদ্ধ লোককে পাগল ভাবাটাই তো পাগলামির মস্ত বড় লক্ষণ! বদ্ধ পাগল ছাড়া এমন কথা কেউ ভাবে নাকি?

নিশীথ। তার মানে, তুমি বলতে চাও—আমি একটি বদ্ধ পাগল?

বিনতা। নিশ্চয়ই। তা নইলে এমন লক্ষ্মীছাড়া কথা কেউ বলে?

নিশীথ। দেখ, যা বোঝ না, তা নিয়ে তর্ক করতে আস কেন বল দেখি?

বিনতা। ও! বুঝিনা! বেশ, তুমি যে একটি পয়লা নম্বরের পাগল তা যদি প্রমাণ করে দিতে পারি—তাহলে আমাকে কি দেবে?

নিশীথ। হুঁ—চ্যালেঞ্জ! All right I accept.—আর যদি না পার, তাহলে তুমি আমাকে কি দেবে?

বিনতা। না, তুমি হেরে গেলে কি দেবে তাই আগে বল।

নিশীথ। কি দেব? [একটু ভেবে] আচ্ছা বেশ, তুমি যা চাইবে, তাই দেব!

বিনতা। বেশ, এবার পুজোয় একটা শ্যাওলা রংএর টিসু শাড়ি কিনে দিতে হবে।

নিশীথ। শ্যাওলা রংএর টিসু শাড়ি কিনে দিতে হবে! [খুব হাসল] শ্যাওলা রংএর টিসু শাড়ি?—বেশ তাই দেব। আর তুমি হেরে গেলে?

বিনতা। তুমি যা বলবে, তাই করব।

নিশীথ। বেশ। তুমি হেরে গেলে, একটি বচ্ছর বাপের বাড়ি যেতে পারবে না।

বিনতা [একটু থমকে গেল]। এক বচ্ছর!

নিশীথ। হুঁ। তুমিই চ্যালেঞ্জ করেছ। পেছিয়ে গেলে চলবে না। আর, এই চ্যালেঞ্জ তিনদিন valid থাকবে। তিনদিনের মধ্যে আমাকে হারাতে না পারলে তোমাকে হার মানতে হবে।

[নিশীথ বিনতার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল]

বিনতা। [নিশীথের হাতে হাত রেখে] আমি রাজী।

[দুকাপ চা হাতে রঘুর প্রবেশ]

নিশীথ। নাঃ রঘুদা—তুমি সত্যিই বুড়ো হয়ে গেছ। দু-কাপ চা করতে এত দেরি!

[বিনতা নিশীথকে চা দিল। নিজে নিল]

বিনতা [এক চুমুক দিয়ে]। ইস্ ভীষণ কড়া হয়ে গেছে!

নিশীথ [এক চুমুক দিয়ে]। বাঃ! চমৎকার হয়েছে! বেঁচে থাক রঘুদা।

রঘু। ভাত আর মাংস ছাড়া আর কি রান্না হবে?

বিনতা। না। আবার কি? মাংস নামিয়ে ভাতটা চড়াবে।

নিশীথ। গরম ভাত আর মাংস! আঃ! গ্র্যান্ড হবে। এখনই জিভে জল আসছে!

বিনতা। থামো তো দেখি। কেবল খাই, খাই। চল রঘুদা, চালটা মেপে দিয়ে আসি।

নিশীথ। এক কুনকে চাল বেশি নিও কিন্তু। চিবিয়ে চুষে চেটে গিলে একচোট যা খাব আজ।

[হাসতে লাগল]

রঘু। তাহলে খানিকটা পেঁপের চাটনিও করলে তো হয়! করব?

বিনতা। চল। চল। যেমন উনি, তেমন তুমি। পেটসর্বস্ব!

নিশীথ। বিনু, ওঘরে বুককেসের সব নিচের তাকে একটা মোটা লাল মলাটের বই আছে, নিয়ে এস তো আসবার সময়।

[বিনতা ও রঘু চলে গেল। নিশীথ সামনে রাখা সেদিনের খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে পড়তে লাগল]

নিশীথ [কাগজ পড়তে লাগল]। ভীষণ বিমান দুর্ঘটনা—তেত্রিশ জন নিহত....বাস লরী সংঘর্ষ...তের জন আহত। পাক-পুলিশের গুলিতে তিনজন ভারতীয় চাষী নিহত...আণবিক বোমার পরীক্ষা!—নাঃ কাগজ খুললেই কেবল মৃত্যু, হত্যা আর বোমা-বিস্ফোরণ! শান্তিতে থাকতে দেবে না দেখছি কিছুতেই!

[বই হাতে বিনতা ঢুকল]

বিনতা। এই বইটা? [বই দিল]

নিশীথ। হ্যাঁ।

[বই এর ওপর জমে থাকা ধুলো সাফ করতে লাগল]

বিনতা। কদ্দিন খোলনি বইটা? পাতায় পাতায় ধুলো জমে গেছে।

নিশীথ। বইটা আর বিশেষ কাজে লাগে না তো। যাক, ওঘরের কাজ সারা হয়ে গিয়ে থাকে তো, বস না। একটু কাছে।

বিনতা। বসব কি গো! সিনেমায় যেতে হবে না?

নিশীথ। তার এখনও ঢের দেরি আছে। একটা চ্যাপ্টারে চোখ বুলিয়ে নিয়েই উঠে পড়ব।

[বইয়ে মন দিল। বিনতা একটু চুপ থেকে দেখল তার বইএ মনঃসংযোগ। একটু পেছিয়ে গিয়ে বাঁ হাতে ধরা একটা নীল কাগজ বার করে পড়তে লাগল]

কোনো পুরুষ মানুষের নাম দেখলে তার পরিচয় জানবার জন্যে কত জ্বালাতে মনে নেই?

নিশীথ। ওঃ সে তোমায় ঠাট্টা করবার জন্যে। পুরুষদের মন মেয়েদের মতো অত প্যাঁচালো নয় বুঝলে?

বিনতা। হুঁ প্যাচালো নয় বটে। তবে জিলিপির মতো সরল।

নিশীথ। পুরুষদের মন বুঝলে আকাশের মতো উদার,—কাঁচের মতো স্বচ্ছ আর—

বিনতা। আর গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসী পাতার মতো পবিত্র! বল। বল। থামলে কেন?

নিশীথ। থামলে কেন—এ্যাঁ! [খপ্ করে বিনতার হাত চেপে ধরে]—ভারী চালাক হয়েছ না? ভেবেছ, এইভাবে আমাকে রাগিয়ে দেবে। তারপর আমিও রাগের মাথায় যা-তা বলতে থাকব। তখন আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলবে—ঐ তো তুমি পাগলামি করছ! এ্যাঁ?

বিনতা [কৃত্রিম বিস্ময়ে]।—সত্যি, কি বুদ্ধি তোমার! [নেপথ্যে কড়ানাড়ার শব্দ] আঃ কে আবার ডাকতে এল?

নিশীথ। কে আবার মূর্তিমান বেরসিক! রঘুদা কে কড়া নাড়ছে দেখ তো?

[রঘু বাইরের দিকে গেল]

বিনতা। ও নিশ্চয়ই শংকরবাবুর লোক। তাস খেলতে ডাকতে এসেছে।

নিশীথ। না! অন্য কেউ নিশ্চয়ই। ওরা জানে আমি আজ সগিন্নী সিনেমায় যাব।

বিনতা। বাঃ, সে গল্পও করা হয়েছে!

নিশীথ। না বললে কি উঠতে দিত নাকি? গিন্নীকে যথাসময়ে সিনেমায় না নিয়ে যেতে পারলে কি দারুণ নিগ্রহ ঘটে—সে অভিজ্ঞতা ওদের সবাইয়ের তো আছে! [বিনতা ও নিশীথ হাসল। রঘু ঢুকল] কে রঘুদা?

রঘু। কি জানি, চেনা মনে হয় না। সুট বুট পরা।

নিশীথ। সুট বুট পরা? তাহলে বোধ হয় হসপিটালের ডাক্তার। ডাক তো।

[রঘু চলে গেল]

বিনতা। যেই হোক বাপু—দু কথায় কাজ সেরে বিদায় কর। আজ আর কোথাও বেরুতে পাবে না।

নিশীথ। তেমন জরুরি কিছু হলে বেরুতে হবে বৈকি! Duty first.

বিনতা। ও! আচ্ছা।

[অভিমানে চলে যাচ্ছিল, দিব্যেন্দু ঢুকল]

দিব্যেন্দু। বিনু!

বিনতা। আরে! দিব্যেন্দুদা! তুমি! উঃ কতদিন পরে দেখা! [আনন্দে তার হাত চেপে ধরল]—সোজা রেঙ্গুন থেকে আসছ?

দিব্যেন্দু। হ্যাঁ। [নিশীথকে]—নমস্কার। বিনুর বিয়ের সময় ছিলাম রেঙ্গুনে। তাই আসতে পারিনি।

বিনতা। আরে দাঁড়িয়েই রইলে যে? বস। [দিব্যেন্দু বসল]—কবে এলে? কোথায় উঠেছ?

দিব্যেন্দু। এসেছি কাল সকালে। উঠেছি একটা হোটেলে। Excuse me, আপনার নামটা—কিন্তু ভুলে গেছি—কি যেন—

নিশীথ। নিশীথ। নিশীথ চক্রবর্তী। আপনি?

দিব্যেন্দু। দিব্যেন্দু গাঙ্গুলী। বিনুর—

বিনতা। বেশ লোক যাহোক! হোটেলে উঠলে কি বলে? আমাদের এখানে উঠতে পারলে না?

দিব্যেন্দু। ঠিকানা কি মনে ছিল? আজ সকালে তোমাদের বাড়ি গিয়ে ঠিকানা নিয়ে—

বিনতা। বেশ করেছ! কোন হোটেলে উঠেছ বল? একটা চিঠি লিখে দাও—রঘুদা গিয়ে জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আসুক।

দিব্যেন্দু। না, না। তার দরকার নেই। দিন পাঁচেক তো ভারী কলকাতা বাসের মেয়াদ।

নিশীথ। তবে এই কটা দিন এখানেই থেকে যান। রঘুদা—

দিব্যেন্দু। না, না। ও পারবে না সব গুছিয়ে আনতে। আমিই বরং কাল সকালে সব গুছিয়ে নিয়ে আসব।

[রঘু বাইরে থেকে এল]

বিনতা। বেশ। আজ রাতে তাহলে এখান থেকে খেয়ে যাও। তাতে অসুবিধে নেই তো?—রঘুদা। একটু চা-এর জল চাপিয়ে দাও। আর কিছু মিষ্টি—

দিব্যেন্দু। না, না। শুধু চা হলেই চলবে।

বিনতা। তুমি থামো তো। আমার খপ্পরে যখন পড়েছ—তখন আমার কথামতোই চলতে হবে। মনে নেই বিয়ের আগের দিনগুলোর কথা!

[রঘু চলে গেল]

দিব্যেন্দু। মনে নেই আবার? জানেন মশাই, ওর বিয়ের আগে যেদিনই গেছি ওদের বাড়িতে, সেদিনই চারটে করে সন্দেশ জোর করে গিলিয়েছে।

বিনতা। জোর করে! লজ্জা করে না মিথ্যে কথা বলতে? কতদিন আমাদের মিটসেফ থেকে এটা সেটা চুরি করে খেয়েছ—তা মনে নেই?

[দুজনে তর্ক শুরু করল]

নিশীথ। বাঃ, বেশ। উনি এলেন এক দেশ থেকে—কোথায় একটু বিশ্রাম করতে বলবে—তা না ঝগড়া সুরু করলে! এই জন্যেই বলে মেয়ে মানুষ—

বিনতা। দেখ, যখন তখন 'মেয়ে মানুষ', 'মেয়ে মানুষ' বলবে না বলে দিচ্ছি।

দিব্যেন্দু। ক্ষান্ত হন মশাই। কিছুতেই পারবেন না ওর সঙ্গে। একবার রসনা-সঞ্চালন শুরু করলে—

বিনতা। তোমার রসনা-সঞ্চালন থামাও দেখি। [অন্দরের উদ্দেশে] রঘুদা। [রঘু এল]—এঁকে বাথরুমটা দেখিয়ে দাও।

নিশীথ। তারপর এস। একবার দোকানে যেতে হবে।

বিনতা। দোকানে কেন?

নিশীথ। কিছু মিষ্টি আনতে হবে না?

বিনতা। মিষ্টিতো ঘরেই আছে। রঘুদা, তুমি যাও। [রঘু চলে গেল। নিশীথকে]—তুমি যাও, সামনের দোকান থেকে ভাল দেখে কিছু ডালমুট আর দুটো ডিম নিয়ে এস। বেণুদা মাংসের চেয়ে ডিমটাই বেশি ভালবাসে।

দিব্যেন্দু। আশ্চর্য! আমি কি কি খেতে ভালবাসি, তাও ঠিক মনে আছে দেখছি!

বিনতা। কেন মনে থাকবে না? আমি তো আর পুরুষ নই।

দিব্যেন্দু। নিন মশাই, কেমন একটা ঠোক্কর দিল?

নিশীথ। একটা ঠোক্কর! দিনেরাতে অমন কত ঠোক্কর যে আমায় খেতে হয়!

বিনতা। তাই নাকি!

[দুজনে তর্ক সুরু করল]

দিব্যেন্দু। দাম্পত্য কলহটা আমার সামনে করা কি ভাল হচ্ছে বিনু? [হাসল]

বিনতা। যাও, যাও। তুমি আমার সামনে থেক না। [নিশীথ প্রস্থানোদ্যত]—আর হ্যাঁ, বেণুদার জন্যেও একটা টিকিট এন।

দিব্যেন্দু। টিকিট! কিসের?

নিশীথ। সিনেমার টিকিট না হয় একেবারে হাউসে গিয়েই নেব।

দিব্যেন্দু। না, না। আমাকে বাদ দাও বিনু। বড্ড tired আজ।

বিনতা। সিনেমা দেখলে ও সব সেরে যাবে। [নিশীথকে] পাশাপাশি সিট হবে তো? কদ্দিন যে বেনুদার সঙ্গে সিনেমা দেখিনি!

দিব্যেন্দু। ভগবান করেন, 'হাউসফুল' হয়ে যায়।

বিনতা। তাতেই বা কি? দুখানা টিকিট তো আছেই। তোমাতে আমাতে যাব। উনি বাড়ি পাহারা দেবেন।

দিব্যেন্দু। অগত্যা! পড়েছি যবনের হাতে।

[দিব্যেন্দু ও নিশীথ হাসল]

বিনতা। যাও। যাও। তুমি আর দেরি কর না।

নিশীথ। হ্যাঁ। যাই। [চলে গেল]

বিনতা। তুমিও যাও। হাত মুখ ধুয়ে এস।

[দিব্যেন্দু চলে গেল। বিনতা ঘরের টুকিটাকি কাজ করতে করতে লাগল। রঘু ঢুকল]

বিনতা। রঘুদা একবার বাজারে যেতে হবে যে।

রঘুদা। উনিও কি ভাত খাবেন?

বিনতা। না, না। বেণুদা আবার রাতে ভাত খেতে পারে না। তুমি খানিকটা ময়দা মেখে ফেল। তারপর দোকানে যাও। খানিকটা রাবড়ি নিয়ে আসবে।

রঘুদা। এক কৌটো বাটারও তো আনতে হবে।
বিনতা। হ্যাঁ। ও ঘরের দেরাজে টাকা আছে। নিয়ে যাও।
[রঘু চলে গেল। একটু পরে দিব্যেন্দু ঢুকল]
দিব্যেন্দু। আঃ, শরীরটা বেশ ফ্রেস বোধ হচ্ছে। [ভালভাবে ঘরের চারিদিক দেখে তারপর চেয়ারে বসে]—বেশ বহাল তবিয়তেই আছ দেখছি!
বিনতা। তা নেহাৎ মন্দ নেই।
[দিব্যেন্দুর কাছে বসল]
দিব্যেন্দু। আচ্ছা, নিশীথবাবু শুনেছিলাম—ডাক্তার না কি যেন?
বিনতা। হ্যাঁ। একটা মেন্টাল হসপিটালের।
দিবোন্দু। মেন্টাল হসপিটালের! মানে, পাগলাগারদের!
বিনতা। কতকটা তাই বটে। তারপর, তোমার খবর কি বল?
দিবোন্দু। ভালই।
বিনতা। ভালই তো বুঝলাম—কিন্তু কি রকম ভাল?
দিব্যেন্দু। কি আশ্চর্য! ভাল ভালই। তার আবার রকম ফের আছে নাকি?
বিনতা। আছে বৈকি। যেমন ধর শুধু ভাল, মন্দের ভাল, খুব ভাল। তারপরও আবার প্রশ্ন থাকে কি ভাল? শরীর ভাল? না, মন ভাল? না শরীর মন দুই-ই ভাল?
দিবোন্দু। ভালরে ভাল! এতো আচ্ছা ভাল লোকের পাল্লায় পড়েছি! আমার শরীর মন সব ভাল—হল তো!
[দুজনে হাসতে লাগল। নিশীথ ঘরে আসবার মুখে এদের হাসি শুনে একটু থমকে গেল। তারপরে ঘরে ঢুকল। হাতে ডালমুটের ঠোঙা]
নিশীথ। এই নাও ডালমুট।
বিনতা। ডিম আননি?
নিশীথ। হ্যাঁ। এই যে।
[পকেট থেকে বার করল।]
বিনতা। পকেটে করে ডিম এনেছ! বেশ। ভেঙে যেত যদি? বেনুদা বস! চা নিয়ে আসছি।
নিশীথ। আমাকেও এক কাপ দিও কেমন?
বিনতা। আবার?
নিশীথ। লক্ষ্মীটি। প্লীজ। বড্ড tried, বেশ, আধকাপ দিও। দিও, কেমন।
বিনতা। ধন্যি নেশা তোমার। রঘুদা—
[বিনতা চলে গেল]
দিব্যেন্দু। বসুন, দাঁড়িয়েই রইলেন যে। [নিশীথ বসল] সংসার বলতে তাহলে আপনারা দুজন?
নিশীথ। আর ঐ রঘুদা আছে।
দিব্যেন্দু। দিব্যি আরামে আছেন বলুন? কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে!—সত্যি আপনাকে দেখে হিংসে হয়।

নিশীথ। কেন?

দিব্যেন্দু। ভাল বাড়ি, ভাল গিন্নী, ভাল চাকরি—একজন সাধারণ লোকের যা কিছু কাম্য থাকতে পারে সবই পেয়েছেন। কজন লোকের ভাগ্য এ রকম জোটে!

নিশীথ। তা সত্যি। তবে আমাদের সংসারে এই সুখ আর শান্তির জন্যে বিনতার গিন্নীপনার কৃতিত্বও অনেকখানি।

[বিনতা আসছিল। শুনতে পেল নিশীথের শেষের কথাগুলো]

বিনতা। কি ভাগ্যি আমার!

দিব্যেন্দু। আপনি ঠিকই বলেছেন নিশীথ বাবু। বিনতার মতো স্ত্রী পাওয়া সত্যি ভাগ্যের কথা।

বিনতা। বটে! এমন উপর্যুপরি খোসামোদের কারণটা কি শুনি?

দিব্যেন্দু। বাঃ, এতে খোসামোদের কি আছে? যা সত্যি উনি তাই বলেছেন।

বিনতা। এমন সত্যি কথাটা উনি কদাচিৎ বলেন কিনা, তাই সন্দেহ হচ্ছে।

নিশীথ। নিন্দে করার কিছু পাওনা তাই করনা। পেলে কি আর ছাড়তে? তোমাদের মতো পুরুষদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।

নিশীথ। ফের তুমি আমাদের জাত তুলে কথা বলছ?

দিব্যেন্দু। সত্যি বিনু, গোটা পুরুষ জাতটার বিরুদ্ধে মন্তব্য করা উচিত নয়।

বিনতা। বাঃ, অমনি গায়ে লেগেছে! সাধে কি আর বলি—তোমরা নিজেদের কোটটা চেন খুব।

নিশীথ। দেখ, আর যা খুশি বল, আপত্তি করব না। কিন্তু পুরুষরা স্বার্থপর একথা বোল না। মেয়েদের মুখে অন্তত এককথা সাজে না!

বিনতা। আমি একশবার বলব।

নিশীথ। আমি হাজারবার আপত্তি করব।

দিব্যেন্দু। আমি তো লক্ষবার আপত্তি করব!

বিনতা। তুমি থামো ভীষ্মদেব। একটা বিয়ে করবার সাহস নেই!

দিব্যেন্দু। বাঃ রে, এর মধ্যে আবার বিয়ের কথা উঠছে কেন?

নিশীথ। হেরে গিয়ে কথা ঘোরাচ্ছে বুঝলেন না। [হাসল]

বিনতা [রাগে]। কক্ষনো না। [চা জলখাবার নিয়ে রঘু ঢুকল] এযাত্রা খুব বেঁচে গেলে!

রঘুদা। আমি তাহলে চট করে বাজার থেকে ঘুরে আসি?

বিনতা। হ্যাঁ যাও। বেশি দেরি কর না। তুমি এলে আমরা বেরুব। [রঘু চলে গেল]—সত্যি বেণুদা তুমি কি বিয়ে করবে না ঠিক করেছ?

দিব্যেন্দু। দরকার কি? এই তো বেশ আছি।

বিনতা। বাজে কথা রাখ। সংসারী হতে মন চায় না কেন বল তো?

দিব্যেন্দু। সংসারই নেই তো সংসারী হব কি করতে?

বিনতা। সেইজন্যেই তো বলছি বিয়ে করতে। মাথার উপর কেউ নেই বলে কদ্দিন আর এমনি ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াবে?

দিব্যেন্দু। যদ্দিন না ফুল ফুটবে। জান তো, জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে—তিন বিধাতা নিয়ে!

বিনতা। হুঁ। বিধাতার ওপর বড্ড ভক্তি জন্মেছে দেখি! দেব নাকি হাটে হাঁড়ি ভেঙে!

দিব্যেন্দু। মানে?

বিনতা। বেণুদা বিয়ে করতে চায় না কেন জান?

নিশীথ। কেন?

বিনতা। দেব বলে?

দিব্যেন্দু। বিনু প্লীজ—don't be ungenerous!

বিনতা। উনি একটি মেয়েকে কথা দিয়েছিলেন—

দিব্যেন্দু। না, না। সেজন্যে ঠিক নয়—মানে—

বিনতা। সেজন্যে নয় বললেই হবে? আমি জানিনা কিছু?

নিশীথ [হেসে]। তা যাকে ভালবাসতেন তাকেই বিয়ে করলেন না কেন?

দিব্যেন্দু [লজ্জা পেয়ে]। করলাম না মানে—সামাজিক বাধা ছিল।

বিনতা। সামাজিক বাধা না ছাই। আসলে তোমারই সাহস হয়নি তাই বল। নইলে সে মেয়ে তো রাজীই ছিল!

নিশীথ। রাজীই ছিল! সে মেয়ের মনের কথাও তুমি জানতে?

বিনতা। জানতাম বৈকি।

দিব্যেন্দু। যাকগে বাজে কথা থাক। আসুন স্যার, দুজনে মিষ্টিগুলোর সদ্ব্যবহার করি।

বিনতা। না, না। তুমি একাই নাও!

দিব্যেন্দু। এত খেয়ে মারা পড়ব নাকি?

বিনতা। এত আবার কি? ভারী তো চারটে সন্দেশ। ও তো একটা কচি ছেলেতেও খেতে পারে।

দিব্যেন্দু। তা পারে। কিন্তু আমি তো কচি নই।

বিনতা। থাক, থাক। অত বিনয়ে কাজ নেই। তুমি যে একটি পয়লা নম্বরের পেটুক তা আমার বেশ জানা আছে।

[দিব্যেন্দু ও নিশীথ হাসল]

নিশীথ। যাক, আপনার কপালেও তাহলে একটা বিশেশণ জুটল।—পয়লা নম্বরের পেটুক!

দিব্যেন্দু। তা হোক। তবু তো পয়লা নম্বরের!

[সন্দেশ খেতে লাগল]

নিশীথ। জানেন মশাই, আমাকেও অমনি একটা বিশ্লেষণ দিয়েছে—পয়লা নম্বরের পাগল।

দিব্যেন্দু। কি আস্পর্দ্ধা! আপনাকে পাগল বলেছে!

বিনতা। পাগলই তো। বদ্ধ পাগল তুমি।

নিশীথ। শুনছেন তো? শুনুন।

দিব্যেন্দু। কি সাংঘাতিক কথা!

নিশীথ। আচ্ছা মশাই—এই যে এতক্ষণ কথা বলছি আপনার সঙ্গে—এর মধ্যে কোথাও এতটুকু পাগলামির ঝোঁক দেখেছেন?

দিব্যেন্দু। একটুও না।

নিশীথ। বেশ তো। তুমি পাগল কিনা—তার প্রমাণ হয়ে যাক। বেণুদা তুমিই বিচার করবে।

দিব্যেন্দু। না, না, আমাকে এসব পাগলামি কান্ডকারখানার মধ্যে টানছ কেন?—শেষে যে আমিই পাগল হয়ে যাব!

নিশীথ। না মশাই, পেছিয়ে গেলে চলবে না। আপনাকেই বিচার করতে হবে। তিনদিন সময় আছে। এর মধ্যে ও আমাকে পাগল প্রমাণ করে ছাড়বে বলেছে।

দিব্যেন্দু। আপনি challenge accept করেছেন।

নিশীথ। নিশ্চয়ই। আমি হলাম গিয়ে পাগলামি সারানোর ডাক্তার—আর আমাকেই বলে কিনা পাগল!

দিব্যেন্দু। না, না। কাজটা ভাল করেননি মশাই। তিনদিন কেন, তিন ঘণ্টার মধ্যে বিনতার মতো যে কোনো মেয়ে, যে কোনোও পুরুষকে বদ্ধ পাগল করে ছেড়ে দিতে পারে।

নিশীথ। দেখাই যাকনা—ওর দৌড় কতদূর। মনে থাকে যেন, হেরে গেলে একটি বচ্ছর বাপের বাড়ি যেতে পাবে না!

বিনতা। হ্যাঁ, হ্যাঁ খুব মনে আছে।

দিব্যেন্দু। না, বিনু কাজটা ভাল হচ্ছে না। ওঁর যা মনের জোর দেখছি—

বিনতা। দেখাই যাক না—উনি কেমন পাগলামি সারানোর ডাক্তার!

নিশীথ [সিগারেট কেস এগিয়ে দিল]। নিন স্যার।

দিব্যেন্দু [সিগারেট নিয়ে দেখে ফিরিয়ে দিল]। ক্যাপস্টান?—চলবে না তো। বিড়িখোর লোক মশাই—ও গোলাপী নেশায় শানাবে না।

বিনতা। ইস—তুমি বিড়ি খাও!

দিব্যেন্দু। হ্যাঁ—খাই। তাতে কি?

বিনতা। মুখ দিয়ে বিশ্রী গন্ধ বেরোয় না ভক ভক করে!—কেন সিগারেট খেতে পারো না?

দিব্যেন্দু। খাইতো—চারমিনার। [পকেট হাতড়ে] ঐ যাঃ সিগারেটের প্যাকেটটা কোথায় ফেললাম?

নিশীথ। আপাতত একটা ক্যাপস্টানই নিন না?

দিব্যেন্দু। মাফ করবেন। স্ট্যান্ডার্ড খাটো করতে পারব না। [উঠে দাঁড়াল]—এখনি আসছি সিগারেট নিয়ে।

বিনতা। ধন্যি নেশা করা বাবা তোমাদের! সিগারেট খাবে—তাও বেছে বেছে—এটা নয়, সেটা নয়।

দিব্যেন্দু। তোমরা শাড়ি জামা বেছে পর না?

নিশীথ। একটা শাড়ি কিনতে কাপড়ের দোকানের গুদাম উজাড় করে ফেল না?

বিনতা। ঘাট হয়েছে বাবা আমার।—যাও, যা নেবার নিয়ে এস চট করে।

দিব্যেন্দু। পারবে আমাদের সঙ্গে তর্ক করে?

বিনতা। যান মশাই, চট করে ঘুরে আসুন। যা চটেছে—বেশিক্ষণ একা থাকতে ভরসা হয় না।

[দিব্যেন্দু হেসে চলে গেল বাইরে]

বিনতা। লোক দেখলে তুমি বড্ড বাড়াও বুঝলে।

নিশীথ। বাঃরে, আমি আবার কি বাড়াবাড়ি করলাম?

বিনতা। বেণুদার সামনে আমাকে অমনভাবে ডাউন করলে কেন?

নিশীথ। বাঃ আমি ডাউন করলাম না, তুমিই আমাদের দুজনকে বাক্যবাগীশ বলে একেবারে নস্যাৎ করে দিলে?

বিনতা। তা ছাড়া আর কি তোমরা? [প্রস্থানোদ্যত]

নিশীথ। সে যাই হোক। তোমার বেণুদা কিন্তু বেশ লোক।

বিনতা [ফিরে]। হ্যাঁ। ও বরাবরই এমনি মিশুকে। হৈ চৈ ভীষণ ভালবাসে।

নিশীথ। আচ্ছা, উনি তোমার কে হন?

বিনতা। সে কি! তুমি চিনলে না ওকে?

নিশীথ। নাঃ, ওঁর পরিচয় তুমি কোনো দিন দিয়েছ বলে তো মনে পড়ে না।

বিনতা। নিশ্চয়ই বলেছি—মনে নেই তাই বল?

[মনে মনে বিনতা কি যেন মতলব ভাঁজছে]

নিশীথ। উঁহু। আমার মেমারি অত খারাপ নয়। এঁর কথা তুমি আগে কখনও বলনি।

বিনতা। বলিনি বুঝি?

নিশীথ। বলেছ বলে তো মনে পড়ছে না।

বিনতা। তাহলে বোধ হয় ভুলে গেছি বলতে।

নিশীথ [অর্থপূর্ণ]। সত্যই কি ভুলে গিয়েছিলেম?

বিনতা। কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?

নিশীথ। তোমার উত্তরটা সত্যিই খুব বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না।

বিনতা। কেন?

নিশীথ। দিব্যেন্দুবাবু কি খেতে ভালবাসেন, ওঁর সঙ্গে কতদিন সিনেমা দেখনি, উনি কেন বিয়ে করছেন না—এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তুমি এমন অন্তরঙ্গভাবে কথা বললে যে, তা শোনবার পর যে কোনোও লোকের এই কথাটাই মনে

হবে এককালে ওঁর সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা বেশ ঘনিষ্ঠই ছিল। আর এত ঘনিষ্ঠ যে—বিয়ের ছমাসের মধ্যে সে কথা ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।

বিনতা। বাঃ, এটাও একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নাকি?

নিশীথ। নিশ্চয়ই। আর সেই জন্যেই তো মনে হচ্ছে—তোমার বেণুদার কথা তুমি ভোলনি, ভুলতে পার না। তবে যে কোনো কারণেই হোক—ওঁর সঙ্গে যে এককালে তোমার ঘনিষ্ঠতা ছিল—এ কথাটাও তুমি আমার কাছে গোপন রাখতে চাও!

বিনতা। যদি বলি সত্যিই তাই।

নিশীথ। তাহলে বলব, আজ আর কোনো সংকোচ না করে—সে গোপন কথাটা খুলে বল।

বিনতা। আমার গোপন কথা জানবার জন্যে ভারী কৌতূহল দেখছি!

নিশীথ। হ্যাঁ—তা একটু কৌতূহল হচ্ছে বৈকি!

বিনতা। অথচ আজ সকালেও না তুমি বলেছ—আমার কোনো গোপন কথা জানবার জন্যে তোমার কোনো কৌতূহল নেই!

নিশীথ। সে বলেছিলাম এই জন্যে যে, আমি তখনও পর্যন্ত বিশ্বাস করতাম—তোমার এমন কোনো কথা থাকতে পারে না, যা তুমি আমার কাছেও গোপন রাখতে পার।

বিনতা। তবে সেই বিশ্বাসেই এই কৌতূহলটুকু ঠেকিয়ে রাখ না কেন?

নিশীথ। উঁহু। এখন আর তা সম্ভব নয়। একটা কৌতূহল যখন জেগেছে তখন আসল কথাটা না জানা পর্যন্ত তা মরবে না। তা ছাড়া দেখ, এমন ভাবে মনের কোনো জিজ্ঞাসাকে লুকিয়ে রাখা উচিত নয়। তাতে মনেরও ক্ষতি হয়—সংসারেও অশান্তি বাড়ে।

বিনতা। বাঃ, সংসারে অশান্তি বাড়বে কেন?

নিশীথ। বাড়বে না?—এই ধর না কেন, দিব্যেন্দুবাবুর সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা যে নেহাৎ তুচ্ছ নয়—তা তুমিও জান, আমিও বেশ বুঝতে পারছি।

বিনতা। বেশ তো—তাতে কি হল?

নিশীথ। সেই সম্পর্কটা যে ঠিক কি ধরনের তা জানবার জন্যেই কৌতূহল জেগেছে। অথচ তা যদি না জানতে পারি তাহলে এই কৌতূহল থেকেই মনের মধ্যে নানান সন্দেহ দেখা দেবে।

বিনতা। অর্থাৎ আমি যদি সব কথা খুলে না বলি—তাহলে তুমি আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করবে?

নিশীথ। অসম্ভব নয়। আর সত্যি কথা বলতে কি, একটা সন্দেহ ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে।

বিনতা। ছিঃ, তুমি আমাকে সন্দেহ কর!

নিশীথ। আমার মনে এ সন্দেহ জাগানোর জন্যে তুমিও কিন্তু দায়ী।

বিনতা। আমি!

নিশীথ। হ্যাঁ তুমি। [একটু চুপ] একথা কি অস্বীকার করতে পার যে, দিব্যেন্দুবাবুর কথা তুমি সত্যিই ভোলনি? [বিনতা চুপ]—বল। চুপ করে রইলে কেন?

বিনতা [ধীর শান্ত স্বরে]। না ভুলে যাইনি। ভুলতে চেষ্টা করেছিলাম।

নিশীথ। কেন? [বিনতা চুপ] কারণটা তুমি না বললেও আমি ব্যাখ্যা করে বলে দিতে পারি—শুনবে?

বিনতা। আজ এ আলোচনা থাক না।

নিশীথ। আশ্চর্য!এই সামান্য কথাটা তুমি এড়িয়ে যেতে চাইছ কেন?

বিনতা। যে কথা ভুলে থাকবার জন্যে আমি চেষ্টা করছি—

নিশীথ। কিন্তু ভুলে যাব বললেই কি সব কথা ভুলে থাকা যায়?

বিনতা। যায় না?

নিশীথ। না। মানুষ ইচ্ছে করলেই তার জীবনের কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভুলে যেতে পারে না।

বিনতা। মানুষ কি চেষ্টা করলে তার জীবনের কোনো দুর্ঘটনার কথাও ভুলতে পারে না?

নিশীথ। না। যে ঘটনার স্মৃতি মানুষের মনকে কষ্ট দেয় বা লজ্জা দেয়—মানুষ প্রাণপণে তা ভুলে থাকবার চেষ্টা করে।—একে বলে অবদমন। কিন্তু সেই ঘটনার স্মৃতি তার সত্তা থেকে সে একেবারে মুছে ফেলতে পারে না।

বিনতা। তুমি কেমন করে জানলে?

নিশীথ। ভুলে যেও না আমি মনোবিজ্ঞানী।

বিনতা। মনোবিজ্ঞানীরা কি মানুষের মনের সব কথা টের পায়?

নিশীথ। পায় বৈকি। এই মুহূর্তে আমি যেমন তোমার মনের কয়েকটা চোরাগলির সন্ধান পাচ্ছি।

বিনতা। কি জেনেছ তুমি আমার সম্বন্ধে?

নিশীথ। সব কিছু না হলেও এটুকু অন্তত স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে—বিয়ের আগে দিব্যেন্দুবাবুর সঙ্গে তোমার এমন একটা সম্পর্ক ছিল যাকে ভদ্রভাষায় বলে—অসামাজিক।

বিনতা। অসামাজিক।

বিনতা। নিশ্চয়ই।

নিশীথ। কক্ষনো না।

নিশীথ [হঠাৎ আক্রমণ করল]। দিব্যেন্দুবাবুকে যদি তুমি সত্যিই ভালবাসতে তবে তাঁকেই বিয়ে করলে না কেন? [বিনতা চুপ]—বল?

বিনতা [ধীরভাবে]। সামাজিক বাধা ছিল।

নিশীথ। সত্যিকার ভালবাসা কোনো দিন কোনো বাধার কাছে হার মানেনি—হার মানেও না।

বিনতা। জানি।

নিশীথ। তবে? [বিনতা চুপ]—জানতাম, এর কোনো জবাব তুমি দিতে পারবে না।

বিনতা। বিয়ের আগে কোনো মেয়ে যদি কোনো পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করে তবে সেটা কি অন্যায়?

নিশীথ। মেলামেশাটা শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে গেলে অন্যায় হয় বৈকি।

বিনতা। তোমার জীবনেও তো এমনি একটা ঘটনা ঘটেছিল। কই, আমি তো তা নিয়ে কিছু বলিনি।

নিশীথ। বলবার উপায় ছিল না। কারণ আমি অকপটে সব স্বীকার করেছি। আর তুমি কপটতার আশ্রয় নিয়েছিলে।

বিনতা। কি করে বুঝলে?

নিশীথ। মানুষের মন নিয়েই যে আমাদের কারবার। আমাদের ছলনা করা কি এতই সহজ?

বিনতা [ব্যঙ্গ করল]। তাই নাকি! তবে তো সত্যিই ভারী ভয়ের কথা!

নিশীথ [উত্তেজিত]। অস্বীকার করতে পার, তোমার আর দিব্যেন্দুর মধ্যে ভালবাসার টানটাই বড় ছিল না?

বিনতা [দৃঢ়স্বরে]। কক্ষনো না। Never!

নিশীথ। আঃ, চিৎকার কর না।

বিনতা। চিৎকার করিনি। প্রতিবাদ করছি।

নিশীথ। প্রতিবাদ! বাঃ, কথা শিখেছ তো বেশ!

বিনতা। কথা কেউ অমনি শেখে না। তুমি যা বলছ তা শুনলে বোবা মেয়ের মুখেও কথা ফুটত।

নিশীথ। তাই নাকি! একটা নতুন তত্ত্ব শিখলাম বটে। অন্যায় কাজ করাটা দোষের নয়—কাজটাকে অন্যায় বলাটাই দোষের!

বিনতা। তোমার কাছে যা অন্যায়—অন্যের কাছে তা তো অন্যায় নাও হতে পারে।

নিশীথ। চোর যখন চুরি করে তখন সেও বোধহয় ঐ যুক্তিতেই চুরি করে! ন্যায় অন্যায় বিচার বোধটা তোমার বেশ প্রখর হয়েছে দেখছি!

বিনতা। হয়েছেই তো। ন্যায় অন্যায় বিচার করবার অধিকার তোমার মতো পুরুষদেরই এক চেটে নাকি?

নিশীথ। থামো। থামো। নির্লজ্জতার একটা সীমা থাকা উচিত!

বিনতা। সে কথাটা তুমিই ভুলে গেছ। তা না হলে যার সম্বন্ধে কিছু জাননা—

নিশীথ [চিৎকার করে]। তুমি চুপ করবে কিনা জানতে চাই। বেহায়া, নির্লজ্জ কোথাকার।

বিনতা। যুক্তিতে পারলে না তাই গালাগাল দিতে সুরু করেছ? বাঃ, এই না হলে আর পুরুষ মানুষ।

নিশীথ [ছটফট করতে লাগল]। উঃ অসহ্য। অসহ্য। [বিনতার কাছে এসে] তুমি যদি আমার স্ত্রী না হতে—

বিনতা। তাহলে বোধ হয় গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে—তাই না?

নিশীথ। তোমার মতো লোককে নিয়ে ঘর করতে হবে ভাবতেও আমার লজ্জা করছে।

বিনতা। ও কথা বলবার অধিকার আমারও আছে।

নিশীথ। থামো। থামো। অধিকার! অধিকার ফলাতে এসেছ? আমি তোমার সেই ইডিয়েট বেণুদা নই—

বিনতা। কেন তাঁকে গালাগাল করছ? তাঁকে গালাগাল দেবার কোনো অধিকার তোমার নেই।

[দিব্যেন্দু ঘরে ঢুকতে গিয়ে থেমে গেল। আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল]

নিশীথ। অধিকার আছে কি নেই, সে কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে হবে নাকি? [পকেট থেকে সিনেমার টিকিট বার করে ছিঁড়ে ফেলল]—Scoundrel! Stupid!

বিনতা। ওকি!—টিকিট দুটো ছিঁড়ছ কেন?

নিশীথ [কাগজের টুকরোগুলো দলা পাকিয়ে দূরে ফেলে দিল]। বেণুদার পাশে বসে সিনেমা দেখবার বড্ড সখ—তাই না? I must get him out this very night!

[দিব্যেন্দু অন্তরাল থেকে ঘরে এল]

দিব্যেন্দু। তার আর দরকার হবে না নিশীথবাবু। আমি নিজেই যাচ্ছি।

বিনতা। না, তুমি যেতে পাবে না।

দিব্যেন্দু। ছেলেমামানুষি কর না বিনু।

বিনতা। তোমাকে আমি কিছুতেই যেতে দেব না। এ বাড়িতে ওঁরও যতটা অধিকার আছে আমারও ততটা অধিকার আছে।

নিশীথ। বটেই তো! বেশ! তোমরা থাক। আমিই বেরিয়ে যাচ্ছি বাড়ি থেকে।

দিব্যেন্দু। কি ছেলেমানুষি করেছেন নিশীথ বাবু?

নিশীথ। Shut up আপনার জন্যেই আমার ঘরের শান্তি নষ্ট হয়েছে। রঘুদা—রঘুদা!

বিনতা। চেঁচাচ্ছ কেন? রঘুদা বাড়ি নেই।

দিব্যেন্দু। নিশীথ বাবু, আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না কি ভাবে আমি আপনার সংসারের শান্তি নষ্ট করেছি। তবু যদি অজ্ঞাতে কিছু অন্যায় করে থাকি, ক্ষমা করবেন। আমি এখনই চলে যাচ্ছি।

[দোরের দিকে গেল]

বিনতা [বাধা দিয়ে]। না তুমি যেতে পাবে না।

নিশীথ। না, না আপনি যাবেন কেন? আপনি থাকুন—আপনারই থাকুন। আমিই চলে যাচ্ছি।

[ছুটে অন্দরে চলে গেল। দিব্যেন্দু বিমূঢ়। বিনতাও নিশীথের পেছনে গেল। অনতিবিলম্বে একটা ছোট

চামড়ার সুটকেশ আর এক বোঝা জামা কাপড় নিয়ে ফিরে এল। টেবিলের ওপর সুটকেশ রেখে জামাকাপড় ভরতে লাগল। রাগে অধীর সে। বিনতা তার কান্ড দেখে বহু কষ্টে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসি চাপল]

বিনতা। ও সুটকেশটা ছোট। একটা বড় ট্রাঙ্ক এনে দেব?

দিব্যেন্দু। আঃ বিনু। নিশীথবাবু শুনুন—

নিশীথ। থাক। আর ভালমানুষির দরকার নেই। I am tired of it. আমার জীবনটাই আপনারা বিষিয়ে দিয়েছেন।

বিনতা [জোরে হেসে ফেলল]। খুব হয়েছে ওঠ এবার। আর তেজ দেখিয়ে কাজ নেই।

[নিশীথের হাত ধরে টানল]

নিশীথ। না, না ছেড়ে দাও।

[হাত ছাড়িয়ে নিল]

বিনতা। ছেড়ে দাও বললেই যদি ছাড়া পাওয়া যেত তাহলে আর ভাবনা ছিল কি? নাও সর। [নিশীথকে সরিয়ে দিল] আচ্ছা তুমি কি গো? কাকে কান নিয়ে গেল শুনেই কাকের পেছনে ছুটলে!

[নিশীথ অবাক]

দিব্যেন্দু। কি ব্যাপার বলুন তো? সবটাই কেমন যেন রহস্যময় ঠেকছে!

বিনতা। ব্যাপার আর কি? তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যে কি তা বুঝতে আর বোঝাতে গিয়েই যত গন্ডগোল।

দিব্যেন্দু। সেকি! ওর সঙ্গে তো আমার সম্পর্কটা আদৌ জটিল নয়! কি বুঝিয়েছ ওঁকে?

বিনতা। আমি আর বোঝাবার সময় পেলাম কই? তার আগেই তো উনি সব বুঝে ফেললেন। মনোবিজ্ঞানী কিনা!

নিশীথ। থামো। থামো।

বিনতা। বাপস এখনও রাগ পড়েনি দেখছি!—বেণুদা হচ্ছে আমার আপন জ্যাঠতুতো ভাই বুঝলে?—সেই যে বৈরাগী জ্যেঠার কথা বলেছিলাম—

নিশীথ [লজ্জায় বিস্ময়ে]। —এ্যাঁ!

বিনতা। এ্যাঁ নয়, হ্যাঁ।

দিব্যেন্দু। কি আশ্চর্য! এ-খবরটা আপনি জানতেন না?

বিনতা। জানবেন না কেন? জানতেন সবই তবে—

নিশীথ [অপ্রস্তুত]। —না, না। সত্যিই জানতাম না।—মানে—

বিনতা। থাক। আর 'মানে' 'মানে' করে কাজ নেই। এখন হার মানলে কিনা—তাই বল?

নিশীথ। কেন! কিসে? বাঃ রে—

বিনতা। বাঃ বেশ। বেণুদা তুমি তো দেখলে শুনলে সব। ওঁর কান্ড দেখে কি ওঁকে বদ্ধ পাগল বলে মনে হয়নি তোমার?

নিশীথ। এ্যাঁ! কি শয়তান!—এইভাবে আমাকে ঠকালে!

বিনতা। ঠকালাম বৈকি? পুরুষ জাতটাই এমনি। স্বার্থে ঘা পড়লে তাদের আর মাথার ঠিক থাকে না।

দিব্যেন্দু। কক্ষনো না।

বিনতা। থাক। আর বড়াই করে কাজ নেই। চোখের সামনেই তো একটি উদাহরণ দেখলে?

নিশীথ। সত্যি বড় অন্যায় হয়ে গেছে। কেন যে মাথাটা বিগড়ে গেল হঠাৎ।

বিনতা। হঠাৎ যায়নি মশাই—হঠাৎ যায়নি। আমি স্ত্রী হয়ে স্বামীর মুখের ওপর কথা বলেছি—আমার অধিকার সাব্যস্ত করতে চেয়েছি—আর কি মাথার ঠিক থাকে?

নিশীথ। না, না, কক্ষনো সেজন্যে নয়—

দিব্যেন্দু। আমি কিন্তু ব্যাপারটা এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি বিনু।

বিনতা। ব্যাপার আর কি?—পুরুষরা কখনো স্বার্থপর হয় না, পুরুষরা কখনো স্ত্রীর ওপর স্বামীত্বের অধিকার ফলাতে চায় না—এ-কথা উনি প্রায়ই বলেন। তাই আমিও ঠিক করেছিলাম, কত তুচ্ছ কারণে যে পুরুষরা স্বার্থপর হতে পারে—তাদের স্বামীত্বের অধিকারে ঘা পড়লে তারা যে কেমন ক্ষ্যাপামি শুরু করে—তা আমি প্রমাণ করব।

নিশীথ। তুমি তো বড় সাংঘাতিক মেয়ে! কবে কি বলেছি ঠাট্টা করে—

দিব্যেন্দু। কিন্তু একা নিশীথবাবুকে দিয়েই তো গোটা পুরুষ জাতটার বিচার হতে পারে না?

বিনতা। তা পারে না জানি। কিন্তু উনি যে গোটা পুরুষ জাতটার পক্ষ নিয়েই কথা বলতেন।—মনে থাকে যেন, শ্যাওলা রংএর টিসু শাড়ি।

দিব্যেন্দু [হেসে]। ওঃ একেই বলে স্ত্রীলোক। এত কান্ডের মধ্যেও শাড়ির কথাটি ঠিক মনে আছে।

[সকলে হেসে উঠল]

বিনতা [ঘড়ির দিকে নজর পড়তে]। ইস আটটা যে বেজে গেছে! বেণুদা নাও। ওঠ।

দিব্যেন্দু। কেন?

বিনতা। বাঃ সিনেমায় যেতে হবে—মনে নেই? [নিশীথকে]—তেজ দেখিয়ে টিকিট গুলো তো ছিঁড়লে—টাকাগুলো জলে গেল তো?

নিশীথ। হুঁ। গেল তো—

বিনতা। তোমার সিগারেটের বরাদ্দ থেকে কাটা যাবে।

নিশীথ। বিনু না, প্লিজ। সিগারেট কমালে সত্যি মারা পড়ব।

বিনতা। উঁহুঁ। কোনো কথা শুনছি না। দোষ করেছ—তার শাস্তি পেতে হবে বৈকি!

দিব্যেন্দু। উঃ বিনু—তুমি কি নিষ্ঠুর!

[সকলে হেসে ফেলল]

দিব্যেন্দু। ঐ যাঃ, ঘড়িটা খুলে হাত ধুচ্ছিলাম—কলতলায় রেখে এসেছি। দাঁড়াও নিয়ে আসি।

[দিব্যেন্দু ভেতরে গেল]

বিনতা [ছড়ান কাপড়গুলো গোছাতে-গোছাতে]। ধোপ-দুরস্ত জামা কাপড়গুলোর কি দশা করলে দেখ তো?—এইজন্যেই বলে নির্গুণ পুরুষদের তিনগুণ রাগ!

[নিশীথ চুপচাপ দাঁড়িয়ে বিনতার কাজে দেখতে লাগল। তার মন অকৃত্রিম অনুশোচনায় ভরে উঠল]

নিশীথ। সত্যি বিনু, তোমাকে অবিশ্বাস করাটা আমার উচিত হয়নি।

বিনতা। স্ত্রীর অসম্মানে স্বামীর সম্মান যে বাড়ে না, একথা তোমরা ভুলে যাও বলেই তো-সংসারে এত অশান্তি বাড়ে।

নিশীথ [বিনতার কাছে এসে তার কাঁধে হাত রেখে আবেগে]। কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে সত্যিই অবিশ্বাস করি না।

বিনতা [তার হাতটা চেপে ধরে সলজ্জে]। আমি জানি।

[তারা যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য ভুলে গেল পরিবেশটাকে। পেছনে দিব্যেন্দু ঢুকল। একটা সাদা রুমাল উড়িয়ে]

দিব্যেন্দু। শান্তি! শান্তি! [বিনতা, নিশীথ সচকিত হল। হেসে উঠল সকলেই। বাইরে থেকে রঘু ঢুকল।]

বিনতা। রঘুদা আমরা চললাম—ঘরদোর সামলে সুমলে রেখ। আর ডিমটা রেঁধে ফেল।—উনুনে আঁচ রেখ আর—

দিব্যেন্দু। আর কোনোও কথা নয়। All quiet on the family front. Now to the cinema. March.

[বিনতার এক হাত ধরল নিশীথ, আর এক হাত দিব্যেন্দু। উচ্ছ্বসিত হাসিতে ঘর ভরিয়ে দিয়ে তিনজনে বেরিয়ে গেল। হতভম্ব রঘু ঘরের মেঝে এগিয়ে এসে আপন মনেই বললে]

রঘুদা। পাগলগুলো ভালয় ভালয় ফিরলে বাঁচি!

[ভেতরে চলে গেল]

দ্বান্দ্বিক

অমর গঙ্গোপাধ্যায়

চরিত্রলিপি

কালী
বিশু
সুরজলাল
দিলীপ
ঘনশ্যাম
ইসমাইল
নেত্য
হীরু
দারোগা

[বস্তির ঘরের দৃশ্য। দারিদ্র্যের চিহ্ন সর্বত্র। এক কোণায় রান্নার সরঞ্জাম। জলের ভাঙা কুঁজো। আর এক পাশে একটা খাটিয়া, তার উপর ময়লা বিছানা। কালীদাস খাটিয়ায় বসে। দৃঢ় বলিষ্ঠ চেহারা। কিছুটা চিন্তিত। বাইরে দরজায় ধাক্কা পড়ে। প্রথমে সে শুনতে পায়নি। তারপর শুনে চমকে ওঠে]

কালী। কে?

বিশু [নেপথ্যে]। তোর বোনাই শালা। দরজা খোল....[প্রবেশ] কি বে শালা, জেনানা হয়ে গেছিস। দিন-দুপুরে দরজা বন্ধ করে ইজ্জৎ বাঁচাচ্ছিস?

কালী। এত আগে ছেড়ে দিল যে?

বিশু। ছাড়বে না? শালাদের বলে দিলুম, ছাড়বে ত ছাড়—না হলে শালা জেলেই চুরি শুরু করে দেব। ওয়ার্ডারের বিড়ির বান্ডিলটাই একদিন হাত সাফাই করে দিলুম। তারপর আর পাঁচজন স্যাঙাৎকে শিখোতে লেগে গেলুম। শালাদের হেডে মাথা আছে বে। চটপট শিখে লেয়। মাইরি দোস্ত, শালারা যখন জেল থেকে বেরুবে—দুনিয়ার সব পাকিট শালা একদম ফাঁকা হয়ে যাবে। এমন শিখিয়েছি যে একদিন আমারই বিড়ির বান্ডিল লোপাট! কি বে বলছিস না যে?

কালী। পালিয়ে এসেছিস?

বিশু। দূর শালা! পালাব কেন? আ-বে পালাব কার জন্যে? আমার কি ঘরে বউ আছে? না বউয়ের জন্য ঘর আছে? হোটেল মে খানা, ফুটপাত মে সোনা—ও শালা জেলেই কি আর বাইরেই কি—হাল শালা সব জায়গায় সমান। তবে হ্যাঁ, বাইরে থাকলে দু'চারটে প্যাকিট [ইঙ্গিতে দেখায়] হ্যাঁ—হ্যাঁ—তারপর শালার সিনেমা! মধুবালা! নার্গিস! কি রে মুখখানা শালা জেলার সাহেবের মতো করে রেখেছিস কেন?

কালী। পেছনে পুলিশ নিয়ে আসিসনি ত? আমাদের কারখানায়—

বিশু। ইস্টেরাইক চলছে! শালা গাধা কোথাকার। আ-বে ওসবে হবে না। ভদ্দরলোকদের দুদিনের সখ; কদিন হৈ-চৈ করবে। তারপর মরতে মরবি তোরা। ওসবে হয় না, কত শালাকে দেখলুম। জেলেতে এক উল্লুক—রাজবন্দী বে—এ কেলাস। শালা বলে, ভাই বিশু, এসব ছেড়ে দাও। নিজে খেটে খাও। খেটে খাওয়া মানুষের জন্য লড়াই কর। লড়াই করে নিজেদের হিস্যে বুঝে লাও....

কালী। ঠিকই ত বলেছে। পকেট কেটে জেলে যাবি, জেল থেকে বেরিয়ে আবার পকেট কাটবি। আবার জেলে যাবি....

বিশু। আবার পকেট কাটব, আবার জেলে যাব। কোন শালা পকেট কাটে না বে? পাকিট কাটে না কোন শালা? যারা ইস্টেরাইক করিয়ে বেড়ায়—ও শালারা পাকিট কাটে না? আমার ভাই মরল গুলি খেয়ে—আর শুয়ারের বাচ্চারা হাত মেলাল টাকা খেয়ে মালিকের সাথে। সব শালা পাকিটমার। তবে হ্যাঁ—ও শালারা এ কেলাস।

কালী। এবার বেইমানি নেই বিশু। আমরা জান দিয়ে লড়ব।

বিশু। জানটি দিয়ে লড়াই শেষ হয়ে যাবে। বেইমানি নেই কি বে? বেইমানি ছাড়া মানুষ বাঁচে? যে শালা যতবড় বেইমান, সে শালা ততবড় মানুষ। বেইমানি করে পয়সা জমে, আবার পয়সা দিয়ে বেইমান তৈরি হয়। তুই না করিস তোর দোস্ত করবে, তোর দোস্ত না করলে তোর লিডর করবে। বেইমানি হবেই।

কালী। বাজে বকিস না বিশু। এবার জান কবুল করে নেমেছি। জিত হবেই, জিত আমাদের হবেই।

বিশু। হবে-ই? বেশ বাবা হবেই। তবে শুনে রাখ শালা—তোদের জিত হলে আমি পাকিট কাটা ছেড়ে দেব। কিন্তু শালা যদি জিত না হয়—

কালী। আমি পকেট কাটা শিখব তোর কাছে।

বিশু। আমাকে বুক ছুঁয়ে বল....

কালী। বুক ছুঁয়ে বলছি।

বিশু। ঠিক হ্যায়! এবার শালা তুমিও পকেটমার হবে। হতেই হবে। গুরুদেব বলেছে, এ শালার দুনিয়াই সুয্যি ঠাকুরের পাকিট কেটে তৈরি।

[নেপথ্যে জড়িত-কণ্ঠে সুরজলাল]

সুরজ। কালীদাস—ভেইয়া কালীদাস। ও দুনিয়াকে রাখোয়ালে—

[সুরজলালের প্রবেশ]

কালী। ছিঃ! সুরজলাল ছিঃ!—আবার তুমি মদ খেয়েছ?

সুরজ। ম্যায় দারু নেই পিয়া দোস্ত। দারু মুঝকো পিয়া হ্যায়। হ্যাঁ কালী ভাই, এ ইস্টেরাইক কব তক শেষ হোবে?

কালী। তা কি বলা যায়। আজও হতে পারে—আবার একমাসও লাগতে পারে।

সুরজ। এক মাহিনা....? ঠিক হ্যায় দোস্ত। চালাও। জোরসে চালাও। মরনা তো এক রোজকে লিয়ে। লেকিন জিনা হর রোজকে লিয়ে। জিয়েঙ্গে তো মরদকা মাফিক ঔর আদমিকা মাফিক।

কালী। এই তো চাই সুরজলাল। বাঁচতে হয় ত মানুষের মতো বাঁচব।

সুরজ। জরুর। লেকিন কালীভাই, ভুখা আদমি সব বেইমান হো যাতা। আউর বেইমানি হারাম হ্যায়।

কালী। এ কথা কেন বলছ সুরজলাল? কেউ বেইমানি করেছে?

সুরজ। মালুম নেহি ভাই। লেকিন হোতে পারে! ভুখা আদমি সব পারে। আউর দশ আদমি দো রোজসে ভুখা হ্যায়। সামালকে কালীভাই সামালকে—হাম ভি ভুখা হ্যায়। ভুখ হামকে বেইমানকা পথ দিখাল।

কালী। কি বলছ তুমি সুরজলাল?

সুরজ। হামাকে বিশওয়াস কোর না কালীভাই। হামারা হিম্মৎ ভুখ কে পাশ হার গিয়া, আউর হামারা ইমান হার জায়গা দারুকি পাস।

কালী। কে তোমাকে মদ দিয়েছে?

সুরজ। ছোটাসাব।

কালী। ছোটসাহেবের কাছে কেন গিয়েছিলে?

সুরজ। দোঠো রুপাইয়াকে লিয়ে। হামারা লেড়কা দো রোজ কুজভি নেহি খায়া কালীভাই। দোঠো রুপাইকে লিয়ে ম্যায়নে ছোটাসাবকা পাস গায়া থা।

কালী। দিয়েছে টাকা?

সুরজ। নেহি। লেকিন দারু দিয়েসে। আউর বোলেসে রুপাইয়া-ভি দিবে, হামি উনকা কুছ কাম করিয়ে দিলে।

কালী। কি কাজ?

সুরজ। পুছা নেহি। সিধা ইধার চলা আয়া। লেকিন কালীভাই হামারা দিল কমজোর হো গায়া। হমারা ভুখা লেড়কাকে লিয়ে ম্যায়নে কুছভি নেহি লায়া কালীভাই, কুছভি নেহি লায়া।

কালী। তাই তো! ফান্ডের টাকা তো সব দিলীপবাবুর কাছে। আমার কাছে তো...

বিশু [দুটো টাকা বার করে সুরজকে দিয়ে]। এই নাও শালা। আর বস এখানে, দু-একটা হাতের প্যাঁচ শিখিয়ে দিই—।

সুরজ। আরে বিশুভাই। দিল লাগাও দোস্ত, দিল লাগাও। দিলমে লাগাকে দিল প্যার কিজিয়ে।.....

বিশু। এ্যা—এ্যা—এ্যাই। শালা মাতালের কারবার দেখ! এই শালা দম বন্ধ হয়ে যাবে যে। এই সুরজ, ছাড় শালা ছাড়, খুব পেয়ার দেখালে বাবা! দিলমে লাগাকে দিল! এর চেয়ে ফাঁসিমে লাগাকে গলা ঢের ভাল।

সুরজ। পাকিট বহুত টুংদার মালুম হোতা! কেয়া দোস্ত রুপাইয়া মিলল কিধারসে?

বিশু। তা দিয়ে তোমার দরকার কি? টাকা পেয়েছ এবার সিধে ঘর যাও। শালা দু মাস খাবার মুরোদ নেই আবার ইস্টেরাইক করতে এসেছে। জিয়েঙ্গে তো আদমিকে মাফিক! তোদের আদমি বলে কোন শালা?

সুরজ। আরে ভাই, উসি লিয়ে তো—

বিশু। বাস্! বাস্! কোনো কথা নয়। যাও শালা—বেরোও—হাঁ করে কি দেখছ শালা। যাও ছেলেটা না খেয়ে আছে, দুটো গেলাও গে।

সুরজ। হাঁ! হাঁ! কালীভাই ইয়াদ রাখনা—

বিশু। ধ্যাৎ শালার ইয়াদ রাখ্না—বেরোও—

[সুরজের প্রস্থান]

কালী। জেল থেকে বেরিয়েই হাতের খেল শুরু করেছিস্ দেখছি—

বিশু। এ্যাঁ! হ্যাঁ তা করেছি। তোদের মতো না খেয়ে লড়বার মুরোদ আমার নেই।—যা এখন দুটো পাঁউরুটি আর দু ভাঁড় চা নিয়ে আয়।

কালী। বাজে খরচ করবার মতো অবস্থা এখন নেই। একটি আধলা এখন—

বিশু। আবে পয়সা আমি দিচ্ছি। [ব্যাগ বার করে] তবু শালা ইস্টেরাইক করা চাই। শালারা চুরি করতে পারবে না, পাকিট কাটতে পারবে না, ছেনতাই করতে

পারবে না, তবু রোয়াবি বুলি কপচাবে—ভাই সুরজলাল বাঁচতে যদি হয়তো মানুষের মতো। আবে শালা তোদের মানুষ বলে কোন শালা? নে এই টাকাটা দিয়ে—

[দিলীপের প্রবেশ। বিশু ভূত দেখার মত চমকে উঠে ব্যাগটা তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলে]

কালী। আবার ফিরে এলেন যে?

দিলীপ। আমার ব্যাগটা তোমার এখানে ফেলে গেছি?

কালী [চারিদিক দেখে]। না। আপনি তো খাটেই বসেছিলেন থাকলে তো এখানেই থাকত।

দিলীপ। হ্যাঁ! থাকলে তো এখানেই থাকত। তাইতো—

কালী। টাকা পয়সা কিছু ছিল ব্যাগে?

দিলীপ। পঞ্চাশটা টাকা ছিল। ঘড়ি বেচে কাল পেয়েছিলাম।

কালী। ঘড়িটা বেচে দিয়েছেন? ওটা আপনার বাবার স্মৃতি—

দিলীপ। এ্যাঁ! অয়েলিং করবার পয়সা ছিল না, তাই—কিন্তু ব্যাগটা কোথায় হারালাম তাহলে? তোমার এখান থেকে বেরিয়ে সিধে ট্রামে চাপলাম। তারপর পয়সা দিতে গিয়ে দেখি—

কালী। পকেটমার হয়নি তো?

দিলীপ। না—না—ট্রামে কোনো ভিড় ছিল না। এক তোমাদের গলির শেষে—আরে? আপনার সাথেই তো আমার ধাক্কা লাগল।

[বিশু বেরিয়ে যাবার উপক্রম করে]

বিশু। আমার সঙ্গে। না—না—আপনি ভুল করেছেন।

দিলীপ। ভুল করেছি! তা হবে। দুশ্চিন্তার আমার মাথার ঠিক নেই কিছু মনে করবেন না।

বিশু। না—না—মনে করবার কি আছে। ভুল মানুষ মাত্রেই করে। সত্যি বলতে কি শালার মানুষই আগাগোড়া ভুল দিয়ে তৈরি।

কালী। ব্যাগটা বার করে দে বিশু।

বিশু। ব্যাগ? কিসের ব্যাগ? দিন-দুপুরে খোয়াব দেখছিস নাকি? যা-যা তুই চা আর রুটি লিয়ে আয়।

কালী। ভাল কথায় বার করবি, না হামলা করতে হবে?

বিশু। এ তো শালার মহা ঝামেলায় পড়লুম? আমার কাছে—

কালী। হারামিপনা করিস না বিশু। দিলীপবাবুর ব্যাগ বার করে দে—।

[বিশুকে ধরে পকেট দেখবার চেষ্টা করে]

দিলীপ। আহা—হা। উনি আমার ব্যাগ পাবেন কোথায়? ছেড়ে দাও কালীদাস—।

বিশু। দেখুন তো স্যার, আমি আপনার ব্যাগ কোথায় পাব? এই শালা কালী—

কালী [বিশুর পকেট থেকে ব্যাগ বার করে]। এই নিন।

দিলীপ। তাই তো, এতো—মানে আমার ব্যাগের মতো দেখতে।

কালী। ও দেখতে-টেখতে নয়। ও আপনারই ব্যাগ—হতভাগা এক নম্বরের পকেটমার। ওই ধাক্কা লাগবার সময় বেমালুম পকেট মেরে দিয়েছে। গুণে দেখুন ঠিক আছে কিনা। দুটাকা কম হবে। সুরজলালকে দান করেছে হতভাগা।

দিলীপ। তা ভালই করেছে। গুণতে হবে না আর—কি বলেন?

বিশু। আরও এক টাকা কম হবে। রুটি আর চা আনতে দিয়েছিলুম। এই নিন।

দিলীপ। রুটি আর চা আনতে দিয়েছিলেন? তা কালীদাস এক কাজ কর তিনটে চা আর তিনটে রুটি নিয়ে এস।

কালী। এই সময় পয়সা নষ্ট করা কি ভাল হবে?

দিলীপ। আরে টাকা কটা ফেরৎ পেলুম আর একটু ভোজ হবে না? মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও নিয়ে এস—[কালীদাস বেরিয়ে গেল] আপনার হাত তো খুব সাফ? একেবারে টের পাইনি।

[অগ্নি দৃষ্টিতে দিলীপের দিকে তাকিয়ে বিশু ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল]

দিলীপ। কি? রাগ করলেন? আমি আপনাকে আঘাত করতে চাইনি।

বিশু। টাকা তো ফেরৎ পেয়েছেন। বাকি দুটাকা কাল পরশু ফেরৎ দিয়ে দেব।

দিলীপ। টাকা তো আমি ফেরৎ চাইনি।

বিশু। আমি ফেরৎ দিয়ে দেব। কোনো বাকি আমি ফেলে রাখি না।

দিলীপ। এতো বাকি নয়। আপনি না দিলে সুরজলালকে আমিই দিতাম।

বিশু। সখের ঝান্ডা ওড়াচ্ছেন। শেষ সময়ে মালিকের কাছ থেকে কিছু পিটে নিয়ে উল্লুকগুলোকে বেঘোরে ফেলে কেটে পড়বেন। কিন্তু আমার নাম বিশু। কোনো শালা বেইমানকে আজ পর্যন্ত ছাড়িনি। কোনো বাকি আমি ফেলে রাখি না। সুদে আসলে শোধ করে দিই।

দিলীপ। বেশ তো। আমি বেইমানি করলে আমার হিসাবটাও মিটিয়ে দেবেন আপনাদের মতো....

বিশু। বাস্! বাস্! সব শালা গোড়াতে বুলি কপচায়। আমার ভাইকেও হারামজাদারা এমনি করে মিষ্টি কথায় নাচিয়েছিল। ভাই মরল গুলি খেয়ে, আর শুয়ারগুলো মোটা হল টাকা খেয়ে।

দিলীপ। কিন্তু আপনার বন্ধু কালীদাস তো আমাদের মতো সখের রাজনীতি করে না। আমাদের রক্তে আছে বিশ্বাসঘাতকতা। ভয় পেয়ে টাকা খেয়ে আমরা হয়তো পিছিয়ে যেতে পারি কিন্তু কালীদাসের জাত অন্য ধাতুতে গড়া। ওরাতো ভয় পাবে না—টাকা খাবে না—

বিশু। টাকা তো আমার ভাইও খায়নি। খেয়েছে গুলি—অন্ধকারে গুলি করে মেরেছে আমার ভাইকে।

দিলীপ। আপনার সেই ভাই আবার বেঁচে উঠেছে কালীদাস আর সুরজলালের মধ্যে, হাজার হাজার ইস্পাতে-গড়া খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে।

বিশু। আর হারামীগুলো বেঁচে উঠেছে আপনাদের মতো পয়সাখোর.....

দিলীপ। বলছি ত, আমার বিশ্বাসঘাতকতাও এদের দমাতে পারবে না। এরা লড়ছে এদের শক্তিতে। আজ আমি পথ দেখাচ্ছি। আমি বিপথে গেলে এরা নিজেরাই পথ চিনে নেবে।

বিশু। ঘোড়ার ডিম চিনে নেবে। হয় ভেড়ার পালের মতো আবার মাথা নিচু করে কাজে যাবে, না হয় না খেয়ে মরবে। শালাদের কত করে বললাম শিখে নে দুটো হাতের প্যাঁচ—

[কালীদাসের প্রবেশ]

দিলীপ। হা—হা—হা—

কালী। কি হাসছেন যে—

দিলীপ। তোমার বন্ধুটি কিন্তু বেশ কালীদাস—অদ্ভুত সরল লোক—

কালী। কে বিশু? সরল লোক? হাসালেন দেখছি—

দিলীপ। লোক চিনতে আমার ভুল হয়না কালীদাস। কিন্তু তোমার বন্ধুটিও এদিকে কম যান না। আমাকে এক নজরে খাঁটি মধ্যবিত্ত শ্রমিক নেতা বলে চিনে ফেলেছে।

কালী। হতভাগা আপনাকে এক হাত নিয়েছে বুঝি? ও কোনো ভদ্দর লোককে বিশ্বাস করে না।

বিশু। বিশ্বাস? ভদ্দরলোককে বিশ্বাস? শালা সাপ লিয়ে ঘর করব তো 'এ-কেলাস'কে বিশ্বাস করব না। শালাদের মুখে মধু মাখানো, আর মাথায় জিলিপির প্যাঁচ।

কালী। এই থাম।

বিশু। কেন থামব, কার ভয়ে? তোকে বলে রাখছি শেষ পর্যন্ত দেখবি—

কালী। নে রুটি খা। [বিশু রুটি ছুঁড়ে ফেলে দেয়] কিরে ফেলে দিলি যে—

বিশু। আমার খুশি।

কালী। এতে দিলীপবাবুর অপমান হল, তা বুঝিস?

বিশু। তাতে আমার কি?

কালী। এই রুটি তোকে তুলে খেতে হবে। তুই আমার ঘরে বসে—

[বিশুকে মারতে উদ্যত। বিশুও মারমুখো]

দিলীপ। কালীদাস, আজ উনি রুটি খেলেন না, কিন্তু যেদিন আমরা সবাই মিলে জিতব, সেদিন আবার একটা ভোজ হবে। সেদিন আপনাকে খেতে হবে।

কালী। হতভাগা তার আগে জেলে যাবে।

বিশু। যাবই তো। তোমার শালার ছুঁচোর কেত্তন দেখার জন্যে সাত মাস এখানে বসে থাকব নাকি?

কালী [রুটিটা তুলে]। আজ সারাদিন কি খাস দেখব—

বিশু। আবে আমার খাওয়ার ভাবনা তোর নয়—কদিন পরে তুই কি খাস তাই দেখব— [প্রস্থানোদ্যত]

কালী। কোথায় যাচ্ছিস?

বিশু। কাজ খুঁজতে—

কালী। তুই কাজ খুঁজতে যাচ্ছিস? দেখ বিশু, আমি ভাল আছি তো খুব ভাল, কিন্তু চটে গেলে বাপের কুপুত্তুর।

বিশু। বাপের কুপুত্তুর সব শালা— [বিশুর প্রস্থান]

দিলীপ। কালীদাস এক কাজ কর—টাকাগুলো রাখ। বুঝে-সুঝে খরচ করবে। এ সময়টাই সাংঘাতিক। একটু এদিক ওদিক হলে সব ভেস্তে যাবে। এখন অনেকে কাজে যোগ দিতে চাইবে—

কালী। কাঁচা খেয়ে দেব তাহলে। ভাল আছি ত খুব ভাল কিন্তু চটলে—

দিলীপ। না—না—চটাচটি নয়—একদম নয়—বোঝাবে, সকলকে বোঝাবে, আর বুঝে নেবে, নতুন করে বুঝে নেবে। অনেকে পাল্টে যাবে। এ সময় মানুষ পাল্টায়। ক্ষিদের জ্বালায় অনেকে পাল্টে যায়। সকলকে বুঝবে আর বোঝাবে। আচ্ছা— [প্রস্থানোদ্যত]

কালী। আপনি চললেন নাকি?

দিলীপ। হ্যাঁ! অনেক খোঁজ খবর নিতে হবে। ইসমাইল এসে পড়বে এক্ষুনি। দুজনে মিলে কাজ করে যাও। কোনো রকম মেজাজ গরম করবে না। হ্যাঁ, একটা টাকা দাও তো। পারি তো ফেরার পথে একবার আসব।

কালী। স্ট্রাইক বে-আইনি হলে—

দিলীপ। পালিয়ে যাবে। কিছুতেই ধরা পড়া চলবে না। তোমার ওপরেই সব।

[বিশুর প্রবেশ]

দিলীপ। কি কাজ পেলেন?

[বিশু কিছু না বলে খাটিয়ায় শুয়ে পড়ে। দিলীপ হেসে বেরিয়ে যায়]

কালী। কিরে শুয়ে পড়লি যে?

বিশু। তাতে তোর বাবার কি?

[হীরু প্রবেশ করে ফিস ফিস করে কালীর সঙ্গে কথা বলে ও কিছু কাগজপত্র দিয়ে বেরিয়ে যায়]

কালী [এক গ্লাস জল খেয়ে গান ধরে]। "ইয়ে ওয়াকত কি আওয়াজ হ্যায়—মিলকে চল।"

বিশু। আবে শালা হারামি। এটা কি মিটিং-এর ময়দান পেয়েছিস? "মিলকে চল"!—এর চেয়ে শালা শ্বশুরবাড়ি অনেক ভাল ছিল।

কালী। তাই যা না শালা—

বিশু। যাব, তবে পাকিট কেটে নয়, এবার শালা খুন করে যাব। সুরজলাল শালাকে আমি আস্ত চিবিয়ে খাব। শুয়ারের জাত শালা—

কালী। সুরজ আবার কি করল?

বিশু। হারামি টাকা দিয়ে মদ গিলে এসেছে—শালার ছেলেটা দুদিন না খেয়ে—আর হারামজাদা টাকা নিয়ে মদ গিলে এসেছে! শালাকে হাতের কাছে পেলে স্রেফ ছুরি চালিয়ে দিতাম। আর তোদের ঐ দিলীপবাবু—ও বেটাকেও নিকেশ করে

দেব। শালাদের কাজ নেই কম্ম নেই, লোক ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে। বাঁচার মতো মজুরি চাই! মজুরি আসবে তোমার বাপের জমিদারি থেকে।

কালী। হ্যাঁরে তুই দেখেছিস সুরজলাল মদ খেয়েছে?

বিশু। দেখলে শালাকে ছেড়ে দিতুম নাকি? ওর পেটের মদ আমি মাথায় তুলে দিতুম না। চিনে রাখ, শালা চিনে রাখ—এই হারামিদের নিয়ে শালা স্টেরাইক জিতবি। থুঃ—থুঃ—

কালী। তাইতো বিশু, ও হতভাগা মদ খেয়ে বেফাঁস কিছু করে না বসে। বেশি মদ খেলে আবার ওর মাথার ঠিক থাকে না। তুই বস একটু আমি দেখে আসি।

[কালীর প্রস্থান]

বিশু। যাও শালা মাতালের সঙ্গে পিরীত করে এসগে। এবার আমরা জিতব—এই হারামীদের নিয়ে জিতবি! শালা জেতা যেন মুখের কথা—।

[দিলীপের ব্যাগটা পড়ে আছে দেখে ছবির পেছনে লুকিয়ে রাখে। চোরের মতো ঘনশ্যামের প্রবেশ]

বিশু। কি বে, হাঁ করে বাপের বিয়ে দেখছিস?

ঘন। হ্যা—হ্যা কি যে বলিস মাইরি, তোর স্বভাবটা পাল্টাল না।

বিশু। হ্যা—হ্যা—তোর স্বভাবটা পাল্টাল না! আবে আমরা কি ভদ্দরলোক যে কথায় কথায় স্বভাব পাল্টাবে? কিন্তু শালা তোর মতলবটা কি? অমন চোরের মতো পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকছিলি কি মতলব?

ঘন। চোরের মতো—হ্যা—হ্যা—কি যে বলিস মাইরি—আমার চলাটাই অমন আস্তে।

বিশু। আমার কানটা তো কালা নয় বে। তুই যে ঘরে ঢুকলি তা শুনতে পেলুম না কেন?

ঘন। লাও ঠেলা, তুই কেন শুনতে পেলি না তা আমি কি করে বলব বল?

বিশু [ঘনশ্যামের ঘাড় ধরে]। তাকা, চোখের দিকে তাকা। ভাল করে তাকা। এবার বল শালা, কেন পিরিত করতে এইছিলি।

ঘন। মাইরি বিশু, তোর মেজাজটা যে মাঝে মাঝে কি হয়!

বিশু। আবে মেজাজের কি দেখছিস? শালা হারামি, বল শালা কি মতলবে ঢুকেছিলি?

ঘন। এই দাদা ছেড়ে দে। ছেড়ে দে—

বিশু। আগে বল.....

ঘন। স্টেরাইকের খবর নিতে এসেছি, কি হল?

বিশু। স্টেরাইক তো তোর বাবার কি?

ঘন। বারে! আমিও যে স্টেরাইক করেছি। কালীদাসের কারখানায় যে আমিও কাজ করি।

বিশু। তুই স্টেরাইক করেছিস? তোর গুষ্টিতে কেউ স্টেরাইক করেছে? শালা, বেইমান—

ঘন। খিস্তি দিস না বিশু, ভাল হবে না শালা পকেটমার—

বিশু। হ্যাঁ রে হ্যাঁ, পাকিটমার। তুই কি রে? শালা, বেইমান থুঃ—

[ঘনশ্যামের মুখে থুতু দেয়]

ঘন। কেন দিক করিস দাদা—সেই কবে একটা ভুল হয়ে গেছে।

বিশু। ভুল! শালা আমার ভাই মরল গুলি খেয়ে আর মজা লুটলি তোরা। শালা হারামি—

ঘন। সেবার ভুল হয়ে গেছে, কিন্তু এবার—

বিশু। তুই যখন আছিস, এবারও ভুল হবে—ও শালা হবেই—

ঘন। এবার ভুল নেই। কালীর দিব্যি মাইরি। এবার একদম পাল্টে গেছি। কালীদাস আমার চোখ খুলে দিয়েছে। বলেছে, সবাই মিলে না লড়লে কেউ জিতব না। তাই এবার সবাই মিলে লড়ছি—

বিশু। এবার যদি শালা ডিগবাজি খাও তো তোমার বাপের নাম ভুলিয়ে দেব।

সুরজ [নেপথ্যে]। পিয়েঙ্গে, হাজার দফে পিয়েঙ্গে—

[সুরজ ও কালীর প্রবেশ]

কালী। খাবে, নিশ্চয়ই। হাজারবার খাবে। তুমি না খেলে কে খাবে?

সুরজ। হ্যাঁ! ওহি বাত বোলো। পিনেবালা হায় তো সুরজলাল। দুনিয়া ইয়ে সামঝো কি হাম পিকে আয়ে—

বিশু। এই শালা চুপ।

সুরজ। পিকে আয়ে—

বিশু। চুপ শালা, চুপ।

[সুরজ নেশার ঝোঁকে বিশুকে জড়িয়ে ধরে। বিশু এক ঝটকায় মাটিতে ফেলে দেয়]

সুরজ। হামারা বাচ্চা দো রোজ কুছভি নেহি খায়া। হাম কামমে যায়গা। [বিশু সুরজের মাথায় কুঁজো থেকে জল ঢেলে দেয়] ডালো ডালো, আউর ডালো। লেকিন কাম পর যানে দেও।

কালী। সুরজ—

সুরজ। নেই ভাই। ম্যায় বেইমান নেহি হুঁ। লেকিন মেরা লাল দো রোজ সে ভুখা হায়। হামকো যানে দো কালীভাই। ম্যায় সরাবি হুঁ, লেকিন বাপভি হুঁ। যানে দেও কালীভাই।

বিশু। বোস শালা চুপ করে....।

সুরজ। নেহি, ঘর যানে হোগা। ধরমকো খিলানে হোগা। হাম দারু পিয়া, লেকিন হামারা পয়সা সে নেহি; ছোটাসাব পিলায়া। বোলা ফিনভি পিলায়গা। শামপর যানে বোলা। ফিনভি উ সরাব দেগা।

কালী। সন্ধ্যার পর যাবে নাকি?

সুরজ। জরুর। আভি হামকো ঘর যানে হোগা। [উঠতে চাইলে বিশু জোর করে

বসিয়ে দেয়] ছোড় দে বিশুভাই, ছোড় দে! তেরি গোড় লাগে ছোড় দে—"ছোড় দে সাজানুয়া....।"

বিশু। চল আমি যাব তোর সঙ্গে।

[উভয়ের প্রস্থান]

কালী। হতভাগা ডোবাবে দেখছি।

ঘন। নির্ঘাৎ। একটু আগে শালা ছোটসাহেবের ওখানে ফুসুর ফুসুর কচ্ছিল। শালা পয়লা নম্বরের বদমাস। বলে আদমি হারামিকা জাত। খোট্টাগুলোকে বিগড়ে না দেয়।

কালী। সুরজলালকে আমি তোর চেয়ে বেশি চিনি শামু। খরবদার—ফের যদি এসব রটাবি তো তোর জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব।

ঘন। আরে বাপ—এসব রটাতে আছে নাকি? তবে কিনা পাঁচজনে বলাবলি কচ্ছে?

কালী। পাঁচজনে বলাবলি করছে?

ঘন। হ্যাঁ! বলছে সুরজলাল শালা মাতালের ডিম। তার ওপর শালা ছাতুখোরদের বিশ্বাস নেই।

কালী। শামু! ফের যদি শুনি এসব রটাচ্ছিস। তবে....

ঘন। পাগল! তবে কিনা স্টেরাইকটা অনেকদিন হয়ে গেল। পাঁচজনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

কালী। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে! কই আমাকে ত কিছু বলেনি।

ঘন। বলবে কি, সব মনে মনে গজরাচ্ছে। না খেয়ে ত আর লড়াই করা যায় না। তাছাড়া ছোটসাহেব তো বলেই দিয়েছে, দুআনা করে বাড়িয়ে দেবে।

কালী। আর কি, সবাই সগগে উঠে যাবে। রোজ আট আনা করে বাড়াতে হবে। আর ছাঁটাই করা চলবে না।

ঘন। সেকি হয় নাকি? ও দু আনা বাড়িয়েছে, ওই ঢের। দু আনাতো আর কম নয়।

কালী। এসব রটাচ্ছিস নাকি?

ঘন। রটাবার কি আছে। সবাইতো আর গাধা নয়।

কালী। না। গাধা আমি, ইসমাইল আর দিলীপবাবু। মনে রাখিস শামু আজ যদি চালে ভুল করিস, ছোটসাহেবের চালে ভুলে যাস তো আর কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবি না।

ঘন। না—না চালে আমি ভুলছি না। তবে কি না দু আনা পয়সা তো আর কম নয়।

কালী। না, দু আনা পয়সা—মাসে তিন টাকা বারো আনা—এ তো হাতে হাতে সগগো লাভ। আর আমাদের কি দরকার? দুনিয়ার ভাল ভাল খাবার তো সব বাবুদের জন্য; লেখাপড়া শিখবে মালিকের ছেলেরা। রোগের ওষুধ তো বড়লোকদের জন্য; পরিষ্কার ঘরদের তো ভদ্দরলোকদের। আমরা কি মানুষ! আমাদের মতো

জানোয়ারদের মাসে ২০ দিন মোটা চালের ভাত। ছেলেপিলেদের জন্য কারখানার বারো আনা রোজের কাজ। অসুখ হলে হাতুড়ে ডাক্তার—আর আছে এই মাথা গোঁজবার খোঁয়াড়। মাসে তিন টাকা বারো আনা আমরা খরচ করব কিসে?

ঘন। সে নয় আমি বুঝলাম, কিন্তু আর পাঁচজন?—

কালী। আর পাঁচজনকে আমি ভালভাবে চিনি। নিজের ভাল সবাই বোঝে—

ঘন। সে মাইরি আমিও বুঝি।

কালী। বুঝিস, একটু বেশি বুঝিস। সাবধান শামু, বেইমানি করলে—

ঘন। আরে বাপরে বেইমানি—ওসবে নেই....

কালী। নেই তো ছোটসাহেবের ওখানে গেছলি কেন? সুরজলাল বলল তোকে দেখেছে।

ঘন। ও শালা সুরজলাল ভাঙন ধরাবার মতলবে আছে। আমি আগেই বলেছিলুম, শালা ছাতুখোরের জাত। হাড়ে হাড়ে হারামি। আমি বলেছিলুম শালার ভেতরে ভেতরে মতলব আছে।

কালী। কিন্তু তুই কি মতলবে গিয়েছিলি ছোটসাহেবের ওখানে।

ঘন। আসছিলুম ওই পথ দিয়ে ছোটসাহেব ডাকলে আদর করে।

কালী। আর অমনি কুত্তার মতো ছুটে গেলি। তারপর ছোটসাহেব আরও আদর করে বল্লে, বাবা শামু তোমায় অনেক টাকা দেব আর....

ঘন। এ্যা—এ্যা—দ্যা—দ্যাখ। শালা সুরজলাল—

[ইসমাইলের প্রবেশ]

ইস। আঃ! সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে মাথাটাই ঘুরতে আরম্ভ করেছে। দেখি কালী একটা বিড়ি দে তো।

কালী। বিড়ি নেই।

ইস। বিড়ি নেই। বিড়ি নেই কিরে? যা যা নিয়ে আয়—

কালী। বিড়ি কেনার পয়সা নেই।

ইস। বিড়ি কেনার পয়সা নেই? তাহলে ধর্মঘটের মধ্যে আমিও নেই। তোকে হাজারবার বলেছি না আমার জন্য দৈনিক দুবান্ডিল বিড়ি রাখবি। আজ তোদের সঙ্গে লোহা পেটাই বলে কি চিরদিন এমনি ছিলুম নাকি? আম্মো দস্তুরমতো ভদ্দরলোক ছিলুম। সব ছেড়েছি কিন্তু ওই দু বান্ডিল বিড়ি আমি ছাড়তে পারব না।

কালী। দেখ সব সময় ও রকম ঠাট্টা ইয়ার্কি ভাল লাগে না।

ইস। ঐটে খুব খারাপ। বিড়ি, আড্ডা আর ইয়ার্কি এর যে কোনো একটা ভাল না লাগলে বুঝবি মনের ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে। বাপজীবন ইয়ার্কি মারলে হাসবে কি করে। হাঃ, হাঃ, হাঃ। শামু বিড়ি দে। [শামু ইসমাইলকে বিড়ি দেয়] বাঃ! বাঃ! সোনার চাঁদ। এক মাসের ওপর স্ট্রাইক চলছে। ঘরে ঘরে চাল বাড়ন্ত। সুরজলালের মদ খাওয়ার পয়সা নেই। আমার পকেটে বদমাইসি করার রেস্ত

নেই!—আর আমাদের শ্যামচাঁদ এখনও বিড়ি কিনে খায়। বলিহারি! কি হে বাপের জমিদারি আছে নাকি?

ঘন। মাইরি ইসমাইল ভাই—শালা বিড়ি না খেলে পেট ফুলে ওঠে।

ইস। পেট তো আমারও ফোলে। কিন্তু পাকিটের হাল! হ্যা হ্যা—পয়সা আসছে কোত্থেকে চাঁদ? দেখি হাত দেখি। [শামুর ডান হাত শুঁকে দেখে] হুঁ? মাংসের গন্ধ। তিনকড়ি তাহলে ঠিকই দেখেছে।

ঘন। লাও ঠেলা! হাতে মাংসের গন্ধ, তা তিনকড়ি কি দেখল?

ইস। দেখল চাঁটের দোকানে বসে গান্ডেপিন্ডে মাংস গিলছ।

ঘন। তা তো খেয়েইছি—

ইস। তা তো খেয়েইছি! তোর মতো আরও কতকগুলো লোক না খেয়ে লড়াই করে চলেছে—আর তুই মনের আনন্দে মাংস রুটি খাচ্ছিস আর বলছিস খেয়েইছি তো?

ঘন। তা খিদের সময় মানুষ খাবে না?

ইস। আরে খিদের সময় বাপের জন্মে কবে মাংস রুটি খেয়েছিস? দেখি, পকেট দেখি।

ঘন। খবরদার, পকেটে হাত দিও না। খুনোখুনি হয়ে যাবে।

ইস। ঢোঁড়াসাপও চক্কোর ধরে! কি চাঁদ পকেটে কত আছে? নাঃ ব্যাপার কিরকম যেন ইয়ে ইয়ে ঠেকছে। সবাই যখন পেটের জ্বালায় আবোল তাবোল বকছে, সেই তুমি মাংস রুটি খাচ্ছ—

ঘন। আমি খাচ্ছি আমার পয়সায়।

ইস। পয়সাটা এল কোত্থেকে চাঁদ? তোমার ট্যাঁকশালটি কোথায়?

ঘন। আমার জমানো টাকা ছিল—

ইস। প্রত্যেক রেসে বেধড়ক হারার পরও তোমার জমানো টাকা ছিল? ক'শো টাকা মাইনে পেতে দাদা?

ঘন। দেখো ইসমাইল, অত জেরার ধার ধারি না।

কালী। তোর বাপ ধার ধারে শালা।

[ঘনশ্যামকে মারতে যায়]

ইস। কালী! দেখ শামু, সত্যি করে বল কোথায় টাকা পেয়েছিস—

ঘন। বৌ-এর একটা নাকছাবি ছিল, সেটা বেচে দিয়েছি—

কালী। ফের মিথ্যে কথা, আমি একটু আগে তোর বৌয়ের নাকে—

[নেপথ্যে]

নেত্য। ঝাড়ুমারি অমন ধম্মঘটের মুখে। না খেয়ে যদি শালা মরেই গেলাম—তবে মাইনে বেড়ে আমার ডিম হবে। করব না স্টেরাইক—আমার খুশি আমি কাজে যাব। তোর বাবার তাতে কি—

[গন্ডগোল শুনে ইসমাইল ও কালী বেরিয়ে যায়। এই সময় ঘনশ্যাম চারপাশ দেখে জামার ভিতর থেকে

একটা পিস্তল ও একটা চিঠি বার করে বিশু যেখানে ব্যাগ লুকিয়ে রেখেছে ঠিক সেইখানে রেখে দেয়]

বিশু। কাঁচা খেয়ে দেব নেত্য, আমাকে এখনও চেনোনি। শালা স্টেরাইকে যোগ দেবার সময় মনে ছিল না। এখন তুই কাজে যা, আর তাই দেখে আর পাঁচজন কাজে যাক।

নেত্য। যাবই ত। না খেয়ে মরব নাকি?

বিশু। আলবৎ মরবি। তোর চোদ্দপুরুষে কে কবে খেয়ে মরেছে? কোন শালা মজুর খেয়ে মরে বে?

নেত্য। সে আমি বুঝব।

বিশু। এই শালা চললি কোথায়?

নেত্য। তোর বাপের কাছে।

বিশু। তবে রে শালা—

ইস। এই থাম—চল [সকলে প্রবেশ করে] খালি পেটে আমিও আছি ভাই। এতদিন লড়ে আজ যদি ভেঙে পড়ি তবে আর কোনো দিন দাঁড়াতে পারব না। একটু কষ্ট করতে হবে দাদা। এ আমাদের ইজ্জতের লড়াই।

নেত্য। রোজ তো দু আনা বাড়িয়ে দিচ্ছে। দু আনা কি কম হল নাকি?

ঘন। বলতো দাদা। আমি ঐ কথা বলতে গিয়ে—

কালী। শামু!

ঘন। এই লাও! নেত্যদা বললে দোষ নেই, আর আমি শালা—

বিশু। তুই শালা, তোর চোদ্দপুরুষ শালা, তোর গুষ্টি শুদ্ধ শালা। স্টেরাইকে আমরা জিতবই! আবে কালী জেতার লোক আলাদা। জেতার জাত আলাদা—এই সব মাতাল আর দালাল নিয়ে স্টেরাইকে জেতা যায় না।

নেত্য। এই! তুই শালা দালাল বললি কাকে? এ্যাঁ! দালাল বললি কাকে?

বিশু। শালা খেকি কুকুর!

নেত্য। খবরদার বিশু!

বিশু। চুপ শালা! চুপ! দুদিন না খেয়ে কেঁউ কেঁউ সুরু করেছে।

নেত্য। দুদিন! চারদিন বে চারদিন—তাও নিজের জন্য নয়, বাচ্চাটার জন্য। আমরা তো জন্মেছি না খেয়ে মরার জন্য। কিন্তু আমি মরার আগে আমার বাচ্চাটা না খেয়ে মরবে কেন?

বিশু। কেন মরবে না? তোর কোন বাচ্চা কদিন বেঁচেছে?

ঘন। এ্যাই লাও? তারা তো সব রোগে টেঁশে গেল—

বিশু। তা শালার রোগ হয় কেন? এমন রোগ হয় কি করে যে বাচ্চাগুলো এক বছরের মধ্যে টেঁশে যায়? আসল রোগ তো না খাওয়া। মরবে, সব শালা মরবে। সে স্টেরাইক করেই হোক, আর কাজ করেই হোক—সব শালা মরবে, মরবে বাজে মাল খেয়ে, আধপেটা খেয়ে, আর—আর—ভেতরে তেজ

থাকলে আমার দাদার মতো গুলি খেয়ে। কত করে বললুম দুটো হাতের প্যাঁচ শিখে নে, অসময়ে কাজে লাগবে—

নেত্য। ঝাড়ু মারি তোর হাতের প্যাঁচে।

বিশু। তিন লাথি মারি তোর রোজগারে! কি শালার কাজ বে? একমাস না কাজ করলে, কুড়িদিন উপোস মারতে হয়।

ঘন। তবু তো, তবু তো....

বিশু। বল শালা, কি বলছিলি বল—শালা—

[মারতে গেলে ইসমাইল আর কালী ধরে ফেলে]

ইস। ছেড়ে দে বিশু।

বিশু। এই সব ইদুরের বাচ্চা নিয়ে লড়াই জিতবে?

ইস। বাঘের বাচ্চাও তো আছে রে? তোরা সব থাকতে লড়াই জিতব না, তা কি হয়? কালী, ফান্ডে কিছু আছে?

কালী। হ্যাঁ! দিলীপবাবু দিয়ে গেছেন।

ইস। দুটো টাকা নেত্যকে দে। [কালী ব্যাগ খুঁজে পেল না] কি রে কি হল?

কালী। বিশু! বিশু!

বিশু। বল শুনছি।

কালী। ব্যাগটা কোথায়?

বিশু। কিসের ব্যাগ?

কালী। আমি ভাল আছি তো ভাল আছি। রাগলে বাপের কুপুত্তুর। বার করে দে ব্যাগ।

বিশু। তোর ব্যাগের খবর আমি কি জানি?

কালী। তোর বাপ জানে শালা। এখানে কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে। আমার ব্যাগে হাত দেয়। ভাল কথায় বার করে দে।

বিশু। দেখ শালা কোথায় ব্যাগ। ভাল করে দেখ।

কালী। কোথায় রেখেছিস বল?

বিশু। পুলিশ কমিশনারের বাড়িতে। আমার নাম করলেই দিয়ে দেবে।

কালী। শামু!

ঘন। এই লাও, এই ভয়ই করছিলুম।

কালী। তখন পকেটে হাত দিতে দিচ্ছিলি না কেন?

ঘন। আবে পকেট সার্চ করে চোর, ছ্যাঁচোর আর বিশুর মতো পকেটমারদের। ও শালা বেইজ্জতের ব্যাপার।

বিশু। তোর ইজ্জতের সের কত বে? শালা ইজ্জতপুরের জমিদার!

ঘন। না বে তোর মতো হেঁট-ডান্ডা পকেটমার!

বিশু। তোর মাথায় শালা আজ ইঁট ভাঙব!

[বিশু ঘনশ্যামকে মারতে গেল। কালী ধরে ফেলে]

ইস। দেখি তোর পকেট।

ঘন। নাও ভাল করে দেখ। সেলাই খুলে দেখ, কলার টিপে দেখ।

ইস। নেই! তাহলে?

ঘন। তাহলে আর কি! ঐ শালা বিশুই হাতিয়েছে।

বিশু। আজ শালা তোর বাপের বিয়ে—

[ঘনশ্যাম ছুটে পালায়]

কালী। বিশু—

বিশু। আবার বিশুকে কেন?

কালী। ব্যাগটা বার করে দে। দেখছিস ত সব। এ সময় ইয়ার্কি ভাল লাগে না।

বিশু। আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই। তোর মতো একটা ছুঁচোর সঙ্গে ইয়ার্কি মারি বসে বসে।

ইস। থাকগে। নিত্য, এই টাকা দুটো নে। বুঝে সুঝে খরচ করিস দাদা। একটা পয়সা এখন এক একটা পাঁজরা। সবদিক সামলে চলিস, এই সময়টাই সাংঘাতিক।

নেতা। সে ত বটেই। কিন্তু এভাবে কত দিন চলবে?

ইস। আমরা মরে না যাওয়া পর্যন্ত এভাবে চলবে। চলতেই হবে। বুঝছিস না, এ-ত শুধু আমাদের জন্যে নয়। আমাদের পরে যারা আসছে তাদের জন্য।

বিশু। থুঃ! থুঃ!

ইস। কি হল?

বিশু। কি আবার হবে। তোমার কথা শুনে বমি আসছিল।

[হীরুর প্রবেশ]

হীরু। সর্বনাশ হয়েছে। স্ট্রাইক বেআইনি হয়ে গেছে। দিলীপদা আপনাকে আর কালীদাকে পালাতে বলেছেন। আর কালীদার কাছে কি টাকা আছে, আমার কাছে দশ টাকা রেখে আর সব নিয়ে আপনারা বেরিয়ে পড়ুন।

ইস। তাইতো, বড় খারাপ খবর শোনালে ব্রাদার। দিলীপের ব্যাগটাও সময় মতো উধাও হল।

কালী। বিশু, লক্ষ্মী দাদা আমার ব্যাগটা বার করে দে—

বিশু। আবে ব্যাগ কি আমি বিয়োব নাকি?

ইস। বিশু, তোর দাদা গুলি খেয়ে গড়িয়ে পড়েছিল এই হাত দুটোর ওপর। এই হাত দুটো দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। তুই কি চাস এই দুটো হাতে আজ হাতকড়া পড়ুক। সময় নেই বিশু, ব্যাগটা নিয়ে থাকলে বার করে দে।

হীরু। আপনারা দেরি করবেন না। দেরি করলে আর কোনোদিক সামলানো যাবে না। টাকার ব্যবস্থা পরে করা যাবে। আপনারা এক্ষুণি বেরিয়ে পড়ুন।

বিশু। ব্যাগ আমি বার করে দিতে পারি। কিন্তু এই কটা টাকা নিয়ে কোথায়

পালাবে? আর ক'দিন পালিয়ে থাকবে? তোমরা পালিয়ে গেলে স্টেরাইক চালাবে কে?

ইস। কেন তুই চালাবি?

বিশু। আমি? ওস্তাদ বলেছে, দেখ বিশু হাত চালাবি, কাঁচি চালাবি ধরা পড়লে জোরসে পা চালাবি, আর দরকার পড়লে দিলসে খিস্তি চালাবি। খবরদার আর কিছু চালাতে যাসনি।

ইস। এবার যে চালাতেই হবে। তোর দাদা তোকে আমার হাতে দিয়ে গেছল। তোকে মানুষ করা আমার বাপের সাধ্যও ছিল না। কিন্তু মানুষের মতো একটা কাজ তো করবি?

বিশু। দাদা আমাকে তোমার হাতে দিয়ে গেছল? ওই জন্যেই সারাটা জীবন আমাকে জেলে কাটাতে হচ্ছে।

হীরু। ব্যাগটা দিয়ে দিন না?

বিশু। বয়েস কত চাঁদ! বিশুর ওপর অর্ডার চালাচ্ছ! মারব এক থাপ্পড়—

ইস। বিশু! জানোয়ার হয়ে গেছিস, এইটুকু ছেলের ওপর ধমক চালাচ্ছিস?

কালী। চালাবে না! উল্লুকটা যে নিজের রোজগারে খায়।

বিশু। না শালা, তোমার বাপের রোজগারে খাই।

ইস। ব্যাগটা বার করে দে।

বিশু। দেব না। মরে গেলেও দেব না। তোমরা মর। তোমরা মরলে এখানে কেউ স্টেরাইক চালাতে আসবে না। আর কেউ গুলি খেয়েও মরবে না।

[দিলীপের প্রবেশ]

দিলীপ। তোমরা এখনও যাওনি। সর্বনাশ করেছ। পুলিশ এসে পড়ল বলে। বেরিয়ে পড় শিগগির।

[বিশু সেলফের কাছে গিয়ে ব্যাগটা আনতে যায়; তখন রিভলবারটা পায়]

বিশু। একি বে! একেবারে খুনে হয়ে উঠেছিস?

কালী। এ্যাঁ! ওটা ওখানে কি করে এল?

বিশু। কি করে! তা আমি কি করে বলব?

দিলীপ। আপনি ওটা রাখেননি? তবে ওখানে হাত দিলেন কেন?

বিশু। এইজন্য।

[দিলীপের ব্যাগটা ছুঁড়ে দেয়]

দিলীপ [ব্যাগ থেকে দশটা টাকা রেখে বাকিটা ব্যাগ শুদ্ধ কালীকে দিয়ে]। তোমরা বেরিয়ে পড়। খবরদার পুলিশের সামনে পড়ে গেলে পালাতে যেও না। খামোখা লাঠি গুলি চালাবে। খুব সামলে, ধরা পড়া চলবে না। আমি এখানে রইলাম। যাও বেরিয়ে পড়।

[বিশু, ইসমাইল ও কালী বেরিয়ে গেল। দিলীপ সেলফের কাছে গিয়ে কাগজপত্রগুলো সরাতে থাকে]

হীরু। দিলীপদা এইবার?

দিলীপ। এই শেষ ধাক্কা। এটা সামলাতে পারলে আমরা জিতব। না হলে আমরা কখনো কখনো জিততে পারব না। কিন্তু রিভলবারটা কে রাখল ওখানে?

হীরু। ওরা পালাতে পারবে ত?

দিলীপ। এ্যাঁ! ইসমাইল ঠিক বেরিয়ে যাবে। ভয় ওই কালীকে নিয়ে ও বেরুতে পারবে কিনা কি জানি? ও ধরা পড়লে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।

হীরু। বিশুকে আপনার কিরকম মনে হয়?

দিলীপ। মাথায় গোলমাল আছে। কিন্তু মনে কোনো গোলমাল নেই।

হীরু। রিভলবারটা ও রাখেনি তো?

দিলীপ। মনে তো হয় না। [বিশুর প্রবেশ] ফিরে এলেন যে?

বিশু। ভদ্দরলোকের ডিগবাজি দেখতে এলাম। পিস্তলটা ওখানে কে রেখেছিল?

দিলীপ। আপনার কি ধারণা ওটা আমি ওখানে লুকিয়ে রেখেছিলাম?

বিশু। আলবাৎ। টাকা খেয়ে সবচেয়ে আগে ডিগবাজি খায় আপনার মতো সখের ঝান্ডাওয়ালারা। মজুর খেপিয়ে ধম্মঘট; তারপর মওকা মতো টাকা খেয়ে ডিগবাজি, এই ত ভদ্দরলোকের কাজ।

দিলীপ। কি সর্বনাশ ওটা নিয়ে এসেছেন! ধরা পড়লে যে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।

বিশু। তাই তো চান। এর কি পাখা আছে নাকি? উড়ে এসে ওখানে বাসা বেঁধেছিল?

দিলীপ। ওটা আমার কাছে দিন।

বিশু। কেন?

দিলীপ। সরিয়ে ফেলতে হবে। মনে হচ্ছে এর ভেতরে কোনো চাল আছে।

বিশু। হাজারবার আছে। শয়তানি চাল। ওসব মামদোবাজি আমি ভাল করেই বুঝি। এখানে এটা দেখলে কালীর বেকসুর দুবছর মেয়াদ হয়ে যাবে। তারপর আর কি, বাকি পাঁঠাগুলো বেছে বেছে কোপ মারলেই হল।

দিলীপ। হীরু, তুমি যাও।

[হীরুর প্রস্থান, দিলীপ দরজা বন্ধ করে দেয়]

বিশু। হুড়কো দিলেন কি মতলবে? বিশুর কাছে কোনো দোপেঁয়াজি চলবে না। বেশি রগড়ালে একদম সাবাড় করে দেব।

দিলীপ। থামুন। ঘরটা একবার ভাল করে দেখুন, কোথায় আর কিছু লুকোনো আছে কিনা।

বিশু। লুকোনো থাকলে তো আপনিই ভাল করে জানবেন। আপনিই দেখুন না।

[দিলীপ সেলফে খুঁজতে গিয়ে চিঠিটা পায়]

দিলীপ। রিভলবারটা পাঠালুম, আজই শেষ করে ফেলবে। কে লিখেছে, কাকে লিখেছে, কিছুই লেখা নেই।

বিশু। হাতের লেখাটা দেখুন না, চিনতে পারেন কিনা।

দিলীপ। রিভলবারটা আমাকে দিন।

বিশু। আর এক পাও এগুবেন না।

দারোগা [নেপথ্যে]। ঘরে কে আছেন? দরজা খুলুন।

দিলীপ। দাঁড়ান। ধরা পড়লে বলবেন, রিভলবারটা আপনার। কি করে পেয়েছেন বললে, যা খুশি বানিয়ে বলে দেবেন।

বিশু। সেটা আপনিই বলুন না। জেলে তো আপনাকে যেতেই হবে।

দিলীপ। জেলে যেতে আমায় ভয় নেই। ব্যাপারটা আমার হলে, রিভলবারটা আমারই বলতাম। কিন্তু এর পেছনে গোটা স্ট্রাইকের মরেল দাঁড়িয়ে আছে। এ বেআইনি রিভলবারটাকে স্ট্রাইকের সঙ্গে কিছুতেই জড়ানো চলবে না।

দারোগা [নেপথ্যে]। আর এক মিনিট সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে দরজা না খুললে আমরা দরজা ভাঙতে বাধ্য হব।

দিলীপ। খুলে দিন।

[দারোগার প্রবেশ]

দারোগা। আপনার নামই তো দিলীপ দাশগুপ্ত। আমরা একটা ইনফরমেশন পেয়ে এসেছি। স্যাবোটেজ এন্ড মার্ডার প্ল্যান।

দিলীপ। আপনাদের ইনফরমেশন তো কারখানায় তৈরি হয়।

দারোগা। আগে হত! এখন স্ট্রাইক চলছে! জব্বর স্ট্রাইক! বিশ্ববিখ্যাত নেতারা একজোট হয়ে স্ট্রাইক চালাচ্ছেন। কারখানায় আর ইনফরমেশন তৈরি হয় না। তারপর বাবা বিশ্বনাথ আজকাল রাজনীতি করা হয় নাকি।

বিশু। আজ্ঞে না, আমার চেয়ে উঁচুদরের পকেটমার না হলে রাজনীতি হয় না।

দারোগা। বাঃ! দিব্যদৃষ্টি খুলেছে দেখছি! তা বাবাজীবন ছাড়া পেয়েই এখানে এসে জুটেছ কেন?

বিশু। কালীদাসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম।

দারোগা। বেশ করেছিলে। কিন্তু ঘরে খিল দিয়ে দুই মহাপুরুষ এতক্ষণ কি করছিলে?

বিশু। আজ্ঞে ঘুমুচ্ছিলুম।

দারোগা। হুঁ! চোখ মুখ দেখে তো সেই রকমই মনে হচ্ছে। থাকগে, দিলীপবাবু—আপনার বডিটা একবার সার্চ করব। আশাকরি বাধা দেবার চেষ্টা করবেন না।

দিলীপ। বেশ তো, করুন না।

দারোগা [পকেটে কিছু বিস্কুট ও একটা চিঠি পেয়ে]। একি ব্যাপার!

দিলীপ। কয়েকদিন ধরে খাওয়া দাওয়ার ঠিক নেই। তাই পকেটে রেখে দিয়েছি, সুবিধে পেলে দুটো একটা খাই।

দারোগা [চিঠিটা পেয়ে]। এ লাইনে বেশ রোমান্স আছে! পুলিশের চাকরি না করলে এ লাইনেই ভিড়ে যেতাম। শুনেছি তেমন কপাল হলে প্রেমও হয়।

বিশু। আজ্ঞে তেমন কপাল হলে....

দারোগা। বাপের নামও ভুলতে হয়। না, এসব বাজে মাল! দেখি সাইড পকেট দুটো মশাই। এক প্যাকেট চারমিনার, একটা দেশলাই আরে গোটা কুড়ি বিড়ি—ব্যাস।

দিলীপ। চার আনা পয়সাও আছে।

দারোগা। হুঁ, চার আনা পয়সাও আছে, বিড়ির তলায় চাপা পড়েছিল। কিন্তু যা খুঁজছি তা তো দেখছিনা। ঘরটা ভাল করে সার্চ করতে হবে দেখছি। বাবা রামসিং? [নেপথ্যে—হুজুর] একটু ভাল করে নজর রাখিস বাবা! এখানে সব মহাপুরুষরা আছেন, সুযোগ পেলেই যে যার লম্বা দেবে। বিশ্বনাথ, একেবারে এগিয়ে এস বাবা, তোমাকেও একবার দেখিনি।

বিশু। যাঃ বাবা! আমাকে আবার এ সবের মধ্যে কেন?

দারোগা। তুমিই তো ঢুকে পড়েছ এর মধ্যে। আর কিছু না হোক, চোরাই মালও তো কিছু পেতে পারি। তোমাদের একদম বিশ্বাস নেই বাবা। কষ্ট করে একটু এগিয়ে এস। [বিশু পালাল। দারোগা ধরবার চেষ্টা করেন] পাকড়ো, রামসিং পাকড়ো। ভাগ না যায়—কি আপনারও লম্বা দেবার ইচ্ছা আছে নাকি?

দিলীপ। না, ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত না দেখে আমি কোথাও যাব না।

দারোগা। একটা কিছু না থাকলে আপনাদের শুভ আর্বিভাব ঘটে!

দারোগা। কিন্তু হতভাগা বিশুটা অমন করে পালাল কেন? কিছু বলতে পারেন?

দিলীপ। ধরা পড়লে ওকেই জিজ্ঞেস করবেন।

দারোগা। তাতো করবই। আপনি কিছু আঁচ করতে পারেন কিনা সেটাই জানতে চাইছিলাম।

দিলীপ। আমার তো মনে হয় আপনার জন্য সরবত আনতে ছুটেছে।

দারোগা [হেসে]। চমৎকার আপনার মনটি। আপনার মতো লোকই পরের দুঃখ বোঝে। কিন্তু সরবতের দোকান পর্যন্ত ও যেতে পারবে কি!

দিলীপ। যেতে না পারলে আপনার সরবত খাওয়াও হবে না।

[কনস্টেবল বিশুকে নিয়ে প্রবেশ করে]

দারোগা। বাইরে দাঁড়া। একটু ভাল করে নজর রাখিস। তারপর বাবা বিশ্বনাথ, অমন টেনে রড় মারলে কেন?

বিশু। আজ্ঞে ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম।

দারোগা। হুঁ! তো তো বুঝলাম। কিন্তু ভয়টা পেলে কেন?

বিশু। আজ্ঞে আমার ওস্তাদ বলেছে, বিশু পুলিশ কাছে এলে বুঝবি ভয়ের কারণ আছে।

দারোগা। উহুঁ। ব্যাপারটা অত সোজা নয়। ঘোরপ্যাঁচটা খুলে বলতো।

বিশু। ঘোরপ্যাঁচের কিছু নেই। আমার কেমন ভয় হল, এবার ধরলে নির্ঘাৎ 'এ কেলাস' ঠুকে দেবেন।

দারোগা। তোমাকে? কি এমন মহাপুণ্য করেছ যে, তোমাকে 'এ কেলাস ঠুকে গভ্‌মেন্টের কিছু পয়সা নষ্ট করব! দেখি পকেটগুলো। [পকেট সার্চ করে কিছু না পেয়ে] নাঃ। তোর পালাবার মানেটা তো বুঝলাম না। অথচ ইনফরমেশন মতো—

দিলীপ। ইনফরমেশনটা পেলেন কোত্থেকে?

দারোগা। আপনি আমাকে জেরা করবেন, না—আপনাকে আমি জেরা করব?

দিলীপ। না, মানে sourceটা জানতে পারলে একটা কিছু আঁচ করা যেত।

দারোগা। সেটাও আমার ব্যাপার। যাকগে, আপনাকে আমার সঙ্গে একবার থানায় যেতে হবে।

দিলীপ। অর্থাৎ—

দারোগা। বুঝতেই তো পারছেন। ইল্লিগেল স্টাইকের নেতা হিসাবে।

[দিলীপকে নিয়ে ইনসপেকটার চলে গেল। বিশু একা বসে রইল। কতক্ষণ পর ঘনশ্যাম সন্তর্পণে ঢুকে বিশুর পাশে এসে দাঁড়াল]

ঘন। বিশু? দিলীপদাকে ধরে নিয়ে গেল?

বিশু। ঐ শালাকে ধরবে না তো কি আমাকে ধরবে?

ঘন। না।—কি জন্যে ধরল?

বিশু। ধম্মঘট বেআইনি, তাই।

ঘন। আর কিছু নয়?

[বিশু লাফিয়ে ঘনশ্যামের কলার চেপে ধরে]

বিশু। তুই আরো কিছু ভেবেছিলি?

ঘন। এই বিশু, ছেড়ে দে মাইরি লাগছে। এই শালা, ছেড়ে দে না বে।

বিশু। ছাড়ছি। ভাল করে ছাড়ছি। বল শালা, তুই আর কি ভেবেছিলি?

ঘন। লাও ঠ্যালা। আমি আর কি ভাবব, পাঁচজনে বলছিল—

বিশু। কি বলেছিল?

ঘন। বলছিল, দিলীপবাবু কোন এক মেয়ে ফুসলে এনেছে, তাই—

বিশু। মেয়ে ফুসলে এনেছ! তোর বাপের মেয়ে ফুসলে এনেছে। দেখ শালা—মনে করিসনি যে কালীদাস আর ইসমাইল নেই তো কেউ নেই। ফের যদি শালা—

ঘন। লাও ঠ্যালা। তা আমি কি করব?

বিশু। কিছু করবে না। একটা কিছু করেছ কি এ জন্মের হিসেব মিটিয়ে দেবে। এ ঘরে রিভলবার রেখেছিল কোন শালা।

ঘন। রিভলবার। ওঃ বাবা! আমি তখুনি জানতুম শেষমেশ খুনখারাপি একটা কিছু হবে!

বিশু। হবে। আমার হাতে তুই খুন হবি। বল শালা, এ ঘরে রিভলবার কে রেখেছিল?

ঘন। লাও ঠ্যালা। তার আমি কি জানি?

বিশু। তোর বাবা জানে। তোকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি শামু। গতবারে তুই শালা দাদার ঘরে কতকগুলো কাগজ রেখে গিইছিলি।

ঘন। সে তো গতবারে! সে সব তো চুকে গেছে।

বিশু। চুকে যায়নি। আজ সব চুকিয়ে দেব। সুদে আসলে সব চুকিয়ে দেব!

[বিশু গলা টিপে ধরল]

ঘন। এই শালা ছেড়ে দে। তোর পায়ে পড়ি, মাইরি, ছেড়ে দে বিশু।

বিশু। আজ তোকে কিছুতেই ছাড়ব না। সেবার ছেড়ে দিয়ে ভুল করেছি। বল শালা—

[ইসমাইলের প্রবেশ]

ইস। ছেড়ে দে বিশু।

বিশু। না। শালাকে আজ নিকেশ করে দেব।

ইস। তোর দাদার দিব্যি বিশু, ছেড়ে দে।

[ঘনশ্যামকে ছেড়ে দিতে ছুটে পালাল]

বিশু। এই সব বেইমানদের নিয়ে তুমি জিতবে?

ইস। বেইমান আর কটারে। একদিকে কালী, সুরজলাল, নেত্য আর একদিকে শামু—আমরা না জিতলে আর কে জিতবে? তোকে একটা কথা বলতে এসেছি। এদিকটা সামলে চালাস, চটাচটি করিস না।

বিশু। আমি চালাব? ও সবের ভেতর আমি নেই। আমি পাকিট মারব, খাব দাব, ধরা পড়লে জেলে যাব। এইসব এস্টেরাইকের মধ্যে আমি নেই। সুরজলালকে বলে যাও, নেত্যকে বলে যাও—ওরা সামলে নেবে। হঠাৎ এসে পড়েছিলাম, তাই! যাকগে—আমি চল্লাম। আর ইসমাইল ভাই। যদি জিততে পার, এসে ভোজ খেয়ে যাব। আর একটা কথা, যদি জেত্তো তো আমি পাকিট মারা ছেড়ে দেব। আমার ভাই-এর রক্তের দামটুকু যদি শুধে নিতে পার, তাহলে যা বলবে আমি তাই করব।

ইস। সত্যিই তুই থাকবি না।

[দূর থেকে গানের ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসে]

বিশু। না। পাকিটমার দিয়ে এস্টেরাইক চলে না। খাঁটি লোক খুঁজে বার কর। আমার দাদার মতো খাঁটি লোক। আমার মেজাজের ঠিক নেই, শামুকে হাতের কাছে পেলে হয়ত খুনই করে ফেলব—আচ্ছা আমি চলি—

ইস। আবার আসিস বিশু। তোর দাদা তোকে আমার হাতে দিয়ে গেছল। আমি তোকে মানুষ করতে পারিনি, কিন্তু তুই এবার গোটা মানুষ হয়ে ফিরে আসিস—

[নেপথ্যে সুরজলালের গান]

বুঝদিলসে লড়না যিস্‌কা কাম হ্যায়
বুঝদিলসে উ ডরতা নেহি
ইমান যিসকা সাথ হ্যায়
বেইমানসে উ ডরতা নেহি
তব আওজী, তুমভি আও
হাতোঁমে হাত মিলাও
গাও জী তুমভি গাও গানা
তুমারা হামারা হ্যায় ইয়ে জামানা।

[গানের ওপর পর্দা নেমে আসে]

মহাকাব্য

রতনকুমার ঘোষ

চরিত্র

শ্বেতাধিপতি
সংগ্রামসিংহ
অগ্নিদূত
বিচিত্রকুমার
সর্বশূন্য
১ম জন [কৃষক]
২য় জন [শ্রমিক]
৩য় জন [মধ্যবিত্ত]
বাজিকর
ঢাকবাদক
প্রথম জনতা
দ্বিতীয় জনতা
তৃতীয় জনতা
চতুর্থ জনতা
পঞ্চম জনতা

[পর্দা ওঠার ঘন্টা পড়ল। কিন্তু প্রেক্ষাগৃহ তখনও অন্ধকার হয়নি। হঠাৎ বেজে উঠল দেবী-আরাধনার ঢাকবাদ্য।

ডি ডি ডি ডি ডি ডি.....

দেখা গেল দর্শকের একদম পেছন দিক থেকে ঢাকবাদক মাতৃ-বন্দনার বাজনা বাজাতে বাজাতে আসছে। তার সামনে বাজিকর। প্রায় নৃত্য-ভঙ্গিমায় বাজিকর আসছে। পরনে তার পাজামা আর আলখাল্লা। কাঁধে বাউলের ঝুলি। আলখাল্লাটা নানারঙের কাপড়ে তালিমারা, মাথায় রঙীন পাগড়ি। হাতে তার ছোট পাতলা একটি যাদুদন্ড। সে এসে মঞ্চে উঠল। ঢাকবাদকের পোশাকও রঙীন কাপড়ের, আঁটোসাটো করে পরা। হাঁটু অবধি তোলা, ঢাকে একটা পালক আঁটা পুচ্ছ। সেও পেছন পেছন মঞ্চে উঠল। বাজনা আবার বেজে উঠল। ডি ডি ডি ডি ডি ডি.....]

বাজি। শোন শোন মহাজন, গুণীজন, সভাজন, অভাজন।

[বাজনা ডি ডি ডি ডি ডি ডি....]

—আজ রাতের তৃতীয় প্রহরে—কালপুরুষ যখন মাথার ওপরে—বাতাস যখন সমুদ্রের জোয়ারে—তখন মা আসছেন!

[বাজনা ডি ডি ডি ডি ডি ডি....]

—পুরবাসীরা ঘুমে ঢলে পড়বেন না। গৃহবাসীরা দরজা এঁটে দেবেন না। অরণ্যচারীরা হিংস্র হবেন না—মা আসছেন!

[বাজনা ডি ডি ডি ডি ডি ডি.....]

—যারা মাকে পেতে চাও, নিতে চাও, দিতে চাও—তারা জাগরিত হও—প্রস্তুত হও—মা আসছেন!

[বাজনা ডি ডি ডি ডি ডি ডি.....তিনজন দরিদ্র মানুষ তিন দিক থেকে বাজিকরের দিকে ছুটে এসে মঞ্চের নিচে দাঁড়াল]

তিনজন। কে আসছেন? কে আসছেন? কে আসছেন?

বাজি। মা আসছেন, মা আসছেন, আসছেন!

১ম। কোন মা?

বাজি। এখানে আসছেন?

১ম। এখানে? সে কি!

[বিস্মিত হল]

বাজি। হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। এখানে, এই ধুলোর মধ্যে, ওই কাদার ভেতর, এই মাটির ওপর।

১ম। মা আসবেন এই মাটির ওপর! [অবিশ্বাসের হাসি] তুমি বল কি?

বাজি। কেন আসবেন না? আসতে নেই?

১ম। মাটিতে যে অনেক ময়লা!

বাজি। মাটিতেই তো ফুল ফোটে।

১ম। এ মাটি যে দারুণ কালো!

বাজি। মাটিতেই তো ফলের বাহার!

১ম। এ মাটি যে উঁচু-নিচু!

বাজি। সেইজন্যই তো রথের চাকা। উঁচু-নিচু সমান হবে। মা আসবেন এই ধুলোর মধ্যে, এই কাদার ভেতর, এই মাটির ওপর।

[ওরা তিনজনে যেন অবাক হল। ঢাক বেজে উঠল]

বাজি [হেসে]। কি গো মাটির মানুষ! কি ভাবছ তোমরা?

আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?

২য়। কি নাম তোমার?

বাজি। অনেক—অনেক নাম আমার। লাল নীল সাদা হলুদ—ফুল ফল মাটি জল পোকা—মাকড় হরিণ বাঘ—আবার যাদুকর বাজিকর। আমি সবই চিনি সবই দেখি সবই বুঝি। বাজিকর—বাজিকর—বাজিকর।

৩য়। তুমি আমাদের চেন, বাজিকর?

বাজি। হ্যাঁ! তুমি মাটির বুকে সোনা ফলাও, রোদের তাপে চামড়া পোড়ে। বৃষ্টিতে ডুব সাঁতার কাট, রাশি রাশি ধানের শিষে বুকের রক্ত ছিটিয়ে দাও।

[প্রথম জন বিস্মিত হল]

২য়। আমি? বল তো আমি কে?

বাজি। তুমি! তুমি সকাল থেকে মধ্যরাত হাপর টানো। বুকের দম ফুরিয়ে দিয়ে হাতুড়ি মারো। কপালের ঘাম ছিটকে পড়ে গনগনে লাল লোহার পরে।

[দ্বিতীয় জন অবাক]

১ম। আর আমি?

বাজি। তুমি!—হ্যাঁ, তোমাকেও চিনি। তোমাকেও চিনি। তুমি রাতের পান্তা পেটে দিয়ে ঢেকুর তুলে বেরিয়ে পড়। পচা ফেন মুখে ঢেলে লাঠি হাতে ছুটে যাও। কেড়ে আনো ভাইয়ের ফসল—বুড়ো বাপের মাথা ফাটাও—হা-হা-হা-হা!

[ওরা সকলে বিমূঢ়]

বাজি। কিগো ধুলোর ছেলেরা! কিগো মাটির ছেলেরা। বিশ্বাস হচ্ছে না?

৩য়। বাজিকর! তুমি এমন করে কিভাবে আমাদের চিনলে?

২য়। কেমন করে আমাদের দুঃখের কথা বুঝলে?

১ম। আমাদের পাপ তুমি কিভাবে দেখলে, বাজিকর?

তিনজন। আমরা যে ধুলোয়-কাদায় মেশানো পথের মানুষ, বাজিকর!

[ওরা যেন কেঁদে উঠে পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়তে উদ্যত হল]

বাজি। ওরে! অমন করিসনে—অমন করে কথা বললে যে আমার কান্না পায়! আমি বাজিকর। আমার এই যাদুদণ্ডে তোদের পাঁজর-বের-করা বুকের ধুকধুকে হৃৎপিণ্ডটাকে ধরে রেখেছি। আর কাঁদিসনে তোরা।

১ম। বাজিকর! কোথায় তোমার দেশ?

বাজি। এই জম্বুদ্বীপে; যেখানে মরা নদী কাদার পাঁকে মাথা খোঁড়ে। রোদের তাপে খালি বুকে রুক্ষ জমি মূর্ছা যায়। ভয়াল চোখে গভীর বন বারে বারে ভয় দেখায়—সেখানে।

তিনজন [আনন্দে]। তুমি তাহলে আমাদের প্রতিবেশী, বাজিকর?

বাজি। একেবারে রক্তে-মাংসে, হাড়ে-মজ্জায় প্রতিবেশী। তাই তো বলছি, তোদের আমি জানি চিনি বুঝি। তোরা কাঁদলে শীর্ণ বুক মাতাল হয়। আর তোরা কথা না বললে আমার গলার স্বর হারিয়ে যায়।

১ম। কিন্তু বাজিকর! এই জম্বুদ্বীপে আমরা যে হাসতে পারি না!

২য়। এখানে যে কান্না বারণ বাজিকর!

৩য়। বাজিকর, কথা বললে এখানে সেটা আর্তনাদে মিশে যায়!

বাজি। সেইজন্যই তো ডাক দিয়েছি তোদের। মা আসছেন। তাকে সব বল।

১ম। কিভাবে বলব?

বাজি। কেন—কেঁদে বলবি, হেসে বলবি। ডেকে বলবি, আস্তে বলবি। শব্দ করে বলবি, আবার নিঃশব্দে বলবি।

২য়। কোন ভাষায় বলব?

বাজি। যে-কোনো ভাষায়, যে-কোনো সুরে। যে-কোনো ব্যাকরণে, যে-কোনো মূর্চ্ছনায়। দেখবি, মা সব বুঝে নিয়েছেন। হা-হা-হা-হা-! ওরে মাটির ছেলেরা! ওরে ধুলোর ছেলেরা! মাকে ডেকে বল তোদের চোখের জলের কথা।

৩য়। কিন্তু আমরা যে মাত্র তিনজন বাজিকর! তিনজনে ডাকলে কি মা আসবেন?

বাজি। কোথায় তোরা তিন? তোরা তিনের পিঠে তিনশো শূন্য। আমার যাদুদণ্ডেও হিসেব নেই—এত তোরা; অনেক তোরা।

১ম। আমরা তাহলে তিন নই?

বাজি। না না না। একের থেকে দূরে থাকিস, তাই তো তোরা তিন। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে যা—দেখবি; তিনের পিঠে তিনশো শূন্য। এ আমার কথা নয়। আমার যাদুদণ্ডের খেলা। হা-হা-হা-হা!

১ম। আমরা হাত ধরছি যাদুকর—তোমার যাদুদণ্ডের খেলা দেখাও।

বাজি। দেখবি খেলা? সত্যি বলছিস?

১ম। সত্যি বলছি।

বাজি। ভয় পাবি না—যখন দেখবি তোদের মাথার ওপর হীরের খাঁড়া ঝুলছে?

১ম। না।

বাজি। কেঁদে উঠবি না—যখন বুঝবি রক্তচোষা ময়না তোদের দিকে তেড়ে আসছে?

২য়। না।

বাজি। রাগ করবি না—যখন আমার যাদুদণ্ডে তোদের পাপের বিচার করব?

সকলে। না না না। তুমি তোমার যাদুর খেলা দেখাও বাজিকর!

[সঙ্গে সঙ্গে বাজিকর সোজা হয়ে দাঁড়াল, উঁচু করে ধরল তার যাদুদণ্ড। ভয়ঙ্কর চোখ যেন জ্বলতে থাকল। গুরু গুরু শব্দে ডমরু বেজে উঠল]

বাজি। খুলে যাক—মেলে যাক—ভেঙে যাক—ভেসে যাক—বন্ধ কপাট—আঁটা দরজা—শক্ত দেওয়াল—অটল পাথর। নগ্ন হোক দেহ, উলঙ্গ হোক আত্মা—পুড়ে যাক মুখোস—অনাবৃত হোক আকাশ। মেঘ করুক—বাজ পড়ুক—সূর্য ডুবুক—আঁধার নামুক।

[সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে আলোআঁধারি খেলা চলতে থাকল। একসঙ্গে অনেক রকমের শব্দ উঠল। তারই মধ্যে মঞ্চের মাঝখানের পর্দা উঠল। ধীরে ধীরে। ফিকে আলো পড়ল মঞ্চে। করুণ একটা বাঁশির সুর শোনা গেল। মঞ্চের মাঝখানে মাত্র একটা সিংহাসন। দেখা গেল, বাজিকর একটি অদ্ভুত রুদ্রমূর্তির ভঙ্গিমায় ফ্রিজ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিচের দাঁড়ানো তিনজন জনতা ছুটতে ছুটতে মঞ্চের সমুখভাগে এককোণে এসে দাঁড়াল। বাজনা বেজে চলেছে। হালকা নীল আলোয় দৃশ্যমান হল পাঁচজন জনতা পাঁচটি ভিন্ন রঙের ছোট আকারের চৌকি কাঁধে নিয়ে কাবুকি ঢঙে ছুটে আসছে। ওরা ছুটে সামনে এল। তারপর একটি লাইন করে মালার মতো পাঁচজন আবার একসঙ্গে মঞ্চের পেছনে গেল। এবং যার যার আসন নামিয়ে রেখে বসে পড়ল। ওরা হাঁপাচ্ছে]

প্রথম। আর পারি না—!

দ্বিতীয়। অনেক পথ—!

তৃতীয়। কত বইব—!

চতুর্থ। বুক ভেঙে যায়—!

পঞ্চম। উপায় নেই—!

[ওদের কথা কান্নার মতো শোনাল। ফ্রিজ ভাঙল বাজিকরের। সে আবার পূর্বেকার চঞ্চল চপল নৃত্য-ভঙ্গিমায় ছুটে বেড়াতে থাকল]

বাজি। শোন শোন মহাজন গুণীজন অভাজন সভাজন! আজ রাতের তৃতীয় প্রহরে—কালপুরুষ যখন মাথার ওপরে—বাতাস যখন সমুদ্রের জোয়ারে—ঠিক তখন মা আসবেন—মা আসবেন—মা আসবেন!

[তালে তালে বাজনা বেজে উঠল। ডি ডি ডি ডি ডি ডি......এবং.....এই পাঁচজন সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে অর্ধ-বৃত্তাকারে ঘিরে ধরল বাজিকরকে]

১ম। তুমি কোথা থেকে এলে?

বাজি। মায়ের কাছ থেকে।

২য়। মা কি বললেন?

বাজি। মা আসবেন।

৩য়। আর যে দেরি সহ্য হয় না!

বাজি। পেতে গেলে যে সময় চাই!

৪র্থ। অনেক সময় তো চেয়ে আছি!

বাজি। আর কিছু কাল চেয়ে থাকো!

৫ম। এই কিছুকাল—আর কতকাল?

বাজি। চোখের পলক যতকাল। ভাবছ কেন?—মা এই এলেন বলে!

পাঁচজন। মা আসছেন—আমাদের মা আসছেন! এতকাল পরে মা আমাদের কাছে আসছেন!

বাজি। ওরে তোরা শঙ্খ বাজা, ডঙ্কা বাজা, মায়ের নামে জয়ধ্বনি কর!

[ওরা সকলে মিলে হাত উঁচু করে একটা বিশেষ ভঙ্গিমায় মায়ের নামে জয়ধ্বনি দিতে যাবে, এমন সময় নেপথ্যে একটা গুরু গুরু বাজনা বেজে উঠল। ওরা থেমে গেল। যেন ভয় পেল। বাজিকর মুহূর্তে ছুটে গেল এবং পরক্ষণেই বেরিয়ে এল। উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করল। মঞ্চের এককোণে পাঁচজন গিয়ে দাঁড়াল]

বাজি। শ্বেতখন্ডের অধিপতি; মৃদুভাষী, মিষ্ট হাসি, প্রেমে প্রাণে গরিয়ান, ধর্ম যাঁর কবচ-কুন্ডল, সেই শ্বেতাধিপতি আসছেন......

[শ্বেতাধিপতির প্রবেশ। এসেই দাঁড়ালেন তাঁর জন্য সংরক্ষিত উঁচু আসনে। সাদা পোশাক। হাত জোড় করা। মুখে বিগলিত হাসি। স্থূলদেহ। নম্র চেহারা]

শ্বেত। প্রণাম প্রণাম প্রণাম! ভূমিকে প্রণাম। মাটিকে প্রণাম। আকাশকে প্রণাম। সমুদ্রকে প্রণাম। আমি ভালবাসা চাই, প্রেম চাই, প্রীতি চাই। হিংসা নয়, দ্বেষ নয়, লড়াই নয়, হানাহানি নয়। আমরা সকলের মিত্র। পরস্পরের ভাই। কেড়ে নেবেন না—চেয়ে নেবেন। ঝাঁপিয়ে পড়বেন না—হেঁটে যাবেন। আপনাদের চোখে জল? ঝরুক; অঝোরে কাঁদুন; কিন্তু হাসিমুখে কাঁদুন। আপনাদের ব্যথা? করুক; তবু এখন কথা নয়। নির্বাক থেকে সহ্য করুন। আপনাদের মনে দাবী? উঠুক। কিন্তু সোচ্চারে নয়, নিরুচ্চারে। কেউ আঘাত করলে প্রত্যাঘাত নয়। কারণ, তা থেকে হিংসা দ্বেষ হানাহানি। বলুন আপনারা—হিংসা নয়, দ্বেষ নয়, লড়াই নয়, হানাহানি নয়!

জনতা সকলে। হিংসা নয়, দ্বেষ নয়, লড়াই নয়, হানাহানি নয়।

বাজি। সুনিপুণ তার্কিক—শীতাতপে নির্ভয়—অনলস কর্মবীর—মহারথী সংগ্রামসিংহ আসছেন।.....

[সংগ্রামসিংহের প্রবেশ। গম্ভীর শান্ত স্থির। সোজা তাঁর আসনে উঠলেন]

সংগ্রাম। বন্ধুগণ! দীর্ঘ সংগ্রামের পর আজ আপনারা এখানে এসেছেন। সুদীর্ঘ লড়াইয়ের পর আজ আমরা মাতৃ-আরাধনার অধিকারী। আপনাদের দুঃখ রয়েছে, দৈন্য রয়েছে, অভাব রয়েছে। আপনারা বঞ্চিত, পীড়িত, অশক্ত। আপনাদের ঘরে রাতের প্রদীপ জ্বালাবার মতো তেল নেই, ঝড় প্রতিরোধের মতো দেওয়াল নেই, বৃষ্টি নিরোধের মতো ছাউনি নেই। অথচ আপনারা দেশের সম্পদ, জাতীয় গৌরব, আমাদের ভরসা। আমরা তাই আপনাদের সঙ্গে সংগ্রাম করে যাব। চিরকালের সম্পদ ভোগকারী সুবিধাবাদী জম্বুদ্বীপের সংগ্রাম। সংগ্রাম আমাদের কর্মে, সংগ্রাম আমাদের ধর্মে, সংগ্রাম আমাদের শয়নে স্বপনে তন্দ্রায় জাগরণে। বলুন, বাঁচতে হলে সংগ্রাম চাই!

সকলে। বাঁচতে হলে সংগ্রাম চাই।

বাজি। ক্ষীণ কান্তি, শীর্ণ বুক, টগবগে তেজ, প্রখর কণ্ঠস্বর—উত্তর পথের মহান নেতা অগ্নিদূত আসছেন।.....

[অগ্নিদূতের প্রবেশ। শীর্ণকায় আয়ত চোখ টগবগে যৌবন]

অগ্নি। যুদ্ধ ধ্বংস মৃত্যু, মৃত্যু ধ্বংস যুদ্ধ। বাঁচার জন্য যুদ্ধ। মৃত্যুর জন্য যুদ্ধ। ধ্বংসের জন্য যুদ্ধ। শান্তির জন্য যুদ্ধ। মানব জাতি গড়ে উঠেছে যুদ্ধের ভেতর দিয়ে, সভ্যতা পথ করে চলেছে যুদ্ধের শবস্তূপের ওপর পা রেখে। আমাদের যা কিছু অগ্রগতি, সবই যুদ্ধের গর্ভজাত ফল। কোনো আপোষ নয়। কোনো সখ্য নয়। কোনো মিত্রতা নয়। শান্তি মানেই মৃত্যু; আর যুদ্ধ মানেই জীবন। সেই জীবনকে পেতে হলে শান্তি শৃঙ্খলা আর নিয়মের বুকে যুদ্ধের আগুন জ্বালাতে হবে। যে আগুনের শিখা এই মাটিকে পুড়িয়ে আকাশকে গ্রাস করবে। বল যুদ্ধ ধ্বংস আর মৃত্যু—মৃত্যু ধ্বংস আর যুদ্ধ!

সকলে। যুদ্ধ ধ্বংস আর মৃত্যু—মৃত্যু ধ্বংস আর যুদ্ধ।

বাজি। স্থূলকায় সদা চপল পক্ককেশ কাঁচা যৌবন—সাদায়-কালোয় বহুরূপী বিচিত্রকুমার আসছেন।.....

[বিচিত্রকুমারের প্রবেশ। কখনো গম্ভীর—কখনো রহস্যময়]

বিচিত্র। সখা এবং নমস্যগণ! হিংসা চাই—অহিংসা চাই। শান্তি চাই—আবার সংগ্রামও চাই। আমরা দাবী করব; আবার দাবী উঠিয়েও নেব। আমরা ক্রুদ্ধ হব, আবার বিনীত হব। লক্ষ্য আমাদের এক, প্রয়োজন দুই। অপ্রয়োজনে তিন। যে যে-পথ বলব—সে-পথে ছুটব না। যে-গান তৈরি করব, সে গান গাইব না। আমরা সত্য চাই, কিন্তু মিথ্যাকে অস্বীকার করতে নারাজ। রোদ হলে বৃষ্টির কথা বলব। বৃষ্টি হলে বলব রোদ্দুরের কথা। বল হিংসা চাই—অহিংসা চাই। শান্তি চাই। আবার সংগ্রাম চাই!

সকলে। হিংসা চাই। অহিংসা চাই। শান্তি চাই। সংগ্রামও চাই।

বাজি। উত্তর দ্বীপের শ্রেষ্ঠী—দক্ষিণ দ্বীপের সন্ন্যাসী—আর্যাবর্তের পণ্ডিত জম্বুদ্বীপের মুর্খ—মহামহিম সর্বশূন্য রায় আসছেন।

[সর্বশূন্যের প্রবেশ। আধুনিক ব্রহ্মচারীর মতো দামী সন্ন্যাস বেশ]

সর্ব। কিচ্ছু নয়। কিচ্ছু নেই। সব শূন্য সব শূন্য! পথ চলছি, কিন্তু শেষ কোথায়? কেউ জানে না। কারণ শেষ নেই। জীবনটা মিথ্যে, জগৎটাও তাই। ঈশ্বরকে ডাকতে চাও—ডাকো; প্রাণভরে চিৎকার করে, অথবা নিঃশব্দে। শয়তানকে আহ্বান করতে ইচ্ছে হয়—কর; হৃদয় মন দেহ সমর্পন করে, অথবা না করে। হাসতে মন চায়—হাসো। কাঁদতে মন চায় কাঁদো। আখেরে কোনো লাভ নেই। বল কিচ্ছু নয়—কিচ্ছু নেই। সব শূন্য—সব শূন্য!

সকলে। কিচ্ছু নয়—কিচ্ছু নেই। সব শূন্য—সব শূন্য।

[এত সময় নির্বাক হয়ে শ্বেতাধিপতি দেখছিলেন। জনতার হাব-ভাব তাঁর কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হল। চঞ্চল হয়ে তাদের ডাকলেন]

শ্বেত। ওহে শোন শোন! [জনতাকে লক্ষ্য করে] তোমরা কারা?

বাজি। এরা জনতা।

শ্বেত। কাদের জনতা? কোথাকার জনতা?

বাজি। মাটির জনতা, ধুলোর জনতা। আপনি জানেন না?

শ্বেত। হ্যাঁ, জানি। এরা আমার জনতা। মাটির নয়, ধুলোরও নয়। ওহে, তোমরা আমার কথা বল—হিংসা নয়—দ্বেষ নয়—হানাহানি নয়—লড়াই নয়!

সংগ্রাম। কখ্খনো নয়। এরা তোমার জনতা নয়। ভুল বলছ তুমি। এরা সব আমার—আমার সর্বহারা জনতার দল। তোমরা আমার সঙ্গে গলা মেলাও—বাঁচতে হলে সংগ্রাম চাই!

অগ্নি। অসম্ভব! তুমি যা বলছ তা কেবল ভুল নয়—স্বেচ্ছাকৃত মিথ্যাচার। এরা তোমাদের দুজনের কারও জনতা নয়। এরা সব আমার মতবাদ বিশ্বাসী আমার জনতা। বল চিৎকার করে, মাটি কাঁপিয়ে বল—যুদ্ধ ধ্বংস আর মৃত্যু, মৃত্যু ধ্বংস আর যুদ্ধ!

বিচিত্র। না না না—তোমরা তিনজনেই ভুল করলে। এরা তোমাদের কারও জনতা নয়। ওরা সব আমার জনতা। দেখছ না ওদের হাত আছে, অথচ অস্ত্র নেই। আবার যখন অস্ত্র থাকবে তখন হাত থাকবে না। ওরা সব আমার জনতা। বল আমার সঙ্গে—হিংসা চাই অহিংসা চাই। শান্তি চাই আবার সংগ্রাম চাই!

[সর্বশূন্য হেসে উঠলেন। সকলে চমকে ফিরে তাকালেন]

সর্ব [হেসে]। কি আশ্চর্য! আপনারা সবাই ভুল করছেন। এরা তো আপনাদের কারও জনতা নয়! এরা আমার। আমার জনতা। দেখছেন না এদের গৃহ নেই, কিন্তু সন্ন্যাসী নয়। এরা শয়তান নয়, অথচ এদের ঈশ্বর নেই। এরা ব্যবহারে মুর্খ, স্বভাবে পন্ডিত। এরা আমার জনতা। বল তোমরা—কিচ্ছু নয়—কিচ্ছু নেই। সব শূন্য—সব শূন্য!

[এরা সকলেই "আমার জনতা, আমার জনতা" দাবী সুরু করলেন]

শ্বেত। কিছুতেই নয়। এরা আমার।

সংগ্রাম। এরা আমার। তোমাদের নয়।

অগ্নি। না, এরা আমার—আমার।

বিচিত্র। এরা আমার।

সর্ব। এরা আমার।

[সঙ্গে সঙ্গে এই পাঁচজনের মধ্যে 'এরা আমার', 'এরা আমার' এই দাবী সহ মূকাভিনয় শুরু হল। জনতা ভয় পেয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। বাজিকর এদের থামাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকল। হঠাৎ বাজিকর কি ভেবে দৌড়ে বাইরে গেল। এবং পরমুহূর্তেই ছুটে এল আবার। এসেই জোরে বলে উঠল আবার]

বাজি। মা আসছেন!

[মুহূর্তে মূকাভিনয় থেমে গেল]

বাজি। —মা আসছেন। এখন নদীর ঘাটে নৌকা বাঁধা। পাল খাটানো হয়ে গেছে। উজান পথে হাওয়া অনেক। মা এই এলেন বলে! হা-হা-হা-হা—

[মুহূর্তের ওঁরা স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করতে থাকলেন]

বাজি। —তোমরা কি এনেছ মায়ের জন্য ?

শ্বেত। এই নাও।

[একটা সাদা পতাকা-জাতীয় কাপড় দিলেন]

বাজি। তুমি ?

সংগ্রাম। এই নাও।

[একটি রক্ত গোলাপ দিলেন]

বাজি। তুমি কি এনেছ ?

অগ্নি। এই নাও, ধর।

[একটি ছুরি দিলেন]

বাজি। তুমি ?

বিচিত্র। ধর।

[একটি পাথরের টুকরো দিলেন]

বাজি। এটা কি ?

বিচিত্র। চকমকি পাথর। কিন্তু জ্বলবে না।

বাজি। আর তুমি ?

সর্ব [মালা দিলেন]। এই নাও।

[বাজিকর সব থেকে একে একে নিয়ে তার থলেয় রাখল]

বাজি। এবার কোথায় রাখব বলে দাও! সিংহাসনের পায়ের কাছে, হাতের কাছে, মাথার কাছে—যেখানে চাও, সেখানে রাখব—বলে দাও!

শ্বেত। সিংহাসনের সামনে রাখ।

সংগ্রাম। সম্মুখভাগ আমার জন্য। ওখানে রাখলেই হল!

অগ্নি। ছুরির দাবী সবার আগে। বললেই হল!

বিচিত্র। মিথ্যে কথা। ও জায়গাটা তো আমি রেখেছি।

সর্ব। সত্য নয়। জায়গাটা আমার।

শ্বেত। খবরদার বাজিকর!

সংগ্রাম। সাবধান বাজিকর!

অগ্নি। হুঁশিয়ার বাজিকর!

বিচিত্র। ভুল কোরনা বাজিকর!

সর্ব। কথা রাখ বাজিকর!

বাজি। তারপর তারপর তারপর ?

শ্বেত [ছুটে গিয়ে বাজিকরের হাত ধরে]। এখানে রাখ।

সংগ্রাম [ছুটে গিয়ে বাজিকরে হাত ধরে]। রাখ এখানে।

অগ্নি [ঘিরে ধরে]। আগুন জ্বালাব।

বিচিত্র। মিনতি রাখ!

সর্ব। কথা শোন!

[ওঁরা বাজিকরকে ঘিরে চক্রাকারে ঘুরতে থাকলেন। ভয়ঙ্কর কোলাহল উঠল। সব কথা মিলে-মিশে একাকার। বিপন্ন বাজিকর আবার চিৎকার করে উঠল]

বাজি। মা আসছেন!

[সঙ্গে সঙ্গে এঁরা পাঁচজন ছুটে গিয়ে যে-যাঁর নিজের আসনে দাঁড়ালেন। শোভন, ভদ্র, স্বাভাবিক]

বাজি। তরতরিয়ে তরী ভাসছে। পালের হাওয়ায় দ্বিগুণ জোর! মা এই এলেন বলে! হা-হা-হা-হা.....[একটু থেমে] তাহলে এবার তোমরা বলে দাও, সিংহাসনের সম্মুখভাগ কার?

[ওঁরা পাঁচজন একে অপরের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে থাকলেন]

বাজি। বল বল বল! লজ্জা কিংবা শঙ্কা কি! তোমরা জম্বুদ্বীপের স্বয়ং নেতা। দেশের ডাক তো সবার আগে! [ওঁরা নির্বাক] তোমরা এখন বলতে নারাজ! ঠিক আছে। তাহলে মা এসেই বলে দেবে। এই রইল সব, কি বল?

সকলে। তাই থাক। তাই থাক।

[সকলে যেন স্বস্তি পেলেন। বাজিকর তার ঝুলিটা রাখল সিংহাসনের কাছে]

বাজি। এবার তাহলে আমি একটু বিশ্রাম করি!

সংগ্রাম। না না। বিশ্রামের সময় নেই। এখন শুধু কাজ আর কাজ!

বাজি। কি কাজ করব বলে দাও?

সংগ্রাম। দেখে এস মা আর কতদূর? ছুটে যাও। দেরি হলে আর সময় পাব না। যাও যাও!

[বাজিকর বেরিয়ে গেল। হঠাৎ সব নির্জন। কেউ যেন কারুর সঙ্গে বিশ্বাস করে নিজের কথাটা বলতে নারাজ। অগ্নিদূত হঠাৎ যেন চিৎকার করে উঠলেন]

অগ্নি। যুদ্ধ ধ্বংস আর মৃত্যু। মৃত্যু ধ্বংস আর যুদ্ধ!

শ্বেত। এ ধরনের কথার আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

অগ্নি। প্রতিবাদ!

শ্বেত। হ্যাঁ, প্রতিবাদ। সোচ্চার প্রতিবাদ।

অগ্নি। কারণটা জানতে পারি?

শ্বেত। কারণ, আমাদের যৌথ-বন্দনায় একথা লেখা নেই। অথচ আপনি বার বার উচ্চারণ করছেন।

অগ্নি। লেখা আছে কি নেই, তাতে আমার কিছুই যায়-আসে না। আমার মতবাদ আমি ঘোষণা করবই। যুদ্ধ ধ্বংস আর মৃত্যু!

শ্বেত। আমাদের শপথ-বাক্য অস্বীকার করে?

অগ্নি। হ্যাঁ। প্রয়োজন হলে যৌথ-বন্দনার টুকরো কাগজটার কালি আমি মুছে ফেলব। দরকার হলে সকলকে আমি অস্বীকার করব।

শ্বেত। সততার ব্যভিচার। এ অসহ্য—অসহ্য!

সংগ্রাম। আপনি তা পারেন না।

অগ্নি। কি পারি না?

সংগ্রাম। শপথবাক্য অস্বীকার করে বিভ্রান্তিকর ধ্বনি দিতে আপনি পারেন না।

অগ্নি। কোনটা বিভ্রান্তিকর? চোখা কাগজের মন-ভুলানো শপথবাক্য? না, আপনাদের প্রাণ-জুড়ানো মিঠে মিঠে স্তোকবাক্য?—যা ঘুম পাড়ায়! নেশা জাগায়! পঙ্গু করে!

সংগ্রাম। জনতাকে বিভ্রান্ত করার কোনো এক্তিয়ার আপনার নেই। জনতাকে আমরা কথা দিয়েছি।

অগ্নি। জনতা! জনতা কি আপনার সম্পত্তি?

সংগ্রাম। জনতার মঙ্গল দেখা আমার দায়িত্ব।

অগ্নি। জনতার মঙ্গল মানে তো আপনাদের কথার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা! এতকাল যা তারা করে এসেছে! এবার তো শুধু পাত্র ভেদ। তা আর হতে দিচ্ছি না! এবার থেকে ধ্বনি তুলবই—যুদ্ধ ধ্বংস আর মৃত্যু!

সংগ্রাম। বিভ্রান্তিকর বাক্য। কাণ্ডজ্ঞানহীন ধ্বনি। এভাবে কিছুতেই চলতে পারে না। আমরা মেনে নিতে রাজী নই।

বিচিত্র। তাহলে কিভাবে চলবে?

সংগ্রাম। সংগ্রাম। সংগ্রামের ভেতর দিয়ে, আমাদের প্রয়োজনে সংগ্রাম ফুরলেই শান্তি।

বিচিত্র। এ তো একটি দ্ব্যর্থবোধক ধ্বনি। আমি মানতে পারছি না।

সংগ্রাম। তাহলে আপনি কি চান?

বিচিত্র। দুটোই বলব। কিন্তু কোনোটাই করব না। শান্তি চাই, আবার সংগ্রামও চাই। হিংসা চাই, আবার অহিংসাও চাই। যখন দেখব ওরা শান্ত, তখনই করে তুলব অশান্ত। যখন দেখব ওরা হিংসায় উন্মাদ, তখনই তাদের ওপর ছিটিয়ে দেব শান্তির বারি।

সংগ্রাম। মিথ্যাচার! শঠতা! অসম্ভব—অসম্ভব! এ ধরনের কথায় আমি কণ্ঠ মেলাতে প্রস্তুত নই।

সর্ব। সুতরাং কিচ্ছু নয়, কিচ্ছু নেই। সব শূন্য—সব শূন্য!

বিচিত্র। কখ্খনো না। আমাদের যৌথ সনদে সবই আছে; সব পূর্ণ।

সর্ব। নেই নেই। সনদও নেই, শপথও নেই। আমরাও নেই, জনতাও নেই। অত্যাচারও নেই, সুবিচারও নেই।

শ্বেত। আপনি চুপ করুন। বাজে কথা বলবে না।

সর্ব। আপনি আমাকে ধমকাচ্ছেন?

অগ্নি। শুধু ধমক নয়, কিল, ঘুষি, চড়। ছুরি আগুন রক্ত, যুদ্ধ ধ্বংস আর মৃত্যু।

বিচিত্র। এ একটা বদ্ধ উন্মাদাগার, এখানে থাকা চলে না।

শ্বেত। অসম্ভব! এ ধরনের চলতে থাকলে আমি চলে যাব। আমি একাকী পথ চলব।

সংগ্রাম। দরকার হলে জনতাকে দিয়ে কোলাহল সৃষ্টি করব। প্রতিবাদের সংগ্রাম করব।

অগ্নি। প্রয়োজন বুঝলে আগুন জ্বালাব। যুদ্ধ আনব, ধ্বংস আনব, মৃত্যু আনব।

অগ্নি। ধেই ধেই করে নাচব আর গাইব।

সর্ব। সব কিছু হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে শূন্য হব, আর হাততালি দেব। হা-হা-হা-হা—

[কোলাহল উঠল আরও জোরে। ওঁরা একে অপরকে সঙ্গে ঝগড়া করছেন। মূকাভিনয়ে এক-একটি বৃত্ত রচিত হচ্ছে, যার ওঁদের ভয়ঙ্কর উত্তেজিত দেখাচ্ছে। এক-একটি বৃত্ত রচিত হচ্ছে, আবার ভাঙছে। হঠাৎ ছুটতে ছুটতে বাজিকরের প্রবেশ]

বাজি। দুঃসংবাদ—ভয়ঙ্কর ভয়াবহ ভীষণ সংবাদ!

এঁরা সকলে। মা এসেছেন?

বাজি। না!

সকলে। সে কি?

[সকলে হতাশ হলেন যেন]

শ্বেত। মা কোথায়?

সংগ্রাম। মা এলেন না কেন?

অগ্নি। মা কি আমাদের ভুলে গেছেন?

বিচিত্র। মা কি আসবেন না?

সর্ব। কথা বল!

[একসঙ্গে সকলে ঘিরে ধরে জবাব চাইতে লাগলেন]

বাজি। মা হারিয়ে গেছেন।

সকলে। বলছ কি?

[সঙ্গে সঙ্গে করুণ বাঁশি বেজে উঠল]

বাজি। তোমাদের ডাকে সাড়া দিতে মা তাঁর তরী ভাসিয়েছিলেন। উজান বেয়ে আসছিল তরী। পালে ছিল পূবের হাওয়া। এমন সময় এক দখিন মেঘ তোমাদের এই আকাশ থেকে উড়ে গেল। সে কি মেঘ! কালো মেঘ! যেন আকাশ জোড়া এক দৈত্যরাজ!

শ্বেত। তারপর—তারপর?

বাজি। তারপর—নদীর বুকে উথাল-পাথাল, পালের দড়ি ছিঁড়ে গেল। উজান হল মত্ত স্রোত, ভাসিয়ে নিল সাগরপানে।

[করুণ সুরের বাঁশিটা যেন আরও জোরে কেঁদে উঠল। সকলে বিমূঢ়]

সংগ্রাম। কি সর্বনাশ!

বাজি। মায়ের তরীখানা ভরা ছিল কাঁচাপাকা সোনা-দানায়। কত সোনা! অনেক

সোনা! মাটির সোনা! ধুলোর সোনা। প্রাণের সোনা! প্রেমের সোনা! সব ডুবেছে সাগর জলে।

[সকলে বিমূঢ় নির্বাক। হঠাৎ যেন উত্তেজিত উল্লাসে লাফিয়ে উঠল বাজিকর]

বাজি। কিন্তু একটি জিনিস পাওয়া গেছে!

সকলে। কি—কি—জিনিস? কি জিনিস সেটা?

[বাজিকর ছুটে গিয়ে মায়ের সিংহাসনের কাছে দাঁড়াল]

বাজি। মায়ের হাতের ন্যায়দন্ড। [জামার ভেতর থেকে পাকানো একটি সাদা রঙের ন্যায়দন্ড বের করল] যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। যাকে ছোঁবে, সেই হবে সোনা!

সকলে। দাও, দাও আমার হাতে। আমার হাতে দাও। আমার হাতে দাও, আমার—আমার হাতে দাও!

[সকলে ছুটে গিয়ে ঘিরে ধরে দাঁড়ালেন বাজিকরকে। বাজিকর উঁচুতে তুলে ধরল]

বাজি। না। মায়ের হাতের ন্যায়দন্ড—এমন করে দিতে নেই। নিতেও নেই এমন করে।

সকলে। তাহলে? কি করে নেব?

বাজি। তোমরা যে-যার জায়গায় চলে যাও।

সকলে। তারপর?

বাজি। ঐ সিংহাসনে রাখব ঢেকে। ঠিক প্রহরে বাজবে বাঁশি। হাত মেলাবে তোমরা সবাই। নত হয়ে পাতবে হাত, কিন্তু হাতের পরে হাত রেখে। একটি হাতের লোভ কোর না যেন! যাও যাও যাও!

[অনিচ্ছায় সকলে যে-যার জায়গায় চলে গেলেন। বাজিকর সিংহাসনের ওপরে ন্যায়দন্ড রেখে কাপড়ে ঢেকে দিল]

বাজি। মায়ের হাতের ন্যায়দন্ড। যে পাবে সে রাজার রাজা, তোমরা লোভ কোরনা যেন! আসল ছেলে পাবেই পাবে। তোমরা শোন। আমি যাচ্ছি সাগর মোহনায়—যদি মায়ের খবর কিছু পাই!

[বাজিকর ছুটে বেরিয়ে গেল। নেমে এল নির্জনতা। ওঁরা পাঁচজন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। একে অপরের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। হঠাৎ শ্বেতাধিপতি সিংহাসনের দিকে ছুটে যেতেই সংগ্রামসিংহ তাঁকে ধরে ফেললেন। বাধ্য হয়ে বিষণ্ণ মুখে তিনি ফিরে এলেন নিজের জায়গায়। কয়েক মুহূর্ত সকলে অনড়। আকস্মিক সংগ্রামসিংহ ছুটে যেতেই অগ্নিদূত ঝাপটে ধরলেন তাঁকে। বিরক্তি নিয়ে আবার নিজের জায়গায় ফিরে এলেন তিনি। একটু চুপচাপ। অসতর্ক মুহূর্তে অগ্নিদূত ছুটে যেতেই সংগ্রামসিংহ তাঁর পথ আটকে দাঁড়ালেন। ক্রুদ্ধ হয়ে আবার তিনি নিজের জায়গায় এলেন। কয়েক মুহূর্ত—বাকি দুজন একসঙ্গে ছুটতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে একে অন্যের হাত ঝাপটে ধরে ফেললেন। আবার তাঁরা ফিরে এসে দাঁড়ালেন। কয়েক মুহূর্ত সকলে নিশ্চল। হঠাৎ প্রেক্ষাগৃহের দিকে ঘুরে নাটকীয় ভঙ্গিতে বক্তৃতা সুরু করলেন শ্বেতাধিপতি]

শ্বেত। মাননীয় জম্বুদ্বীপবাসী ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ! আপনাদের কাছেই আমি

বিচারপ্রার্থী। জীবনের বৃহৎ অংশটা আমি আপনাদের সেবায় নিয়োজিত রেখেছি। অন্যায়ের কাছে যেমন আমি মাথা নত করিনি, তেমনি ন্যায়ের জন্য—

সংগ্রাম। আমি সংগ্রাম করে চলেছি। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সম্পদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। স্থায়ী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং এই সংগ্রামের মূল লক্ষ্য—

অগ্নি। যুদ্ধ ধ্বংস আর মৃত্যু, মৃত্যু ধ্বংস আর যুদ্ধ। কোনো আপস নয়, কোনো সখ্য নয়। কোনো চুক্তি সনদ অঙ্গীকার নয়। রক্তাক্ত যুদ্ধের মধ্যে শান্তি। শ্মশানের নির্মমতায় শান্তি। আর তা পেতে গেলে যে পথ আমাদের অনুসরণ করতে হবে—তা হল—

বিচিত্র। শান্তির সময় অশান্তি—আবার অশান্তির সময় শান্তি। কারণ, আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হিংসা চাই, অহিংসা চাই। পাপও চাই, পুণ্যও চাই, যেহেতু—

সর্ব। কিচ্ছু নয়, কিচ্ছু নেই। সব শূন্য—সব শূন্য। যেহেতু নেতাও নেই, জনতাও নেই। আমরা যা বলি তার কোনোটাই কথা নয়—আবার সবটাই কথা। আমরা যা করি তার কোনোটাই কাজ নয়—আবার সবটাই কাজ।

শ্বেত। থামুন! আমার বক্তৃতায় আপনি বাধা দিতে পারেন না। আগে আমার কথা শেষ হোক, তারপর আপনি বলবেন।

সর্ব। আপনার বক্তৃতায় আমি খেই ধরেছি মাত্র। বাধা তো দিইনি!

সংগ্রাম। জনতাকে নিয়ে কথা বলবার একমাত্র অধিকার আমার, আপনাদের নয়। আগে আমার কথা শেষ হোক। তারপর যতসময় যা খুশি বলবেন।

বিচিত্র। বাঃ! মজার কথা বললেন আপনি। আপনার কথার আমি তীব্র প্রতিবাদ করতে চাই।

অগ্নি। আমি প্রতিরোধ করব। দরকার হলে আগুন জ্বালাব, প্রয়োজন হলে রক্ত বইয়ে দেব। যুদ্ধ ধ্বংস মৃত্যু ছাড়া আর অন্য কথা নেই।

শ্বেত। আপনি আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন?

সর্ব। কোলাহল করবেন না। ফয়সালা করুন।

বিচিত্র। কি ভাবে ফয়সালা করব, তাই বলুন!

সংগ্রাম। জনতাকে ডাকুন। তারা রায় দিক কার কথা সত্য!

সকলে। ডাকুন—ডাকুন—তাই ডাকুন!

[ওঁরা পাঁচজনে হাত উঁচু করে ফ্রিজ হলেন। সেই জনতার দল বৃত্ত করে এসে দাঁড়াল]

শ্বেত। আমি জানি তোমরা সকলে আমার জনতা। তাহলে এবার আমার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ধ্বনি দাও—হিংসা নয়, দ্বেষ নয়, লড়াই নয়, হানাহানি নয়—বল—বল—

[জনতা নির্বাক, শ্বেতাধিপতি চঞ্চল, অন্য সকলে খুশি]

অগ্নি। জানতাম, তোমরা তা পার না। কারণ, তোমরা আমার অনুগত জনতা।

এবার আমার সঙ্গে গর্জে ওঠ—যুদ্ধ ধ্বংস আর মৃত্যু, মৃত্যু ধ্বংস আর যুদ্ধ। বল—বল—

[জনতা নির্বাক]

বিচিত্র। বল—হিংসাও চাই, অহিংসাও চাই। শান্তি চাই, আবার অশান্তিও চাই। বল—বল—

[জনতা নির্বাক]

সর্ব। জানি, ওসব কথা বলবে না। আমার জনতার দল ওসব দায়িত্বহীন কথা বলতে পারে না। এবার তোমরা আমার সঙ্গে সুর মেলাও তো—কিচ্ছু নয়, কিচ্ছু নেই। সব শূন্য—সব শূন্য

পাঁচজন [চিৎকার করে]। বল—বল—বল—কথা বল—আমার কথা বল—তোমাদের কথা বল—

[ওঁরা সকলে জনতার উদ্দেশ্য আবেদন করতে থাকলেন, আর জনতা গোল হয়ে একটি পদ্ম ফুলের বৃত্ত রচনা করে নিজেরা পরামর্শ করতে থাকল। সে এক বিস্ময়কর মুহূর্ত]

জনতা। মা!

[হঠাৎ 'মা' বলে সোচ্চারে চিৎকার করে উঠল জনতা এবং জনতা মুহূর্ত দেরি করল না, নৃত্য ভঙ্গিমায় বেরিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত হতবাক হয়ে রইলেন ওঁরা। পরক্ষণেই কোলাহলে ফেটে পড়লেন, যে-যাঁর নিজের স্লোগান দিতে লাগলেন। ওঁরা মায়ের সিংহাসনকে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকলেন এবং মূকাভিনয় চলতে থাকল। এই সময়ে ছোট্ট একটি মেয়ে পায়ে পায়ে মঞ্চের কোণে এসে দাঁড়াল। কোমরে হাত রেখে অবাক হয়ে এদের ঘোরা দেখতে থাকল। দর্শকদের পেছনে রেখে কোমরে হাত রেখে নির্বাক দাঁড়িয়ে এদের মূকাভিনয় দেখছে। ছুটতে ছুটতে বাজিকরের প্রবেশ। সে দেখল। এবং ছুটে গিয়ে মেয়েটিকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে দর্শকের দিকে টেনে নিয়ে এল]

বাজি। মা গো! তুই এসে গেছিস মা! শঙ্খ, ডঙ্কা না বাজাতেই তুই এসে গেলি মা! কালপুরুষের আগেই তুই চলে এলি মা! চেয়ে দেখ মা—বীজের বুকে জলের তৃষা। মাটির বুকে তাপ। প্রাণগুলো সব বিষের জ্বালায় বেহুঁস পড়ে আছে। এবার তুই কথা বল মা! ওরা যে সব সিংহাসনের চারিদিকে ঘুরছে—কেবল ঘুরছে! কথা বল মা—ডাক দে ওদের! নইলে ওরা সারা জীবন ঘুরে ঘুরেই মরবে! কথা বল মা—কথা বল!

[মেয়েটি নির্বাক। বাজিকর মেয়েটিকে বুকে তুলে ওদের কাছে এগিয়ে গেল]

বাজি। ওরে, মা এসেছে—চেয়ে দেখ! মিথ্যে ঘুরিস চতুর্দোলা সিংহাসনের লোভে। ওরে থমকে দাঁড়া। চেয়ে দেখ তোদের হাতের কাছে, বুকের কাছে, প্রাণের কাছে—মা!

[ওঁরা তবু ঘুরতে থাকলেন। মূকাভিনয় চলতে থাকল]

বাজি। দোহাই তোদের, ঘোরা থামা। চেয়ে দেখ—মায়ের চোখে অশ্রুজলের ধারা। মুছে দে সেই জল—মাকে মাথায় তুলে বল—আমরা মায়ের মাটির ছেলে—প্রাণের ছেলে—প্রেমের ছেলে যে! দোহাই তোদের—ঘোরা থামা—

[তবু ঘুরতে থাকলেন। বাজিকর তখন ছুটে এল মেয়েটিকে বুকে নিয়ে প্রসেনিয়ামের শেষ কিনারে। প্রেক্ষাগৃহের দর্শকের দিকে তাকিয়ে আকুল স্বরে কথা বলল]

বাজি। ওরে, কেউ নিবি না মাকে তোরা তোদের হাতের কাছে, বুকের কাছে, প্রাণের কাছে মা! কথা বল—কে নিতে চাস মাকে!

[সঙ্গে সঙ্গে সেই জনতার দল দর্শকের দুদিক থেকে দুভাগে ছুটে এলো]

জনতা। আমরা নেব। আমরা নেব। আমরা নেব—মাকে।

বাজি। তোরা? তোরা কারা?

জনতা। আমরা মায়ের ধুলোর ছেলে, মাটির ছেলে, প্রাণের ছেলে যে!

বাজি [ছোট্ট দণ্ড বের করে]। তোরা এটা নিবি না? যা ছোঁবে তাই হবে সোনা!

জনতা। না!

বাজি [ছোট্ট একটা পাথর দেখিয়ে]। এটা নিবি? সাতরাজার ধন মানিক পাবি!

জনতা। না। মাকে দাও, শুধু মাকে চাই।

বাজি। তোদের হাতগুলো সব—

জনতা। এক করেছি! মাকে দাও!

[ওদের হাতগুলো একসঙ্গে মায়ের দিকে প্রসারিত হল। মুহূর্তে দেখা গেল মায়ের মুখে হাসি: একটি হাত জনতার দিকে মা বাড়িয়ে দিয়েছে। সে এক অনাবিল মুহূর্ত! নেতা পাঁচজনেই সিংহাসনের কাছে ফ্রিজ। তাদের হাতগুলো সিংহাসন ধরবার ভঙ্গিমায় উদ্যত। মাথা নিচু। সঙ্গে সঙ্গে মাতৃ-আরাধনার ঢাক সারা প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে বেজে উঠল। আস্তে আস্তে পর্দা নেমে এল]

শতাব্দীর পদাবলী

রাধারমণ ঘোষ

চরিত্রলিপি

কখনো বাবা
কখনো পল্টন
কখনো মদন
কখনো বুটে
কখনো ছানু

[পর্দা খুললে দেখা গেল মঞ্চে দাঁড়িয়ে—বাবা, এখন প্রফেসর, পল্টন, মদন, ছানু ও বুটে। মঞ্চের মাঝামাঝি একটা চৌকি বা বেঞ্চ কালো অথবা নীল কাপড়ে ঢাকা। চৌকির পিছনে থাকবে একটি টুল বা আর একটি বেঞ্চ, সেটি দেখা যাবে না, কারণ চৌকি ও বেঞ্চের মাঝে ওদেরই দৈর্ঘ্যের অনুপাতে একটি কালোর ওপর হিজিবিজি লালের নক্সা কাটা কাপড়ের দেওয়াল। পিছনের বেঞ্চ অথবা টুলের ওপর প্রফেসর দাঁড়িয়ে। দেওয়ালটি প্রফেসরের দেহের প্রায় অর্ধেকের বেশি ঢেকে ফেলেছে। মঞ্চে আবছা আলো। বাকিরা সামনে দাঁড়িয়ে আছে—প্রফেসরের দিকে মুখ করে দর্শকের দিকে পিছন করে]

প্রফেসর। ফলো মাই বয়েজ, আজ থেকে প্রায় তিন কোটি বছর আগে 'মানুষ' নামে একটি প্রাণী পৃথিবীর অন্য সমস্ত প্রাণীদের থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছিল। তারপর আরো দশ লক্ষ বছর ধরে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে সেই মানুষ পৃথিবীর ওপর অন্যান্য প্রাণীদের ওপর বজায় রেখেছিল আপন প্রভুত্ব। ডু ইউ ফলো মি? সুদূর অতীতের এই চতুষ্পদ জন্তুটা বহুদিনের বহু অধ্যবসায়ের ফলে যেদিন তার সামনের পা দুটোকে দুটো হাতে রূপান্তরিত করতে পেরেছিল সেই দিনটা ছিল তার জয়যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ। শুধু মাত্র দুটো হাত মানুষকে আলাদা করে ফেলল অন্য সমস্ত প্রাণী-জগত থেকে। পৃথিবীর মধ্যে মানুষ হল শ্রেষ্ঠ প্রাণী, একমাত্র চিন্তাবিদ, পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বর।

সবাই। আমরাই সেই মানুষ—

[এরা দর্শকের দিকে ঘুরল]

মদন। পৃথিবীর বুকে যেদিন আমরা প্রথম আগুন জ্বালাতে শিখেছিলাম, সেদিন কেউই কল্পনা করতে পারিনি যে ঐ আগুনেই একদিন আমরা পুড়ে ছারখার হয়ে মারা যাব। সেদিন পৃথিবীতে আমাদের সভ্যতার জয়যাত্রা সুরু হয়েছিল, সেদিন আমাদের ছিল দুটো হাত ও আত্মরক্ষার জন্যে অস্ত্র, আর যেদিন আমাদের বিসর্জনের যাত্রা সুরু হল সেদিনও আমাদের ছিল দুটো হাত, কিন্তু সঙ্গে ছিল আত্মহত্যার জন্য অস্ত্র।

পল্টন, ছানু। আমরা মানুষ, পৃথিবীর বিস্ময় মানুষ—

পল্টন। আমরা জন্মেছি মানুষের দেশে, মানুষের ঔরসে, মানুষের গর্ভে। কিন্তু এক অভিশপ্ত শতাব্দীতে আমাদের জন্ম, এক প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়ের যুগে। মাঝে মাঝে এক একটা দমকা বাতাস এসে সব ওলট-পালট করে দিচ্ছে। আমরা বিক্ষিপ্ত, অস্থির মন নিয়ে এক প্রচন্ড যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠছি। বুঝতে পারছি না—কি করছি, কি হচ্ছে, কোথায় যাচ্ছি।

ছানু। যে হাত দিয়ে আমরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলাম, যে হাত দিয়ে সঙ্গীতের ঝঙ্কার তুলেছিলাম, যে হাত দিয়ে বিজ্ঞানকে সুদূরপ্রসারী করেছিলাম, সেই হাত দুটো দিয়েই আমরা টিপে ধরলাম আমাদের গলা। সেই হাত দুটো দিয়েই তৈরি করলাম পৃথিবীর ধ্বংসের মারণাস্ত্র, সেই হাত দুটোই আমাদের সাহায্য করল

লোভ, স্বার্থ, লালসা চরিতার্থ করার পথকে। মানুষ, পৃথিবীর বিস্ময় আমরা, এগিয়ে চললাম পৃথিবীর বুক থেকে ধ্বংস হবার পথে।

বুটে। এমনি করে আমরা মানুষ হারিয়ে ফেলাম মনুষ্যত্বকে। যে 'মনুষ্যত্ব' নামে বস্তুটা আমাদের 'মানুষ' পরিচয় এনে দিয়েছিল তা হারিয়ে যেতে যেতে—আমরা হয়তো একদিন পড়ে থাকব ইতিহাসের ছেঁড়া পাতায়, কিংবদন্তীর উপকথায়, স্মৃতির রোমন্থনে।

[আলো জ্বলে; মঞ্চে ছানু পল্টন ও মদন। পল্টন ও মদন ছানুকে প্রচন্ড মারছে]

ছানু। আমায় মারিস না পল্টন, আমায় মারিস না। আমি তোদের কিছু করিনি। পল্টন, পল্টন, প্লিজ পল্টন। আমি সত্যি বলছি....আমি কিছু জানি না। মদন, মদন, তুই তো জানিস আমি একমাস বাড়িতে ছিলাম না।

পল্টন। খাটালের পাশে নর্দমার ধারে পেটো লুকোন আছে, থানায় খবরটা কে দিয়েছিল রে ছানু?

ছানু। আমি না পল্টন, আমি না।

মদন। জগাদার দালালি করতে খুব মজা লাগে না রে? কিরে জবাব দে?

ছানু। জগাদা আমাকে দুচার টাকা দিয়ে মাঝে মাঝে সাহায্য করত বটে, কিন্তু আমি দালালি করিনি।

মদন। ও, দুচার টাকা দিয়ে জগাদা তোকে মাঝে মাঝে সাহায্য করত!

পল্টন। আর আমাদের দু চার পয়সা দিয়ে কেন সাহায্য করত না বলতে পারিস?

ছানু। তোরা তো গিয়ে কোনো দিন সাহায্য চাসনি—

মদন। পটলির মা গিয়ে সাহায্য চেয়েছিল—

পল্টন। মরা স্বামীর ঘাট খরচার টাকার জন্যে দুপায়ে মাথা খুঁড়েছিল—

মদন। পটলীর মাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল কেন?

পল্টন। কিরে জবাব দে?

ছানু। কেন সেটা আমি কি করে জানব বল?

মদন। অথচ দুচার টাকার লোভে কি করে দালালগিরি করতে হয় তা তো জানিস।

ছানু। জানিসতো বাবার অসুখ—

পল্টন। চোপ শালা বাবার বাচ্চা। এখন শালা বাবা দেখাচ্ছে।

ছানু। পল্টন, আমি তোর পায়ে পড়ছি, আমায় ছেড়ে দে।

মদন। তাহলে থানায় গিয়ে পুলিশকে খবর দেবার খুব সুবিধে হয় বুঝি?

ছানু। আমি তোদের কি করে বোঝাব মদন, পুলিশকে আমি কোনো খবর দিইনি। তোদের ভেতরের ব্যাপার আমি কিছুই জানি না। [পল্টন ছুরি বার করে] না—না, আমায় খুন করিস না পল্টন। আমি মরে গেলে বাবা পাগল হয়ে যাবে। মদন, মদন, আমায় ছেড়ে দে। তোরা যেখানে যেতে বলবি আমি সেখানেই যাব, আমায় ছেড়ে দে।

মদন। ঠিক—

ছানু। মাইরি বলছি। মা কালীর দিব্বি।

পল্টন। তোর বাবার দিব্বি গাল বে শালা—

ছানু। পল্টন!

পল্টন। কিরে শালা গাল—

ছানু। আমি বুঝতে পারছি না—

মদন। বল, আমি বাবার নামে দিব্বি করে বলছি—তোরা যেখানে যেতে বলবি আমি সেখানেই চলে যাব।

ছানু। আমি.....আমি.....আমি.....

পল্টন। শালা মেনি বেড়ালের মতো মিউ মিউ করবি না! নে নে ঝটপট—

ছানু। তোরা আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিস না তো?

পল্টন। আমরা কি শালা তোর পিরিতের ঠাকুর যে তোর সঙ্গে ঠাট্টা করব?

মদন। নে নে জলদি—

ছানু। আমি—আমি বাবার নামে দিব্বি বলছি তোরা যেখানে যেতে বলবি আমি সেখানেই চলে যাব।

পল্টন। তবে শালা নরকে যা।

[ছুরি মারে। ছানু টলে পড়ে। ওরা ধরাধরি করে নিয়ে চলে যায়। অন্য পাশ দিয়ে ছানুর বাবার প্রবেশ]

বাবা [ছানুকে খুঁজছে]। ছানু, ছানু, কোথায় গেলি? ভাত যে ঠান্ডা হয়ে গেল বাবা, [যেন কাউকে দেখতে পেয়ে] হ্যাঁ বাবা, আমার ছানুকে দেখেছ? সে যে বলে গেল, ভাত বাড়, আমি এসে খাব। কোথায় যে গেল ছেলেটা? ছানু...ও ছানু...

[ক্লান্ত হয়ে চৌকিতে বসে পড়ে। প্রবেশ করে পল্টন]

পল্টন। আমি পল্টন। আমি ছানুকে খুন করেছি। খুন করার সময় আমার হাত একটুও কাঁপেনি। একবার মনে হয়নি এ অন্যায়, এ অপরাধ। বিবেক বলে কোনো বস্তু ভেতর থেকে আমাকে বাধা দেবার চেষ্টাও করেনি। কিন্তু কেন? কেন একটা নিরীহ, নিরপরাধ মানুষকে খুন করার জন্যে আমার হাত একটিবারের জন্যেও কেঁপে উঠবে না? কেন আমার একবারও মনে হবে না—এ অন্যায়, এ অপরাধ? কেন আমার বিবেক আমাকে বাধা দেবে না?...আমি তো খুনী হতে চাইনি, আমি তো গুন্ডা হতে চাইনি। আমি তো বলেছিলাম আমি লেখাপড়া শিখব। আমি বড় হব। আমি ডাক্তার হব।

বাবা [এখানে পল্টনের বাবা]। আমি পারব না, পারব না, পারব না। তোমার কলেজের পড়ার খরচ নিজে যোগাড় করে নিতে পার তো পড়, নইলে পড়া ছেড়ে দাও। সামনের মাস থেকে আমি আর একটাও পয়সা দিতে পারব না।

পল্টন। আর তো মাত্র ছটা মাস বাবা, তারপর না হয় একটা টিউশানি যোগাড় করে নিয়ে—

বাবা। ছটা মাস কেন, ছটা দিনের খরচও আমি দিতে পারব না। কোত্থেকে

দেব বলতে পার? চাকরি নেই, রিটায়ার করেছি, মাস গেলে কেউ আর আমাকে মাইনের খাম হাতে ধরিয়ে দেবে না।

পল্টন। তাই বলে এতদূর এসে লেখাপড়াটা বন্ধ করে দেব?

বাবা। চুলোর দোরে লেখাপড়াকে পাঠিয়ে দে। কি করবি লেখাপড়া শিখে? চাকরি পাবি? দেখগে যা কত এম. এ., এম. এস-সি. একটা একশো টাকার চাকরির জন্যে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করছে। ওসব লেখাপড়া শিকেয় তুলে রাখ। তার চেয়ে এখন থেকে খোঁজ করগে যা যদি কোনো চায়ের দোকানে বয়-টয়ের কাজকম্ম পাস। তাছাড়া ঘরে একটা সোমত্ত মেয়ে, তারও বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে না কি?

পল্টন। বেশ, তুমি তোমার মেয়ের চিন্তা কর। আমার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার পড়ার খরচ আমি যেখান থেকে পারি যোগাড় করে নেব।

বাবা। আর খাওয়ার খরচ? খাওয়ার খরচ আসবে কোত্থেকে? ঐ বড় বাজারের ষাঁড়কে আমি দুবেলা বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে পারব না।

পল্টন। তার মানে তুমি বলতে চাও—

বাবা। আমি কিছু বলতে চাই না, কিছু করতেও চাই না। বড় হয়েছ, বুঝতে শিখছ। কিছুটা লেখাপড়াও শিখিয়ে দিয়েছি। আর কেন? এবারে আমাকে রেহাই দাও। [প্রস্থান]

পল্টন [বাবার যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে]। ও আমাকে খাওয়াতে পারবে না, পড়াতে পারবে না, আমি বড়বাজারের ষাঁড়! ঠিক আছে, আমিও দেখে নেব কত ধানে কত চাল। তুলকালাম কান্ড করব, তবেই আমার নাম পল্টন। মেয়ে বড় হয়েছে, তার বিয়ে দিতে হবে? তা দাওনা, আমি কি বারণ করেছি? তার জন্যে আমার লেখাপড়া বন্ধ করতে হবে কেন? আমি যেন আমার বোনকে ভালবাসি না? তুমি শুধু একাই তোমার মেয়েকে ভালবাস? সতী যেন আমার বোন নয়? ঠিক আছে, ঠিক আছে, খাওয়াতেও হবে না, পড়াতেও হবে না, আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নেব। [প্রস্থান]

[মঞ্চে আলো তীব্র হয়। হাসতে হাসতে প্রবেশ করে মদন, বুটে ও ছানু]

মদন। এ শালা এমন এক আজব দেশে বাস করছি যেখানে খালি চোরম, চোরে, চোরাণি—চোরম, চোরে, চোরাণি—

বুটে। হলুনি—শুদ্ধ ভাষায় বল, সমুদ্র ও পর্বত বেষ্টিত এক তস্কর অধ্যুষিত উপমহাদেশের আমরা নাগরিক।

ছানু। এ ছাড়া যেদিকে তাকাবি দেখবি হেনর জায়গায় তেন আর তেনর জায়গায় হেন। সেই সুকুমার রায়ের কবিতাটা—মাসী গো মাসী/পাচ্ছে হাসি/নিম গাছেতে হচ্ছে শিম। হাতির মাথায়/ব্যাঙের ছাতা/কাগের বাসায় বকের ডিম।

[সবাই হো হো করে হেসে ওঠে মদন সবাইকে থামিয়ে দেয়]

মদন। ইস্টপ...ইস্টপ...

ছানু। কেন, কেন?

মদন [গাম্ভীর্য নিয়ে]। বিধানসভায় যাইলে দেখবে বাছা?

ছানু। কুস্তিগীর বনাম কবিদের লড়াই চলিতেছে মহাপ্রভু।

মদন। করেকটো—। কুস্তির আখড়ায় কি হইতেছে বেটা?

বুটে। কুস্তিগীরেরা সবাই ল্যাঙট পরিয়া ভোটের পোস্টার লিখিতেছে দেব।

মদন। ভেরি কারেক্‌টো—। বিদ্যালয়ে কি হইতেছে বৎস?

ছানু। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতেছে জগন্নাথ।

মদন। রাইটো—। যুদ্ধক্ষেত্রে কি হইতেছে বালক?

বুটে। হরিনাম সংকীর্তন হইতেছে মদনমোহন।

মদন। ডবল রাইটো—-। আর হরিনাম সংকীর্তনের জায়গায়?

ছানু [অদ্ভুত আওয়াজ]। মধুকুঞ্জ—। [সবাই আবার হেসে ওঠে। হঠাৎ ছানু যেন ভাবে গদ গদ হয়ে যায়। বলতে থাকে—] ওরে হরিনাম ছাড়া এ সংসারে আর কি আছে রে? [মদনের দিকে এগোয়] কাছে আয় মা, লজ্জা কি? আমি যে তোর জন্যে দুহাতে প্রেম বিলোতে এসেচি—

[হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে যায়]

মদন। খবরদার ছানু, এদিকে এলে আপার কাট ঝাড়ব। বুটের দিকে যা না শালা।

বুটে। এই দেখ আবার আমার নাম কেন বাবা? এই মাইরি ছানু, আমার কাতুকুতু লাগে ভাই। আরে ভাল হবে না বলছি।

[ছানু বুটের দিকে এগোচ্ছে]

ছানু। ওরে সেই বৈকুণ্ঠধামে আমি নারায়ণ, তুই লক্ষ্মী। ত্রেতাতে আমি রাম, তুই সীতা। দ্বাপরে আমি কৃষ্ণ, তুই রাধা। আর এই কলি যুগে আমি হরিদাস বাবাজী; আর তুই হাবুল ঘোষের বিধবা শালী। ওরে বুকে আয়। [বুটে ধাক্কা মারে। ছানু পড়ে যায়। পড়ে গিয়ে গান ধরে—] মেরেছ কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দেব না—

[শোনা যায় পল্টনের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। পল্টন প্রবেশ করে]

পল্টন। শালা এটা লাইফ? একদিন তুলকালাম কান্ড হয়ে যাবে। তোমার আর কি? তুমি তো বুড়ো হয়ে শ্মশানের দিকে পা বাড়িয়েছ তা আমার লাইফটা শেষ করে দিচ্ছ কেন বাবা?

মদন। এত চটিতং কেন রে? কার কথা বলছিস?

পল্টন। ঐ বাবা—

ছানু। বাবা? কার? তোর?

পল্টন [আরো রেগে]। না আমার পিসশ্বশুরের। শালার কথা শোন। এখনো বলে আমার ব্রহ্মতালু হু হু করে জ্বলছে আর উনি বলছেন, কার বাবা, তোর? ন্যাকাসোনা।

মদন। তা তুই রাগ করছিস কেন? বুটে হাওয়া কর।

পল্টন। হাওয়া করতে পার। পকেটে কিন্তু চা খাওয়াবার পয়সা নেই।

মদন। ছিঃ ছিঃ পল্টন, বুটে ছোটলোক হতে পারে, তাই বলে অভদ্র নয়। তুই হাওয়া করে যা।

বুটে। নিশ্চয়। শাস্ত্র বলেছে না, মা ফলেষু কদাচন।

পল্টন। একদিন দেখিস আমি নিশ্চয় ডবল ডেকারের তলায় কাঁপিয়ে পড়ব!

ছানু। ও বুঝেছি?

পল্টন। কি বুঝেছিস?

ছানু। মেরেছে।

মদন। কি মেরেছে?

ছানু। ল্যাং মেরেছে।

বুটে। কে ল্যাং মেরেছে?

ছানু। বুচকি ওকে ল্যাং মেরেছে।

[সবাই হেসে ওঠে]

পল্টন [রাগ চরমে ওঠে]।। দেখ্ ছানু, এই তোকে শেষবারের মতো বারণ করে দিচ্ছি পরের মেয়ে সম্বন্ধে যা তা বলবি না বলছি। বুচকি কিরে? বুচকি কি? ওর একটা ভাল নাম নেই?

বুটে [ছানুকে]। মারব গালে এক থাপ্পড় ননসেন্স ছেলে, বুচকি কি? শুদ্ধ ভাষায় বলতে পারনা পুঁটুলি—

[ওরা আবার হেসে ফেলে]

পল্টন। ও তোরা সবাই একজোট হয়ে...বেশ আমি চললাম।

মদন। এই এই নো রাগারাগি—নো রাগারাগি। নে নে বোস। মাথা ঠাণ্ডা করে বলত, ব্যাপারটা কি হয়েছে?

পল্টন। বলাবলির কিছু নেই। বাবা স্রেফ জানিয়ে দিয়েছে যে আমার মতো বড়বাজারের ষাঁড়কে আর বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবার ক্ষমতা তার নেই। লেখাপড়া বন্ধ।

ছানু। বন্ধ মানে?

মদন। তোকে আর পড়াবে না?

বুটে। তাহলে তোর ভবিষ্যত?

পল্টন। অন্ধকার। কি বলে জানিস? আমাকে চায়ের দোকানে বয়গিরি করতে বলে। ঐ সব এঁটো কাপডিস আমাকে ধুতে হবে?

মদন। ডেঞ্জারাস ফাদার তো—

বুটে। ফেরোসাস—

ছানু। আচ্ছা আমি বলিকি, আমরা যদি সবাই মিলে পল্টনের বাবাকে গিয়ে—

পল্টন। এই ব্যাটাকে দেখে আমায় রাগ হয় কেন বলতে পারিস। ব্যাটা কিছু বুঝবে সুঝবে না—এমন এক একটা কথা বলবে না, ওরে আমাকে না হয়

বড়বাজারের ষাঁড় বলে রেহাই দিয়েছে আর তোরা গেলে যে পেছনে ষাঁড় লেলিয়ে দেবে।

বুটে [কথা ঘোরাতে চায়]। এই এই মদনা আজকের আনন্দবাজারটা দেখেছিস—

মদন। আরে দূর, কালোবাজারের ঠেলায় অস্থির আর আনন্দবাজার! বাজার থেকে বেবিফুড লোপাট। বোনটাকে কি খাওয়াই বলত?

পল্টন। ঐ সব হারামির বাচ্চাদের ধর। লাইটপোস্টে ঝোলা আর গুলি কর।

ছানু। আনন্দবাজারে কি আছে রে বুটে?

বুটে। ঐ ছোটকাকা বলছিল একটা নাকি চাকদাই চাকরির খবর আছে।

পল্টন। আরে ফালতু ফালতু—। ও সব দেখে দেখে চোখ হ্যাজ বিন পচাইড মানে পচে গেছে।

মদন। না না হতাশ হইলে চলিবে না। কবি কি বলিয়াছেন?

বুটে। কি বলিয়াছেন বাপ?

মদন। কবি বলিয়াছেন—যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলে পাইতে পার—

বুটে। পরশ পাথর—

মদন। লে আও আজকা আনন্দবাজার। হম অ্যাপ্লিকেশন করেগা—

ছানু। হ্যাঁ হ্যাঁ দরখাস্ত করতে আর ক্ষতি কি?

পল্টন। ব্যাটা গাড়োল তো একেবারে গাড়োল। আরে দরখাস্ত যে করবি—তার পোস্টাল খরচটা কোত্থেকে আসবে মানিক? নাড়া দিলে পড়বে? ন্যাকাসোনা—

ছানু। না—না আমি বলছিলাম কি—

পল্টন। তুই আমার পোস্টাল খরচা দিবি?

বুটে। ইয়েস ছানু, এটা তোর দেওয়া উচিত। কারণ তুই পল্টনের মেজাজ টক করে দিয়েছিস।

ছানু। যা বাব্বা পেনালটি—

মদন। রাইট, পেনালটি—পল্টনের হৃদয়েশ্বরীকে পুঁটুলি না বলিয়া বুচকি বলার অপরাধে ছানুকে অপরাধী হিসাবে—

বুটে। সাব্যস্ত করা হইল। ইহা আমাদের বিচারপতি....বিচারপতি.....পল্টন মহারাজের আদেশ।

[পল্টনকে ভেংচি কেটে পালায়]

পল্টন। এই আবার—

[এরা হেসে ওঠে। রঙীন আলোর চক্র মঞ্চ জুড়ে ঘুরতে থাকে। নেপথ্যে শোনা যায়]

নেপথ্যে। হিয়ার ইজ অ্যান ইন্টারভিউ ফর দি পোস্ট অব এ ক্লার্ক। আউট অব ফাইভ থাউজেন্ড অ্যাপ্লিকেশন্স আই এসর্টেড ওনলি ওয়ান হান্ড্রেড অ্যামং হুইচ ওয়ান উইল বি সিলেক্টেড। নাউ মিঃ ছানু, মিঃ মদন অ্যান্ড মিঃ পল্টন আর রিকোয়েস্টেড টু কাম ফর অ্যান ওরাল টেস্ট।

[ঘোষণা চলাকালীন এরা এক লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সকলের চোখে মুখে উৎকণ্ঠা। প্রবেশ করে বুটে—এখন কোম্পানীর উচ্চপর্যায়ের অফিসার]

অফিসার। হোয়াট ইজ ইওর নেম?

ছানু। ছানু।

অফিসার। এডুকেশন?

ছানু। বি. এ. অনার্স—

অফিসার। সরি, আমার কর্মাসের লোক দরকার....[মদনকে] হোয়াট ইজ ইওর নেম?

মদন। মদন।

অফিসার। এডুকেশন?

মদন। বি. কম.।

অফিসার। সরি, আমার বি. এস. সি-র লোক দরকার....[পল্টনকে] হোয়াট ইজ ইওর নেম?

পল্টন। পল্টন।

অফিসার। এডুকেশন?

পল্টন। বি. এস. সি.।

অফিসার। এনি এক্সপেরিয়েন্স?

পল্টন। নো।

অফিসার। সরি।

ছানু। হোয়াট এব্যাউট মাই ফ্যামিলি?

মদন। হোয়াট এ্যাবাউট মাই ফাদার এ্যান্ড সিসটার?

অফিসার। আই স্যাল প্রে ফর দি আনফরচুনেট সোলস অব ইওর ফ্যামিলি। আ-মে-ন। [প্রস্থান]

[আলোর চক্র থেমে যায়। আবার আগের মতো তীব্র আলো। ওরা গিয়ে চৌকিতে বসে। নেপথ্যে শোনা যায়—]

নেপথ্যে। শতাব্দীর যৌবন। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছবার আগেই নিঃশেষ হয়ে যাবে।

[ওরা গান ধরে]

আহা চাকুরি চাকুরি করি
দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরি
চাকুরি যে সরিষার ফুল রে।
যেখানে যেখানে যাই
শুধু গলাধাক্কা খাই
সকলেই দেয় শুধু গুলরে।

[হঠাৎ মদন লাফিয়ে ওঠে]

মদন। এই, নপুংসক জগবন্ধু চক্রবর্তী যাচ্ছেরে—

ছানু। কে জগাদা? কইরে?

মদন। ব্যাটাকে পাকড়াবি? ভোটের আগে তো চাকরি দেব বলেছিল।

পল্টন। ও বাবা ভোটের আগে অনেক চাঁদুই বড় বড় বাতেলা মারে, হেন করেঙ্গা, তারপর চাকুরি চায়েঙ্গা তো স্রেফ বুড়ো আঙ্গুলে ঠেকায়েঙ্গা।

ছানু। তবু একবার ডেকেই দেখা যাক না। ডাকব?

পল্টন। শালার ছটফটানি দেখ—

মদন। যা যা ডেকে নিয়ে আয়।

ছানু। জগাদা—ও জগাদা— [প্রস্থান]

মদন। যদি ব্যাটা বেশি ট্যান্ডাই ম্যান্ডাই করে তাহলে শালার চোদ্দগুষ্টির পিন্ডি চটকাব আজ।

পল্টন। জনদরদী জগবন্ধু চক্রবর্তী, এম. এল. এ.! ব্যাটার পোশাকখানা দেখ? যেন লাটসাহেবের লাতি লবাব লন্দন লাচতে বেরিয়েছে।

মদন। লব নির্বাচিত লটবর।

পল্টন। একেবারে ছাড়িয়ে বলবি মদনা।

মদন। এই ল্যাকামনি আসছে।

[ছানুসহ বাবার অথবা বুটের প্রবেশ, এখন জগাদা]

জগাদা। আরে কি ব্যাপার তোমরা এই পার্কে বসে কি করছ?

মদন। কি আর করব বলুন? কাজকর্ম তো আর নেই। তাই সবাই মিলে একটু নরক গুলজার করছিলাম।

জগাদা। বেশ বেশ, ভাল করে নরক গুলজার কর। তা দেখ ছানু আমার একটা জরুরি মিটিং আছে যে।

ছানু। জগাদা, আপনি যে বলেছিলেন মানে আমাদের সেই চাকরি—

জগাদা। চাকরি! কিসের চাকরি বল তো?

মদন। বারে এরি মধ্যে ভুলে গেছেন! ভোটের আগে বললেন, ভোটে আমাকে জিতিয়ে দাও, আমি তোমাদের সব্বার চাকরি করে দেব।

জগাদা। ও চাকরি, না? হ্যাঁ হবে, নিশ্চয় হবে! সবার চাকরি হবে। আচ্ছা ছানু, আমার মিটিং বোধ হয় শুরু হয়ে গেল। পরে কথা বলব।

পল্টন। পরে পরে করে তো ছমাস গন ফটাশ হয়ে গেল বাবা—

মদন। এদিকে যে বাবা সমিতির রান্না ঘরে ক্লোজার নোটিশ টাঙিয়ে দিয়েছে।

ছানু। আপনি যদি একটু চেষ্টা করেন জগাদা, তাহলে ঠিকই হয়ে যায়, মানে আপনার তো অনেক সোর্স।

জগাদা। এই দেখ, তোমরা ভাবছ আমি চেষ্টা করছি না, চেষ্টা আমি ঠিকই করছি। তবে কি জান—এই মরেছে পাঁচটা দশ! আমি এখন চলি ভাই—

পল্টন। মদনা, এক পাও এগুতে দিবিনা, আজ একটা হেস্তনেস্ত করে তবে ছাড়বি।

জগাদা। না না এসব কি কথা, তোমরা কি দল বেঁধে—

পল্টন। আজ্ঞে হ্যাঁ, দল বেঁধে আপনাকে জেতানো হয়েছে। কি রে হয়নি?

মদন। আলবাৎ, রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করে—বোমা, পিস্তল, ছোরা, ডান্ডা—এমনকি প্রাণের মায়া পর্যন্ত করিনি।

পল্টন। কিরে ছানু, তুই যে একেবারে মেনি বেড়াল হয়ে গেলি। গলায় বাঁশ ঢুকেছে নাকিরে শালা?

ছানু। না মানে আমরা সবাই মিলে সিনসিয়ারলি আপনাকে জিতিয়েছি, আপনার ক্যালিবার নয়।

জগাদা। এই দেখ আমি তো বলছি তোমরা না থাকলে আমার একটু অসুবিধে হত বৈকি।

মদন। একটু নয়, হেরে একেবারে ভূত হয়ে যেতেন।

পল্টন। তখন চা, ডিমসেদ্ধ, ঘুগনি, সিনেমা দেখার পয়সা, চাকরি দেবার আশা কিছুই তো বাদ পেত না। আর আজ ভোটে জিতে যেহেতু আমরা শালা ছেঁড়া চটি জুতো হয়ে গেলাম না?

জগাদা। তা তুমি অত গরম হচ্ছ কেন হে ছোকরা?

পল্টন। এই, ছোকরা টোকরা বলবেন না বলে দিচ্ছি!

জগাদা। এই দেখ, তুমি রেগে যাচ্ছ বাবা—মানে তোমার নামটা ঠিক—

ছানু। আজ্ঞে ওর নাম পল্টন—

জগাদা। হ্যাঁ হ্যাঁ লণ্ঠন—

ছানু। লণ্ঠন নয় জগাদা, পল্টন—

ছানু। তা দেখ বাবা পল্টন চাকরির বাজার তো দেখছ।

মদন। ওসব বাজার টাজার জাহান্নামে যাক। আপনি বলেছিলেন চাকরি দেবেন, এখন চাকরি দিন।

জগাদা। আহা চাকরি তো আর গাছে ঝুলছে না যে পেড়ে পেড়ে তোমাদের একটা একটা করে বিলিয়ে দেব।

মদন। ভোটের আগে আপনার কথা শুনে মনে হয়েছিল, যেন চাকরি আপনার পকেটে আছে। জিতে গেলেই লজেন্সের মতো এক একটা বিলিয়ে দেবেন।

ছানু। এই মদন মাথা গরম কচ্ছিস কেন?

জগাদা। না না ছানু, তুমি দেখ, আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছে!

মদন। আজ্ঞে না, ঠাট্টা করছি।

ছানু। আঃ মদন, কি হচ্ছে কি?

পল্টন। চুপ করে থাকবি ছানু! তোর ইচ্ছে হয় তুই পা চাটগে যা। শালা চামচে কোথাকার। আজ হয় এস্পার—না হয় ওস্পার—

জগাদা। এস্পার—ওস্পার! মানে তোমরা আমাকে চোখ রাঙাচ্ছ?

মদন। কোনো কথা নয়, চাকরি দেবেন কিনা বলুন?

জগাদা। তোমরা আমাকে উত্তেজিত করে তুলছ কিন্তু।

ছানু। আমি বলি কি জগাদার যখন তাড়া আছে বলছেন, তখন না হয় ওনার বাড়িতে গিয়ে—

পল্টন। ছানুটার মুখে একটা কাপড় গুঁজে দে তো মদনা—

মদন। ভোটের আগে খালি লম্বা লম্বা বাত। বড় বড় বুকনি। [জগাদার গলার অনুকরণে] ভাইসব, তোমরা আমাকে ভোট দাও। আমি তোমাদের সর্ব দুঃখ হরণের মাদুলি বানিয়ে দোব। সাতদিনের মধ্যে চমৎকার ফল পাওয়া যাবে। বিফলে ভোট ফেরত পাইবে।

জগাদা। দেখ আমাকে রাগিও না। আমার বেলাড পেসার আছে কিন্তু।

মদন। নিকুচি করেছে আপনার বেলাড পেসারের, শালা, চশমখোর কোথাকার।

জগাদা। এই গালাগালি দেবে না বলছি। আমি তো বলেছি, দেশের জনগণের কাছে বলেছি, মনুমেন্টের তলায় দাঁড়িয়ে মাইক ফাটিয়ে বলেছি, দেশের এই বেকার সমস্যার কথা আমি অ্যাসেম্বলিতে তুলে ফাইট করব।

পল্টন। অ্যাসেম্বলিতে তো আপনারা যান চেয়ার টেবিল ভাঙতে, পচা ডিম ছুঁড়তে, বেড়ালের ডাক ডাকতে।

মদন। শালারা জনগণের প্রতিনিধি—

জগাদা। এই মাইরি গালাগালি দিওনা। ডাক্তার বলেছে, আমার উত্তেজনা একদম বারণ। ভোটের রেজাল্ বেরুবার এক ঘন্টা আগে আমার ফারাম এসটোক হয়ে গেছে কিন্তু।

পল্টন। কোনো কথা নয়, শুনে রাখুন জগবন্ধু চক্রবর্তী এম. এল. এ. মশাই, চাকরি করে দিতে পারেন তো ভাল; না হলে চুরি ডাকাতি, ছেনতাই শুরু হলে তখন আর দোষ দেবেন না। আর সেগুলো শুরু হবে আপনাদের মতো রায়সাহেবদের দিয়ে বউনি করে।

জগাদা। তার মানে তোমরা আমার বাড়িতে ডাকাতি করবে?

ছানু। না না, পল্টন বলতে চায়—

মদন। চুপ, তুই একটাও কথা বলবি না।

পল্টন। হ্যাঁ ডাকাতি করব। তুমি মিটিং করে দেশ উদ্ধার করবে আর আমরা না খেয়ে তোমার নাম গান করব নাকি?

জগাদা। আরে আমাকে 'তুমি' বলছ? মাতা ধরিত্রী যে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে রে—

পল্টন। তার আগে তোমাকে চৌচির করব, তবেই আমার নাম পল্টন। এই, চলে আয়। এই শালা চামচেকে নিয়ে আয়। [প্রস্থান]

মদন। ফিরে শালা চল, পায়ে বিষফোড়া হল নাকি।

[মদন ও ছানুর প্রস্থান]

জগাদা। অপমান! আমাকে অপমান করে গেল! ওরে এত অধম্মো সহ্য হবে

না! ধম্মো এখনো রসাতলে যায়নি। এখনো চন্দ্র উঠছে। সূর্য উঠছে। দিনরাত্তির হচ্ছে।

[জগাদা প্রস্থান করে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যপাশ দিয়ে গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করে বুটে, ছানু, মদনের মধ্যে যে কোনো দুজন। দুজনের গলায় দুটো লাল উড়ুনি]

ধর্ম নেইরে, ধর্ম কোথায়, ধর্ম নেইরে নেই,
ধর্ম এখন পণ্য দাদা দাঁড়ি পাল্লাতেই।
ওজন করে কিলো দরে ধর্ম বিক্রি হচ্ছে,
স্বর্গে যাবার টিকিট তারা টাকার বদল দিচ্ছে।
যে ধর্ম জ্বেলেছিল অন্ধকারে আলো,
বলতে পারো সেই ধর্ম কোথায় চলে গেল?
[এখন] ধর্মে ধর্মে যুদ্ধ হচ্ছে বাজছে রণবাদ্য,
ধর্ম এখন খাদক দাদা, আমরা হলাম খাদ্য—

[প্রবেশ করে বুটে, এখন ১ম ধার্মিক]

১ম ধার্মিক। শোনো শোনো ভক্তগণ শোনো দিয়ে মন।
ধর্মের মাহাত্ম্য কিছু করিব বর্ণন॥
পৃথিবীর মধ্যে বহু ধর্ম আছে জানি।
তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম মোর ধর্মখানি॥
এই ধর্ম মেনে চল দুঃখ নাহি রবে।
রোগ শোক অর্থকষ্ট কিছু নাহি হবে॥
এই ধর্ম হয় শোনো জগতের সার।
এই কথা যে ভুলিবে রক্ষা নাহি তার॥

[২য় ধার্মিক হয়ে পল্টনের প্রবেশ]

২য় ধার্মিক। আহা মুস্কিল আসান হবে মোর ধর্ম নাও [ধুয়া]
যেই জনা মোর ধর্ম করিবে গ্রহণ।
এন্তেকালে বেহেস্তে সে করিবে গমন॥ [ধুয়া]
[ঐ] মূর্তি গড়ে যারা বাবা পুতুল পুজো করে।
তাদের ধর্ম নিলে পরে দুঃখ এসে ধরে॥ [ধুয়া]
[ঐ] ঈশ্বর যে এক বাবা বহু নাহি হয়।
বহু দেবতার পুজো শাস্ত্রে নাহি কয়॥ [ধুয়া]

১ম। ওরে ঐ হাঁদার হাঁদা, গাধার গাধা, এলি কি তুই মরতে।
পারবি কি তুই আমার সাথে কবির লড়াই লড়তে॥

২য়। পারি কি না পারি তাই দেখবে সবাই, আসর হবে মাত।
লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যাবি হবি কুপোকাত॥

১ম। আমার ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম নেইকো এতে ভুল।
যতই কেন এদের কাছে দিয়ে যা না গুল॥

২য়। বেশি কথা বললে পরে করব না তো সহ্য।
এক চড়েতে মহাশূন্যে হয়ে যাবি উহ্য।।
১ম। [ওরে] শালার ব্যাটা নাককাটা মগজে নেই ঘি।
আমার ধর্ম কত প্রাচীন সেটা জানিস কি।।
২য়। সে সব জেনে কচু হবে আসল হল স্বার্থ।
সেটা তুইও চাস, আমিও চাই, চাইনা পরমার্থ।।
[কীর্তনের সুর]
১ম। করুণানিধান প্রভু শোন দুঃখহারি
এই ব্যাটা দেখছি যে ভীষণ আনাড়ি।
[ব্যাটা কথা বোঝে না
ব্যাটার মাথায় গোবর আছে,
ব্যাটা কোনো কথা বোঝে না]
আর শোনো যত আছ, আমার ভক্তজন
এই ব্যাটার ধর্ম যদি করগো গ্রহণ।
মাথাটি নেড়া করে ঘোল ঢালাব
বাপের নাম আমি ভুলিয়ে ছাড়াব।।
২য়। আমি ছেড়ে দেব কি [২ বার]
আমার ধর্ম না নিলে পরে আমি তোদের ছেড়ে দেব কি
কিলিয়ে কাঁঠাল পাকিয়ে দেব, আমি তোদের ছেড়ে দেব কি।
১ম। তুই ম্লেচ্ছ— [প্রস্থান]
২য়। তুই কাফের— [প্রস্থান]
মদন। ধর্মের সঙ্গে ধর্মের সংঘাত।
ছানু। মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের সংঘাত।
মদন। পল্টনের বাবা চেয়েছিল রেহাই পেতে, কিন্তু সে রেহাই পায়নি।
ছানু। ছানু চেয়েছিল বেঁচে থাকতে, কিন্তু তাকে বেঁচে থাকতে দেওয়া হয়নি।
মদন। পল্টন চেয়েছিল বড় হতে কিন্তু তাকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল নিচে—অনেক নিচে—হয়তো নরকের অন্ধকূপে।
ছানু। শতাব্দীর পদাবলীতে শুরু হল মাথুরের বিরহ।
[তারপর "ধর্ম নেইরে ধর্ম কোথায়...." গানটা উভয়ে গাইতে গাইতে প্রস্থান করে। অন্যধার দিয়ে প্রচন্ড রেগে যেন ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে পল্টন]
পল্টন। আবার বড় বড় বাত ঝাড়ছে শালা। শালা আমার বাবাগিরি ফলাতে এসেছে। বড় বড় বুলি কপচাতে শিখেছে।
[বাবার প্রবেশ]
বাবা। সতী ওকে চুপ করতে বল।
[সতী যেন ঘরের মধ্যে আছে]

পল্টন। ও একেবারে নবাব বাহাদুর হুকুম চালাচ্ছেন—

বাবা। হ্যাঁ হ্যাঁ হুকুম চালাচ্ছি। শুধু হুকুম নয়, দরকার হলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব।

পল্টন। কোন শালা আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারে? আমার যা ইচ্ছে তাই করব। তুমি আমায় খেতে দাও যে বড় বড় বুকনি দিচ্ছ।....ঘরে একটা সোমত্ত মেয়ে আছে। তাই লেখাপড়া শেখাতে পারব না। বড় বাজারের ষাঁড়কে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে পারব না। এখন তো সেই ষাঁড়কে আর বসিয়ে খাওয়াতে হয় না। লেখাপড়া সে তো শ্মশানের চিতায় উঠিয়ে দিয়ে এসেছে। এখন এ ষাঁড় আর তোমার চোখ রাঙানির ধার ধারে না। বরং সুযোগ পেলে গুঁতিয়ে দেবে।....আমার খুশি আমি মদ খাব। মাগীবাজী করব। ফূর্তি করব। কোনো শালার বাবার পয়সায় করি না।

বাবা। হতভাগা শেষে তুই একটা জানোয়ার তৈরি হলি—

পল্টন। জন্ম দেবার সময় এই কথাটা মনে রাখলে ভাল হত না বাবা।

বাবা। পল্টন—!

পল্টন। কেন মিছিমিছি খেপছ মাইরি। চুরি করি, ডাকাতি করি, যেখান থেকে পারি গেলবার পয়সা তো ঠিক যুগিয়ে যাচ্ছি।—

বাবা। তোর গুন্ডামির পয়সায় আমি পেচ্ছাব করে দিই। তুই বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে।

পল্টন। তাই নাকি? সত্যি গেলে পেটে যে হুড়কো মেরে বসে থাকতে হবে। চাকরি থেকে রিটায়ার করে আর তো কিছু করনি, খালি ঐ গঙ্গার ঘাটে গাঁজা খেতে শিখেছ—সেই গাঁজার পয়সা তাহলে জুটবে কোত্থেকে?

বাবা। যেখান থেকে জুটুক। তুই একেবারে চলে যা। আমার কাকেও চাই না। কাকেও না।

পল্টন। আমি একেবারে চলে গেলে বাড়িওলাও যে হড়কে দেবে বাবা। তখন থাকবে কোথায়? খাবে কি? তোমার ওই সোমত্ত মেয়ের রোজগারে নাকি?

বাবা। পল্টন! হ্যাঁ তাই তো আমার কপালে লিখেছে। তাই যে আমায় খেতে হবে। তুইতো গুন্ডা হয়েছিস। আমার মেয়ে—সে না হয় বেশ্যা হবে! [যেতে গিয়ে দাঁড়াবে] পল্টন, তোর মনে পড়ে তোর বোনকে তুই কত ভালবাসতিস। তাকে নিজের হাতে করে না খাইয়ে তুই যে কখনো তৃপ্তি পাসনি পল্টন। সতীকে কেউ বকলে তুই তার ওপর রাগ করতিস। কেউ মারলে তার সঙ্গে ঝগড়া করতিস। নিজে জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে তুই সতীর জন্যে পুতুল কিনে নিয়ে এসেছিস। সে যে তোর একমাত্র বোন—বড় আদরের বোনরে পল্টন। ওর মা ওর নাম রেখেছিল দুর্গা। স্কুলে ভর্তি করবার সময় তুই যে নাম পাল্টে ওর নাম রাখলি সতী। পল্টন, কেন কেন? [প্রস্থান]

পল্টন। কিন্তু কেন, কেনর জবাব আজকে দেবে কে?
মানুষ হতে চেয়েছিল মানুষ হতে পারল না তো সে।
রেখেছিল অনেক আশা গভীর বুকে এঁকে।
সোজা পথে চলতে গেল, পথটা গেল বেঁকে।
কুঁচবরণ কন্যা যে গো, মেঘবরণ কেশ,
চাইনি পেতে তাকে কিংবা সোনায় মোড়া দেশ।
বাঁচার মতো বেঁচে থাকা একটু আলোর রেখা,
একটি শুধু শান্তির নীড় দুচোখ ভরে দেখা।
স্বপ্ন সে যে স্বপ্ন শুধু সফল হল না,
বেঁচে থাকাই সার হল তার মানুষ হল না।
কিন্তু কেন, কেনর জবাব আজকে দেবে কে?
আমরা সবাই হয়েছি আজ অসম্ভবের সে। [প্রস্থান]

নেপথ্যে। ইউ আর রাইট মাই বয়েজ, আজ সমস্ত পৃথিবীটা জুড়ে এই কেনর উত্তর খোঁজা চলছে। তবু এই কেন সৃষ্টিকারী নায়কের দল আজও আমাদের উপর শোষণের কষাঘাত চালিয়ে যাচ্ছে অবিশ্রান্তভাবে। সেই বাস্তবের হবু রাজা, গবু মন্ত্রীর দল নিজেদের সঙ্গে আমাদেরও এগিয়ে নিয়ে চলল মৃত্যুর কারখানায়।

[প্রবেশ করে হবু ও গবু। এই দৃশ্যের অভিনেতারা মদন, বুটে, ছানু ও বাবার মধ্যে যে কেউ যে কোনোটা করতে পারে। তবে শ্রমাধিপতি পল্টন করবে]

হবু। অ্যাসিসটেন্ট গবু, আমার রাজ্যে বেকার সমস্যার সমাধান হয়েছে?

গবু। নিশ্চয় স্যার, আপনি জনগণের প্রতিনিধি হয়ে এই সিংহাসনে আরোহণ করার পর—আপনার নিকটাত্মীয়, দূরাত্মীয়, ঊর্ধ্বাত্মীয় ও নিম্নাত্মীয় প্রত্যেকেই এমনকি আমার খুল্লতাত-ভ্রাতা, ভাগিনেয়-জামাতৃ সকলেই বিভিন্ন পদে অভিষিক্ত হয়েছেন।

হবু। রাজ্যে আর বেকার আছে?

গবু। অর্ডিনারি পিপল আই মিন সাধারণ জনতা ব্যতীত আর কেউই বেকার নেই স্যার।

হবু। এখুনি নিচ্ছি স্যার, আরে আসুন আসুন শ্রমাধিপতি। আপনার চরণধূলির স্পর্শ পেয়ে আজ রাজকোয়ার্টার ধন্য হল।

শ্রম। আমি রাজ্যের শ্রমিকদের রক্ত শোষণ করে সেই রক্ত জমিয়ে এক মনোরম প্রাসাদ তৈরি করেছি। সেই প্রাসাদের দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য আমি মিঃ হবুকে নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছি। আর সঙ্গে এনেছি এই উপঢৌকনটি।

হবু। বাঃ চমৎকার। চমৎকার।

শ্রম। শ্রমজীবীদের কঙ্কাল দিয়ে এটি তৈরি করা হয়েছে।

হবু। অ্যাসিসটেন্ট গবু, তুমি শ্রমাধিপতির রাজভোগের বরাদ্দ বাড়িয়ে দাও।

গবু। স্যার, ওনারি কৃপায় আপনি এই পোস্ট পেয়েছেন। আমি আপনার অ্যাসিসটেন্ট

হয়েছি। উনি ইচ্ছা করলে আজই অন্য ব্যক্তিকে এই সিংহাসনে বসিয়ে আমাদের অপসারিত করতে পারেন। ওনার রাজভোগের বরাদ্দ বৃদ্ধি করার ক্ষমতা আমাদের নেই স্যার।

হবু। অ্যাসিসটেন্ট গবু তবে তুমি শ্রমাধিপতিকে বল উনি যেন তোমার ও আমার রাজভোগের বরাদ্দ বাড়িয়ে দেন।

[হবু ও গবুর প্রস্থান। শ্রমাধিপতি হাসতে থাকে। নেপথ্যে কে যেন পড়া মুখস্ত করছে]

নেপথ্যে। তিন কোটি বৎসরের অধ্যবসায়ের ফলে যাহারা অন্যান্য প্রাণিজগত হইতে নিজেদের আলাদা করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই মানুষই ধ্বংস হইয়া গেল।

[পল্টন ঘোরে]

পল্টন। এ আমার নিজের কথা নয়। আপনার কথা নয়। এ যেন ইতিহাসের ভবিতব্যের কথা।

[প্রবেশ করে মদন]

মদন। কিন্তু এটাই কি ভবিতব্য? ইতিহাসকে কি অন্য কোনো ভাবে, অন্য কোনো উপায়ে তৈরি করা যায় না? আমাদের ভবিষ্যত ইতিহাস কি ঘোষণা করতে পারে না পৃথিবীতে মানুষ নামে যারা বাস করে তারা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী। তারা বাঁচতে চেয়েছিল, তারা বেঁচেছে। সত্যকারের বাঁচার পথ একমাত্র তারাই জেনেছে।....কিন্তু কে পাল্টে দেবে ইতিহাসের এই অমোঘ গতি? কে বলবে মানুষ কোনো দিন কিংবদন্তীর উপকথায় পরিণত হবে না? তাই আজও পল্টনের দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

পল্টন। হ্যাঁ আমার চোখ দুটো এখনো জ্বালা করে। চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। আমি জানি এ জল কান্নার জল নয়, এ জল যন্ত্রণার জল। ওরা যেদিন নাগাসাকি, হিরোসিমা ধ্বংস করল সেদিনের বিষাক্ত ধোঁয়ায় আমায় চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল। যেদিন আফ্রিকায়, ল্যাটিন আমেরিকায়, পূর্ব এশিয়ায় মুক্তি যোদ্ধাদের নির্মমভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল সেদিনও আমার চোখ দুটো জ্বালা করে উঠেছিল যন্ত্রণায়।

মদন। ঘুমোতে পারিনি, কতকাল আমি ঘুমোতে পারিনি। পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছি আর চমকে চমকে উঠেছি। দেখছি দাউ দাউ করে পৃথিবীটা জ্বলছে। দাবানল ছড়িয়ে পড়ছে বিষুবরেখা থেকে উত্তর মেরুতে—দক্ষিণ মেরুতে। পালাবার পথ পাইনি, ঘুমোবার সময় পাইনি।

নেপথ্যে। আয় ঘুম আয়রে। সোনার কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা রে। মাছ কুটলে মুড়ো দেব, ধান ভানলে কুঁড়ো দেব, কালো গরুর দুধ দেব, সোনার কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা রে।

মদন। আমি ঘুমোতে চাইলাম, ক্লান্ত দেহে অবসন্ন চিত্তে চাইলাম একটু শান্তির বিশ্রাম।

পল্টন। কিন্তু বিশ্রাম কোথায়? পৃথিবী জুড়ে যে দাবদাহ শুরু হয়েছে তার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে বিশ্রাম যে অলীক স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়।

মদন। বিজ্ঞানীদের উন্মত্ত চিৎকার আকাশ কেঁপে উঠল।

পল্টন। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য আবিষ্কারের বিস্ফোরণে বাতাস কেঁদে উঠল।

মদন। শুরু হল বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের উন্মত্ত প্রতিযোগিতা।

পল্টন। শুরু হল বীভৎস জিঘাংসায় বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের সংঘাত।

[প্রবেশ করে বুটে অথবা ছানু]

॥ বিজ্ঞানীর গান ॥

ছানু। আহা শুনুন শুনুন দাদা শুনুন সবাই।
বিজ্ঞানীর কীর্তি কথা কিছু বলে যাই॥

ম,প। আহা শুনুন শুনুন দাদা করি নিবেদন।
বিজ্ঞানের কীর্তিকথা অমৃত কথন॥

পল্টন। বিজ্ঞানী হইয়া মোরা যত কিছু গড়ি॥
তার চেয়ে বেশি দাদা ধ্বংস চেষ্টা করি॥

মদন। যার যত গুলি আছে, আছে বোমা তাজা।
পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ সেই, সেই মহারাজা॥

ছানু। সকলেই তাকে দেখে ভক্তি করে চলে।
পুজো দেয়, তেল দেয়, তার পদতলে॥

পল্টন। পৃথিবীতে আছে দেখ কয় বৃহৎ শক্তি।
আমরা বিজ্ঞানী তার পাই সবার ভক্তি॥

মদন। চাঁদের দেশেতে আমি মানুষ পাঠাই।
সোনার অক্ষরে মোর নাম লেখ ভাই॥
তাই আমি বিজ্ঞানীর মধ্যে মহাশ্রেষ্ঠ।
আর যত আছ সব দারুণ নিকৃষ্ট॥

ছানু। চাঁদ থেকে বহুদূরে গ্রহ সে মঙ্গলে।
রকেট গিয়েছে মোর শুধু বুদ্ধিবলে॥
তাহলেই আমি শ্রেষ্ঠ ভুল এতে নাই।
মিছি মিছি মূর্খ ব্যাটা করে যে বড়াই॥

পল্টন। আমাদের কাজ কিছু প্রকাশ্যে না হয়।
গোপনেতে কাজ সারি গোপনেতেই রয়॥
কেবা শ্রেষ্ঠ কে নিকৃষ্ট বোঝা যাবে পরে।
[তবে] চেঁচামেচি করলে মুন্ডু থাকবে না তো ধড়ে॥

মদন। এক ঘন্টা সময় মাত্র হাতে যদি পাই।
আমার ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে পৃথিবী ওড়াই॥

ছানু। এক মিনিট সময় মাত্র ঘন্টা কোন ছার।
তাতেই পৃথিবী আমি করি যে ছারখার॥

পল্টন। ঘন্টা মিনিট নয় সেকেন্ডেই জানি।
পৃথিবীটা ধ্বংস করতে পারে এ বিজ্ঞানী॥

মদন। আমি শ্রেষ্ঠ

ছানু। আমি শ্রেষ্ঠ

পল্টন। আমি শ্রেষ্ঠ দাদা।

মদন। বুদ্ধি নেই

ছানু। শুদ্ধি নেই

পল্টন। ব্যাটা হল হাঁদা।

[সবার প্রস্থান পল্টন ছাড়া]

পল্টন। আমি পল্টন। আমরা মানুষ। মনুষ্যত্বহীন জীবনেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম। আমি জগাদাকে খুন করলাম। ছানুকে খুন করলাম। আমার বোন সতী দেহের ব্যবসা শিখল। আমার বাবা শয়তানের চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। কারো কোনো অস্পষ্টতা নেই, কোনো আড়ষ্টতা নেই, কোনো দ্বিধা নেই।

[মদন প্রবেশ করে]

মদন। দুশো কোটি বছরের পৃথিবীতে কয়েক লক্ষ বছরের মানুষের, কয়েক হাজার বছরের সভ্যতা, কয়েক শতাব্দীর মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

[বাবার প্রবেশ]

বাবা। ছানু...ছানু...কোথায় গেলি। ভাত যে ঠান্ডা হয়ে গেল বাবা। ছানু...ছানু....

পল্টন। আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধার্মিক। আমার ধর্মই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার ধর্ম গ্রহণ না করলে তোমাদের স্থাপত্য ভাস্কর্য, সাহিত্য সব ধ্বংস করব।

মদন। আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। আমি এই পৃথিবীকে এক ঘন্টায়, এক মিনিটে, এক সেকেন্ডে ধ্বংস করতে পারি।

পল্টন। আমার প্রাসাদ তৈরির জন্য রক্তের প্রয়োজন। আমাকে আরও রক্ত দাও।

বাবা। ধর্ম, বিজ্ঞান, রক্ত, মানুষ। জান, আমার একটা ছেলে ছিল। তার নাম ছিল পল্টন। সে বলেছিল ডাক্তার হবে। বড় হবে। কিন্তু সে গুন্ডা হল, খুনী হল। পুলিশের গুলিতে একদিন মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়ল, আর উঠল না।

পল্টন। ধর্ম, বিজ্ঞান, রক্ত, মানুষ।

বাবা। আমার একটা মেয়ে ছিল। তার নাম ছিল সতী। দেহের ব্যবসায় সতীত্ব বিলিয়ে দিয়ে আজ সে রোগের যন্ত্রণায় মৃত্যু প্রতীক্ষায় দিন গুণছে।

পল্টন। ধর্ম, বিজ্ঞান, রক্ত, মানুষ।

[ছানুর প্রবেশ]

ছানু। বুটে, বুটে, জগাদা খুন হয়ে গেছে বুটে। আমাকে বাঁচা বুটে। ঐ পল্টন আর মদন আমাকে শেষ করে দেবে। তুই তো জানিস আমি কোনো পার্টি

করি না, আমি কোনো কথা কাকেও লাগাইনি। ওরা আমাকে ভুল বুঝেছে। [যেন পল্টন আসছে দেখে]....না...না...

[এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়ায়]

পল্টন। ধর্ম, বিজ্ঞান, রক্ত, মানুষ।

বাবা। এত বড় একটা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। যদি একটা বোমা মেরে গোটা পৃথিবীটা কেউ ধ্বংস করে দিত, কিংবা যদি হাজার হাজার ভিসুভিয়াস এক সঙ্গে গর্জে উঠত তাহলে কিন্তু তিল তিল করে আমাদের মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করতে হত না। গ্যাংগ্রিনের মতো সমস্ত দেহটা পঁচে গেল, বিষিয়ে গেল। আমরা শুধু অসহায় দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলাম আমাদের খসে যাওয়া আঙুলগুলোর দিকে।

[এরা ভোট প্রার্থী হয়ে যায়]

মদন। আমাকে ভোট দিন। আমি শান্তির চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করে দেব।

পল্টন। আমাকে ভোট দিন। আমি সব দুঃখ-দারিদ্র মিটিয়ে দেব।

ছানু। আমাকে ভোট দিন। আমি প্রত্যেককে রাজা করে দেব।

মদন। ওকে ভোট দেবেন না। ও ভেজাল ওষুধের কারবারী।

পল্টন। ওকে ভোট দেবেন না। ও ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার।

ছানু। ওকে ভোট দেবেন না। ও চরিত্রহীন।

মদন। আমাকে ভোট দাও—

পল্টন। আমাকে ভোট দাও—

ছানু। আমাকে ভোট দাও—

বাবা [চিৎকার করে উঠে]। না—না—না—

[সবাই নিশ্চল হয়ে যায়]

নেপথ্যে। আমরা পৃথিবীর মানুষ তোদের প্রশ্ন করছি কিসের লোভ, কিসের আকাঙ্ক্ষায় আমরা আমাদের মনুষ্যত্বকে হারিয়ে ফেলছি? রাজা দায়ী?

পল্টন। এর জন্য দায়ী কে? কেন আমরা বিবেককে দুপায়ে পিষে মাড়িয়ে ফেলছি? মন্ত্রী দায়ী?

ছানু। এর জন্য দায়ী কে? কেন আমরা জন্তুর চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছি? প্রজা দায়ী?

বাবা। এর জন্য দায়ী কে? রাজা দায়ী, মন্ত্রী দায়ী, প্রজা দায়ী?

সবাই। এর জন্য দায়ী আমরা—দায়ী তোমরা।

[আলো নেভে। বাজনা। আলো জ্বললে দেখব নাটক শুরুর সময় সবাই যে যেভাবে ছিল, সেই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে]

প্রফেসর। ইয়েস মাই বয়েজ, এমনি করে মানুষ এগিয়ে চলল ধ্বংসের পথে। কিন্তু আমরা বেঁচে থাকতে চাই। আজকের বিভিন্ন সমস্যার চাপে, বিভিন্ন মতবাদের

বিভ্রান্তিতে আমরা হারিয়ে যাচ্ছি বটে, কিন্তু এমন একদিন আসবে যেদিন সত্যিকারের বাঁচার পথ আমরা খুঁজে বার করবই। কারণ যেদিন ধ্বংস হতে চাইনা।

সবাই। হ্যাঁ তবু আমরা ধ্বংস হতে চাই না।

মদন। আমাদের প্রত্যেককে সেই পথ খুঁজে বার করতে হবে। আমাদের দেখতে হবে সেই পথের সন্ধান আজকের বিভ্রান্তির মধ্যে আছে কিনা, আজকের ক্ষয়িষ্ণু সমাজের মধ্যে আছে কিনা; আজকের ক্ষিপ্ত, দুর্বার প্রচন্ড যৌবনের মধ্যে আছে কিনা? আমরা তো দেখতে পাচ্ছি শোষক শ্রেণী আর পুরোন কায়দায় শোষণ করতে পারছে না। বার বার তাদের শোষণের পদ্ধতি পাল্টাচ্ছে। তাদের শোষণ যন্ত্র চালু রাখতে তারাও আজ দিকভ্রান্ত, উন্মত্ত।

পল্টন। তাহলে সেদিন আর বেশি দূরে নয়, যেদিন সমস্ত শোষিতেরা একসঙ্গে এই শোষণতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবে।

ছানু। জেহাদ ঘোষণা করবে ঐ স্বার্থান্বেষী ধর্মের বিরুদ্ধে, মারণপ্রয়াসী বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে।

বুটে। জেহাদ ঘোষণা করবে যারা আমাদের নিয়ে পুতুল নাচের মতো নাচাচ্ছে সেই বাজীকরদের বিরুদ্ধে।

প্রফেসর। সেদিন শতাব্দীর পদাবলী মাথুরের বিরহে শেষ হবে না। সেদিন শতাব্দীর পদাবলী গাইবে মিলনের গান, বেঁচে থাকার আহ্বান, সংগ্রামের জন্যে শপথ।

[সবাই শপথের জন্যে হাত তোলে। নেপথ্যে হতে ভেসে আসে কোনো সংগ্রামী গান। পর্দা পড়ে]

অশ্বত্থামা

মনোজ মিত্র

চরিত্রলিপি

কৃপাচার্য
কৃতবর্মা
অশ্বত্থামা

[তখন গোধূলিবেলা। দিগন্তে উজ্জ্বল হলুদ আলো। প্রান্তরের মাঝখানে একটি যুদ্ধরথ দাঁড়িয়ে ছিল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অবস্থায়। রথচূড়ার ধ্বজাটি ছিল ভাঙা এবং অবনত। প্রান্তরে রথটিকে আগলে শিলাখণ্ডের উপর বসেছিল দুই রাজপুরুষ। মধ্যবয়সী বিপুলদেহী ধাতুনির্মিত শিরস্ত্রাণপরা ভোজরাজ কৃতবর্মা; এবং দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রুকেশমণ্ডিত সুপ্রবীণ আচার্য কৃপ। কৃপের বিস্ফারিত দৃষ্টি সম্মুখে দূরদূরান্তে স্থির, অনিমেষ। কৃতকর্মাও নীরব নিশ্চল, ভয়ার্ত। চরাচর নিঃশব্দ]

কৃপ [নিষ্কম্প শীতল গলায়]। সব গেছে....সব গেছে! কত অক্ষৌহিণী সেনা...হস্তী অশ্ব রথ কত শত...রথী মহারথী...বিপুল বাহিনী...নিঃশেষ! কৃতবর্মা, মহারাজা এখনো কি আশা করেন....

কৃত। হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করবেন...

কৃপ। ...এত বড় পতনের পরেও?

কৃত। মহারাজ পুনরায় সিংহাসনে বসবেন...

কৃপ। ভগ্নোরু মহারাজ সিংহাসনে বসে ভারতবর্ষ শাসন করবে! দুরন্ত বাসনা!

[কিয়ৎকাল উভয়ে নিশ্চুপ। তখন দিঙ্মণ্ডলের আলোকে অশ্বক্ষুরের পুঞ্জ পুঞ্জ ধূলি উড়ছিল...রাশি রাশি স্বর্ণচূর্ণ যেন। ক্ষুরধ্বনি শোনা যাচ্ছিল]

কৃত [উৎকর্ণ হয়ে]। ঐ! ঐ আসছে! [ক্ষুরধ্বনি ক্রমশ এগিয়ে আসছিল] আসছে! আসছে! [কিছু দূর ছুটে গিয়ে একটি অতিকায় শিলার উপর উঠে] ঐ! ঐ তো প্রান্তরে প্রবেশ করল!...তীর! তীর! নিক্ষিপ্ত তীরের মতো ছুটে আসছে। [দু হাত উত্তোলিত করে প্রবল আনন্দে] অশ্বত্থামা! অশ্বত্থামা!

কৃপ। অশ্বত্থামা!

কৃত। আসছে অশ্বত্থামা! অশ্বত্থামা! কাল সকালে আবার দামামা...হাঃ হাঃ...অস্ত্রে অস্ত্রে উঠবে ঝংকার...

কৃপ। ওঃ যুদ্ধের সাধ তোমাদের এখনো মিটল না কৃতবর্মা!

কৃত [শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে আর্ত স্নায়ুগুলিকে সতেজ করে]। ....অনন্ত সংগ্রাম! মহারাজ আমৃত্যু সংগ্রামে নেমেছেন। যতক্ষণ এতটুকু শ্বাস...ততক্ষণ প্রয়াস! জয় চাই...চাই বিজয়!

কৃপ। অষ্টাদশ দিন কুরুক্ষেত্রের পরেও তোমরা জয়ের স্বপ্ন দেখ...দেখতে পার! পরাজয় মেনে নাও কৃতকর্মা!

কৃত। হাহাকার করবেন না। মহারাজের আদেশ, হাহাকার বন্ধ করে আবার শত্রুকে আক্রমণ কর....

কৃপ। কী ভাবে....কী ভাবে করবে! আঠারো দিনের কুরুক্ষেত্রে সব শেষ...বিপুল বাহিনীর একটি প্রাণীও জীবিত নেই।...আছি মাত্র আমরা তিনজন...

কৃত। যথেষ্ট! যথেষ্ট! [অশ্বক্ষুরধ্বনি নিকটবর্তী] প্রাণশক্তি! প্রাণশক্তি! আহা ঘোড়া

তো নয়, উদ্দাম ঝড়...চার পায়ে প্রলয় নাচন...কৃতবর্মা, এবার একজনও বাঁচব না!

কৃত। মহারাজের আদেশ, আতঙ্ক ছড়াবেন না। মৃত্যুকে আমরা ডরাই না।

কৃপ। আমি ডরাই। ঐ একমাত্র ভাগিনেয় ছাড়া আমার যে আজ কেউ নেই কৃতকর্মা! ঐ অশ্বত্থামা....

কৃত। ভাগ্যবান! তবু একজন ভাগিনেয় আছে। কিন্তু মহারাজের! অত সব নামী দামী দিগ্বিজয়ী সেনাপতি...কোথায় তাঁরা...ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শল্য...শঙ্খনাদে দশদিক কাঁপিয়ে ছুটেছেন কুরুক্ষেত্রে...একজনও ফিরলেন না...! অশ্বত্থামা ছাড়া মহারাজ দুর্যোধনেরও আজ আর কেউ নেই!

কৃপ। একা অশ্বত্থামা কী করতে পারে?

কৃত। পৃথিবী উল্টে দিতে পারে, যা খুশি তাই করতে পারে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রতিদিন হাজার সৈন্যের মুন্ড একাই নামিয়েছে সে...হাঃ হাঃ, মহারাজের ইচ্ছা এবার অশ্বত্থামা হবে সেনাপতি...

কৃপ। সে কি! না, না, এবার ওকে নিষ্কৃতি দাও কৃতকর্মা...

কৃত। মহারাজের সাধে বাধা দেবেন না...

কৃপ। মহারাজকে নিরস্ত কর....

কৃত। মহারাজকে নিরস্ত করা যায় না। তিনি কখনো পরাজয় মানেননি...মানবেন না! [অশ্বত্থামার আগমন পথে তাকিয়ে] হ্রেষা! হ্রেষা! ঐ তার হ্রেষা শোনা যায়....

কৃপ। না। সর্বনাশ আর ঘটতে দেব না আমি...আমি অশ্বত্থামাকে নিবৃত্ত করব!

কৃত। মহাত্মা কৃপ, আপনি কি চান পরাজিত মহারাজ এই বিজন প্রান্তরে আমৃত্যু নির্বাসনে থাকবেন আর আমরা তাঁর পরাজিত সেনানী প্রেতের মতো চূর্ণ রথখানি আগলে যাব চিরকাল! গৌরব পুনরুদ্ধার করব না! হৃত সিংহাসন...

[ক্ষুরধ্বনি আরো নিকটে]

কৃপ [রথের মুখে এসে]। সুযোধন! সুযোধন!

কৃত [ক্ষিপ্র পায়ে কৃপের সম্মুখীন]। আচার্য কৃপ!

কৃপ। সুযোধন...আর যুদ্ধ নয়..

কৃত। মহারাজের আজ্ঞা, অশ্বত্থামা হবে সেনাপতি। যান, অভিষেকের আয়োজন করুন।

কৃপ। বৎস সুযোধন, আমি আবার বলছি...

কৃত। মনে রাখবেন, মহারাজ আপনার প্রতিটি কথা শুনছেন। অনেকক্ষণ থেকে তিনি আপনার প্রতিটি আচরণ লক্ষ্য করছেন। গুরুজন বলে তিনি আপনাকে কিছু বলতে পারছেন না। অযথা তাঁকে বাধ্যও করবেন না।

[কৃপ শিরে করাঘাত করতে করতে অন্তরালে গেল। ক্ষুরধ্বনি নিকট নেপথ্যে এসে থামল। আগন্তুক অশ্বারোহী ঢুকল। সর্বাঙ্গ ধূলিধূসর, চোখে বিমূঢ় দৃষ্টি। নইলে সে বড় সুন্দর সুঠাম তরুণ অশ্বত্থামা, রণসাজে সজ্জিত। হাতে বিশাল খড়্গ, ললাটে অত্যুজ্জ্বল মণি। অশ্বত্থামা রথের সামনে এসে বিহ্বল চোখে ভিতরে

তাকিয়ে থাকে। রথের মুখটা বেশ অনেকটা কোণাকুণি ফেরানো থাকায়, ঠিক অশ্বত্থামার ঐ জায়গাটিতে না দাঁড়ালে অভ্যন্তর কখনো দেখা যায় না]

অশ্ব [আর্তনাদে বিস্ফারিত হয়]। দুর্যোধন! মহারাজ!

কৃত। সসাগরা ধরিত্রীর একচ্ছত্র অধিপতি কুরুরাজ দুর্যোধন...

অশ্ব [অদ্ভুত গলায়]। কোথায় তোমার স্বর্ণমুকুট...রত্নের আভরণ! চির উন্নত ললাট! ওরে এমন করে আমার আকাশের সূর্যটাকে ছিঁড়ে নামাল কে?

[প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মতো অশ্বত্থামার কণ্ঠস্বর]

কৃত। মহারাজ আহত! মুমূর্ষ!

অশ্ব। কে? কে তুমি? তুমি দুর্যোধন! মহারাজ...আমার রাজাধিরাজ!...[বিপুল বেগে খড়্গটা ছুঁড়ে ফেলে আকাশের দিকে হাত তুলে] হা ঈশ্বর! আমাকে অন্ধ করে দাও!

[ভূমিতে আছড়ে পড়ে থরথর করে কাঁপে। কৃতকর্মা তার পিঠে হাত রাখে]

কৃত [অল্পক্ষণ নীরবতার পর]। দুঃসংবাদ পাওয়ার পর আমি দ্বিপ্রহরে এখানে এসে পৌঁছাই। কোথাও কেউ নেই...চারিদিক লন্ডভন্ড! রথখানি চুরমার! নিঝুম মধ্যাহ্নে! চারি দিকে খুঁজি...তারপর দেখি, ঐ...ওইখানে! মহারাজ দুর্যোধন! রক্তে কাদায় লুটিয়ে আছেন। যন্ত্রণায় তৃষ্ণায়...আমাকে দেখেও মাথা তুলতে পারছেন না...তখনি তোমার কাছে দূত পাঠাই অশ্বত্থামা....

অশ্ব [ধীরে ধীরে মুখ তোলে। দুচোখে তার আগুন ঝলসাচ্ছে]। আপনার দূত যখন গেল কৃতকর্মা, কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে তখন তান্ডব!

কৃত। অনুমান করেছিলাম তুমি যুদ্ধে মেতে আছ...

অশ্ব। যুদ্ধ...ঘনঘোর যুদ্ধ! [বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে] উড্ডীন খড়্গ! দেখেছে আজ শত্রুসেনা! কৃতকর্মা, আজো সহস্র পান্ডবসেনা...আর আমি...আমি একা! আঘাতে আঘাতে ছত্রখান করে দিচ্ছি। ওরা ছুটছে...পালাচ্ছে...মৃত্যুর ভয়ে কলরব করছে। তুমুল কলরব! পাখির কুলায় শিকারী বাজের হানা দেখেছেন কৃতবকর্মা! বাঁচাও...বাঁচাও...রক্ষা কর! একে একে একেকটি কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দিচ্ছি! সংহার...সংহার...দেব না বাঁচতে! [খড়্গটা জড়িয়ে গরগর হাসতে হাসতে—সহসা থেমে] এমন সময় আপনার দূত কৃতকর্মা...সর্বনাশের খবর বয়ে নিয়ে..

কৃত [দূতের মতো]। পঞ্চপান্ডবের আক্রমণে আত্মরক্ষা করতে মহারাজ দুর্যোধন আত্মগোপন করলেন কুরুক্ষেত্রের উত্তরে তিন যোজন পথ দূরে জনশূন্য প্রান্তরের হ্রদে। শত্রুরা সেখানে পর্যন্ত ধেয়ে এসে সবলে জল থেকে টেনে তুলে প্রান্তরের এক ভয়ানক গদাযুদ্ধে....

অশ্ব [খড়্গটা নাচাতে নাচাতে]। শুনতে পাইনি...প্রথমে তার কোনো কথাই কানে ঢুকছে না আমার। দারুণ ব্যস্ত তখন। ঐ মৃগপাল ধাওয়া করে ধরাশায়ী করতে! পিছন থেকে কে আমার খড়্গ টেনে ধরল...

কৃত। ...মহারাজের দুই উরু চূর্ণ...দুই জানু জর্জরিত...

অশ্ব। ...আমি তার কণ্ঠ চেপে বলি, কী...কী বলিসরে হতভাগা, সত্য করে বল্, কার পতন?...আরো...আরো প্রবল বেগে সে আমায় টানতে লাগল...

কৃত। ছিন্ন পর্বত! প্রবল গদাঘাতে মহারথী রথ থেকে ছিটকে পড়লেন....

অশ্ব। ...ওরে ছেড়ে দে ছেড়ে দে খড়্গ! মিথ্যা শোনাস না। ওরা সব যে বেঁচে যায়!...ভগ্নদূত দুই মুঠিতে বল্গা টেনে...[দম ছেড়ে]...আমার অশ্বের মুখ ঘোরাল!...হা হা হা—[হাহাকার করে অশ্বত্থামা] কে, কে ভাবতে পারে কৃতবকর্মা, যখন মহানন্দে শত্রুসেনার মুন্ডপাত করছি, তখন মাত্র তিন যোজন দূরে...ওরা আমার মেদিনী দীর্ণ করে দিয়েছে...আমার আকাশ ভেদ করেছে!

কৃত। অশ্বত্থামা, তোমার জন্যে রয়েছে এক বিরাট সুসংবাদ!

অশ্ব। সুসংবাদ!

কৃত [অশ্বত্থামার হাতে সুরা পাত্র দিয়ে]। কাল প্রাতে অশ্বত্থামা, তুমি হবে কৌরব সেনাপতি!

অশ্ব। কৌরব সেনাপতি!

কৃত। পঞ্চম কৌরব সেনাপতি! ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শল্য....অশ্বত্থামা! জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য! পঞ্চপান্ডবের বিজয়হাসি মুছে দিতে হবে অশ্বত্থামা ....চাই পঞ্চপান্ডবের চিন্ন শির—

[গোধূলি আলোক কী অদ্ভুত রেখায় চিকচিক করছিল অশ্বত্থামার চিবুকে। পানপাত্র হাতে সে রথের সামনে নতজানু হয়]

অশ্ব। আমায় ক্ষমা কর দুর্যোধন...

কৃত। ক্ষমা!

অশ্ব। ক্ষমা কর দুর্যোধন!...অযোগ্য...আমি তোমার সেনাপতির অযোগ্য! দুর্যোধন, আমি তোমাকে জয়ী করতে পারব না!

কৃত। কী বলছ তুমি অশ্বত্থামা।! বীরশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা...

অশ্ব। মহারাজ, আঠারো দিনে হাজার মানুষ মেরেছি। তারা কেঁদেছে—ছুটেছে—বাঁচাও বাঁচাও...বাঁচতে দিইনি! অথচ যাদের মারার কথা—সেই পঞ্চপান্ডব কিন্তু বেঁচে আছে! তারা জয়ী! মহারাজ লক্ষ্যটা ওরা ভেদ করেছে...আর আমি বীরশ্রেষ্ঠ...অলক্ষ্যে রক্ত ঝরিয়ে ঝরিয়ে...সহস্র ধারায় ঝরিয়ে ঝরিয়ে...দুর্যোধন, ক্ষমা কর।

কৃত। মহারাজ! [রথের মুখে ছুটে যায়] মহারাজ! অশ্বত্থামা কী বলছে! [রথের ভিতরে চাপা আর্তনাদ। রথটা কাঁপছে] অশ্বত্থামা, উম্মাদ হলে তুমি! মহারাজের আদেশ...! অশ্বত্থামা!

অশ্ব। অশ্বত্থামার বুক ভেঙে গেছে...এক নিদারুণ লুণ্ঠন সাঙ্গ হয়ে গেছে! এই দীর্ঘ পথ আসতে...ওঃ দুর্যোধন, পাহাড় পর্বত শূন্য শস্যক্ষেত্র অতিক্রম করতে করতে বারংবার শুনেছি প্রতিদিনের নিহত সৈনিক আমায় ব্যঙ্গ করছে, কেন আমাদের মারলে অশ্বত্থামা! দুর্যোধনকে রক্ষা করতে পারনি....তবে কেন মারলে। ওঃ সারাজীবন...সারা দীর্ঘ জীবন কাদের মারতে কাদের মারলাম!...আর কোনো আদেশ কর মহারাজ...

কৃত। আশ্চর্য কথা! অভিষেকের সব আয়োজন সম্পূর্ণ! আর শেষ মুহূর্তে তুমি...

অশ্ব। যদি বল অমৃত এনে দিতে, অশ্বত্থামা তাই এনে দেবে, সাগর মন্থন করে। মুক্তাছত্র চাই...তাই এনে দেব এই মুহূর্তে...নানা রঙের মনোহর ছত্র! এ শিলাভূমিতে তুমি কষ্ট পাও মহারাজ..প্রাসাদ গড়ে দেব এইখানে...এই দণ্ডে...তোমার অন্তিম আমি স্বর্গসুখে ভরে দেব...মহারাজ, পারব না শুধু ঐ সিংহাসন...

[রথে যন্ত্রণার বিলাপ বাড়ছে]

কৃত। মহারাজ! মহারাজ! শান্ত হোন।....অশ্বত্থামা, এ কী অদ্ভুত আচরণ তোমার!...তোমার আশায় মহারাজ এখনো জীবন ধরে আছেন...শুধু তোমার মুখের দিকে চেয়ে! আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে আজ মহারাজকে পুনরুজ্জীবিত করতে পার কেবল তুমি—আর তুমি কি না আজ....

অশ্ব। দুর্যোধন মহারাজ, তোমার পতন তুমি দেখছ না! কী বিপুল কী বিশাল! দেখলে বুঝতে অশ্বত্থামা তার নিজেরই মুমূর্ষু দেহটার দিকে চেয়ে বসে আছে...

[গালে হাত দিয়ে অধোবদনে রথের সামনে বসে থাকে]

কৃত। মহারাজ তাঁর সেনানীদের হতাশা সহ্য করতে পারেন না! পারছেন না! বীর অশ্বত্থামা, কীসের বিষাদ! ভুলে গেলে আমরা কারা? আমরা অষ্টাদশ দিনের কুরুক্ষেত্রের যোদ্ধা...

[একটি পৃথক আলোকবৃত্তে কৃপাচার্যকে দেখা যায়]

কৃপ। আমরা কুরুক্ষেত্রের হতাবশেষ যোদ্ধা...

কৃত। মৃতদেহের পাহাড় ঠেলে ঘোড়া ছুটিয়েছি আমরা....

কৃপ। জনারণ্য ধ্বংস করেছি আমরা...

কৃত। মরুভূমি করেছি আমরা...

কৃপ। তথাপি ওদের নিধন করতে পারিনি! পাঁচটি মহীরুহ আজো অবিচল! পঞ্চপাণ্ডব তথাপি জীবিত!

[কৃপ ও কৃতবর্মা দুপাশে দুই আলোকবৃত্তে মহাকালের দুই পুতুলের মতো আবৃত্তি করে চলে—মধ্যখানে উপবিষ্ট অশ্বত্থামার চোখ নিমীলিত]

কৃত। আমরা রাজার বাহিনী। ব্যর্থতা মানি না। ভুলে গেলে, ওদের মারতে কত না কৌশল করেছি আমরা। একবার....কৌশলে গৃহবন্দী করে...

কৃপ। কৌশলে জতুগৃহে আগুন লাগিয়েছি আমরা....

কৃত। জীবন্ত দাহন হবে পাণ্ডব....

কৃপ। কিন্তু হয়নি। লেলিহান অগ্নিকুণ্ড মাথায় নিয়ে বেরিয়ে এসেছে ওরা। পরিত্রাতা পাঁচটি চণ্ডাল! ওদের হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে তারা...ওরা জীবিত!

কৃত [ক্ষণেক বিরতি]। এবার পাঠিয়েছি বনে...

কৃপ। কৌশলে অজ্ঞাতবাসে বাধ্য করে...

কৃত। জনপদ থেকে বিতাড়িত করে....

কৃপ। প্রজাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে...

কৃত। ওদের দুর্বল করে...

কৃপ। পথের ভিখারী করে....

কৃত। শেষ করতে চেয়েছি আমরা....

কৃপ। কিন্তু হয়নি। বন থেকেও বেরিয়ে এসেছে ওরা...চতুর্গুণ শক্তি নিয়ে।

কৃত [দ্বিগুণ জোরে]। আমরাও থামিনি। ডেকেছি যুদ্ধ!

কৃপ। ভারত সংগ্রাম!

কৃত। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমবেত করেছি কুরুক্ষেত্রে...

কৃপ। রচনা করেছি ব্যূহ...

কৃত। দুর্ভেদ্য সব বেষ্টনী...

কৃপ। তথাপি প্রতিরোধ করা যায়নি। সব বেষ্টনী ভেদ করেছে ওরা।

কৃত [কণ্ঠে শেষ শক্তি ঢেলে]। কিন্তু আমরা ছাড়ব কেন? আমরা দুর্যোধনের যোদ্ধা...

কৃপ। আমরা মৃতদেহের পাহাড় মাড়িয়ে...

কৃত। ঘোড়া ছুটিয়েছি, আমরা..

কৃপ। ষটবিংশতি সহস্র মানুষ...

কৃত। নিধন করেছি আমরা....

কৃপ। কৃপাণে ভল্লে তূণে তোমরে...

কৃত। ভারতবর্ষ ছত্রখান করেছি আমরা...

অশ্ব [সম্মুখের পানপাত্র ঠেলে দিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে]। অন্ধ! অন্ধ!

কৃত। অন্ধ!

অশ্ব [খড়্গাটি হাতে তুলে]। অন্ধ! অন্ধ আমরা! [খড়্গাটিকে উদ্দেশ্য করে] যত বলি...ঐ...ঐ তো ওরা পঞ্চপান্ডব...ওরে তোর শত্রু...তোর আজন্মের লক্ষ্য...মার...ছিন্ন কর ওই শির...[সবেগে সামনের প্রস্তরে খড়্গা ঝাঁকিয়ে নামায়। কৃতবর্মা লাফিয়ে ওঠে। অশ্বত্থামা দারুণ ক্লান্তিতে খড়্গাটা তুলে নিতে নিতে...] কোথায় পান্ডব? চেয়ে দেখি রক্ত মেখে ছটফট করছে আর কেউ...অন্য কেউ! হয় পাঁচটি চন্ডাল, নয় পাঁচটি নিষাদ!...তাদের চিনি না...জানি না! ওরে তোরা কেন, তোরা কোথা থেকে এলি! তারা শুধু হাসে...অশ্বত্থামা, কাদের মারতে কাদের মারলে!...অন্ধ! আমরা ভীষণ অন্ধ!

কৃত। অন্ধ!

অশ্ব। হ্যাঁ...হ্যাঁ...শত্রু চিনি না! শত্রুকে আঘাত করতে পারি না! শেষ মুহূর্তে ভুল করি! একটা দৃষ্টিহীন বিশাল খড়্গা কাঁধে আমি জনারণ্যে ঘুরপাক খাই। [খড়্গাটি লক্ষ্য করে] নির্বোধ! ভয়ানক! ভয়ানক! দুর্বহ!

[বারংবার খড়্গাটি প্রস্তরে নিক্ষেপ করতে থাকে। কৃতবর্মা অন্তরালে অদৃশ্য হয়। আছড়াতে আছড়াতে অশ্বত্থামা খড়্গাটিকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে একটা অবোধ্য আর্তনাদ করে নিশ্চুপ হয়। কৃপ এগিয়ে আসে]

কৃপ। অশ্বত্থামা...[অশ্বত্থামা অদ্ভুত চোখে কৃপের দিকে তাকিয়ে থাকে। কৃপ তার মাথায় হাত রাখে] পুত্র...

অশ্ব। আমি জানতাম তুমি নেই...তুমি নিহত!

কৃপ। আমি জানতাম তুমি আছ...এখানেই তোমায় পাব।

অশ্ব। তোমায় হঠাৎ দেখে আমি এমন চমকে উঠেছি...

কৃপ। যেন প্রেত দেখছ!

অশ্ব। বেঁচে আছ...ওঃ, মাতুল! তুমি বেঁচে আছ!

[কৃপের আলিঙ্গনে ধরা দেয়]

কৃপ। আছি...বেঁচে আছি...এই মহাধ্বংসের সাক্ষ্য হয়ে।...অশ্বত্থামা, কুরুক্ষেত্রে কাতারে কাতারে মৃতদেহ...

অশ্ব। হ্যাঁ, কারো হাত আছে, পা নেই....

কৃপ। কারো মুখের একটা পাশ ভক্ষণ করেছে জন্তু!

অশ্ব। নিরন্তর বন হতে পিপীলিকার সারি ফেলে....

কৃপ। বেরিয়ে আসছে শৃগাল কুকুর...

অশ্ব। আকাশে শকুনি...কৃষ্ণকায় উল্কা...

কৃপ। মহাভোজ....দেশ জুড়ে আজ মহাভোজ! ষটবিংশতি সহস্র মানুষ...

অশ্ব। অকারণ....কী অকারণ রক্তপাত! [খড়্গটি তুলে নিজের বুকে বসাতে যায়] ওঃ।

কৃপ [অশ্বত্থামার হাত চেপে]। কী করছ!

অশ্ব [শীতল গলায়]। ছেড়ে দাও!

কৃপ। অশ্বত্থামা!

অশ্ব। এই পরাজিত অক্ষম দেহ আমি রাখব না! ছেড়ে দাও!

কৃপ। আত্মনাশ করবে!

অশ্ব। একটা ভীষণ কর্মহীন জীবন আমাকে গ্রাস করতে আসছে। তার পূর্বে...

কৃপ [খড়্গটি ছিনিয়ে নিয়ে]। আমি বুঝেছি, রাজার আদেশ প্রত্যাখান করার জ্বালা তুমি সহ্য করতে পারছ না!

অশ্ব। হ্যাঁ! [দুহাতে চুল মুঠি করে ধরে] ওঃ যদি পারতাম পান্ডবনিধন করে দুর্যোধনের পরমায়ু বাড়াতে!...ও হো হো!

কৃপ। চল, আমরা এ প্রান্তর ছেড়ে চলে যাই...চল পালাই...

অশ্ব। পালাব? বলছ কী? রাজাকে ফেলে আমরা...

কৃপ। ও মুমূর্ষু! শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের দেরি নেই! এখানে বসে কী করবে তুমি....

অশ্ব। তবু পারি না...ছেড়ে যেতে পারি না! রাজার চেয়ে বড় আত্মীয় আমার কেউ নেই...কিছু নেই...

কৃপ। পলায়ন ছাড়াও এখন পথ নেই। এরা ছাড়বে না। আবার তোমায় ঐ মারণখেলায় পাঠাবে....

অশ্ব। যুদ্ধে!

কৃপ। সেই মন্ত্রণাই করছে! অশ্বত্থামা, আমি দুর্যোধনকে বাঁচাতে এখানে আসিনি।

এসেছি তোমাকে বাঁচাতে! পুত্র, ওরা যতই বলুক, এই ভয়ঙ্কর রক্তস্রাবী সংগ্রামে আর ঝাঁপিয়ে পড়োনা...এস...চলে এস....

[কৃপ অশ্বত্থামাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে]

কৃত [দ্রুতপদে অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে রথের সামনে দাঁড়ায়]। দেখুন, দেখুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কীর্তিটা দেখুন মহারাজ! নিজে তো কিছু করবেন না...যে কিছু করতে পারে তাকেও সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন! মহারাজ এই কুচক্রী ব্রাহ্মণের প্রভাব থেকে ওকে মুক্ত না করতে পারলে....

কৃপ। কৃতবর্মা, কুচক্রী বলছ কাকে!

কৃত। আপনাকে আপনাকে!...শাস্ত্রজীবী ব্রাহ্মণ নিয়ে কখনো যুদ্ধে জেতা যায় না। আমি আপনাকে বহুবার বলেছি মহারাজ, এদের বিশ্বাস নেই।

কৃপ। কৃতবর্মা, সংযত হও!

কৃত। ওই, ওই দেখুন! এতক্ষণ মিউমিউ করছিল...এবার ভাগিনেয়কে সঙ্গে পেয়ে কী রকম বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল! তখনি জানি, একটা গোলমাল উনি পাকাবেনই।

কৃপ। কৃতবর্মা, আমি স্তম্ভিত!

কৃত। স্তম্ভিত আপনি কেন? হব তো আমরা! এই সমস্ত অকৃতজ্ঞ স্তম্ভ নিয়ে মহারাজ, আপনি ডুবলেন! আজীবন মহারাজের অন্নে প্রতিপালিত হয়ে আজ তাঁর শত্রুতা করেন! নির্লজ্জ কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণ!

অশ্ব। কৃতবর্মা! কী বললেন, আবার বলুন...

কৃত। হাজার বার বলব! সপরিবারে না খেয়ে মরছিলেন...দীন দরিদ্র ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ! হস্তিনার রাজবাড়িতে আশ্রয় না পেলে এতদিন কোথায় থাকতেন সব!

[কৃপ মাথা নিচু করে]

অশ্ব। মহারাজ, তোমারই সামনে আমার পূজনীয় মাতুলকে, সর্বশ্রদ্ধেয় মানুষটিকে কৃতবর্মা ও কী বলে?

কৃত। ভুলে গেছে মহারাজ...আজ আপনার দুর্দিনে সব ভুলতে চাইছে ওরা! [কৃপকে] আপনি...আপনার ভগ্নীপতি আচার্য দ্রোণ...ঐ অশ্বত্থামার পিতা...অনাহারে শুকিয়ে একবস্ত্রে ঐ শিশুপুত্রের হাত ধরে দাঁড়াননি কুরুরাজের দুয়ারে হাত পেতে?...কে আশ্রয় দিয়েছিল...কে অন্ন দিয়েছিল...কে দুবেলা শাস্ত্র পাঠের সুযোগ দিয়েছিল আপনাদের।

কৃপ। ভুলিনি...ভুলিনি কৃতবর্মা। মহারাজ দুর্যোধন আমাদের অন্ন দিয়েছে...এবং অন্ন দিয়েছে...সর্বোপরি অন্ন দিয়েছে...সে ঋণ কি ভোলার?

কৃত। ও, আর খেয়ে-দেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে আজ বুঝি...মহারাজ যতকাল আপনার বিক্রম ছিল এবং ভাণ্ডার পূর্ণ ছিল...এই ব্রাহ্মণ পরিবার চুপ করে বসেছিল। আর আজ দেখুন...আপনার পতনের সঙ্গে সঙ্গে দেখুন—মুখোশ ছিঁড়ে চতুর লোভী সুযোগসন্ধানী রূপটি বেরিয়ে পড়েছে। ওরা তো বুঝেছে দুর্যোধন শেষ হয়ে এল! ধূর্ত! শঠ! বিশ্বাসঘাতক!

অশ্ব। বিশ্বাসঘাতক! আমরা!

কৃত। নয়তো কে? আমি! আমি মহারাজের অনুগ্রহ পেয়েছি এবং তাঁর জন্যে প্রাণপাত করতে নিজের রাজ্য ছেড়ে ছুটে এসেছি! কে বিশ্বাসঘাতক, আমি না তুমি!

অশ্ব। মূর্খকে থামাও! মহারাজ—আমার পিতা অস্ত্রগুরু দ্রোণ তোমার জন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে...আমার মাতুল চিরদিন তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী...আর আমি...

কৃত। এতই যদি, তবে আজ কুরু সেনাপতিত্বে অরুচি কেন? তাহলে কি বুঝব অশ্বত্থামা কাপুরুষ!

অশ্ব। কাপুরুষ!

কৃত। কাপুরুষ! ভীত! দ্রোণপুত্র পান্ডবের ভয়ে ভীত! মৃত্যু ভয়ে ভীত!

অশ্ব। আমাকে উত্তেজিত কর না কৃতবর্মা।

[অশ্বত্থামা গর্জন করে কৃতবর্মার দিকে ছোটে]

কৃপ। থাম...থাম...তোমরা, হোক যুদ্ধ!

কৃত। হোক যুদ্ধ!

অশ্ব। না....

কৃত। অকৃতজ্ঞ! শত্রুর চর! এবার নিশ্চয়ই ওরা শত্রুর দলে যোগ দেবে!

অশ্ব [প্রবল মুঠিতে কৃতবর্মার কণ্ঠ চেপে ধরাশায়ী করে]। কী চাও তুমি, কৃতবর্মা?

কৃত। যুদ্ধ!

অশ্ব [ঝাঁকুনি দিয়ে]। কী চাও?

কৃত। যুদ্ধ!

অশ্ব। যুদ্ধ! যুদ্ধ! কী করে বোঝাব তোমায় মূর্খ, নিরন্তর বৃথা...বৃথা হত্যা করে...ভুল...ভুল মানুষ হত্যা করে করে...আমি ক্লান্ত! ক্লান্ত! বল কী চাও?

কৃত। যুদ্ধ!

অশ্ব [কৃতবর্মাকে ছেড়ে]।যাও ক্ষত্রিয়রাজ, তোমার যুদ্ধসাধ মেটানো ব্রাহ্মণপুত্রের অসাধ্য।

কৃত [উঠে দাঁড়িয়ে]। যুদ্ধ! যুদ্ধ! যুদ্ধ বিনা আমাদের কোনো গতি নেই! বিজয়ী পান্ডব আমাদের প্রাণদন্ড দেবে। অতএব যুদ্ধ! যুদ্ধ!

[দ্রুত পদে নিষ্ক্রান্ত হল। অশ্বত্থামা অভিমানী সর্পের মতো বড় বড় নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে থাকে]

অশ্ব। যুদ্ধ মহারাজ, যুদ্ধ চাই তোমার? মহারাজ এ যুদ্ধের প্রথম দিন আমায় সেনাপতি করলে পান্ডবের পঞ্চমুন্ড আর তোমার পায়ের নিচে শোভা পেত! কিন্তু তুমি তা করনি!...আমায় উপেক্ষা করেছ! আমার প্রবল বাসনা জেনেও, না জানার ভান করে তিলে তিলে দগ্ধ করছ। আমার তুল্য বীর কজন ছিল তোমার, বল কার ছিল আমার সমান ক্ষমতা? দুর্যোধন, এই অবেলায় সেনাপতি করে তুমি আমায় নিশ্চিত অসাফল্যের দিকে এগিয়ে দিচ্ছ!

কৃপ। অশ্বত্থামা, হোক যুদ্ধ!

অশ্ব। মাতুল, তুমিও বলছ! তুমিও! আচ্ছা, কী বলে তুমি...

কৃপ। আমি যে একজন অন্নদাস শাস্ত্রজীবী।....কোনো দিন নিঃসংশয়ে প্রতিবাদ করতে পারি নি। নীরবে গুমরে গুমরে যা বলে করে যাই। [অল্পক্ষণ থেমে থাকে] তখন ভরা শ্রাবণের ঝরঝর বর্ষণ চলেছে। সারাটা বেলা একমুঠো খুদ আর একটু পিটুলিগোলা ছাড়া আর কিছু জোটেনি! তোমার মা তাই তোমাদের ভাইবোনদের ভাগ করে দিচ্ছেন। আমি স্থির থাকতে পারলাম না...তোমার বাবাকে নিয়ে এলাম হস্তিনায়।...তখন ভেবেছিলাম, মহাপরোপকারী রাজা বুঝিবা দীন-দরিদ্রের বন্ধু...বুঝি সে চায় ভারতে শাস্ত্রবিধি চর্চা হয়, জ্ঞানগরিমার বিকাশ ঘটে...দুহাত বাড়িয়ে তাই আমাদের ব্রাহ্মণ পরিবারটিকে কাছে টেনে নিল! মূর্খ! মূর্খ ছিলাম! বুঝিনি রাজার উদ্দেশ্য কখনো এমন জলের মতো স্বচ্ছ নয়। বুঝিনি রাজা তার শক্তি সংগঠিত করতে ধীরে ধীরে বল অর্জন করছে! সব দিয়ে সর্বস্ব কিনে নিচ্ছে। বুঝিনি একদিন তোমাকে আমাকে তোমার পিতাকে হাতে অস্ত্র নিয়ে তার হয়ে লড়তে হবে!

অশ্ব। দুর্যোধনের অন্ন ...সে কি নিঃশর্ত নয়!

কৃপ। রাজার অন্ন, হা পুত্র, এত গুরুপাক...তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আর বিষক্রিয়ায় চিরদিন স্তব্ধ হয়ে ছিলাম! লজ্জায় ঘৃণায়...কত বার ভেবেছি, এই বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসি...

অশ্ব। পিতা!

কৃপ। নিজের বাঁধন নিজে ছিঁড়তে হয়। নইলে কেউ সহজে মুক্তি দেবে না। সম্ভব...মুক্তি সম্ভব! শুধু একটু কঠিন আর নির্মম হতে হবে। অশ্বত্থামা, থাক দুর্যোধন, চল আমরা যাই...

অশ্ব [জলপাত্র এনে কৃপের সামনে ধরে]। অন্তিমকালে আশ্রয়দাতাকে ত্যাগ করব!

কৃপ [জলপান করতে গিয়ে থেমে]। পুত্র আমাদের জীবন যে আজ সব দিক দিয়ে বিপন্ন! পাণ্ডবের চূড়ান্ত জয় হয়েছে! ওরা ভারতের অধীশ্বর! আজ হোক, কাল হোক ওরা আমাদের চরম শাস্তি দেবে! আমরা শুধু আজ পরাজিত না, পলাতক। অশ্বত্থামা, যত শীঘ্র সম্ভব এখন আমাদের ভবিষ্যৎ স্থির করতে হবে। অশ্বত্থামা, চল আমরা ওদের কাছে যাই—

অশ্ব [চমকে]। কোথায়?

কৃপ। চল ওদের মার্জনা ভিক্ষা করি...

অশ্ব। পাণ্ডবদের কৃপা!

কৃপ। বাঁচতে হবে তো। ওদের কৃপা বিনা দাঁড়াব কোথায়?

অশ্ব। ওঃ যে জীবন শত্রুর কৃপায় বাঁচে...

কৃপ। ভুলে যেয়ো না, এখন এ ছাড়া আর গতি নেই!

অশ্ব। কী বলছ তুমি! ওদের দুয়ারে মাথা নিচু করে দাঁড়াব! শুধু একটু জীবন...একটু নিশ্চিত জীবনের আশায়! [জলপানে উদ্যত কৃপের হাত থেকে পানপাত্র ছিনিয়ে নেয়] বৃদ্ধ তুমি! বোঝ না সে কী লজ্জা!

কৃপ। ওরা তোমায় পেলে খুশি হবে। সব অপরাধ ভুলে যাবে। ওরা নির্দয় নয়।

অশ্ব। দয়া! দয়া! দয়ার জন্যে আমরা যাব...আমরা ...আমরা!...ওঃ কৃতবর্মা তবে ঠিকই বলে...

কৃপ। কী বলে?

অশ্ব। বলে ব্রাহ্মণ লোভী! সর্বদা নিরাপত্তা খোঁজে! ব্রাহ্মণ চতুর আর...

কৃপ। এতে চাতুর্য কী! জয়ীকে স্বীকার করে নেব....

অশ্ব। আর ওদের বিজয়-উৎসবে গলা ছেড়ে বন্দনা গাইব! তুমি আমাকে অবাক করলে!

কৃপ। উৎসব! কোথায় উৎসব! কাদের উৎসব!

অশ্ব। ওদের! ওদের! লক্ষ লক্ষ প্রদীপ জ্বেলে আজ পাণ্ডব সিংহাসন সাজাবে!

কৃপ। ওরা নিষ্ঠুর নয়। ওরা জানে কত অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে এই জয়লাভ! আনন্দ করার মতো নির্বোধ ওরা নয়। ওদের শিবিরে আজ শোকরজনী।

অশ্ব। শোকরজনী!

কৃপ। আলো জ্বলবে না, বাদ্য বাজবে না, আজ এক অন্ধকার কক্ষে ওরা রাত্রি কাটাবে।

অশ্ব। সে কী! এত বড় জয়ে তারা উৎসব করে না!

কৃপ। আমরা হলে তাই করতাম। একটা নির্বোধ উল্লাসে হত-চৈতন্য হতাম। কিন্তু পঞ্চ পাণ্ডবের যে এটা দীর্ঘকালের সাধনার ফল। দুর্যোধনের হাতে নির্যাতনের দিনগুলোকে স্মরণ করে ওরা আজ নিভৃতে অশ্রুপাত করবে। ওরা জানে প্রাণের মূল্য! চল পুত্র, ওদের সঙ্গে আমরাও আজ রাত্রি কাটাই, অগণিত নরহত্যার অভিশাপমুক্ত হই! ওরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ক্ষমা করবে! চল পুত্র...

অশ্ব। না!

কৃপ। অশ্বত্থামা!

অশ্ব। আমি তোমায় আর কোনো রাজদ্বারে ভিক্ষা করতে দেব না। কৌরব কিংবা পাণ্ডব, যে হোক!

কৃপ। পুত্র!

অশ্ব। অন্ন হোক জীবন হোক...দুয়ার হতে দুয়ারে অধিক সুখ খুঁজে কী হবে! এস আমরা স্বাধীনভাবে বাঁচি!

কৃপ [অভিভূত স্বরে]। অশ্বত্থামা!

অশ্ব। স্বাধীনতা...তার চেয়ে বড় সুখ বড় নিরাপত্তা আর কীসে!...আমরা এই প্রান্তরে বাস করব।

অশ্ব। এই প্রান্তরে?

অশ্ব। এই নির্জন ঊষর প্রান্তরে। লোকালয় থেকে অনেক দূরে। ওরা জানতেও পারবে না আমরা কোথায় আছি। আদৌ বেঁচে আছি কি না...

কৃপ। এখানে কি বসবাস সম্ভব?

অশ্ব। কেন কেন কেন? আমার সঙ্গে শিলাখণ্ডে শয়ন করতে পারবে না তুমি!

কৃপ। না হয় হল! কিন্তু সামনে বর্ষাকাল—

অশ্ব। ভেব না, ভেব না। আবার শ্রাবণ নামার আগে গুল্মলতায় কুটির বেঁধে ফেলব। একটা ছোট্ট পাতার ঘর...

কৃপ। তারপর?...দুরন্ত শীতে?

অশ্ব। আগুন জ্বালব শুষ্ক কদম্বের মূলে!

কৃপ। আহার তৃষ্ণা?

অশ্ব। শৈলচূড়া থেকে এনে দেব দ্রাক্ষাফল? বনে বনে শিকার করব কচি হরিণ, বৃদ্ধ সজারু...

কৃপ। এ বিলাসহীন জীবন তো তোমার নয় পুত্র। কী বা বয়স তোমার! এ জীবন বনচারী সন্ন্যাসীর....আমি কাটাতে পারি...তোমার কত ভোগতৃষ্ণা।

অশ্ব। কিছু নেই...আজ আমার কিছু নেই। ভোগতৃষ্ণা কিছু না। ঐ নীল শৈলপারে চাঁদ উঠলে, আমার কুটিরের দ্বারে...তোমার পায়ের পাছে বসে শুনব পিতা, ভূলোক দ্যুলোক নভোমণ্ডল আর জীবনের অগাধ সব রহস্য কথা!

কৃপ। বলব, বলব অশ্বত্থামা...তোকে আমি বলে যাব সব। মাটির কথা...মৃত্তিকার অণু পরমাণু ভেঙে ভেঙে দেখিয়ে যাব এক আশ্চর্য আলোক...মহাবিশ্বব্যোম-ব্যাপী মঙ্গলের আলোক। তোকে আমি দিয়ে যাব সব।

অশ্ব। ধীরে ধীরে ভুলে যাব ফেলে আসা জীবনের সব কথা। আহার বিহার বসন ভূষণ...সব। সব রক্ত মুছে ফেলব! নীরবে নিভৃতে অশ্রুপাত করে ধুয়ে দেব দুচোখের অন্ধতা!

কৃপ। পুত্র!

[অশ্বত্থামা ধীর পায়ে প্রান্তরে অদৃশ্য হয়। সন্ধ্যা হয়-হয়। কৃপ এক পাশে আহ্নিকে বসে। রথের মুখে কৃতবর্মাকে দেখা যায়, তার চোখ জ্বলছে। মুখে বিস্তৃত এক কিম্ভূত হাসি]

কৃত। সুযোগ! দারুণ সুযোগ! হ্যাঁ হ্যাঁ মহারাজ, আমিও শুনেছি। সুবর্ণ সুযোগ! হ্যাঁ হ্যাঁ মহারাজ পারব, এবার নিশ্চয় রাজি করাতে পারব! কৃপের মুঠি থেকে ওকে ছিনিয়ে নেব! ওঃ কী দারুণ পরিকল্পনা! মহারাজ, মহারাজ, আচার্য কৃপ নিজেও বোধ হয় জানেন না, তাঁর কথার মধ্যে কী বিরাট সুযোগের ইঙ্গিত! নিজেও জানেন না কৃপ...

[কৃতবর্মা সন্ধ্যাহ্নিকরত কৃপের কাছে যায় ও করজোড়ে মাথা নিচু করে]

কৃত। দেব কৃপাচার্য!

[কৃপ কৃতবর্মার দিকে তাকায়]

কৃত। অজস্র অপরাধ করেছি আপনার কাছে, অধম অজ্ঞ জেনে ক্ষমা করুন আচার্য।

কৃপ। আমি তোমার প্রতি বিন্দুমাত্র রুষ্ট নই কৃতবর্মা!

কৃত। বাঁচলাম! সেই থেকে কী যে অসহ্য পীড়া ভোগ করছি! মহাত্মা কৃপ, আপনি শুনে সুখী হবেন, মহারাজ তাঁর ভুল বুঝেছেন...মহারাজ তাঁর যুদ্ধ লিপ্সা ত্যাগ করছেন!

কৃপ। দুর্যোধন!

কৃত। আজ্ঞে হ্যাঁ, কী হবে আর যুদ্ধে? মহারাজের আয়ু তো আর বেশিক্ষণ নয়!

কৃপ। কৃতবর্মা! সত্য!

কৃত। অন্তিমকালে প্রতিহিংসা—না না, সুস্থ চিন্তা নয়।

কৃপ। নয়...নয়ই তো! [আসন ছেড়ে উঠে] সুযোধন, তোমার যে শুভবুদ্ধি জাগল! মহারাজ, আজ আমার আনন্দ হচ্ছে! এত বড় বিপুল ধ্বংসকান্ড, তবু এই যে শুভবোধ, এর তুলনায় তাও ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র! না না, আর বৈরিতা নয়। প্রার্থনা কর ওরা যেন ভারত আবার নতুন করে গড়তে পারে। ধন্য! ধন্য সুযোধন! মহারাজ, আমার আশীবাদ নাও...মহিমান্বিত কুরুরাজ আমার আশীর্বাদ....

কৃত। মহাত্মা কৃপ একটু আগে শোকরজনীর কথা কী বলছিলেন...

কৃপ। পান্ডব শিবিরে আজ শোকরাত্রি!

কৃত। নিরালোক ঘরে পঞ্চপান্ডব রাত্রি কাটাবে, সত্য?

কৃপ। সত্য! সত্য! পান্ডবশিবির আজ বিষাদমগ্ন। প্রতিটি যোদ্ধা অস্ত্র ত্যাগ করেছেন, খুলে ফেলছেন যুদ্ধবর্ম। এমনকি শিবিরদ্বারে রক্ষীটি পর্যন্ত আজ নিহতদের স্মরণে বিলাপরত।

কৃত। বটে! বটে! শিবিরদ্বারে তবে তো আজ প্রহরী নেই! কেনই বা থাকবে। বিপক্ষ তো পরাভূত! পর্যুদস্ত! পান্ডবশিবির আজ নির্ভয়, নিঃশঙ্ক! তা মহাত্মা কৃপ, এত কথা আপনি কোত্থেকে...

কৃপ। কোত্থেকে জানলাম? স্বচক্ষে সব দেখে এলাম। আমি যে ওদের শিবিরে গিয়েছিলাম....সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে—

কৃত। সন্ধির প্রস্তাবও জানিয়ে এসেছেন! ভাল ভাল। তাহলে মোটকথা দাঁড়াল এই, ওরা আজ নিরস্ত্র হয়ে পাঁচজনে একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে রাত্রি যাপন করবে! সারাটা শিবিরে নামবে শোকের স্তব্ধতা, দুয়ারে প্রহরী থাকবে না! পান্ডব শিবির আজ সম্পূর্ণ অসতর্ক!

কৃপ [চমকে]। কৃতবর্মা! কী বলতে চাইছ!

কৃত। এক আশ্চর্য সুসংবাদ এনেছেন আচার্য। হাঃ হাঃ হাঃ [ছুটে রথের কাছে যায়, এবং অদৃশ্য দুর্যোধনের রত্নহার নিয়ে ফিরে আসে। অশ্বত্থামা ঢুকছে] আসুন মহাত্মা, গ্রহণ করুন।

কৃপ। এ কী!

কৃত। মহারাজ দুর্যোধনের পুরস্কার।

কৃপ। পুরস্কার! কেন?

কৃত। শত্রুশিবিরের গোপন বার্তা সংগ্রহ করে এনেছেন আপনি! আর আমাদের সামনে খুলে দিয়েছেন সাফল্যের স্বর্ণদুয়ার!

কৃপ। সাফল্য!

কৃত। যদি মধ্যরাত্রে আমরা ওদের শিবিরে প্রবেশ করতে পারি...একসঙ্গে পাঁচজনকে পেয়ে যাব! নিরস্ত্র, অসতর্ক...

কৃপ। কৃতবর্মা!

কৃত। মহারাজ বুঝেছেন সম্মুখ সমরে ওদের মুন্ডচ্ছেদ অসম্ভব। এখন অভিযান নিশীথের অন্ধকারে—

কৃপ। নিরস্ত্র মানুষকে তোমরা হত্যা করবে!

কৃত। করব...করতে পারব, যদি এখন থেকে প্রস্তুত হই, নির্ভুল পদক্ষেপে এগিয়ে যাই—

কৃপ। পাপ! পাপ! শোকমগ্ন মানুষ হত্যা...জঘন্য নীচতা! সুযোধন বৎস...[কৃপ রথের দিকে অগ্রসর হয়। ভিতরে তাকিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে] আঃ কী বীভৎস। কী পৈশাচিক মুখ। তুমি কি মানুষ! [রথের ভিতর অদৃশ্য মহারাজের হাসি] চক্রান্ত....হীন নীচ চক্রান্ত! পিশাচ! পিশাচ! অন্তিমকালে রক্ততৃষ্ণা! [অদৃশ্য মহারাজের হুঙ্কার] না, ভয় করি না...ও রক্তচক্ষু আর ভয় করি না তোমার। সারাজীবন করেছি, সারাজীবন গর্দভের মতো তোমার ঋণের ভারে দুমড়ে মুচড়ে চলেছি...গর্দভ বোঝে না একটা ঝাঁকি দিলে ভারটা ঝরে পড়ে...আপন নির্বুদ্ধিতায় সে ভারবাহী! রাজা, তোমার জাল ছিঁড়েছি। আমাদের ভবিষ্যৎ আমরা স্থির করেছি! চলে এস অশ্বত্থামা....

কৃত। ভেবে দেখ অশ্বত্থামা, পান্ডব পাঁচজন এক ঘরে! ওরা ছাড়া আর কেউ নেই। ভেবে দেখ অশ্বত্থামা, নির্ভুল লক্ষ্যভেদের সুযোগ! ভেবে দেখ অশ্বত্থামা, বিভ্রান্তির কোনো অবকাশ নেই। ওদের মারতে অন্যকে মারার প্রশ্নই ওঠে না।

কৃপ। অশ্বত্থামা আমি বুঝতে পারিনি, শোকরজনীর সংবাদ এদের কাছে এত লোভনীয় হবে!

কৃত। অশ্বত্থামা...একটি রাত্রি...জীবনে একবার আসছে—

কৃপ। চলে এস অশ্বত্থামা....

অশ্ব। বেলা ডুবে যায় গোধুলি হারায়...

কৃত। হ্যাঁ হ্যাঁ এগিয়ে আসে সে রাত্রি! পরম রাত্রি!

কৃপ। হ্যাঁ হ্যাঁ বিকট হাঁ করে নেমে আসে এক কৃষ্ণকায় দানব...

অশ্ব। আঁধার ঘনায় শিলায় শিলায়...

কৃত। আঁধার...আঁধার নামছে! প্রশস্ত লগ্ন...

অশ্ব। শৈলচূড়ে গুল্মলতায়...

কৃপ। আঁধার ঘনায় পেঁচার চোখে...

অশ্ব। রাত্রি নামে নদীর কূলে...বৃক্ষশাখায়..চরাচরে...

কৃত। দ্রুত! অতি দ্রুত অশ্বত্থামা...

কৃপ। দ্রুত! অতি দ্রুত ঢেকে যাবে সব। একটি কালো দানবের গ্রাসের মধ্যে লুপ্ত হবে দ্যুলোক, ভূলোক। দ্রুত...অতি দ্রুত...

কৃত। দ্রুত...অতি দ্রুত...

অশ্ব। দ্রুত! অতি দ্রুত নেমে আসে রাত্রি! এগিয়ে আসে মধ্যরাত্রি! পিতা, এ দারুণ সুযোগ!

[কৃতবর্মা হেসে ওঠে]

কৃপ। অশ্বত্থামা!

অশ্ব। এমন নিশ্চিত এমন অব্যর্থ সুযোগ জীবনে আর আসেনি...

কৃত। আসেনি...আসবে না। এই তুমি...ওই ওরা পাঁচজন। মাঝখানে কেউ নেই!

অশ্ব। কিছু নেই ! শুধু ওরা...এবার শুধু ওরা...নিরস্ত্র! ধ্যানমগ্ন কৃতবর্মা!

[ভয়ঙ্কর হেসে কৃতবর্মাকে জড়িয়ে ধরে]

কৃত [রথ দেখিয়ে]। সর্বাগ্রে মহারাজ...

অশ্ব। দুর্যোধন!

[ছুটে গিয়ে রথের মধ্যে হাত বাড়ায়। মুহূর্তের জন্যে রথের অন্তরালে সে অদৃশ্য হয়]

কৃত। ওঃ! ওঃ! অপূর্ব দৃশ্য! বীরশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা শায়িত মহারাজের কণ্ঠলগ্ন! অদ্ভুত! অপূর্ব! আনন্দাশ্রু! অপূর্ব! অপূর্ব!

অশ্ব। [বেরিয়ে আসে] অশ্ব প্রস্তুত করুন! হাতে সময় নেই ভোজরাজ...

কৃত। এখনই।

[কৃতবর্মা দ্রুত বেরিয়ে গেল]

অশ্ব [দ্রুত হাতে মাথায় কেশবন্ধনী জড়াতে জড়াতে]। রাত্রি নামছে...গোধূলি হারিয়ে যাচ্ছে...তিনটে নদী...দুটো প্রান্তর...একটা পাহাড়...কয়েকটা শস্যক্ষেত্র পার হতে হবে...তারপর কুরুক্ষেত্র...পার হতে হবে...তারপর...

কৃপ। অশ্বত্থামা, কুরুক্ষেত্রের আকাশে শকুনি...

অশ্ব। ওরাই হবে আমার পথের নিশানা...

কৃপ। নিশীথের চাঁদ ভয়ঙ্করী চামুণ্ডা...

অশ্ব। সে আমার পথের আলো...

কৃপ। এলোকেশী চাঁদ তাম্র কেশ বিছিয়ে কুরুক্ষেত্রে ক্রন্দনরত। পূর্ণোদর জন্তুরা সেখানে উদ্গার ছাড়ছে! আবার হত্যা করবে?

অশ্ব। হত্যা! হত্যা!

কৃপ। হত্যা করবে!

অশ্ব। হত্যা! রক্তপাত! আমার শরীরে বিদ্যুৎ হানে। দ্রুত অতি দ্রুত! হত্যা আমাকে প্রলুব্ধ করে, টানে! কী ভীষণ টানে! [নেপথ্যে তাকিয়ে] কৃতবর্মা, আমার অশ্বের মুখ ঘোরান...

কৃপ। নিজে বলেছ তুমি নরহত্যায় ক্লান্ত!

অশ্ব। ও চুপ চুপ চুপ! এমন অসত্য এমন অর্বাচীন কথা আমি কাউকে বলিনি! হত্যা আমায় ক্লান্ত করে? না না না! ভুল ভুল...বলেছি ভুল হত্যা করে করে আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম। অন্ধতায় আর লক্ষ্যভ্রষ্টতায় শ্রান্ত! হত্যা চাই...হত্যা! একটি সঠিক নির্ভুল হত্যা! কী শুনতে কী বুঝেছ তুমি!

কৃপ। বুঝতে পারিনি...অন্তরের অন্তরালের ওই বিষম বাসনা...আমি ধরতে পারিনি! ওরে শোন শোন আমার কথা শোন...

অশ্ব [যেন একটি শরীরী বিদ্যুৎ। চোখ দুটি ক্রমশ ক্ষুরধার হয়ে উঠছিল]। একটা পাহাড়...কয়েকটা পতিত শস্যক্ষেত্র আর একটা শূন্য জনপদ পার হতে পারলে আমার সাফল্য! সঠিক শিকার! একটা রাত্রি! রাত্রি শেষে মুছে যাবে আমার সহস্র অকীর্তি! একটা সঠিক কর্ম! [কৃপকে] শিবিরের মূল প্রবেশপথ থাকবে তোমার প্রহরায়। অতি সংগোপনে সতর্কতায় দ্বার আগলাতে হবে।

কৃপ। ভেবে দেখ, ভেবে দেখ, অশ্বত্থামা কী করতে চলেছ!

অশ্ব। বুঝতে পারছি কী বিরাট ঝুঁকি নিয়ে আমরা যাচ্ছি। কাজটা খুব সহজ মনে হলেও, তা নয়। ওরা দারুণ ধূর্ত! হিসাবে একটু ভুল হবে কি, ওরা আবার বেরিয়ে আসবে জীবিত! তথাপি জীবিত! ...কৃতবর্মা! [কৃপকে] সময় নষ্ট কোর না...শীঘ্র তৈরি হয়ে নাও!

কৃপ। হা পুত্র, কোথায় তোর সেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মূর্তি। শুনবি না, ভুলোক দ্যুলোকের কথা...

অশ্ব। দ্যুলোক দুলছে আমার চোখে। হাঃ হাঃ হাঃ! কৃতবর্মা...

[নেপথ্যে একাধিক যুদ্ধাশ্বের হ্রেষারব ঘনায়মান অন্ধকারকে ভারী করে তুলছিল]

কৃপ। শঠ! প্রবঞ্চক! আমাকে প্রবঞ্চনা করলি কেন!

অশ্ব। প্রবঞ্চনা!

কৃপ। শান্ত জীবনের লোভ দেখিয়ে কেন তুই আমায় এমন করে...[অশ্বত্থামার হাত ধরে] আমাদের কুটির—

অশ্ব। কুটির...?

কৃপ। ওরে পাতায় ছাওয়া ছোট ঘরখানি...

অশ্ব। ওঃ চুপ চুপ চুপ! এমন দীনতার কথা বল না! পাতার কুটির কেন, আমি তোমাকে সোনার প্রাসাদে রাখব!

কৃপ। ধিক! ধিক! দেহভারে নড়তে পারছিলে না, মৃতের মতো শুয়েছিলে!...ঠিক সেই অজগর...ভিতরে সে গর্জন করে, বাহিরে নির্মল! আর মেষ পশু সামনে এলে...

অশ্ব। সহসা সে গ্রাস করে!

কৃপ। ছদ্মবেশী অজগর! তুই কপট বৈরাগী!

অশ্ব। হ্যাঁ আমি যে ক্ষত্রিয়! পিতা, ভুলে যাও কেন, সেই দূর শৈশবে বালক অশ্বত্থামার এই ধমনীতে অশনি-সংকেত দেখে...কুরুরাজ তার কুলনাশ করে ব্রাহ্মণত্ব ঘুচিয়ে বুকে এঁকে দিয়েছিলেন ক্ষত্রিয়ের রক্ততৃষ্ণা, হত্যার অঙ্গীকার! তুমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়। আমি শঠ! প্রবঞ্চক! অজগর! হত্যা চাই আমার। সাফল্য চাই!....গোধূলি শেষ হয়ে আসছে। মহারাজের মৃত্যু রোধ করতে হবে! পঞ্চমুন্ড জয় করে ফিরতে হবে! কোথায় তোমার অস্ত্র, তৈরি হয়ে নাও—

কৃপ। দূর! দূর হও তুমি!

অশ্ব। তুমি! যাবে না?

কৃপ। উচ্ছন্নে যাও!

অশ্ব। তুমি না থাকলে সবই যে পন্ড। ওদের শিবিরের অন্ধিসন্ধি সব তোমার জানা। তোমাকে যেতে হবে!

কৃপ। ভেবেছ কি এই পাপ অভিযানে আমি তোমার সঙ্গী হব!

অশ্ব [কৃপের পদপ্রান্তে বসে]। পিতা, তুমি ছাড়া এ অভিযান সফল হবে না।

কৃপ। সফল হবে! সফল! আবার ভুল করবে তুমি! ভুল!

অশ্ব [সহসা দারুণ শব্দে কৃপের মাথার উপর খড়্গ তোলে]। কী করব?

কৃপ। অশ্বত্থামা।

অশ্ব। আবার বল কী করব।

কৃপ। অশ্বত্থামা, আমাকে তুমি...

অশ্ব। বধ করব! বৃদ্ধ আর একবার ব্যর্থতার কথা উচ্চারণ করলে, আমি তোমায় বধ করব!

[কৃপের শিরে অশ্বত্থামার খড়্গ শেষ মুহূর্তের জন্য ঝলসে ওঠে। তখন গোধূলি দ্রুত ক্ষয়ে আসছিল। কৃতবর্মা জ্বলন্ত প্রদীপ আর জলভাণ্ড নিয়ে ঢোকে]

কৃত। আরে আরে কী কর অশ্বত্থামা! নামাও, নামাও! ছিঃ ছিঃ এ কী কান্ড! সুপন্ডিত শাস্ত্রজীবী আচার্য কৃপ, পূজ্যপাদ বন্দনীয়। মহারাজ ওঁকে কোনোদিনও কটু কথাটি পর্যন্ত বলেননি! আর তুমি কিনা...না না না...মহারাজ এ কখনো সহ্য করবেন না। [অশ্বত্থামাকে সরিয়ে] উনি চিরকাল মহারাজের অনেক কাজে বাধ সেধেছেন...তবু দেখেছ, কখনো দেখেছ মহারাজকে এতটুকু বিচলিত হতে? মহারাজ জানেন, এঁরা মুখে যে যাই বলুন, শেষ পর্যন্ত এঁরা মহারাজেরই দলে। তাই তো হস্তিনারাজের কাছে এই সব পন্ডিত মনীষী এত প্রিয়! চিরকাল সভা উজ্জ্বল করেছেন। দেখবে, দেখবে, এখুনি সর্বাগ্রে ওঁর ঘোড়াটাই ছুটবে আগে আগে! [কৃপকে] আসুন আচার্য, মঙ্গল অনুষ্ঠান আরম্ভ করুন। [কৃতবর্মা রথের সামনে গিয়ে রাজকীয় সম্ভ্রমে করজোড়ে দাঁড়ায়] সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি কুরুরাজ অনুমতি দিন, আজ নিশীথ-অভিযানের সেনাপতি পদে মহাবীর অশ্বত্থামার অভিষেক হোক...[অল্পক্ষণ নীরবতা] আচার্য কৃপ, আমি আপনাকে আহ্বান করছি!

[কৃপাচার্যের আনত মুখমন্ডলে তখন বিন্দু বিন্দু স্বেদ দেখা দিয়েছিল। প্রদীপের শিখা বিচিত্র রেখায় কাঁপছিল তাঁর ললাটে। ওদিকে অশ্বত্থামা অভিষেকের জন্য খড়্গ নামিয়ে নতজানু হয়ে বসেছে। শান্ত শিষ্ট বালকের মতো। কৃপ ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে প্রদীপ তুলে নিল। অশ্বত্থামার মাথায় জল সিঞ্চন করে, প্রদীপে তাকে বরণ করতে লাগল]

কৃপ [কিছুক্ষণ অস্ফুট স্বরে কী সব বলার পর...ধীরে ধীরে তাঁর কণ্ঠস্বর শ্রুতিযোগ্য হল]। কুরুক্ষেত্রের নিহত মানুষদের স্মরণ করে, রাজসভার সকল শাস্ত্রজীবী আচার্যের কৃপা ভিক্ষা করে, জগতের রাজরাজেশ্বরের অগাধ মহিমা স্মরণ করে...চৈত্রমাসের চতুর্দশী সায়াহ্নে দ্রোণপুত্র বীরোত্তম অশ্বত্থামাকে আজ আমি নৈশ অভিযানের সেনাপতিরূপে অভিষিক্ত করছি....

[কৃতবর্মার মুখে যাত্রার শঙ্খ বেজে উঠল। প্রান্তরে সেই কম্বুরব ছড়িয়ে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে গোধূলি ঢেকে রাত্রি নেমে এল দ্রুত]

নিশীথ পর্ব

[তখন মধ্যরাত্রি। ঘনঘোর তমসা। প্রান্তরে পরিত্যক্ত রথখানির ভিতরে মৃদু আলো জ্বলছিল। তারই আলোছায়ায় চতুর্ধার চিত্রিত। দিগ্বলয়ে বিন্দু বিন্দু তিনটি মশাল জ্বলে উঠতে দেখা গেল। ক্রমে অশ্বক্ষুরধ্বনি ভেসে এল। তিনটি বেগবান তুরঙ্গম মধ্য নিশীথ প্রকম্পিত করে তাদের প্রত্যাবর্তন ঘোষণা করছিল। রথের নিদ্রা টুটল সেই অদৃশ্য রথী দুর্যোধনের। তার চেতনা দলিত মথিত করে অশ্বগুলি এগিয়ে আসছে। অক্ষম দেহভারে রথটা কাঁপছিল ঠকঠক করে। দুর্বোধ্য একটানা চিৎকার উচ্চ পর্দায় উঠে সহসা থেমে গেল। ঘোড়াগুলি নিকটে এসে থামল। সর্বাগ্রে ছুটে এল কৃতবর্মা। পিঠে তূণ, কাঁধে ধনুর্বাণ, হাতে প্রজ্বলিত মশাল]

কৃত [বজ্র নির্ঘোষে]। জয়! মহারাজের জয়! জয় কুরুরাজ দুর্যোধনের জয়!...কে...কে ছিনিয়ে নেবে সিংহাসন....কার সাধ্য হরণ করে রাজার মহিমা...রাজার প্রাণ!...ঈশান কোণে জট পাকানো রক্ত মেঘের জটা ছিন্নভিন্ন! পাণ্ডব নিহত! পাণ্ডব নিহত!

[তখন অশ্বত্থামা ঢুকছিল নীরব পায়ে। তার গায়ে গুপ্ত ঘাতকের ধূসর বস্ত্র। ললাটে উজ্জ্বল শ্রান্তির স্বেদবিন্দু। কাঁধে নরমুণ্ডের ঝুলি। হাতে রক্তমাখা খড়্গ। সে কী করবে, সে কী বলবে, সে নিজেও বোধ করি জানত না। অবরুদ্ধ আবেগে ঘন ঘন শিহরিত হচ্ছিল সে]

অশ্ব। হে নক্ষত্রপুঞ্জ, আরো উজ্জ্বল আরো ঘনবদ্ধ হয়ে তোমরা জয়ের মালা রচনা কর...বৃক্ষরাজি, তোমাদের শীতল মধুর স্পর্শ দাও...নিদ্রিত পক্ষীকূল জাগো...সমস্বরে গাও বন্দনা...জয় দুর্যোধনের জয়...

কৃত [এতক্ষণ সুরাপান করে কিঞ্চিৎ প্রমত্ত]। মহারাজ অচেতন! চেয়ে দেখ বহুবার রক্ত বমন করে করে মূর্ছা গেছেন!

অশ্ব। এ কী মহারাজ, এমন সময় তুমি মুর্ছিত! না না...এ ভীষণ অন্যায়? আমি তোমায় বলে গেছি, জেগে থাকো দুর্যোধন।

কৃত। ভাবতে পারেননি...ভাঙা তরী সাগর ডিঙোবে!...কে জানে হয়তো আমাদের জীবিত প্রত্যাবর্তন করতে দেখেই মূর্ছা গেলেন...হাঃ হাঃ হাঃ...কখনো কোনো সেনাপতি তো জয় করে ফেরেননি...হাঃ হাঃ হাঃ....

অশ্ব। দুর্যোধন! ওঠ...জাগো...দুচোখ মেলে চেয়ে দেখ—

কৃত। চেয়ে দেখ এই বীরের স্কন্ধে—

অশ্ব। স্কন্ধে আমার এই যে পেটিকা...

কৃত। কুষ্মাণ্ড আকার এই যে পেটিকা...

অশ্ব। দেখ মহারাজ পেটিকা ভরে আজ আমরা কী এনেছি! ঈশ্বর, শীঘ্র তার জ্ঞান ফিরাও—

কৃত। ফিরবে! ফিরবে! দুর্যোধন নবজীবন লাভ করবে! [অশ্বত্থামার হাতে পূর্ণ পানপাত্র তুলে দিয়ে] ভগ্নোরু মহারাজ সিংহাসনে বসবেন...ভারতবর্ষ শাসন করবেন...হাঃ হাঃ হাঃ...এক বিশাল রাজশক্তি তার অন্তিমে পৌঁছেছিল...মৃত্যুর মুখ থেকে টেনে এনে তুমি তাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করলে—হাঃ হাঃ হাঃ [অশ্বত্থামাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ

করে] অসাধ্য সাধন করেছ! ধন্য ধন্য হে বিজয়ী বীর! সিংহের গুহায় ঢুকে কেশরীকে শৃগাল ভেবে, শৃগালকে মুষিক-জন্ম নিতে পরলোক নিক্ষেপ করেছ...হাঃ হাঃ হাঃ...

অশ্ব। ভোজরাজ, যা করেছি আপনাদের জন্যই সম্ভব হয়েছে!

কৃত। না না না, আমরা কেউ না। শয়নাগারে ঢুকেছ তুমি, পেটিকা বোঝাই করে ফিরেছ তুমি! যা করবার করেছ তুমি। সব কৃতিত্ব তোমার।

অশ্ব। না না না ভোজরাজ কৃতকর্মা, আপনারাও সমান কৃতী।

কৃত [আনন্দে চোখ দিয়ে জল পড়ে]। ক্ষুদ্র ভোজদেশ! ছোট সেই রাজ্যের আমি এক ছোট রাজা। অস্ত্রবিদ্যায় তোমাদের মতো ভুবনখ্যাতি আমার নেই। নগণ্য এক নরপতি। আমার চেয়ে সহস্রগুণ শক্তিধরের পতন ঘটেছে ভারত সংগ্রামে! জানি না কোন পুণ্যবলে আমি আজো বেঁচে আছি! ভাবিনি কোনোদিন আমায় দিয়ে সম্ভব হবে পান্ডব-নিধন! এ কী অঘটন...এ কী অঘটন ঘটল! এ কী অঘটনে আমি হলাম নিমিত্তের ভাগী! কৃতিত্বের সমান অংশীদার...! অশ্বত্থামা বলতো কেমন করে ঘটনাটা ঘটালে! আমরা তো সব শিবিরের বাইরে দাঁড়িয়ে। অন্দরে কী হল কিছুই তো জানলাম না। দূর থেকে শুধু দেখলাম প্রাঙ্গণের আলোছায়ায় তুমি ওদের কক্ষের দিকে ছুটে চলেছ...তারপর...

অশ্ব। তারপর? নিথররাত্রি...পান্ডবশিবির শোকভারে আছে নিমগ্ন...

কৃত। হ্যাঁ হ্যাঁ...

অশ্ব। দেখি পাঁচ ভাই শ্রান্ত ক্লান্ত পাশাপাশি শুয়ে...

কৃত। ঘুমায় ওরা?

অশ্ব। ঘুমায় ওরা, বর্মবিহীন সংজ্ঞাহীন শিথিল বেশবাস...

কৃত। শিয়রে প্রদীপ...

অশ্ব। জ্বলে না প্রদীপ, একটিও ধূপ...শিয়রে তাদের খোলা বাতায়ন...

কৃত। বাহিরে জ্যোৎস্না?

অশ্ব। কোমল জ্যোৎস্না লুটায় তাদের বাজুপরে আর কেশদামে...

কৃত। হ্যাঁ হ্যাঁ...

অশ্ব। মন্দ বাতাস বহিছে সেথা, থরথর ভাসে বনযূথিকার বাস...

কৃত। তারপর?

অশ্ব। চাপি নিঃশ্বাস পাকড়ি খড়্গ যেমন হয়েছি একাগ্র...

কৃত। বল বল...

অশ্ব। ঘরের বাতাস হঠাৎ স্তব্ধ!

কৃত। বাহিরে ঝিল্লি?

অশ্ব। বাহিরে ঝিল্লি নীরব হল!—মিলায় জ্যোৎস্না...হারায় দৃষ্টি...কোথা গেল চলি সিক্ত যূথীর বাস...

কৃত। হারিয়ে গেল!

অশ্ব। হারায় হারায় সকলি হারায়...হঠাৎ যত শব্দ গন্ধ সব সব ডুবে যায় অতল পাতাল...হেরি চোখে শুধু পঞ্চপাণ্ডব...

কৃত। এক লক্ষ্য পঞ্চপাণ্ডব...

অশ্ব। ক্রমে পাণ্ডব সেও মুছে যায়...পরিচয় যত সব লোপ পায়, হেরি চোখে শুধু পঞ্চশির...

কৃত। স্থির লক্ষ্য...

অশ্ব। তুলেছি খড়্গ...আমার খড়্গ...ব্যাকুল খড়্গখানি...

কৃত। নেমেছে খড়্গ...নামছে ওই...

অশ্ব। ভোজরাজ, তখন জীবন বিনা দেখি না কিছু...নিঃশ্বাসে শুধু জীবন বয়...

কৃত। পড়েছে খড়্গ....

অশ্ব। করেছি আঘাত! একে একে পাঁচ! অঙ্ক মিলিয়ে পাঁচটি আঘাত। ভোজরাজ, তখন জেনেছি শুধু, দিয়েছি উড়িয়ে পাঁচটি শ্বাস!

[*কৃপাচার্য নিঃশব্দে ঢুকে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছেন*]

অশ্ব। পিতা, আমি সফল...আমি কৃতার্থ! আজ আমি পাণ্ডবসংহার করেছি! পিতা, আজ আমার চিত্ত পূর্ণ...সাগরের মতো পূর্ণ... [*কৃপের হাতে পানপাত্র এগিয়ে দিয়ে*] আশীর্বাদ কর পিতা...

[*কৃপ পানপাত্রটি ঘৃণায় ছুঁড়ে ফেলে। অশ্বত্থামা ক্ষণকাল নীরব থেকে গর্জে ওঠে*]

অশ্ব। কৃতবর্মা!

কৃত। বিজয়ী সেনাপতিকে অভিনন্দন জানাবার রীতি ভুলে গেছেন না কি!

অশ্ব। সারা পথ আমরা উল্লাস করেছি! আমি লক্ষ্য করেছি উনি একবারও আমাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মেলাননি! কেন?

কৃত। দেব কৃপাচার্য...আপনি শিবিরদ্বার রক্ষা করেছেন...বলতে গেলে আপনিই সাফল্যের মূলে...

কৃপ [চিৎকার করে]। না। কারো সাফল্য এনে দিতে চাইনি আমি! কারো দ্বার রক্ষা করতেও যাইনি আমি...

কৃত। তবে!

কৃপ। ভেবেছিলাম ঐ ঘাতক শিবিরে ঢুকলে আমি দ্বারে দাঁড়িয়ে একটা আর্তনাদ করব...ভীষণ আর্তনাদ...পাণ্ডবদের সতর্ক করে দেব!

[অশ্বত্থামা অস্ফুট গর্জন করে দূরে সরে যায়]

কৃত [বিস্ফারিত চোখে]। আপনার মনে এই ছিল!

কৃপ। হ্যাঁ, ঐ পাষণ্ডের কোপ থেকে ওদের জীবন রক্ষা করতে গিয়েছিলাম তোমাদের পিছু পিছু। বুঝেছ?

কৃত। সত্যই যদি ওদের নিদ্রা ভাঙত, আমাদের কী হত তাই তো বুঝছি না।

কৃপ [বিকট হেসে]। অন্তত বেঁচে থাকতে না!

অশ্ব। দেখতে ইচ্ছে করে ভোজরাজ, বৃদ্ধের অন্তর উপড়ে এনে দেখতে ইচ্ছে করে কতখানি জটিল! ওঃ আমায় বিজয়রাত্রি বিস্বাদ করে দিলে!

কৃপ। বিজয়! এর নাম বিজয়! গুপ্ত ঘাতক! অন্ধকারে নরমুন্ড সংগ্রহ করে নিতান্ত কাপুরুষের মতো উল্লাস কর! নিশীথের সওদাগর!

অশ্ব। জানো ব্রাহ্মণ, এর কী শাস্তি!

কৃপ। কাকে ভয় দেখাও? কৌরব সেনাপতি, কত শাস্তি আর দিতে পার তুমি! আজ আমি তোমার যে হত্যালীলা দেখেছি, দেখতে হয়েছে...তার চেয়ে বড় শাস্তি আর কী আছে!...বোঝাই পেটিকা কাঁধে বয়ে বেরিয়ে আসছ! রমণীরা ছুটে আসছেন। তারা আর্তনাদ করছে, ধূলায় লুটাচ্ছে! দানব! দুপায়ে তাদের মাড়িয়ে মাড়িয়ে স্ফীতকায় ঝুলিটা নিয়ে লাফিয়ে চড়েছ অশ্বপৃষ্ঠে! একবার ফিরে তাকাওনি....

অশ্ব। প্রয়োজন বোধ করিনি! আমার কার্য শেষ! কেন ফিরে চাইব? ব্রাহ্মণ, আমি তোমার মতো সংশয়ী না!

কৃপ। ওঃ! ভূলুণ্ঠিত রমণীর আর্তনাদ যামিনী বিদীর্ণ করল! একটা চিৎকার...দুয়ারে দাঁড়িয়ে সর্বশক্তি দিয়ে শুধু একটা চিৎকার করতে পারলাম না...

[কৃপাচার্য বুকে করাঘাত করছে]

অশ্ব। ওঃ বৃদ্ধ আমার আত্মা ফালা-ফালা করে দিল! কৃতবর্মা, শত্রুর নামে কেউ যেন অশ্রুপাত না করে।

কৃপ। কে শত্রু!

অশ্ব। কে শত্রু! এই যাদের পঞ্চশির...

কৃপ। পান্ডব তোমার সঙ্গে কী শত্রুতা করেছে!

অশ্ব। আজ এতদিন বাদে প্রমাণ দিতে হবে, পান্ডব কীসে শত্রু, কেন শত্রু! শিশুকাল থেকে জানি ওরা আমার শত্রু!

কৃপ। ভুল জানো! জনকল্যাণের মহান মন্ত্রে যারা ধর্মরাজ্য গড়তে চেয়েছে, তারা কি জ্ঞানত কারো কোনো অমঙ্গল চাইতে পারে? বল কার কী ক্ষতি করেছে ওরা?

অশ্ব। বাঃ বাঃ! চায়নি ওরা দুর্যোধনের রাজ্য ছিনিয়ে নিতে?

কৃপ। হ্যাঁ চেয়েছে। ক্ষমতার সিংহাসন থেকে ওরা ঐ অধার্মিক দুর্যোধনকে নামাতে চেয়েছে! তাও প্রথমে ওরা অস্ত্র ধরেনি। সবিনয়ে মিষ্ট কথায় দুর্যোধনকে বোঝাতে চেয়েছে। আজ প্রাণ দিয়ে বুঝলে কি পান্ডব, প্রথম দিনেই অস্ত্র ধরলে এভাবে তোমাদের মরণ হয় না!

অশ্ব। রাজনিন্দা আমি শুনব না! দুর্যোধনের শত্রু...সে কি আমার শত্রু নয়...আমাদের শত্রু নয়?

কৃপ। না....

অশ্ব। না?

কৃপ। না, প্রভুর যে বৈরী, সে কি ভৃত্যেরও বৈরী হয়! শিশুকাল থেকে ঐ রাজা তোমায় ভুল শত্রু চিনিয়েছে!

অশ্ব। ওরে ওঃ! সত্যিই যদি ওরা শত্রু না হয়, কোথায় থাকে আমার বিজয়...আমার

লক্ষ্যভেদ! সারা জীবন শত্রু ভেবে খড়্গ ঘুরিয়ে এলাম...আজ বলছে ভুল, সব ভুল! আজ আমি তাদের মুন্ডচ্ছেদ করেছি...আর ছেদ করার পর বলছে...[থেমে] আমি কি তবে স্বজন বধ করলাম....

কৃপ। স্বজন...বন্ধু...পরমাত্মীয়!

অশ্ব। বৃদ্ধ, আমার হাতের রক্ত এখনো শুকায়নি।

কৃপ। বুকে হাত রেখে বল অশ্বত্থামা...ওদের ওপর কোনো রোষ ছিল তোমার...তোমার নিজের...কোনো ঘৃণা...কোনো বিচার...

অশ্ব। ছিল! ছিল!

কৃপ। মিথ্যা কথা! আমাদের ঘৃণা....আমাদের বিচার....কোনোটাই আমাদের নয়। সব ঐ বিকৃত-চৈতন্য রাজার...ঐ ওর বিকৃত বাসনাই চরিতার্থ করেছ তুমি...আর কিছু নয়!

অশ্ব। উন্মাদ করে দেবে! ওরে এমন করে তুমি আমায় ঘোর লাগাচ্ছ কেন? শীঘ্র বল, যা করেছি ঠিক করেছি...

কৃত। চুপ করুন। চুপ করুন আপনারা। মহারাজ জেগেছেন! পেটিকা খোলো। মহারাজকে পঞ্চমুন্ড দেখাও...

অশ্ব। না—

[কৃতবর্মাকে রথের সামনে থেকে টেনে সরিয়ে আনে]

কৃত। মহারাজ ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন...হাত বাড়িয়েছেন! দাও...

অশ্ব। কী দেব! শত্রু মেরেছি, না কাকে মেরেছি, কার মুন্ড এগিয়ে দেব!

কৃপ। স্বীকার কর পক্ষ নির্বাচনে ভুল হয়েছে। এ যুদ্ধে সঠিক পক্ষ অবলম্বন করিনি...সঠিক শত্রু চিনিনি...

অশ্ব। কেন চিনিনি? ওরা আমার পিতাকে বধ করেনি? আচার্যশ্রেষ্ঠ দ্রোণহত্যা করেনি ওরা?

কৃপ। তোমার পিতা ওদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলেন, ওরা তার শাস্তি দিয়েছে। তাকে হত্যা বলে না।

অশ্ব। ওহোঃ ওরা মারলে সেটা হত্যা নয়? কাকে....কাকে....কাকে বলে হত্যা?

কৃপ। জগতের মঙ্গলকারীর রক্ত ঝরালে তবেই হত্যা! হত্যা এই!

অশ্ব। জিহ্বা ছিঁড়ে নেব তোমার!

কৃপ। আমাকে তুমি বধ কর...তবু যা সত্য...

অশ্ব। তোমার কণ্ঠ থামবে না?

[অশ্বত্থামা খড়্গ তোলে]

কৃত [বাধা দেয়]। অশ্বত্থামা! কৃপ, আপনি কিছুতেই ভুলতে পারেন না?

কৃপ। না—পারি না। তোমাদের মতো ক্ষুদ্রচেতা হীনবুদ্ধির হাতে পান্ডব কী করে বিনাশ হয়—এ যে আমি মেলাতে পারি না। মূষিকে পর্বত গিলে খায়!

কৃত। কৃপ! আপনিও দায়িত্ব এড়াতে পারেন না!

কৃপ। না—পারি না! ও হো হো, এত বড় পাপ রোধ করতে পারিনি, তার

সহায়তা করে এলাম। মহাজ্ঞানী মহাপন্ডিত হয়ে শেষপর্যন্ত অবশেষে পঞ্চমুন্ড বয়ে বেড়ালাম! [পেটিকা দেখিয়ে] তোমরা কারা, কারা ঐ ক্ষুদ্র পেটিকায়? বনে জঙ্গলে অজ্ঞাতে অজস্র নির্যাতন উপেক্ষা করে...আপন ব্রতে ধারা নিশ্চল...বার বার মেঘমুক্ত দিনমণির মতো যারা উদয় হলে....পান্ডব....মহান পান্ডব তোমরা? আমি বিশ্বাস করি না ধর্ম নেই...বিশ্বাস করি না..না..না..

[কৃপ চলে যায়]

অশ্ব। যে করবে পান্ডবের নামে অশ্রুপাত, চক্ষু উপড়ে নেব তার। আমি অশ্বত্থামা...দুর্যোধনের অশ্বত্থামা!...জনপদবাসী, আমি জানি কুটিরে কুটিরে তোমরা ওদের নামে দীপ জ্বাল! নিভিয়ে দাও!...আমার আদেশ! আমি জানি, বুকের নিচে লিখে রেখেছ পান্ডবের নাম। মুছে ফেল...নইলে ছিন্নভিন্ন করব বক্ষ। আমি ওদের বিশ্বাস করি না...নাম থেকে ওরা জন্মায়। পুনরায় জন্মায়। নিশ্চিহ্ন করব ওদের। পান্ডব রমণীর গর্ভের ভ্রূণগুলিকেও আমি ছাড়ব না...উৎপাটিত করব...বিনষ্ট করব...পান্ডবের পুনরাগমনের সব পথ বন্ধ করব আমি! আমি অশ্বত্থামা...দুর্যোধনের অশ্বত্থামা...

কৃত। অশ্বত্থামা, পেটিকা উন্মুক্ত কর—

অশ্ব [গভীর ক্লান্তিতে]। এই চৈত্র-নিশীথ আমার মর্মে মর্মে কী দাহ ছড়ায়! কী ঘোর চর্তুদশী নিশি...প্রবল বায়ু...মহারাজ, আমাকে উদ্ধার কর...আমি বড় একা! [থেমে] একটা পাহাড়, কয়েকটা নদী, শুষ্ক প্রান্তর...কী দুর্গম অন্তহীন পথ অতিক্রম করে এসেছি...দুচোখে তপ্ত বালুকা...দাও মহারাজ, আলিঙ্গন দাও...মহারাজ, তুমি আমাকে ঘিরে থাক। দূর কর যত লজ্জা সংশয় ভয়...শক্তি দাও...! [পেটিকা উন্মোচনে অগ্রসর হয়] কে, কে বলে রে হত্যা...কে বলে রে গুপ্তঘাতক আমি...নীতিহীন অবিবেচক? ওরে মূর্খ, মানুষেরই দেখিস নীতি নেই...দেখিস না এই ধরণীর গাছে একটি পাতা নেই...তড়াগে নেই জলকণা! কাতারে কাতারে মৃতদেহ শ্মশান শকুনি! এমন রিক্ত নিঃস্ব বিধবা ধরিত্রী! ওরে কোথা হতে আসে নীতি...কোথায় বাস করে পূণ্য! [থেমে] মহারাজ, বল মহারাজ, এই শেষ রক্ত! বল মহারাজ, আর হিংসা নয়, আর ধ্বংস নয়—সৃজন! এই মুহূর্তে একটা বৃহৎ সৃজনের বাসনা আমায় অস্থির করে তুলেছে। বল মহারাজ, যত প্রাণ নাশ করেছি আমরা, তত প্রাণ সৃজন করব আমরা! বল মহারাজ, এই ধরিত্রীর তৃণমূলে জল দেব! তাকে লালন করব! অনাবৃত ধরণীর উলঙ্গ রূপ ঢেকে দেব পল্লবিত বিকাশে....[অশ্বত্থামার মুখখানি পবিত্র দেখায়, পেটিকা উদ্দেশ্য করে] যাও বন্ধুগণ, মন্দার মালিকায় ভূষিত হয়ে স্বর্গের অক্ষয় অমরতা লাভ কর। আমরা রইলাম এই ভাঙাচোরা পৃথিবীতে...বলিষ্ঠ সমাজ...মানব সমাজ গড়তে...তোমাদের স্বপ্ন সার্থক করতে...যাও বন্ধুগণ...

[বলতে বলতে অশ্বত্থামা পেটিকার মুখটি সম্পূর্ণ উন্মোচন করেছিল, শান্ত চোখে তাকিয়েছিল ভিতরে। এবং তারপর কয়েক মুহূর্ত সেই একই ভাবে তাকিয়েছিল নিস্পন্দ, স্থির। একবার ভাবলেশহীন মুখ তুলে কৃতবর্মাকে দেখে নিয়ে আবার পেটিকায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল। তারপর—সত্রাস চিৎকার]

অশ্ব। কারা...ও কারা...!

কৃত। কারা!

অশ্ব। ও কারা...কাদের মুন্ড!

[মশাল হাতে ছুটে আসেন কৃপ]

কৃপ [পেটিকার ভিতরটা দেখে]। পান্ডব নয়! শিশুর মুন্ড!

কৃত। শিশু!

কৃপ। পাঁচটি শিশু...পাঁচটি শিশুর মুন্ড! পঞ্চপান্ডবের পাঁচ সন্তানের ছিন্নশির!

কৃত। সেকী!

কৃপ। কী করেছিস! কী করেছিস তুই!

অশ্ব [দু হাতে চোখ ঢাকে]। দেখতে পাইনি আমি...দেখতে পাইনি...

কৃত। পুত্রদের দেখতে পান্ডবদের মতোই!

অশ্ব। চিনতে পারিনি! জ্যোৎস্না...কপট জ্যোৎস্নায় সব হারিয়ে গেল!

কৃপ। পিশাচ! পিশাচ! জগতের নিকৃষ্টতম হত্যাকারী!

অশ্ব [ক্রমাগত দুর্বোধ্য চিৎকারে]। ভুল! ভুল! আবার ভুল করেছি আমি...কাদের মারতে কাদের মেরেছি! অন্ধ! অন্ধ! আমি ভীষণ অন্ধ!

কৃপ। পৃথিবী তুমি মুখ লুকাও আজ আমি এই নরঘাতী যৌবন ধ্বংস করব!

[অশ্বত্থামাকে লক্ষ্য করে কৃপ অসির আঘাত করল বারংবার। অশ্বত্থামা আঘাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে ধূলায় পাথরে গড়াগড়ি খাচ্ছিল...কৃপের অসিমুখ থেকে সরে সরে যাচ্ছিল...একটি ভয়ার্ত শ্বাপদের মতো। এমন সময় বহুদূরে রথের শব্দ শোনা গেল]

কৃত। রথ! রথ! কৃপ, পান্ডবদের রথ!

অশ্ব [দুর্যোধনের রথের সামনে]। এই দুরাচার রাজা আমাদের প্রতিপালিত করেছে...

কৃপ। অন্নের সাথে বিষ মিশিয়ে...

অশ্ব। স্বজনকে শত্রু বলে চিনিয়েছে...

কৃপ। বোধবুদ্ধি কেড়ে নিয়ে দেহমজ্জা দূষিত করেছে...

অশ্ব। অন্তরে বাহিরে আমার প্রবল তান্ডবের রাজত্ব গড়েছে...ওরে আমি যে বারংবার নিজের হৃৎপিন্ডে শেল হানি!

কৃপ। আমরা স্বপ্ন দেখেছি সুস্থ সবল মানব সমাজ...ধ্বংস করেছি ভবিষ্যৎ...মানুষের প্রজন্ম!

অশ্ব। স্বপ্নগুলিকে কটাহে চাপিয়ে পিন্ড বানিয়েছি...নে নে পিন্ড নে রাজা, খা শিশুর রক্ত খা...

কৃত। ওই ওরা আসছে...ওরা পাঁচজন...

কৃপ। ঘাতক আমরা, রাজার পালিত ঘাতক...আমাদের সাধ্য কি কৃতবর্মা, মহান ধর্মকে চূর্ণ করি! যুগে যুগে মৃত্যুর নাগপাশ ছিন্ন করে বেরিয়ে আসবে সে—অধর্মের বিনাশে!

কৃত [সভয়ে]। ঐ...ঐ দেখুন...ঐ আসছে...ঐ...

কৃপ। ঐ কপিধ্বজ রথে দেখ গান্ডীবধারী অর্জুন! নাশ করবে...নাশ করবে এই ভ্রষ্ট যোদ্ধাদের! মহাকালের বিচার! মুক্তি নেই...আমাদের মুক্তি নেই...

[ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসা রথের আলো এসে পড়েছিল তিন যোদ্ধার উপর]

রাক্ষস

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

চরিত্রলিপি

লেখক
মহারাজ
মহারানী
উদয়াদিত্য
শঙ্খমালা
রাক্ষস

[বহুকণ্ঠের মিলিত ঠাট্টা-বিদ্রূপ-মেশানো হাসির তীব্র, তীব্রতম শব্দের মধ্যে পর্দা উঠবে। মঞ্চের মাঝখানে দরজা বোঝাতে একটা সাদা পর্দা ঝুলছে। থিয়েটারের জন্য তৈরি রাজপুরীর আভাস মঞ্চে—জীর্ণ, হৃতশ্রী। একটা প্রকাণ্ড সিংহাসন রয়েছে। দু'পাশের উইংস দিয়ে বিভিন্ন চরিত্র আসবে, যাবে। মঞ্চের দর্শকদের দিকে একখানা আধুনিক কালের পুরনো চেয়ার। ঐ মিশ্রিত হাসির শব্দের মধ্যে উইংস দিয়ে লেখক কিছু কাগজ নিয়ে যেন কোলাহলতাড়িত হয়ে ঢুকল। হাসির শব্দের আঘাতে তার মুখ ক্লিষ্ট হতে লাগল। মঞ্চের মাঝখানে দুহাতে কান চেপে, চোখ বুজে যন্ত্রণায় তীক্ষ্ণ চিহ্ন নিয়ে সে মুখটা নিচু করতে লাগল, যেন প্রচণ্ড বিরক্তি আর কষ্টের চাপে তার মাথা নুয়ে পড়ছে]

লেখক [দুহাতে কান চেপে প্রায় চেঁচিয়ে]।থামো, দয়া করে আমাকে অন্তত বাঁচতে দাও! [শব্দগুলো স্তিমিত হতে থাকে। লেখক দর্শকদের দিকে অনেকটা এগিয়ে আসে] এই বিকট হাসির শব্দে আমি ঠিক মরে যাব! বিশ্বাস করুন, যখন হাঁটি পিছন থেকে কারা সব হেসে ওঠে, যেন আমি একটা ক্লাউন, সার্কাস থেকে রঙচঙে কিম্ভুত মুখটা নিয়ে ছিটকে এসেছি; ফোন তুললে—উল্টোদিক থেকে সেই হাসি, যেন আমার গলা কোনো হাস্যকর জানোয়ারের মতো; কোনো দরজার কড়া নাড়লে কী তুমুল হাসি, যেন আমি ভুল বাড়িতে ঢুকে ভুল কথা জিজ্ঞেস করেছি। আর যখন আমি কিছু লিখি, যখন নিজেকে গোপনে রাজার মতো ভাবতে ইচ্ছে করে, ঐরকম একটা সিংহাসনে বসতে লোভ হয়, তখন যে কী প্রচণ্ড হাসি—বিশ্বাস না হয়, দেখুন। [সিংহাসনটার কাছাকাছি আসতেই শব্দ, হাসি, কথা, বিদ্রূপের একটা মিলিত মর্মর মৃদুস্তর থেকে উচ্চনিনাদে প্রখর হয়ে উঠল। দুই কান চেপে ক্লান্ত বিমর্ষ মুখে নেমে এল লেখক। ধীরে ধীরে শব্দ স্তিমিত হবে] একটা ছন্নছাড়া অন্ধকারে আমি বড় হয়েছি—ঘুটঘুটে কালোর বাইরে এসে রৌদ্রের তাপ, জ্যোৎস্না ছড়ানো সুখ, আমি তেমন কুড়োতে পারিনি। আমি পারিনি, সে কি আমার দোষ? বলুন, আমি কি কোনো দোষ করেছি? সবকিছু ধরতে গেলেই যদি পালায়, সে কি আমার দোষ?

[লেখক যখন শেষদিকের কথা বলছিল, খুব সন্তর্পণে যাত্রার সেনাপতির মতো ছিন্ন মলিন পোশাকে মরচেধরা খোলা তরবারি হাতে একজন তরুণ ঢুকল। ধীরে ধীরে মাঝখানের পর্দাটার কাছাকাছি গিয়ে দেয়ালে কান পেতে কিছু শুনবার চেষ্টা করল]

লেখক। আপনারা লক্ষ্য করুন ব্যাপারটা, পরে বলছি।

[আরো উৎকর্ণ হয়ে তরুণটি শুনতে চেষ্টা করছে। উইংস দিয়ে ছেঁড়া ময়লা রাজার পোশাকে একজন বৃদ্ধ ঢুকে তরুণটিকে বিষাদখিন্ন মুখে লক্ষ্য করল]

লেখক [রাজাকে চাপা গলায়]। এই যে শুনুন, শুনুন—আপনার মুকুট? আপনার মুকুটটা পরে আসুন। এত ভুলে যান! [রাজা রাঙতার কাজ-করা মুকুট বেখাপ্পাভাবে মাথায় পরে এল] কী বিশ্রীভাবে পরেছেন মুকুটটা? রাঙতাগুলো দেখছি টেনে টেনে ছিঁড়েছেন। এত রাগ আপনাদের! যাকগে, আপনারা কথা বলুন।

[নিজের চেয়ারে বসল]

মহারাজ। উদয়, উদয়াদিত্য!

উদয়াদিত্য [সমকে ফিরে তাকিয়ে]। মহারাজ!

মহারাজ [অল্প বিষণ্ন হেসে]। কি শুনছ? শুনে কি লাভ?

উদয়াদিত্য। হয়তো আর দেরি নেই মহারাজ। সেই ভয়ঙ্কর পায়ের শব্দটা ক্রমশ এগিয়ে আসবে। সেই বিপুল ঘন্টাটা বেজে উঠবে, এই দরজায় আঘাত হবে...মহারাজ, মরতে আমার ভয় করে!

মহারাজ। তুমি সেনাপতি, একজন অশ্বারূঢ় তরুণ, হাতে অস্ত্র—এত ভয় তোমার? মৃত্যুকে এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিতে পার না?

উদয়াদিত্য। আজ কেবল আমার বয়সটাই তরুণ, মহারাজ! এই অন্ধকূপ আমাকে শুষে খেয়েছে! দিনের পর দিন আমার রক্তের লাল ফিকে হয়ে যাচ্ছে। মহারাজ, মনে হয়—যুদ্ধক্ষেত্রে আমার সেই মৃত ঘোড়াটা বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে খুর ঠুকে ঠুকে আমাকে ডাকছে। আমি পালিয়ে যাব। চারদিকে মৃত অশ্বের প্রেত, ভাঙা বিষাক্ত অস্ত্রের কাঁটা, পুরনো অস্ত্রাঘাতের কালো জমাট রক্ত—আমি পালাব, আমার ভিতরটা হিম হয়ে আসে। মহারাজ, রাক্ষসটাকে আমার ভয় করে। ও আসবে, এখুনি আসবে। আমার ভয় করে।

[মহারাজ সিংহাসনে বসে চিন্তান্বিত মাথায় হাত রেখে চোখ বুজল। উদয় মাটিতে বসে একটা হাঁটুতে কপাল রাখল, অন্য উইংস দিয়ে বৃদ্ধা মহারানী ঢুকল। ছিন্ন নকলরানীর পোশাক। মাথায় রাঙতার মুকুট]

লেখক [মহারানীকে]। গলার সেই সাত-লহর মুক্তোর হার কোথায়? পরে আসুন। এত বিশ্রীরকম ভুলে যাচ্ছেন সবাই! [মহারানী একটা ঝুটো মুক্তোর সাত-লহর হার দ্রুত পরে এল] ঝলঝলে মুক্তোগুলোর কি চেহারা করেছেন! ধুলোমাটিতে ফেলে রাখলে হবে না এরকম!

উদয়াদিত্য। মহারাজ, যদি সত্যি সত্যি পালাতে চাই?

মহারানী। কোথায় পালাবে উদয়?

[বুক চেপে ধরে কাশতে থাকে মহারানী, মুখে কষ্টের চিহ্ন]

উদয়াদিত্য [তাকিয়ে]। মহারানী!

মহারাজ। মহারানী, তুমি? তুমি এখানে এলে কেন? তুমি অসুস্থ, শয্যা ছেড়ে উঠতে রাজবৈদ্য তোমাকে নিষেধ করেছে।

মহারানী। রাজবৈদ্য! রাজবৈদ্য আমার অসুখের কি বুঝবে, মহারাজ! অসুখ কি কেবল আমার এই জীর্ণ দেহে? ঐ দরজাটায় আঘাত করে বিকট রাক্ষসটা যখন হুঙ্কার দিয়ে এসে দাঁড়াবে, ধারাল দাঁতে রক্তের পিপাসা দাউ দাউ করে জ্বলবে, তখন না উঠে এসে কি আমি পারব? বিছানায় আমি শুয়ে থাকতে পারি না, আমার চারদিকটা পুড়ে ওঠে, আমি পারি না।

মহারাজ। তুমি শান্ত হয়ে ঘুমোও। কারুর কোনো ভয় নেই। আমি সম্রাট, সব দায়িত্ব আমার। রাক্ষস এলে আমি যাব।

উদয়। মহারাজ!

মহারাজ। আমার ভয় নেই, উদয়। সম্রাটের ভয় নেই। আমি যাব।

মহারানী। তুমি গেলেই আমার ভয় থাকবে না ভেবেছ? কি ভেবেছ তোমরা? আমি কি কেবল আমাকেই ভালবাসতে শিখেছি—ছিঃ ছিঃ, তোমরা আমাকে এত ছোট ভাবছ! আমার ঘেন্না করে! তোমরা না থাকলে আমার প্রাণটা নিয়ে আমি কি করব! ধূমাবতী নদীর জল কি শুকিয়ে গেছে, আমি কি সেখানেও আশ্রয় পাব না?

উদয়। এ আপনি কি বলছেন, রানীমা?

মহারানী। ভুল বলছি না, উদয়। চারদিকটা বড় বেশি ফাঁকা লাগছে। কেবল আমার বুকের ভিতরটাই নয়, গোটা রাজ্যটার বাতাস ফুরিয়ে আসছে।

মহারাজ। তুমি ভিতরে যাও, বিশ্রাম কর।

মহারানী। তা হয় না, মহারাজ। আমি রানী, রাজ্যের মৃত মানুষগুলোর চোখ আমাকে ডাকে, ঘুমুতে দেয় না।

মহারাজ। সে দায়িত্ব তো আমারও।

মহারানী। দায়িত্ব আমাদের সকলের।

উদয়। জানি, আমাকে আপনারা অপদার্থ ভাবেন। ভাবনা ভুল নয়। এ-ভাবে বাঁচতে আমি চাই না। আমি পালাতে চাই, কিন্তু পালিয়েই বা কোথায় যাব? আমি কিছু বুঝতে পারি না—হা ঈশ্বর, এ আমি কোথায় এলাম!

মহারানী। উদয়, এ তোমার দেশ, তোমার জন্মভূমি। তোমার পিতা ছিলেন শত্রুর সন্ত্রাস, সেনাপতি বিক্রমজিৎ।

উদয়। কিন্তু চারদিকটা এত শূন্য, এত পুড়ে পুড়ে গেছে! আমি কি এই মাটিতে জন্মেছি?

[দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসল]

মহারাজ। রাক্ষসের পা লেগে লেগে নরম মাটি পুড়ে গেছে, ওর ভয়ে বাতাস পর্যন্ত পালায়।

উদয় [হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তলোয়ার নিষ্কোষিত করল]। এই কি আমার পিতৃপুরুষের তরবারি? কোথায় গেল সেই ধাতুনির্মিত তীক্ষ্ণ ফলক? আমার হাতে কি বিশ্রী, হাল্কা একটি টিনের তরবারি,—মরচে-ধরা, ভোতা, অর্থহীন! কি মানে হয়, এই সেনাপতির মিথ্যে পোশাকের?

মহারাজ। উদয়, পিতৃপুরুষের সেই দাম্ভিক ক্ষোভ তোমার ফুরোয়নি, এখনো তোমার বাঁচার কিছু আছে।

উদয়। কিছু নেই আমার।

মহারানী। বাঁচা বড় সুন্দর, উদয়!

উদয়। ভেবেছিলাম, আমিই প্রথম ঐ রাক্ষস এলে যাব। আমার বাঁচার কোনো মানে হয় না। কি আছে আমার! কি থাকতে পারে?

মহারাজ। তুমি যদি মরতে চাও, দুজন বৃদ্ধ কোন আশায় বাঁচবে?

উদয়। আজ বাঁচলেও কাল তো আমার পালা আসবে।

মহারানী। অন্তত একটু বেশি সময় তুমি পাবে। সময়ের থেকে দামী কিছু নেই। আমাদের সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে।

[হঠাৎ দূর থেকে বিকট একটা হাসির শব্দ]

মহারাজ [চিৎকার করে]। আমি প্রস্তুত।

মহারানী। না, না, মহারাজ।

[পর্দার দরজাটায় দুহাত ছড়িয়ে দর্শকের পিছন করে তাকাল। উদয় কোষ থেকে তলোয়ার বের করল]

মহারাজ। উদয়! ওকে আসতে দাও। ওর পায়ের শব্দটা যত এগোবে আমি জানি তোমার হাত তত দুর্বল হয়ে পড়বে।

উদয়। আমি শক্ত করে তলোয়ার ধরতে পারছি না, আমার আঙুল অবশ লাগছে, কি ভীষণ অবশ লাগছে!

লেখক। একটুকাল। একটুকাল চুপ করুন আপনারা।

[সব পাথরের মূর্তির মতো থেমে গেল। লেখক দর্শকদের দিকে এগিয়ে এল]

লেখক। নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন, এরা আমার নাটকের চরিত্র—যেটা লিখছি। রূপকথার সেই পুরনো চেনা গল্প। একটা রাজ্যে ভয়ঙ্কর একটা রাক্ষস এল। সে দেশশুদ্ধ খেয়ে ফেলতে পারত। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল—রোজ একটি করে মানুষ তাকে দেয়া হবে। দেশশুদ্ধ সব মানুষ মৃত্যুর জন্যে পর পর চিহ্নিত হয়ে আছে, প্রত্যেকের পালা আসবে। আজ এই বাড়ি। ভাঙা মৃতপ্রায় এই রাজবাড়িটা পালাক্রমে এক এক করে এবার সেই রাক্ষসটা নিঃশেষ করবে। তবে আমার রাক্ষস একটু অন্যরকম, সে হাড়গোড় প্রাণ সমেত নিশ্চিহ্ন করে না। অস্তিত্বের দুর্লভ কিছু খায়, যেমন দৃষ্টি, পায়ের গতি, বুকের ভিতরের রঙ, হাসি, আঙুল মুঠো করার ক্ষমতা, যুদ্ধের ইচ্ছে—এই রকম সব। তারপর ছিবড়ে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। আজ এই দরজায় এসে রাক্ষস শব্দ করে হেসে উঠবে। তার পায়ের ভয়ঙ্কর শব্দ এরা কান পাতলেই শুনতে পাচ্ছে। ঠিক আছে, আরম্ভ করুন।

[মানুষগুলো নড়ে উঠল]

মহারাজ। উদয়, তুমি পালাবে বলছিলে, না? যদি পার পালাও। আমরা বৃদ্ধ হয়েছি এক এক করে চলে যাব। তুমি অন্তত দুদিন সময় পাবে, যদি পার পালাও। আমিও ভয় পাচ্ছি। নিজের জন্যে নয় তোমার কাঁচা প্রাণটার কথা ভেবে।

উদয়। কেমন করে পালাব? এ রাজ্যে আসার পথ খোলা কিন্তু যাবার পথ নেই। সেই বিকট রাক্ষস প্রহরীর মতো সিংহদ্বারে অন্ধকারে থাবা মেলে আছে। ওর বিষাক্ত নখ আমাকে ছিঁড়ে ফেলবে, ওর ধূর্ত ভয়ঙ্কর চোখকে আমি ফাঁকি দিতে পারব না।

মহারানী। মহারাজ, কেবল ভয় হয়, আমরা চলে যাবার পর, আমাদের একমাত্র মেয়ে শঙ্খমালার কি হবে। কে দেখবে ওকে, কি করে ওর দিন কাটবে। আমাদের ছাড়া ওর যে সব অন্ধকার মনে হবে। উদয়, তুমি পালাও, তুমি শঙ্খমালাকে বাঁচাতে পার। ও তোমার কথা শুনবে, তুমি ওকে সান্ত্বনা দিতে পারবে।

উদয়। রাজকুমারীকে আমি স্বর্ণকূট মন্দিরে সাবধানে রেখে এসেছি। বিগ্রহ পূজায় তার মন শান্ত হবে, দুঃখ ভুলে যাবে। তবে রানীমা, হয়তো বলা ঠিক নয়, তাহলেও বলি, মন্দিরে বোধ হয় ও সুখী নয়। দেবতার কাছেও ওর মুখ আমি বিষণ্ণ দেখেছি। দেবতাও বোধহয় সব পারে না।

মহারানী। ও কথা বলতে নেই, উদয়।

মহারাজ। ওর চোখ বেঁধে নিয়ে গিয়েছিলে? [উদয় চুপ করে থাকে] চুপ করে আছ কেন? পথ চিনে নিলে ও হয়তো কোনো মুহূর্তে এখানে পালিয়ে আসতে পারে। আর তাহলেই আমাদের মতো ভয়ঙ্কর পরিণাম। এখানে মৃত্যু গন্ডী দিয়ে বেঁধে রাখে।

মহারানী। চুপ করে আছ কেন, উদয়? ওর চোখ বেঁধে নিয়ে যাওনি?

উদয়। না, মহারাজ।

মহারাজ। বুঝেছি উদয়, আজ আমি হতবল, অথর্ব, তাই তুমি রাজাদেশকে তুচ্ছ করতে সাহস পাও। কিন্তু কত বড় ভুল তুমি করেছ বুঝতে পারছ না। সব গেল, সব।

উদয়। মহারাজ, চোখ ওর বাঁধাই ছিল। যেতে যেতে হঠাৎ বলল, উদয়! আমার চেনা গাছ-পালা, আকাশ, এই পরিচিত রাজ্য শেষবারের মতো দেখতে দাও। আমার শেষ দৃষ্টি কেড়ে নিও না। আমি কেমন অভিভূত হয়ে গেলাম। চোখ খুলে দিলাম। মৃত্যুর আগের দৃষ্টির মতো ওর চোখ কি আকুল আর অসহায় ভাবে সব কিছু দেখছিল। মহারাজ, ওকে বাঁচাতে গিয়ে হয়তো ওকে আমরা মেরেই ফেলছি। এই পৃথিবীটাকে ও ভালবাসে। ভালবাসার চোখ বেঁধে রাখা যায় না। সকলকে ফেলে একা-একা ও বাঁচতে চায় না।

মহারাজ। তুমি এত দুর্বল-চিত্ত হবে ভাবিনি। তুমি মহাসর্বনাশ করেছ!

মহারানী। হয়তো ও একদিন এ বাড়িতে ছুটে আসবে তখন আমরা কেউ নেই। কে দেখবে ওকে?

মহারাজ। আমরা থাকব, রাক্ষসটা যে প্রাণে মারে না! একটি বিকৃত মাংসপিন্ডের মতো অর্থহীন অস্তিত্ব হয়ে থাকব। খুকি আমাদের নষ্ট আত্মার বিকট ছায়াটা দেখে কেঁপে উঠবে। ছুঁয়ে দিলে সারাজীবন ওর আঙুলে ভয়ঙ্কর শীত লেগে থাকবে।

মহারানী [বুক চেপে একটা উদগত ব্যথা সামলাবার চেষ্টা করে]। বুকের অসুখ আমাকে

এখনো বাঁচিয়ে রাখল কেন? এখন মনে হচ্ছে, মরণে সুখ ছিল। কে যেন কিসের শোধ নেবার জন্যে আমাকে বাঁচিয়ে রাখছে।

উদয়। রানীমা!

মহারাজ। চল, তুমি আমার সঙ্গে ভিতরে চল। একটু বসবে অন্তত।

মহারানী। কেন, কিসের লোভে?

মহারাজ। কোনো লোভে নয়, আমাদের ইচ্ছেয়, শেষ ইচ্ছেয়। চল।

[ওরা তিনজন চলে যেতে থাকে, উদয়াদিত্য একসময় ফিরে আসে। লেখকের দিকে সোজা চলে আসে]

উদয়। শুনুন।

লেখক। কি হল?

উদয়। একা-একা আমার ভয় করে।

লেখক। কিসের ভয়? ঐ রাক্ষসের? ভয় তো আমারো আছে!

উদয়। ভয় ছাড়াও, বিরাট একটা দুঃখ আছে আমার।

লেখক। তার আমি কি করতে পারি?

উদয়। করতে হবে।

লেখক। তার মানে, আমাকে আদেশ করছেন? আমি লেখক, আমাকে আদেশ!

উদয়। আদেশও হতে পারে। আমি প্রচন্ড ফাঁকা। আমি কিছু পাইনি। অথচ আপনি আমাকে একটা সেনাপতির পোশাক পরিয়ে রেখেছেন। ভিতরে সব শক্তি শূন্য—অথচ এই পোশাকটা আমাকে জ্বালায়, ভারী পাথরের মতো চেপে আছে। কাঁটার মতো বিঁধছে। কি ময়লা আর ছেঁড়া এই পোশাক, যেন যাত্রার দলের ভাড়াটে সাজ—আমাকে কি নিদারুণ ব্যঙ্গ করছে! আমি এটা আপনার মুখের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে এসেছি। [খুলে ফেলল পোশাক] এই নিন। [ছুঁড়ে দিল] আমি বাঁচলুম। আমি যা ছিলুম, এখন তাই। দশটায় অফিসে যাব, একটা বিরাট যন্ত্রের তলায় ঘাড় পেতে দিয়ে একটু করে খন্ড-বিখন্ড হব। তাই ভাল, আমি যা, আমি তাই হব।

লেখক। কিন্তু এই পোশাকটা মিথ্যে নয়। তুমি একজন যোদ্ধা হয়ে জন্মাওনি? যুদ্ধ তোমাকে ডাকত না, ভালবাসার জন্যে যুদ্ধ, উল্লাসের জন্যে যুদ্ধ, অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে যুদ্ধ? সেগুলো ভেঙেচুরে, ময়লা মেখে গেলেও ভিতরে ম্রিয়মাণ আগুনের মতো মাঝে মাঝে জ্বলে না? এজন্যেই ঐ পোশাকটা আমি দিয়েছি।

উদয়। কিন্তু আপনার এই খেলায় আমি তো জিতব না!

লেখক। আমি নিজেও তো জিতিনি। ঐ পোশাকটা নিয়ে অন্তত মরতে হয়। তুমি ওটা পরো।

উদয়। না, কিছুতে না। আমি পালাব এবার, বলে দিন কিভাবে পালাব। এখান থেকে বেরুবার পথ বলে দিন। এই কৃত্রিম, ভাঙাচোরা রাজারানী, এদের ভাগ্য এরা বুঝবে।

লেখক। এদের তাহলে ঠকাতে চাও?

উদয়। তাছাড়া আমার উপায় নেই। আপনাকে বলি, এদের আমি আগেই ঠকিয়েছি।

যখন রাজকুমারীকে নিয়ে যাই, সে চোখ খুলতে চায়নি। বড় শান্ত ছিল। সব মেনে নিয়েছিল। কিন্তু চারদিকের আকাশ, গাছপালা, জ্যোৎস্না, নক্ষত্র আর বুকের আদিঅন্ত কম্পনের ভিতর থেকে আমি রাজকুমারীর দুটি চোখ খুলে তাকিয়েছি। ভালবাসা বড় দুর্বল! ইচ্ছে হচ্ছিল আমি ওর সঙ্গে চলে যাই।

লেখক। আবার ফিরে এলে কেন?

উদয়। ঐ দুটো চোখ আমাকে ডাকল না বলে। অন্তত ভালবাসা আমি চাই। আমি এখান থেকে পালাতে চাইব না, যদি আমার মুঠোর মধ্যে ভালবাসা পাই। আমাকে পালাতে না দিলে, ভালবাসতে দিন।

লেখক। কোথায় পাব? যদি ভালবাসা পেতাম, আমাকে নিয়ে সকলে হাসত না। আমি পাইনি, বিশ্বাস কর কোনোকালে পাইনি। ভালবাসা আমাদের ঘুমের মধ্যে পালিয়ে গেছে, স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন হয়ে মিলিয়ে গেছে। কোথাও কিছু নেই।

উদয়। কিন্তু অনেকে পায়।

লেখক। আমি পাইনি।

উদয়। আমি পেতে চাই।

লেখক। বাতাসের মতো মুঠো থেকে সরে যাবে। জলের ওপর চাঁদের আলোর মতো কিছুকাল থেকে মুছে যাবে।

উদয়। আমি ধরে রাখব।

লেখক। পারবে না। একটু আগেও পারনি। শঙ্খমালাকে তুমি পাওনি।

উদয়। অন্তত আমাকে চেষ্টা করতে দিন।

লেখক। আরো দুঃখ পাবে।

উদয়। ভালবাসার দুঃখেও তাহলে পাব! সেও তো পাওয়া! অন্তত কিছু তো চাই।

লেখক। কিন্তু কি করে পাবে? চাইলেই তো মেলে না!

উদয়। আমি কোনো কথা বুঝি না। আমার চাই।

লেখক। একটা পথ আছে, ধর শঙ্খমালা ফিরে এল। মন্দিরের শান্তি তাকে তৃপ্তি দিল না।

উদয়। খুবই স্বাভাবিক।

লেখক। এক সময় সে সবকিছু ফেলে তার বাবা-মার কাছে পৌঁছবার জন্যে মন্দির ছেড়ে পালাল। এবার ও আসবে। একা থাকার কষ্টে ও ছুটে আসবে।

উদয়। কিন্তু অনেক পথ, ওর আসতে দেরি হবে।

লেখক। ঘোড়ায় চেপে আসবে।

উদয়। তাই হওয়া উচিত। ভালবাসার গতি চিরকাল দ্রুত হয়।

লেখক। কিন্তু তোমার ভালবাসার টানে ও আসছে না, আসছে বাবা-মার জন্যে তীব্র স্নেহে। তুমি ভালবাসা চাইবে। শেষ চেষ্টা!

উদয়। সময় যে কম!

লেখক। এখানেই তোমার পরীক্ষা।

উদয়। বেশ, তাই হবে।

লেখক। তাহলে সমস্ত অরণ্যের শুকনো পাতা মাড়িয়ে সাদারঙের উদ্‌ভ্রান্ত একটা ঘোড়া শঙ্খমালাকে নিয়ে আসছে। তুমি আপাতত ভিতরে যাও, রাজকুমারীকে আমি বুঝতে চাই। রাজকুমারী আসছে। অরণ্যের সবুজ দুলিয়ে আসছে। তুমি যাও।

[উদয় চলে গেল। ফিকে সবুজ আলো মঞ্চে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। দূর থেকে ঘোড়ার পায়ের শব্দ নিকটতর হতে থাকে। লেখক নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। হঠাৎ উদ্ভাসিত আলোর মতো শঙ্খমালা ঢুকল। রাজকুমারীর পোশাক, ছিন্ন মলিন। গুন গুন করে গান গাইছিল]

শঙ্খ। কী ফাঁকা ঘরটা! নিশ্চয়ই, মা বাগানে ফুল তুলতে গেছে। মা?

লেখক। চেঁচিও না।

শঙ্খ। নিজের বাড়িতে আমি যা খুশি তাই করব। দৌড়ব, হাসব, গান করব।

লেখক। কোনটা নিজের বাড়ি?

শঙ্খ। কেন এটা, যেখানে দাঁড়িয়ে আছি।

লেখক। সব বাড়ি অন্ধকারে জলের দরে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।

শঙ্খ। বিজ্ঞের মতো কথা বলবেন না, বুঝলেন? মা?

লেখক। চেঁচাতে বারণ করলুম না!

শঙ্খ। আপনার কথামতো চলতে হবে নাকি? আশ্চর্য লোক তো আপনি!

লেখক। মনে হচ্ছে, বেশ আনন্দে আছ, অ্যাঁ? গুনগুনিয়ে গাইতে গাইতে ঢুকলে!

শঙ্খ। গাইতে ভাল লাগলেই গাইব। আমার ইচ্ছে।

লেখক। ইচ্ছে! রাজকুমারীর পোশাক রয়েছে না তোমার! গাইতেই যদি হয়, ঐ পোশাকটা খুলে চেঁচাও। রাজকুমারীর এত আনন্দ এখন মানায় না।

শঙ্খ। পোশাকটা আমার ভাল লাগে, খুলতে হবে কেন?

লেখক। ওটা আমি পরিয়েছি, আমার কথামতো চলতে হবে।

শঙ্খ। বয়ে গেছে!

লেখক। তাহলে রাজকুমারীর মতো চল, এই রাজ্যের রাজকুমারীর মতো।

শঙ্খ। আমাকে কিছু শেখাতে হবে না।

[গুনগুন করে গাইতে লাগল আবার]

লেখক। এখন গানের সময় নয়।

শঙ্খ। ও পোশাকটা কার পড়ে আছে, মনে হচ্ছে উদয়ের। ওকেও ওটা ছাড়তে বলেছিলেন বুঝি?

লেখক। ও নিজেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

শঙ্খ। কেন?

লেখক। ওর ভাল লাগছে না।

শঙ্খ। আর আপনি অমনি মেনে নিলেন? কি অপদার্থ লোক আপনি!

লেখক। আমি ওকে পরতে বলেছিলাম। আমার কথা ও শুনতে চায় না।

শঙ্খ। ঠিক আছে, আমি বলব। উদয়!

লেখক। শোন, সব ব্যাপারটা তুমি জানো না। আজকের দিনটা বড় ভয়ঙ্কর, সেই রাক্ষসটার পালা আজ এ বাড়িতে পড়েছে। তুমি এসে ভাল করনি।

শঙ্খ। কি বলছেন আপনি?

লেখক। ঠিক বলছি। তুমি পালাবে?

শঙ্খ। না।

লেখক। তাহলে মরবে।

শঙ্খ। কেউ মরব না আমরা।

লেখক। মরতে হবে। মরতে হয়।

শঙ্খ। না, না, না।

[উদয় ঢুকল]

শঙ্খ। বাবা কোথায়? মা? উদয়, ওরা কোথায়? কথা বলছ না কেন?

উদয়। ভিতরে আছেন।

[দ্রুত শঙ্খমালা চলে যাচ্ছিল]

উদয়। শঙ্খমালা!

শঙ্খ। ভিতরে যাব।

উদয়। এখন যেও না। তোমাকে দেখলে ওঁরা দুঃখ পাবেন। রানীমা ভয় পাবেন।

শঙ্খ। কিন্তু আমি ওদের না দেখতে পেলে বাঁচব না।

উদয়। তুমি এখানে এসেছ বলে তুমিও যে বাঁচবে না।

শঙ্খ। সবাইকে ছাড়া আমি বাঁচতে চাই না।

উদয়। আমার অনুরোধ তুমি এক্ষুণি যেও না। আমি ওঁদের বুঝিয়ে বলি, তারপর যেও। হঠাৎ তোমাকে দেখে ওরা বিচলিত হয়ে পড়বেন।

শঙ্খ। বেশ, তাহলে তুমি আগে যাও। এক্ষুণি যাও।

উদয়। আচ্ছা শঙ্খমালা, তুমি সকলের জন্যে ভাবছ, আমার জন্যে ভাবনা নেই তোমার?

শঙ্খ। কেন থাকবে না। তুমি আমাদের একমাত্র হিতৈষী। প্রচন্ড দুর্দিনেও তুমি আমাদের ত্যাগ করেনি।

উদয়। আমার কর্তব্য ছাড়া আর কি কিছু নেই?

শঙ্খ। সবকিছু বোঝার সময় পাইনি আমি।

উদয়। শঙ্খমালা, কাল বা পরশু বিকট রাক্ষসটা এসে আবার দরজায় শব্দ করবে। আমাকে যেতেই হবে। আমার ভিতরের অনেক কিছু খেয়ে নেবে। হয়তো আমি তোমাকে যে চোখে দেখছি, যে মনে ভাবছি তাকে শিকড় সুদ্ধ উপড়ে চিবিয়ে খাবে। সাদা দেয়ালের দিকে যেমন করে তাকাই হয়তো তেমনি চোখে আমি তোমাকে দেখব। সেই ভয়ঙ্কর মৃত্যুর হাত থেকে আমাকে বাঁচাও।

শঙ্খ। আমি কেমন করে বাঁচাব? কি পারি আমি!

উদয়। তুমি সব পার। তুমি জানো, কি ভীষণ ভালবাসতে চাই আমি তোমাকে। তুমি আমার যন্ত্রণাকে মিথ্যে ভেব না। তোমার মুঠোর মধ্যে আমাকে বন্ধ করে রাখ, আমি বেঁচে যাব, তোমার চোখের একটা পলকের মধ্যে আমি লুকিয়ে থাকতে পারি—রাক্ষসটা আমাকে খুঁজে পাবে না।

শঙ্খ। এসব কথা এখন থাক। আমি কিছু ভাবতে পারছি না, বুঝতে পারছি না।

উদয়। এখন ছাড়া আর সময় নেই। সময় শেষ হয়ে আসছে। হয় এখন, নাহলে আর কখনও নয়। তুমি আমাকে শেষবারের মতো দাঁড়াতে দাও, আমি ভয় পাব না, সবকিছু দুহাতে ঠেলে দূরে সরাতে শক্তি পাব। সারা জীবন আমি কিছু পাইনি। যদি মরেও যাই, মরবার আগে আমাকে একটা তৃপ্তি পেতে দাও।

শঙ্খ। কেমন করে হঠাৎ আমি ভালবাসব? সবকিছু যে হঠাৎ হয় না।

উদয়। হয়, শঙ্খমালা হয়। আমাদের হৃদয়ে হঠাৎ বিদ্যুৎ, হঠাৎ মেঘ, হঠাৎ রৌদ্র, হঠাৎ অন্ধকার।

শঙ্খ। কিন্তু বাবা-মা ওদের জন্যে আমার মন মোটে শান্ত নেই যে! আমি একবার যাব ওদের কাছে।

উদয়। বেশ, আমি যাচ্ছি। একটুকাল অপেক্ষা কর তুমি।

[উদয় চলে গেল]

লেখক। ঐ ছেলেটিকে রাক্ষসের আগে তুমি মারছ।

শঙ্খ। কেন?

লেখক। তুমি ওকে ভালবাসলে ও মরতে চাইত না।

শঙ্খ। ওকে ভালবাসি না কে বলল আপনাকে?

লেখক। শুনলুম যে এতক্ষণ।

শঙ্খ। পরের কথা শোনার তো অভ্যেস আছে, বোঝার বিদ্যে হল না কেন?

লেখক। নিজের মুখে ওকে ভালবাস না বললে না?

শঙ্খ। তাতে কী বোঝাল?

লেখক। যা বোঝায় তা-ই। ওকে ভালবাসতে চাইছ না।

শঙ্খ। ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি—এমনি চেঁচিয়ে দশবার না বললে বুঝি ভালবাসা হয় না! আমি ওকে বলতে যাব কেন, ও খুঁজে নেবে, বুঝে নেবে।

লেখক। কি কান্ড! তাহলে ওকে বেমালুম দুঃখ দিয়ে গেলে এতক্ষণ!

শঙ্খ। আমার খুশি! দেখুন সেই থেকে আপনি আমাকে জ্বালিয়ে যাচ্ছেন। একটা বিশ্রী বিকট পরিবেশের মধ্যে সব্বাইকে আটকে রেখেছেন। এতটা জুলুমের অধিকার কে দিল আপনাকে?

লেখক। আমার উপায় নেই, যেসব ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে তা আমি চাই না—তাহলেও ঘটে যায়। আমি পথ জানি না।

শঙ্খ। আমি জানি।

লেখক। জানো?

শঙ্খ। জানি।

লেখক। আমাকে বলে দেবে?

শঙ্খ। বলতে যাব কেন? রূপকথার গল্পে পড়েননি, সব রাক্ষসের মৃত্যুর একটা রাস্তা থাকে।

লেখক। সেটা কোন রাস্তা?

শঙ্খ। রাস্তা আছে জানি, কিন্তু কোন পথে কি করে বলব!

লেখক। আশ্চর্য! এটুকু জ্ঞান দিয়ে আমাকে পণ্ডিত না করলেও চলত। এরপর থেকে আমার নাটক সব স্ত্রী-চরিত্রবর্জিত, বুঝলে।

শঙ্খ। বাঁচলুম।

লেখক। পুরোপুরি বর্জন করতে পারলে আমিও বাঁচতুম।

শঙ্খ। খুব অসহায় লাগছে যে গলার স্বর!

লেখক। এটাই আমার নিয়তি।

শঙ্খ। আমাকে বিরক্ত না করে ঐ নিয়তির মুখোমুখি গালে হাত দিয়ে বসে থাকুন।

লেখক। বড় প্রখর মেয়ে তো তুমি!

শঙ্খ। হবেও বা।

লেখক। কারুর কথা শোনার অভ্যেস নেই দেখছি।

শঙ্খ। অন্তত আপনার নয়।

লেখক। কিন্তু তুমি আমার চরিত্র, আমার কথামতো চলাই নীতিসম্মত।

শঙ্খ। আমি অনেকক্ষণ থেকেই আপনার নীতি-দূর্নীতির বাইরে।

লেখক। মানে?

শঙ্খ। মানে, আমি স্বাধীন।

লেখক। স্বাধীন?

শঙ্খ। হ্যাঁ, স্বাধীন! স্বাধীন বলতে যা বোঝায়, আমি আপনাকে মানি না, হল?

[রানী ঢুকল। পিছনে রাজা, উদয়াদিত্য]

মহারানী। খুকি! খুকি!

লেখক। খুকি নয়, শঙ্খমালা বলুন।

রাজা। শঙ্খমালাই খুকি, খুকিই শঙ্খমালা।

লেখক। কিন্তু আমি ওকে রাজকুমারী শঙ্খমালা নাম দিয়েছি।

মহারানী। তাতে আমার খুকির কোনো বদল হয় না।

লেখক। আশ্চর্য, যা খুশি করুন। এরা দেখছি সবাই আমার মুখের ওপর কথা বলছে অথচ মুখগুলো আমারই বানানো।

[নিজের জায়গায় এসে বসল]

রাজা। তুই এতবড় বিপদের মধ্যে কেন এলি, খুকি?

শঙ্খ। তোমাদের ছাড়া একা-একা আমি করে থাকব? আমার ভাল লাগে না, একদম ভাল লাগে না। তোমরা আমাকে দূরে রাখতে চাও কেন?

মহারানী। রাক্ষুসে আগুনটা যাতে তোর গায়ে না লাগে! তুই বাঁচলেই আমাদের বাঁচা, খুকি। আমাদের কথা শোন, তুই চলে যা।

শঙ্খ। না। আমি কোথাও যাব না।

রাজা। উদয় তোকে রেখে আসবে।

উদয়। অসম্ভব মহারাজ।

রাজা। অসম্ভব কেন?

উদয়। এখান থেকে বাইরে যাবার লম্বা সুড়ঙ্গের মুখে সেই বিকট রাক্ষস তাহলে আমাদের দুজনকেই নিঃশেষ করবে। একা আমি যেতে পারি। নিজের ওপর কোনো মায়া নেই আমার। কিন্তু চোখের সামনে রাজকুমারীর মৃত্যু আমি সহ্য করতে পারব না। সব দৃশ্য এখনো আমি সয়ে নিতে পারিনি।

লেখক। এসব ভেবেই আমি ওকে এখানে আনতে চাইনি। মেয়েটি বেশ ছিল বাইরে।

শঙ্খ। আপনি না আনলেও আমি আসতুম।

লেখক [দর্শকদের দিকে তাকিয়ে]। মেয়েরা মুখরা হলে কথা বলা শক্ত! যা তা বলে দেবে। কিচ্ছু মানে না।

রাজা। তাহলে আপনিই ওকে এনেছেন?

লেখক [আপন মনে]। দেখছি, সবাই মিলে আক্রমণ করছে! [সাহস এনে] হ্যাঁ, এনেছি।

রাজা। এই যমের পুরীতে একটা কচি মেয়ের সর্বনাশের জন্যে টেনে আনতে মায়া হল না? একফোঁটা স্নেহ নেই মনে! ভিতরটা কি পাথর?

লেখক। কি করব আমি? এই তো হচ্ছে! যা হয়, তাই করেছি। আপনারা কি এখনো বুঝতে পারেননি, পৃথিবীর সবকিছু শক্ত হতে হতে পাথর হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন পর ফুলের পাপড়িগুলো পাথর হয়ে যাবে, নবজাতকের চোখ শক্ত পাথরের, এমনকি কান্না-হাসি—সেও পাথর! স্টোন-এজ, আমরা আবার স্টোন-এজে ফিরে যাব। প্রস্তর যুগের প্রহরী ঐ রাক্ষস। [সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড একটা ঘন্টার শব্দ। বিকট হাসি। ভারি পদক্ষেপের মন্থর শব্দ] রাক্ষস আসছে! যে কেউ তৈরি হন! যে কেউ প্লিজ, সময় নষ্ট করবেন না।

মহারানী [কান্নায় ভেঙে পড়ে তীব্র গলায়]।এত নিষ্ঠুর কেন আপনার কাহিনী?

লেখক। কাহিনী নিষ্ঠুর নয়, নিষ্ঠুর ঐ রাক্ষস।

মহারাজ [তলোয়ার বের করল। তলোয়ারটা মাঝখান থেকে ভাঙা]। আমার হাতে এই ভাঙা তলোয়ার কেন?? কি করব এ দিয়ে আমি?

লেখক। আমার যা ছিল তাই দিয়েছি। আমাদের সব অস্ত্র ভাঙা, নয়তো মরচে ধরা। একদিন স্বপ্নের ভিতর একটা তলোয়ার কে আমার বুকে ভীষণ জোরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আমি টেনে তুলতে গেলুম। আধখানা ভেঙে আমার হাতে

থেকে গেল, বাকী আধখানা আমার বুকের মধ্যে রক্তপাত করছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু কী ভীষণ কষ্ট, আমি বোঝাতে পারব না।

মহারাজ। সেই ভাঙা আধখানা আমার খাপে ঢুকিয়ে দিয়েছেন?

লেখক। এছাড়া কিছু নেই আমার।

উদয়। আমার অস্ত্রে ধার নেই। এ দিয়ে একটা ফুলের বোঁটাও কাটা যায় না। টিনের তৈরি, টিনের তলোয়ার!

মহারানী। রাক্ষসের পায়ের শব্দ এগোচ্ছে। আমি, আমি যাব—তোমরা অন্তত একদিন বেশি বাঁচ।

শঙ্খ। তুমি যাবে না।

মহারানী। আমার বুকের মধ্যে ভয়ঙ্কর ক্ষয়ের অসুখ। বয়স পোকার মতো খেয়ে খেয়ে আমাকে রক্তশূন্য করছে, আমি পৃথিবীর ভার, আমিই যাব।

শঙ্খ। তুমি যাবে না। যতদিন মরে না যাই, মাটি আঁকড়ে ধরে আমরা বাঁচব।

মহারাজ। এই ভাঙা তলোয়ারের অপমান থেকে বাঁচার একমাত্র পথ, ঐ রাক্ষসটার প্রচন্ড ক্ষিদের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। যতক্ষণ আমি বেঁচে, ততক্ষণ তুমি আমাদের আগে মরতে পার না, রানী। আমি যাব। ও আরো কাছে এসেছে, তোমরা অনর্থক বাধা দিও না আমাকে।

শঙ্খ। তুমি যাবে না, বাবা। যেতে পারবে না।

মহারাজ। না গিয়ে উপায় নেই।

শঙ্খ। যাবে না তুমি, যতদিন মরে না যাই, বাতাস আঁকড়ে ধরে আমরা বাঁচব।

উদয়। আমার প্রত্যেকটা শিকড় পোকায় কাটা। একটা ভারী গাছের মতো আমি উপড়ে পড়ে আছি। গায়ে ছিল হাস্যকর যাত্রার দলের সেনাপতির পোশাক। রাগে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। হাতের টিনের তলোয়ারটাও ছুঁড়ে ফেলে দেব। কোনো অর্থ নেই আমার বাঁচার। আমি মরলে পৃথিবীর ওজন বাড়বেও না, কমবেও না। একটা শূন্যের মৃত্যুতে কোনো শোক নেই। আমি যাব।

শঙ্খ। তুমি যাবে না।

উদয়। আমাকে বাধা দেবার কেউ আছে আমি বুঝি না। রাক্ষসটার পায়ের শব্দ প্রায় এসে পড়েছে, আমি যাব।

শঙ্খ। না, তুমি যাবে না। যতদিন মরে না যাই, শেষ আলোটুকু আঁকড়ে ধরে আমরা বাঁচব।

[শব্দটা কাছে এল। খুব কাছে]

লেখক। কিন্তু কে যাবে তাহলে, কে?

শঙ্খ। আমরা কেউ যাব না।

লেখক। কি আশ্চর্য, তা হয় কি করে! একজনকে যেতেই হবে। রাক্ষসটার ক্ষিদে বড় প্রচন্ড। কিছু না-নিয়ে ফিরবে না।

শঙ্খ। তার আমরা কি করতে পারি!

লেখক। তোমরা আমার চরিত্র। আমার কথা শুনতে হবে। আমার কাহিনীর শেষটা

অনিবার্য পরিণামে পৌঁছবেই। আমার ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক—পরিণামে পৌঁছতে হবেই।

শঙ্খ। আমরা অনেকক্ষণ আপনার নির্দেশের বাইরে।

[সম্মিলিত বিদ্রূপের হাসিটা মৃদুস্বরে জাগল]

লেখক। আপনারাও কি ঐ একই কথা বলতে চান?

উদয়। সম্ভবত।

লেখক [রাজা-রানীকে]। আপনারা?

মহারাজ। নিজেদের মধ্যে দ্বিমত হওয়া ভাল নয়।

মহারানী। সবাই মিলে বাঁচব, নাহলে সবাই মিলে মরব।

লেখক। কি অদ্ভুত! শেষপর্যন্ত কাহিনীর চরিত্রগুলো বিদ্রোহী হয়ে উঠবে এত ভয়ঙ্কর পরিণাম আমি ভাবিনি। আপনারা বিশ্বাসঘাতকতা করছেন।

মহারাজ। উপায় নেই।

লেখক। কিন্তু রাক্ষসের কাছে কাউকে যেতে হবে। কে যাবে?

শঙ্খ। আপনি যাবেন। আপনি।

লেখক। আমি? কেন? আমি যাব কেন? এরকম কোনো কথা ছিল না। কি শুনছি আমি!

[তলোয়ার বের করল]

উদয়। আপনাকে যেতে হবে।

[ভাঙা তলোয়ার বের করল]

মহারাজ। হ্যাঁ, প্রথমে আপনি।

মহারানী। আমাদের ফেলে পালাতে পারবেন না।

[দরজা আড়াল করে দাঁড়াল]

শঙ্খ। রাক্ষসের দিকে কত হাসিমুখে যেতে পারেন, আমি দেখব।

লেখক। অসম্ভব, আমি যেতে পারি না। আমি পালাব।

উদয়। কোথায়?

লেখক। অন্য কোথাও।

মহারাজ। কোথায়?

লেখক। অন্য কোথাও।

শঙ্খ। কোনো পথ দিয়ে যাবেন?

লেখক। জানি না।

উদয়। তাহলে কেমন করে পালাবেন?

লেখক। জানি না। হা ঈশ্বর, আমি জানি না কেন? [সম্মিলিত হাসি তীব্র হল। তারপর মৃদু হয়ে মিলোল] সেই হাসি! আমার অসহায়তা নিয়ে সেই হাসি! কোথায় পালাব? কেমন করে পালাব।

মহারানী। যে পথ দিয়ে এখানে ঢুকেছেন, সেই পথটা মনে নেই?

লেখক। না, বড় অন্ধকার ছিল। আমার উপায় নেই। কোথায় পালাব? চারদিকে

পাথর, পাথর, পাথর। স্টোন-এজ। পাথরের মতো পা ফেলে রাক্ষসটা এসে দরজায় দাঁড়াবে। ওর বিকট হাসির ধারালো শব্দে আমি কেটে কেটে যাব। আমি যাব না, যাব না। [রাক্ষসের একটা বিশাল হিংস্র রূপ নিঃশব্দে পর্দার দরজায় ছায়া ফেলল] দেখুন, তাকান আপনারা; ঐ সেই রাক্ষস! কী বিকট লোভ, কী তীক্ষ্ণ দাঁত! কী বিশ্রী অসহায় লাগছে! [সেই বিদ্রূপমেশানো মিলিত কণ্ঠে হাসি মর্মরিত হয়ে উঠল] চারদিকটা আমাকে নিয়ে কী নিষ্ঠুরের মতো হাসছে! [চেঁচিয়ে] অসহ্য! থামো, থামো, [হাসিটা আরো জোরে হল] আগে এই হাসিগুলোর তবু দয়া ছিল, এখন ওদের ঠাট্টা এত নির্মম!

[এবার রাক্ষসটা হেসে ওঠে, ছায়া দীর্ঘতর হয়, সম্মিলিত হাসি থেমে যায়। রাক্ষসের একক হাসিটা আর-একবার শোনা যায়]

উদয়। আপনি এখনো না গেলে রাক্ষসটা দরজা ভেঙে ঢুকবে। আপনি যান।

মহারাজ। রাক্ষসের ক্রোধ অহেতুক বাড়িয়ে কি লাভ?

লেখক। কিন্তু আমি যে বাঁচতে চেয়েছিলাম। রাক্ষসের বিষাক্ত নখে আমি কী ভীষণ খণ্ড খণ্ড হয়ে যাব! কি অদ্ভুত সুন্দর ছিল পৃথিবীটা, রঙিন ঘুড়ির মতো সুতো ছিঁড়ে আমি কোথায় যাব! [ভয়ে ভয়ে এগোতে লাগল] মহাপ্রস্থানের পথ!

[পর্দার দরজার দুপাশে উদয়াদিত্য এবং মহারাজ। লেখক এগোতে এগোতে হঠাৎ ওদের কোষের তরবারি দুটো দুই হাতের মুঠোয় ধরল। ক্রমশ ওর শরীর শক্ত হতে লাগল, বক্ষ বিস্ফারিত, দৃষ্টি ঋজু ও তীক্ষ্ণ। একসময় দ্রুতভঙ্গিতে পর্দা সরিয়ে বাইরে রাক্ষসের মুখোমুখি দাঁড়াল। রাক্ষসের দানবীয় ছায়ার মুখের দিকে লেখকের উদভ্রান্ত তাকিয়ে থাকা মুখের ছায়া দেখা গেল। যেন পরস্পর নিঃশব্দে দ্রুত কিছু বুঝে নিচ্ছে। হঠাৎ রাক্ষস ধীরে ধীরে পিছনে সরতে লাগল, লেখক তীব্রভাবে তাকিয়ে অনুসরণ করছে। রাক্ষসের পায়ের শব্দ মৃদু হতে লেখক পর্দার দরজা হঠাৎ সরিয়ে উজ্জ্বল বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ঘরের সকলের দিকে তাকাল]

লেখক। আশ্চর্য! দেখেছেন—আমি ফিরে এলাম। আমি মরিনি! জানেন, রাক্ষসটা আমাকেও ভয় পাবে ভাবতে পারিনি। আমি সোজা ওর চোখের দিকে তাকাতে হঠাৎ কেমন ভয় পেয়ে গেল। চোখের সোজা দৃষ্টিতে অতবড় একটা জন্তু কী নিদারুণ অসহায় হয়ে পালাল। আসুন, আমরা আস্তে আস্তে এই ভয়ঙ্কর জায়গাটা থেকে বাইরে যাই। সোজা তাকাবেন, স্পষ্ট, সোজা তীব্র—রাক্ষসটা ঠিক ভয় পাবে। এত ভাল লাগছে আমার, ইচ্ছে করছে, একটা চমৎকার মুকুট পরে প্রথম বাইরের আলোতে বেরুব। আসুন, আসুন আপনারা—

[সকলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল]

লেখক [বাইরে থেকে]। দেখছেন, কেউ হাসছে না আমাকে নিয়ে। আর কেউ ঠাট্টা করে দল বেঁধে হেসে উঠছে না। এখন আমারই হাসি পাচ্ছে, তুমুল হাসি তুমুল। কী ভীষণ ভাল লাগছে!

[তীব্র ঝংকারে উত্তাল প্রাণের কল্লোল জাগিয়ে তারযন্ত্র বেজে উঠল]

এক যে ছিল রাজা

রবীন্দ্র ভট্টাচার্য

চরিত্রলিপি

রাজা
সত্যকাম
ভুঁইদাস
ভণ্ড
রক্ষক
তের
সতের
ছাব্বিশ
একান্ন

নেপথ্যে ঘোষণা।—আমি বলছি, আমরা বলছি, আমরা সকলে বলছি, আমরা সকল নিপীড়িত লোকেরা বলছি। তুমি শোন, তোমরা শোন, তোমরা সকলে শোন, অতীত ইতিহাসের চরিত্রেরা শোন। জানকী এলেন জনক রাজার লাঙলের ফলাতে। অত্যাচারী রাবণ নিঃশেষ হল। আমাদের লাঙলের ফলাতে পেয়েছি তোমাদের কঙ্কাল, তোমাদের পাঁজর ভাঙা কঙ্কালগুলো আমাদের চেতনা জাগাচ্ছে। আমাদের নুয়ে পড়া শরীরগুলো আবার সোজা হয়ে দাঁড়াতে চাইছে। তোমরা ইতিহাসের নগণ্য চরিত্র। তোমাদের মৃত্যুর কথা লেখা আছে কিন্তু রক্তের দাগ ইতিহাসে নেই। কেন? আমাদের রক্তের দাগ কি সভ্য ইতিহাস বহন করবে না! আমরা যে মরছি চিৎকার করছি আর্তনাদ করছি। আমাদের বাঁচার রাস্তা চাই। [আস্তে আস্তে পর্দা খোলে] তোমরা বল তোমরা কেমন করে বিদ্রোহ করতে চেয়েছিলে। কেমন করে জনকরাজার কুটিরে আশ্রয় নিতে রাবণ বধ করতে চেয়েছিল। বল-হে অতীত কথা কও, হে অতীত কথা কও, কথা কও-কথা কও।

[এবার সম্পূর্ণ পর্দা খোলে। একদিকে শস্যনগরীর প্রতিনিধি তের ও ছাব্বিশ। তাদের পরনে ফিকে সবুজ রং-এর হাফহাতা ফতুয়া হাঁটুর নিচ পর্যন্ত সবুজ রং-এর পাজামা। জামার পেছনে কাস্তে আঁকা। অন্যদিকে বিশ্বকর্মা নগরীর প্রতিনিধি সতের ও একান্ন। এদের পরনে হলদে রঙ-এর ফুলহাতা ফতুয়া ও নিচের দিকে চাপা ঐ রঙ-এর পাজামা এবং পেছনে হাতুড়ি আঁকা। এরা এতক্ষণ যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্তনাদ করছিল এবার খুব আস্তে আস্তে গান গেয়ে চলে]

হায়-হায়-হায়
রাজার দেশের প্রজা আমরা,
খেতে পাই যা দেয় আমলা,
হায়-হায়-হায়। হায়-হায়-হায়।
খাওয়া দায়, পরা দায়, চলা দায়, বাঁচা দায়।
হায়-হায়-হায়।

[দেখা যায় তের ছাব্বিশ ইত্যাদি মহারাজের বিচারশালায় বন্দী। তাদের নুয়ে পড়া শরীর উঠে দাঁড়াতে চায়। গান শেষ হলে হাতে চাবুক নিয়ে প্রবেশ করে রক্ষক। পরনে বাঘছালের জামা। হাতে, পায়ে, বুকে, কোমরে চামড়ার বেল্ট। মাথায় লোমশ টুপি]

রক্ষক। মহারাজের আদেশ তোমরা শুনতে পাওনি?

সকলে। শুনেছি রক্ষক।

রক্ষক। বিচার না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের দুঃখ করা নিষেধ।

সকলে। আমরা জানি।

রক্ষক। হায় হায় করে তোমরা তোমাদের অপরাধের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলছ তোমরা জান?

সকলে। জানি রক্ষক।

রক্ষক। তা সত্ত্বেও তোমরা অন্যায় করতে সাহস কর?

সতের

আমাদের রাজা এখন বিশ্বকর্মানগরে।

একান্ন

তের

আমাদের রাজা এখন শস্যনগরে।

ছাব্বিশ

রক্ষক। এইমাত্র সংবাদ এসেছে মহারাজ বিচারনগরীর প্রধান তোরণ পার হয়ে বিচারশালার দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছেন।

সকলে। আমাদের কি হবে?

রক্ষক। মহারাজ তোমাদের বিচার করবেন।

তের [উঠে দাঁড়ায়]। আমি তো কোন অন্যায় করিনি।

সতের [উঠে দাঁড়ায়]। মহারাজকে আমি দেবতাজ্ঞানে পূজা করি।

রক্ষক। তোমরা আহাম্মক।

তের। আমি সত্যি কথা বলে মহারাজের দয়া ভিক্ষা করব।

রক্ষক। তার আগে আমার চাবুকের ঘায়ে তোমার প্রাণ যাবে।

সতের। আমার ছেলেকে আমি সত্যিই পাঠাইনি শস্যনগরে। ভুঁইদাস মিথ্যে করে—।

রক্ষক। যতদিন ভুঁইদাস মহারাজের অস্ত্রের মতো কাজ করবে, ততদিন জীবন দিয়েও তার কথা মানতে হবে।

তের। তুমি কি আমাদের হয়ে কথা বললে।

সতের। তোমার কি আমাদের জন্যে দুঃখ হচ্ছে।

রক্ষক। না, আমি তোমাদের কেউ নেই। আমি মহারাজের আজ্ঞাবহ দাস।

ছাব্বিশ [উঠে দাঁড়ায়]। আমি কিন্তু তোমাকে চিনেছি।

একান্ন [উঠে দাঁড়ায়]। আমার মনে হচ্ছে তুমি আমাদেরই মতো মানুষ। মহারাজের আদেশে যন্ত্রের মতো কাজ করে চলেছ।

রক্ষক। তোমরা শাস্তি পাবার উপযুক্ত হয়ে উঠেছ।

একান্ন। কিন্তু তোমার বিবেকটাকে কি তুমি বিসর্জন দিতে পারবে রক্ষক?

রক্ষক। বি-বে-ক!

ছাব্বিশ। হ্যাঁ বিবেক। তুমি মহারাজের জন্যে আমাদের শাস্তি দাও। কিন্তু আমাদের মতো অভাবই তোমাকে মহারাজের দাস তৈরি করেনি কি?

রক্ষক। মহারাজ বলেছেন, উপযুক্ত সময়ে আমার বিনা উপস্থিতিতেই তুমি তোমার অস্ত্র ব্যবহার করবে।

[চাবুক চালায়]

একান্ন। মহারাজ বিচার করবার আগেই তুমি যদি আমাদের শেষ করতে পার তাহলে আমরা মুক্তি পাব রক্ষক।

রক্ষক। আমি তা পারি না মনে করেছ।

তের। আমাকে তুমি মেরেই ফেল রক্ষক। নয়নকে ওরা যেভাবে মেরে ফেলেছে সে দৃশ্য আমি ভুলতে পারছি না। আমি পাগল হয়ে যাব শেষকালে।

রক্ষক। আমার যদি সে ক্ষমতাই থাকত তাহলে তোমাদের মুক্তি দেবার জন্য আমি চিন্তা করতাম না।

সকলে। মুক্তি!

তের। কিন্তু আমি মুক্তি নিয়ে কি করব, রক্ষক?

সতের। বাইরের আকাশ ঠিক সেরকম আছে রক্ষক?

ছাব্বিশ। চন্দ্র সূর্য ঠিকমত উঠছে, রক্ষক?

একান্ন। মহারাজের বিচারটা প্রত্যক্ষ না করে মুক্তি আমি চাই না, রক্ষক।

রক্ষক। তোমরা প্রত্যেকেই মহারাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চাইছ।

সকলে। না।

রক্ষক। তাহলে মহারাজের প্রতি এ অশ্রদ্ধার কারণ কি?

তের। এ আমার একমাত্র মেয়েকে যারা ছিনিয়ে নিয়েছে, মহারাজ তাদের প্রতি সুবিচার করুন এটাই আমার একমাত্র ইচ্ছা।

সতের। আমার ছেলে উপযুক্ত হয়েছে। তার শস্যনগরে গিয়ে কাজ নেওয়াটা আমার অপরাধ কেন হবে তা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

ছাব্বিশ। আমরা দুনগরী এক হয়ে বাঁচতে চাওয়াটা কি অন্যায়।

একান্ন। মহারাজ আমার হৃৎপিন্ডটা একটু একটু করে কেটে নিতে পারেন যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি আমি জানি আমরা কেউ পৃথক নই। আমাদের আলাদা সত্তা নেই। মহারাজ নিজের প্রয়োজনে আমাদের ছোট বড় ভেদ করিয়ে রেখেছেন।

রক্ষক। তুমি ভীষণ! তুমি মারাত্মক! তুমি বিদ্রোহী!

একান্ন। মিথ্যে কথা। আমি মানুষ, আমি সত্যবাদী। আমি ন্যায়নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবান।

রক্ষক। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি মহারাজের ভুঁইদাসের পুঁথির ঘরে প্রবেশ করে থাক।

একান্ন। শুধু আমি নই। আজ হাজার হাজার নাগরিক পুঁথি পড়ার সুযোগ পায়।

রক্ষক। কে—-কে সেই পুঁথির মালিক?

একান্ন। সত্যকাম।

সকলে। সত্যকাম!

রক্ষক। না—ভক্ষক।

ছাব্বিশ। না। মহারাজের দেওয়া নামে আমরা তাকে ডাকব না। আমরা বলব—

সকলে। সত্যকাম।

রক্ষক [চাবুক শূন্যে চালিয়ে]। মহারাজের আদেশে ওর নাম হয়েছে ভক্ষক।

একান্ন। মহারাজের আদেশ আমি মানি না।

রক্ষক। মহারাজ তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন।

ছাব্বিশ। আমিও মৃত্যুদণ্ড নেবার জন্যে তৈরি। সত্যকামের পথই আমার পথ।

রক্ষক। বেশ মহারাজকে তোমরা সেই মতই জানিও।

তের। তুমি মাথা নিচু করলে কেন, রক্ষক?

সতের। তুমি কি আমাদের জন্যে ভাবছ?

রক্ষক। কে! কে বললে। একদম মিথ্যে কথা। আমি মহারাজের আদেশের জন্যে তৈরি।

তের। আমার জন্যে তোমার মনে কি কোনো দুঃখ নেই রক্ষক!

রক্ষক। আমার মেয়েটা বোধহয় তের বছরে পড়ল। জান ওর আজ জন্মদিন।

একান্ন। তোমার মনেও দুঃখ আছে, রক্ষক!

রক্ষক। কে, কে বলেছে তোমাকে?

ছাব্বিশ। তোমার মন বিদ্রোহ করতে চাইছে। তুমি আমাদের মতো বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইছ।

রক্ষক। মিথ্যে কথা। আমি কোনোদিন তা ভাবিনি। আমার হাতের চাবুকই তার প্রমাণ। উপযুক্ত সময়ে অস্ত্রের ব্যবহার করাই আমার কাজ।

[ছাব্বিশকে চাবুক মারে]

সতের। আমরা তো কোন অন্যায় করিনি রক্ষক। শস্যনগরীর কিছু লোক আমাদের নামে মিথ্যে লাগিয়েছে।

তের। বিশ্বকর্মানগরীর লোকেরাই শস্যনগরীতে বিদ্রোহ করতে চেয়েছিল। আমরা দায়ী হব কেন?

একান্ন। আমি বলছি বন্ধু—তোমরা আলাদা করে বাঁচতে চাইছ কেন?

ছাব্বিশ। আলাদা করে বাঁচতে চাইলে আমরা শক্তিহীন হয়ে পড়ব। আমরা ভাবব আমাদের কোনো পৃথক সত্তা নেই। আমরা সকলে এক!

সতের। ওঃ—তুমি চুপ কর।

একান্ন। এটা কারুর মঙ্গলের পথ নয়।

তের। আমি আমার মেয়ের জন্য দুঃখ জানাব। আর এ-ও বলব যে বিশ্বকর্মানগরীর উসকানিতেই ভুঁইদাস আমাদের ওপর অত্যাচার চালায়।

রক্ষক। তোমরা চুপ না করলে আমি শাস্তি দিতে বাধ্য হব।

একান্ন। তুমি আমাদের সকলের হয়ে লড়াই কর—রক্ষক।

রক্ষক। চুপ কর। আমি দুর্বল হব না। আমি বিশ্বাসঘাতকতা করব না। পরিচয় দাও। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না। এই ঘাসকাটার বাচ্ছারা পরিচয় দে।

[তেরকে চাবুক দিয়ে আঘাত]

তের। শস্যনগরীর তের।

ছাব্বিশ [রক্ষক আঘাত করার পর]। শস্যনগরীর ছাব্বিশ।

রক্ষক। হাতুড়ি ঠেঙাড়ের দল, পরিচয় দে।

সতের [রক্ষক আঘাত করার পর]। বিশ্বকর্মানগরীর সতের।

একান্ন [রক্ষক আঘাত করার পর]। বিশ্বকর্মানগরীর একান্ন।

রক্ষক। আজ তোমার সঙ্গে আর একজনের বিচার হবে।

সকলে। কার?

রক্ষক। ভক্ষক।

সকলে। সত্যকাম!

রক্ষক [চাবুক হাত থেকে পড়ে যায়]। সত্যকামকে আমরা কেউ ভালবাসতে পারলাম না বন্ধু।

সকলে। রক্ষক তুমি আমাদের!

রক্ষক। আ-আ-আমি। [চাবুক কুড়িয়ে নেয়] না—আমি তোমাদের কেই নই। মহারাজ বলেছেন, ভক্ষক দুনগরীকে শোষণ করছে।

তের। সত্যকাম আমাদের।

সতের। সত্যকাম আমাদের।

রক্ষক। কেউ না। ওর নাম ভক্ষক। বল ভক্ষক। বল—তোমাদের বলতে হবে ভক্ষক।

[রক্ষক সকলকে চাবুক মারে। সকলে মাটিতে পড়ে যায়]

রক্ষক। আমি মহারাজের নুন খেয়েছি। আমি তার আজ্ঞাবহ দাস। তোমাদের শূন্যগর্ভ বক্তৃতা আমাকে ফাঁসির দড়ি দেখাবে। আমি তা পারব না—কিছুতেই পারব না—কিছুতেই না। [প্রস্থান]

তের। [যন্ত্রণার সঙ্গে] সত্যি করে বলত তোমরা, সত্যকাম কি আমাদের কাছে কোনোদিন লোভী হয়ে উঠেছে!

সতের। আমার তা কোনোদিন মনে হয়নি।

তের। আমাদের যাতে দুটো ভাল খাবার জোটে আমাদের ছেলেমেয়েরা যাতে সুখে থাকতে পারে তার জন্যে ভেবেছে সত্যকাম।

সতের। উদয়াস্ত খাটুনির বদলে আমরা যাতে উপযুক্ত খাদ্য পেতে পারি তার জন্যে বলতে শিখিয়েছে সত্যকাম আর তার দলের লোকেরা।

তের [উঠে দাঁড়ায়]। আমার মেয়ের অত্যাচারের প্রতিকারে সত্যকাম এগিয়ে এসেছিল।

সতের [উঠে দাঁড়ায়]। আমাদের বন্ধুদের যখন চিমনির মধ্যে ঢুকিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হল, তখন সত্যকাম আমাদের কাজ বন্ধ করার দায়িত্ব নিয়েছিল।

একান্ন [উঠে দাঁড়ায়]। আমি তা বলেছি। আমি দুজনের কথাই বলেছি।

ছাব্বিশ। [উঠে দাঁড়ায়] আমরা এখনও বলছি। তোমরা আমাদের দুনগরীকে এক করে দেখার চেষ্টা কর।

তের। তুমি চুপ কর।

একান্ন। তোমরা ভুল কর না।

সতের। মহারাজের বিচারের আগে আমরা তোমাকেই শেষ করব।

ছাব্বিশ। আমরা নিজেদের ক্ষতিটা এখনও বুঝতে পারব না!

একান্ন। আমরা এক হলে অনেক শক্তি পাব।

সতের। তুমি কথা বলবে না।

একান্ন। আমি বলব। বলব সত্যকাম আমাদের দুনগরীর।

ছাব্বিশ। কেউ তাকে আলাদা করে ভাবতে পারবে না।

[ছাব্বিশ এবং একান্নকে যথাক্রমে তের ও সতের সজোরে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। সেই সঙ্গে যৌথভাবে বলে]

তের ও সতের। ভাববো ভাববো আমরা ভাববো।

একান্ন। তোমাকে আমাকে আঘাত করলে! [মাটিতে পড়ে]

সতের। আঃ—তুমি চুপ কর। [যন্ত্রণার সঙ্গে]

ছাব্বিশ। আমি কী অন্যায় করেছি বলবে বন্ধু?

তের। আমি—আমি জানি না। [যন্ত্রণার সঙ্গে]

ছাব্বিশ। অথচ তোমরা আমাকে পর করে দিলে।২ তের। মিথ্যে কথা। আমরা তোমাকে বন্ধু বলেই জানি।

ছাব্বিশ। তাহলে তোমরা আমাকে পীড়ন করলে কেন?

তের। আমরা নিজেরা আগে বেঁচে নিই বন্ধু।

একান্ন। যায় না। কখনো কেউ একলা বাঁচতে পারে না।

[নেপথ্যে চাবুকের শব্দ ও সত্যকামের আর্তনাদ।—সকলে সত্যকামের সঙ্গে যন্ত্রণাকে নিজের যন্ত্রণা বলে মনে করে]

তের। ওরা সত্যকামকে যন্ত্রণা দিচ্ছে।

সতের। সত্যকামকে যদি ওরা শেষ করে!

একান্ন। পারবে না!

ছাব্বিশ। ওরা ভয় পায় সত্যকামকে।

তের। তাহলে ওকে যন্ত্রণা দিচ্ছে কেন?

একান্ন। ওরা আমাদের মন ভেঙে দিতে চাইছে।

সতের। সেইজন্যে ওরা সত্যকামকে শাস্তি দেবে বলতে চাও!

ছাব্বিশ। তাইতো দেবে। ওরা জানে আমরা এক হতে পারব না।

একান্ন। আমরা এক হয়ে মহারাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারব না।

তের। আমরা এক হলে মুক্তি পাব কি করে?

একান্ন। মহারাজের অত্যাচারের যোগ্য জবাব চাইব। আমাদের তোমাদের চেয়ে বড় করে রেখেছ কেন?

সতের। সত্যকাম বলে, আমাদের মধ্যে পার্থক্য আনবার জন্যে মহারাজ শস্যনগরীকে ছোট করে দেখান।

ছাব্বিশ। তাহলে তোমরা বুঝতে চাও না কেন—আমাদের দুজনকে একসঙ্গে প্রতিবাদ করতে হবে?

একান্ন। মরবার আগে একবার লড়াই করে যাই না বন্ধু।

তের। কেমন করে করব?

একান্ন। সত্যকামকে ভুলব না।

ছাব্বিশ। মহারাজের সামনে চিৎকার করে বলে যাব—সত্যকাম আমাদের রাজা। তুমি আমাদের কেউ না।

সতের। ওঃ—কী ভীষণ তোমাদের পরিকল্পনা। ওরা আমাদের সকলকে সারমেয়র সামনে ছেড়ে দেবে। আমাদের মাংস টুকরো টুকরো করে খাবে মহারাজের মানুষখেকো কুকুরগুলো।

[নেপথ্যে চাবুকের শব্দ ও সত্যকামের আর্তনাদ—শস্যনগরীর সকলে আমার ভাই। বিশ্বকর্মানগরীর সকলে আমার বন্ধুর মতো। ওরা সকলেই আমার ভাই বন্ধু ওদের ছাড়তে আমি পারব না—। আ—। পুনরায় আর্তনাদ]

তের। ওকে কি ওরা মেরে ফেলবে।

[সকলের যন্ত্রণা]

সতের। আমরা ওকে বাঁচাতে পারব না।

একান্ন। না-না-না।

তের। না?

একান্ন। ওকে বাঁচাবার মতো মনের জোর আমাদের নেই। আমরা একা একা বাঁচতে চাইছি।

ছাব্বিশ। কিন্তু সত্যকাম আমাদের সকলকে ভাই বন্ধুর মতো ভালবাসে।

একান্ন। সত্যকাম বলে দুঃখ দূর করতে হলে নিজের দুঃখ বুঝতে হবে, অপরের দুঃখে কাঁদতে হবে।

ছাব্বিশ। নিজের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে হবে। অপরের ওপর অত্যাচারকে নিজের বলে ভাবতে হবে।

তের। আমি তা পারব। আমার নয়নকে আমি হারিয়েছি, সেই অত্যাচারের বিচার করতে হবে ঐ মহারাজকে।

সতের। আমার ছেলে শস্যনগরে গিয়ে কি অন্যায় করেছে আমি তা জানতে চাইব।

একান্ন। আমরা শস্যনগরীর মতোই মানুষ। তবু আমাদের ওদের চেয়ে খাদ্যের বরাদ্দ বেশি কেন?

সতের। কেন বন্ধু?

একান্ন। আমরা যাতে নিজেরা ঝগড়া করি। সব সময় মনে রাখি তোমাদের চেয়ে আমাদের মর্যাদা অনেক বেশি।

ছাব্বিশ। তোমাদের ভাল পোশাক দেয়, কিন্তু আমাদের—।

তের। আমাদের থাকবার ঘরে জল পড়ে। সূর্যের আলো প্রবেশ করে।

ছাব্বিশ। আমাদের থাকতে দেওয়া হয় কুঁড়েঘরে। ওরা বলে, তোমরা বেশি পরিশ্রমী তোমরা বেশি সম্মান পাবার যোগ্য। তোমরা মানুষ আর আমরা কেউ মানুষ নই বলতে চাও!—বল, উত্তর দাও—।

[নেপথ্যে ডুগডুগি বাজার শব্দ, হেলতে দুলতে হাতে অঙ্কুশ নিয়ে প্রবেশ করে বিচিত্র পোশাক পরিহিত ভুঁইদাস]

ভুঁই। হে-হে—। কথা বলছিস না কেন? অ্যাঁ—কথা বল, কথা বল।

তের। ঐ দাসপ্রভু আমার মেয়েকে খুন করেছে।

ভুঁই। অ্যাই অ্যাই তোরা কি আমার এই সুন্দর দেহটাকে কুকুরের পেটে দিতে চাস? এই কথা বলছিস না কেন? কথা বল।

সতের। তার আগে বলুন, ঐ শসানগরীর লোকেরা ছোটলোক কিনা।

ভুঁই। ছোটলোক মানে! দুর্দান্ত ভীষণ অসম্ভব ছোটলোক হে—হে।

তের। আমাদের রক্তে রোয়া ধান দিয়ে আপনাদের সেবা করি না বলতে চান?

ভুঁই। ছিঃ ছিঃ ছিঃ এ কেমন কথা। আজ তোদের কোনো মূল্য নেই বলে কি তিনপুরুষ বাদে তার কোনো মূল্য পাব না, তোদের বংশধরদের কাছে। অ্যা—। তোদের জন্যে মহারাজকে বলে কত নতুন নতুন ব্যবস্থা করেছি বল—অ্যা।

তের। কিন্তু আমার মেয়েকেও আপনি শেষ করেছেন।

ভুঁই। ভগবান। ভগবান যদি তোদের ছোট করে দেখেন তাতে আমি কি করতে পারি বল! না কি বলিস সতের হে—হে?

সতের। ঠিক কথা দাসপ্রভু।

ভুঁই। তবু পরিত্রাতা মহারাজ তোদের খাবার বন্দোবস্ত করেছেন এটাই তো যথেষ্ট ওাঁ।

একান্ন। তাহলে আমাদের চেয়ে খাদ্য ওরা কম পায় কেন?

ছাব্বিশ। মানুষ হিসেবে ওরা আমাদের চেয়ে বড় হল কি করে?

ভুঁই। মানুষ! মানুষ বলতে নেই। বল দাস। মহারাজের দাস তোরা হে—হে। আমি তোদের প্রভু—এাঁা। এবার বলতো সকলের চেয়ে বেশি খাদ্য ভাল খাদ্য মহারাজের কেন? কথা বলছিস না কেন অ্যাঁ!

সতের। আমি বলছি ওরা বুঝতে চাইছে না।

ভুঁই। ভগবান যাকে যেমন করে পাঠিয়েছেন তাকে তেমন কর্ম করতে হবে বৈকি।

ছাব্বিশ। আর আপনি?

ভুঁই। আমি—আমি কি অ্যাঁ। ফাজিল বকা কোথাকার।

তের। আমরা মহারাজকে মানব, আপনাকে মানব না।

ভুঁই। তা কি হয় রে! আমরা যে মহারাজের ইচ্ছা। মহারাজ একা তোদের পালন করতে পারেন না বলেই তো আমাদের নিয়ে এসেছেন ভগবানের ইচ্ছেয়। কিরে কিছু বুঝলি অ্যাঁ!

তের। তাহলে আমার মেয়েকে আপনি জোর করে নিজের প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে দাসী করলেন কেন?

ভুঁই। সে কি আমার ইচ্ছেয় রে! ভগবানের ইচ্ছেয় বাড়তি যুবতীদের আমাদের প্রাসাদে দাসীর কাজে লাগতে হচ্ছে। এতো তোদের ভাগ্যিরে—অ্যাঁ।

তের। মহারাজ আমাদের তেমন কোনো নির্দেশ দেননি।

ভুঁই। মহারাজের সব নির্দেশ কি প্রত্যক্ষভাবে হয় রে। অপ্রত্যক্ষ নির্দেশ বোঝবার ক্ষমতাই যদি তোদের থাকবে তাহলে তোরা ছোটলোক হবি কেন?

তের। সেই জন্যে বুঝি আমার মেয়েকে আপনি খুন করবেন?

ভুঁই। হে-হে। হে-হে-। মেরে ফেললাম। কি আহাম্মকরে তোরা। তোদের কি কোনো কালে একটু মানুষের মতো বুদ্ধি হবে না।

তের। আমার মেয়েকে আপনার প্রাসাদের ওপর থেকে নিচে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

ভুঁই। অ্যাঁ—কি বললি। কে—অ্যাঁ নাম বল, নাম বল?

তের। আপনি জানেন না বুঝি?

ভুঁই। ও—হে-হে—বুঝেছি বুঝেছি অ্যাঁ। তুই রাগ করেছিস। তা অমন ডাগর মেয়েটা কি বলে ছাদের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ল? ওর মাথাটা অনেকদিন ধরেই খারাপ চলছিল।

ছাব্বিশ। আপনার বাড়িতে গিয়ে তার মাথা খারাপ হয়ে গেল বুঝি!

ভুঁই। তুই আবার মাথা গলাচ্ছিস কেন?

একান্ন। আমাদের কথা আমরা ভাবব না তো কি দাসপ্রভুরা ভাববেন নাকি?

ভুঁই। তাইতো চিরকাল ভেবে এলাম রে—

ছাব্বিশ। এবার আমরা নিজেরাই ভাবব ভাবছি।

ভুঁই। বেশ তো তোর কথা তুই ভাব। আর মহারাজকে বলব যাতে তোর কথা ভাবেন।

একান্ন। ভয় পাব মনে করেছেন বুঝি!

ভুঁই। না-না। তা ভাবব কেন? আমার তো অ্যাঁ—এসব ব্যাপার—অ্যাঁ—

একান্ন। বলুন নয়ন মরল কেন?

সতের। অত চিৎকার করলে উনি মহারাজকে—।

একান্ন। তুমি চুপ কর।

ভুঁই। ঠিক আছে। আমি চললাম—অ্যাঁ।

[প্রস্থানোদ্যত। একান্ন পথ আটকায়]

একান্ন। উত্তর না দিলে আপনি এখান থেকে যেতে পারবেন না।

ভুঁই। না-না। যাব কেন? তোরা কি আমার পর? [আবার প্রস্থানোদ্যত। একান্নর পথ অবরোধ] তা মেয়েটা প্রাসাদের দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে কপাল ফাটাল। এতে আমার—

সতের। এতে দাসপ্রভু কি করবে ছাব্বিশ?

ছাব্বিশ। এ ব্যাপারে তোমার কোনো কথা বলার অধিকার নেই।

ভুঁই। হ্যাঁ। তা তো বটেই। তুই মাথা গলাচ্ছিস কেন?

একান্ন। চিৎকার করলেই সত্যি মিথ্যে হয়ে যাবে! হ্যাঁ না হয়ে যাবে মানে করেন?

ভুঁই। আমার কষ্ট হচ্ছে। আমাকে মেরে ফেললে। আমি পড়ে যাব।

[টলতে টলতে পড়ে যাবার ভান করে। বাইরে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। ভুঁই আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। চারিদিকে ঘুরে নাচতে থাকে]

ভুঁই। আসছেন—আসছেন—। মহারাজ আসছেন। মহারাজ তোদের চোখে অঙ্কুশ বেঁধাতে বলবেন।

[শিঙার আওয়াজের পর বাইরে থেকে ঘোষণা—"ত্রিকালজ্ঞ, মহাজ্ঞানী, সর্বজনধন্য দেবাংশ, দিগ্বিজয়ী মহারাজ হর্ষ-জ্যোতিষ্ক মহাপ্রভু-উ-উ-উ-উ।" ভুঁই তার হাতের অঙ্কুশটা সামনের টেবিলে রেখে করজোড়ে দাঁড়ায়। হাতে একটা বিরাটাকার চকচকে বিদ্যুৎ দণ্ড নিয়ে হেলতে দুলতে প্রবেশ করে বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত মহারাজ। তার পিছনে বিচিত্র পোশাকে মাথায় একটা পালকের টুপি পরিহিত রানারদের মতো ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করে ভণ্ড। মহারাজকে দেখে তের ও সতের ঘাড় নিচু করে বসে। ছাব্বিশ ও একান্ন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। মহারাজ সকলকে বিদ্যুতের দণ্ড স্পর্শ করায়। সকলে যন্ত্রণায় চিৎকার করে। মহারাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হবার পর হাতের মুগুরটি সামনের টেবিলে রাখে। ভণ্ড মহারাজের মাথার মুকুটটি খুলে সামনের টেবিলে রাখে। ভণ্ড পাঁচালী পড়ার মতো সুর করে কথা বলে]

মহারাজ। আমি বসেছি।

ভণ্ড। বসেছেন।

[মহারাজের প্রায় প্রতিকথার শেষাংশ ভণ্ড বলবে]

ভুঁই। মহারাজের জয় হোক।

মহারাজ। বিচারশালায় নিশ্চয় সকলে সুখে শান্তিতে—।

ভণ্ড। ছিলে।

মহারাজ। ঐ দুটো নরকের কীট কী বধির, অন্ধ। ওরা আমাকে সম্মান দিল না ভণ্ড।

ভণ্ড। শস্যনগরীর ছাব্বিশ আর বিশ্বকর্মা নগরীর একান্ন।

মহারাজ। যারা হাজার হাজার মানুষ খুন করেছে?

ভণ্ড। মহারাজের বরাদ্দ তণ্ডুল ওরা জোর করে কেড়ে নিয়ে সকলের মধ্যে বণ্টন করেছে। নিজেরাও ভক্ষণ করেছে।

মহারাজ। হাজার হাজার তণ্ডুলকে ওরা খুন করেছে বলছ না কেন ভণ্ড?

ভণ্ড। আমি ত তাই বলতে চাইছি মহারাজ।

মহারাজ। ওহে হাতুড়ির বাঁট শুনতে পাচ্ছ?

ভণ্ড। শুনতে পাচ্ছিস?

একান্ন। তাতে কিছুই যায় আসেনা মহারাজ।

মহারাজ। তা বেশ। তোরা যে মহারাজকে কিছু বলতে শিখেছিস এটাই যথেষ্ট। তা লাঙলের ফলা তোরও কি ঐ একই কথা?

ভণ্ড। একই কথা?

ছাব্বিশ। আমি আলাদা করে কোনোদিন ভাবিনি। জীবনে কোনোদিন ভাবতেও চেষ্টা করব না।

মহারাজ। রক্ষক—।

ভণ্ড। [উঠে দাঁড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে দরজার কাছ পর্যন্ত ডাকতে ডাকতে যায়] রক্ষক——রক্ষক——রক্ষক——। [ফিরে আসে। রক্ষক এসে দাঁড়ায়]

মহারাজ [ছাব্বিশ ও একান্নকে দেখিয়ে]। ওদের মাটিতে শুইয়ে ভূগর্ভ দেখাও।

[রক্ষক অভিবাদন করে ও ছাব্বিশ ও একান্নকে নিয়ে যায়]

মহারাজ [হাসি]। দেখলে ভণ্ড কেমন শান দেওয়া জিভটা বন্ধ হয়ে গেল। ভুঁইদাস, তোমার হাসি পাচ্ছে না?

ভুঁই। মহারাজ আদেশ করলে——।

মহারাজ। আজ মহা আনন্দের দিন। যত খুশি হেসে নাও। প্রাণ খুলে হেসে নাও।

[ভণ্ড, ভুঁই ও মহারাজ বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসতে থাকে। মহারাজ হঠাৎ হাসি থামিয়ে]

মহারাজ। ভুঁইদাস, তোমাকে এখানে কেন পাঠিয়েছিলাম?

ভণ্ড। কেন পাঠিয়েছিলেন?

ভুঁই। ওদের প্রায় বুঝিয়ে এনেছিলাম মহারাজ। শুধু ঐ হাড় বজ্জাত দুটোর জন্যে——।

মহারাজ। ওদের শাস্তি ওরা পেয়েছে।

ভুঁই। মহারাজের জয় হোক।——এ্যাঁ।

মহারাজ [রেগে]। অ্যাঁ?

ভুঁই। ভুলে যাই মহারাজ। আর কখনো অ্যাঁ বলব না মহারাজ——অ্যাঁ।

মহারাজ [আরও রেগে]। আবার অ্যাঁ! আমার মরণকূপ——।

ভুঁই [মহারাজের পায়ে পড়ে]। আর ভুল হবে না মহারাজ। [মহারাজ শান্ত হলে উঠে দুনগরীকে] তোরা সকলেই বেশ সুখে শান্তিতে ছিলিস!

[সতের ও তের ঘাড় হেঁট করে]

মহারাজ। ওরা কি সকলেই সম্মতি জানিয়েছে, ভণ্ড?

ভণ্ড। এ রাজত্বে মহারাজের আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা কারুর নেই মহারাজ।

মহারাজ। তাহলে বিচার হোক।

ভণ্ড। বিচার হোক।

মহারাজ। তোমার গুপ্ত মন্ত্রের সত্য মন্ত্র পাঠ কর

ভণ্ড। [হাতের পেটাইয়ের মতো জিনিসটা হাঁটু গেড়ে বসে দর্শকদের দিকে ছুঁড়ে দেয়——ও তার থেকে যে কাগজ বের হয় তা পাঁচালীর মতো পাঠ করে——]

ভণ্ড। শুনুন, শুনুন, শুনুন মহারাজ শুনুন দিয়া মন——
হাড় হাভাতে তেরর কাহিনী আমি করিব বর্ণন।
তের ব্যাটা অতিনীচ জন্ম আস্তাকুঁড়ে।
মহারাজের চরণ ছিল, নয়ত হত অবশ্যই ভবঘুরে।
ব্যাটা পাজি ছুঁচো উল্লুক বেল্লিক বিটকেল।
দাসপ্রভুকে ছোট করে এমনি শয়তানের আক্কেল।

ভুঁই। ব্যাটা বজ্জাতের চেরতা।

মহারাজ। তের, শুনছ সব কথা?

তের। এখন শুনতে পাচ্ছি মহারাজ।

মহারাজ। ফর্দ ছেড়ে কাহিনী সংক্ষেপে বল ভণ্ড।

[ভণ্ড তার হাতের ফর্দ গোটাতে থাকে]

ভণ্ড। একদিন দেখা গেল হাড় বজ্জাত তের ওদের রাংচিতে বেড়া দেওয়া উঠোনে চিৎকার করছে—লাফাচ্ছে—।

মহারাজ। তের নস্কর, একথা সত্যি?

তের। সত্যি মহারাজ।

ভণ্ড। হঠাৎ বাড়ির মেয়েরা এই দেখে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল।

ভুঁই। আর কী কুৎসিৎ দেখতে সেই মেয়েগুলোকে।

মহারাজ। ভুঁইদাস তুমি কথা বলবে না।

তের। ভণ্ডপ্রভু যা বলেছেন তা সত্যি মহারাজ।

ভণ্ড। আমাদের রক্ষকেরা মেয়েদের এইভাবে ভয় দেখতে নিষেধ করল। কিন্তু তের কোনো কথায় কর্ণপাত না করে লাফিয়েই চলল।

মহারাজ। সত্যি?

তের। মিথ্যে মহারাজ।

মহারাজ। তেরকে দশ ঘা চাবুক ভুঁইদাস।

[ভুঁই তার পোঁটলা থেকে কড়ি গুনে টেবিলে রাখে]

ভণ্ড। তারপর তের ওর প্রতিবেশীর কাছে চিৎকার করে বলতে লাগল, ওর একটিমাত্র মেয়ে। তাকে ভুঁইদাস জোর করে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে।

মহারাজ। তুমি বলেছ তের?

তের। আমার মেয়েকে দাসপ্রভু—।

মহারাজ। তুমি কি প্রতিবেশীদের শুনিয়ে একথা বলেছিলে?

তের। তার কারণ—।

মহারাজ। আরও কুড়ি ঘা চাবুক ভুঁইদাস।

[ভুঁইদাস পূর্বমতো কড়ি গোনে]

ভুঁই। মহারাজ অতিশয় দয়ালু।

ভণ্ড। তারপর তের চারিদিকে রটনা করে দিল ওর মেয়েকে ভুঁইদাস প্রাসাদ থেকে নিচে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেল ওর মেয়ে আত্মহত্যা করবে বলে লাফিয়ে পড়েছে।

মহারাজ। মৃতাকে পরীক্ষা করা হয়েছিল?

ভণ্ড। চর্মকার সমিতির সভাপতি মৃতাকে পরীক্ষা করে বলেছেন মেয়েটাকে কেউ ফেলে দেয়নি। সে নিজে নিচে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। কারণ—

মহারাজ। কারণ?

ভণ্ড। কারণ মেয়েটিকে কেউ ফেলে দিলে মাথা তলার দিকে থাকত না। ওর

হৃদপিণ্ড আর ঘিলু পরীক্ষা করে সভাপতি বলেছেন, ওর মধ্যে যে আত্মহত্যার বাসনাই ছিল তা এই দুটো থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়।

মহারাজ। তুমি কি বলেছিলে ভুঁইদাসের প্রাসাদ থেকে তোমার মেয়েকে নিচে ফেলে দেওয়া হয়েছে?

তের। একথা আমি জানতে পেরেছি মহারাজ!

মহারাজ। আরও কুড়ি ঘা চাবুক ভুঁইদাস।

ভুঁই। গুরুপাপে লঘুদণ্ড।

[কড়ি গুনে রাখে]

তের। মহারাজ আমার ঐ একটিমাত্র মেয়ে। এবছর ওর বিয়ে দেব বলে রাতে না ঘুমিয়ে আমি বেত বুনেছি। আমার মেয়ের ওপর এ অত্যাচারের বিচার করুন মহারাজ।

ভণ্ড। এই চুপ কর বজ্জাত কোথাকার।

মহারাজ। আহা-হা বলতে দাও। শুনতে বেশ মজা লাগছে। হ্যাঁরে তোর মেয়েটা বেশ ডাগর-ডোগর হয়েছিল?

তের। ওর মা নেই আমাকে কোনেদিন ভাবতে দেয়নি মহারাজ।

[তিনজনে প্রচণ্ড হাসতে থাকে]

তের। মহারাজ আমাদের কাছে ভগবান।

মহারাজ। ভগবান! ওর পাঁচ ঘা চাবুক কমিয়ে দাও।

তের। ঐ দাসপ্রভু রক্ষকদের দিয়ে জোর করে ধরে নিয়ে গেল। মেয়েটা কত কাঁদল। ঐ পাষণ্ডটা শুনল না।

ভুঁই। মহারাজ পাষণ্ড—।

মহারাজ [চেয়ারের ওপর লাফিয়ে বসে]। কে—কাকে বলল ভুঁইদাস?

ভুঁই। আমাকে মহারাজ।

মহারাজ। আর কি বলবে শষ্যনগরীর তের?

তের। রাতে যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়ত, আমি সারারাত আপনার উঠোনে বসে থাকতাম দাসপ্রভুর প্রাসাদের দিকে চেয়ে, রাতে শুনতাম নয়নের কান্না।

মহারাজ। অতগুলো মেয়ের মধ্যে তোর নয়ন কাঁদছে, তুই কি করে বুঝতিস?

তের। আমার মেয়ের কান্না আমি জানি।

মহারাজ। আমি তোর কে?

তের। আমাদের মা-বাপ।

মহারাজ। আচ্ছা তাহলে আমরা তিনজন হাঁচছি। [তিনজনে হাঁচে] বলতো কোনটা আমার হাঁচি?

তের। আমি—আমি—।

মহারাজ। ভণ্ড তড়িতাহত কর।

[ভণ্ড ন্যায়দণ্ড নিয়ে দুবার তেরর ওপর ঠেকায়। তের বিদ্যুতের শক লাগার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে]

তের। আঁ্যা—বলছি, বলছি মহারাজ। দ্বিতীয়টা, দ্বিতীয়টা মহারাজ।

মহারাজ। আরও কুড়ি ঘা চাবুক ভুঁইদাস। [হাসি] যোগ করে নাও।

ভণ্ড। যোগ করে নাও।

তের। মহারাজ নয়নকে ওরা ওপর থেকে নিচে ফেলে থেঁতলে মেরেছে। নয়ন বাবা-বাপরে বলে আর্তনাদ করে উঠল। নয়ন চিৎকার করে উঠল—বাপ, ওরা আমাকে প্রাসাদ থেকে নিচে ফেলে দিচ্ছে আমাকে বাঁচা বাপ—। আমাকে বাঁচা।

মহারাজ। বাঃ বাঃ বেশ সুন্দর তো।

ভণ্ড। সুন্দর তো।

তের। আমি ডাকতে লাগলাম—নয়ন—নয়ন আমার, কাছে আয় মা। আমি তোকে নিতে এসেছি মা আমার কাছে আয়।

মহারাজ। বাঃ বাঃ একি মজারে একি খুশির কথারে—।

ভণ্ড। মজারে মজা—।

[তের খুব জোরে কেঁদে ওঠে। মহারাজ, ভণ্ড ইত্যাদি প্রচণ্ড উল্লাস করতে থাকে। তের চিৎকার করে বলে]

তের। ঐ দাসপ্রভু আমার মেয়েকে খুন করেছে।

মহারাজ। ভণ্ড ওকে তড়িতাহত কর।

[ভণ্ড ন্যায়দণ্ড নিয়ে তেরকে স্পর্শ করায়। তের চিৎকার করে ওঠে]

ভুঁই। মহারাজ ও আমার নামে কলঙ্ক দিচ্ছে!

মহারাজ। ওকে নিয়ে যাও। ওর চোখে অঙ্কুশ বিদ্ধ করবে।

ভুঁই। মহারাজ অতিশয় দয়ালু।

[ভুঁই তার বিরাট দেহ নিয়ে হেলে দুলে উঠে দাঁড়ায় এবং তেরকে আঘাত করতে করতে ভেতরে নিয়ে যায়। তের অঙ্কুশ বেঁধানোর জ্বালায় চিৎকার করে ওঠে]

মহারাজ [সতের এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল, সতেরকে দেখিয়ে]। ঐ শৃগাল গোঁফোর পরিচয় দাও।

ভণ্ড। ওটা বিশ্বকর্মানগরীর সতের।

মহারাজ। তোমার তালিকায় ওর কথা কি লিপিবদ্ধ করেছ?

ভণ্ড [আবার ফর্দ খুলে]। শস্যনগরীর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবে বলে।
সত্যকাম উদিত হয়েছে, পড়েছে মহারাজের বিচারকলে।
এইবার বর্ণন করি শুনুন মহারাজ—।
সতের, ছাব্বিশ আর একান্নকে দর্শন করান যমরাজ।
বড্ড বাড় বেড়েছে ওরা মেতেছে মহানন্দে
সত্যকামের কার্য সিদ্ধি করবে বলে ঘুরছে দুনগরীর অলিন্দে।
ঐ যে সতের, এক নম্বরের মিচকে পটাশ,
ছাব্বিশ বেটাও কম নয়, বলে বিদ্রোহ করে ফাটাবে পটাশ।
একান্ন তো হাড় হারামজাদা
বিচার করুন মহারাজ টের পাক মজাটা।

মহারাজ [ভণ্ডর মতোই পাঁচালীর সুর করে]। কি নাম যেন বললে ভণ্ড—সত্যকাম, ভক্ষক নামে যাকে পরিচিতি করে পেয়েছি সুনাম!

ভণ্ড। মহারাজ আপনি আমাদের অবশ্য দেবতা, এমন স্মৃতিশক্তি কল্পনা করাও যায় না।

মহারাজ। সতের তুমি সব কথা স্বীকার করছ?

সতের। মহারাজ আমার একমাত্র ভরসা আপনি।

মহারাজ। তুমি অপরাধ স্বীকার করছ?

সতের। আমার একমাত্র ছেলে শস্যনগরে চলে গেছে খেটে খাবার জন্যে।

মহারাজ। ভক্ষকের মন্ত্রশিষ্য?

সতের। সত্যকাম আমাদের ভাল করতে চেয়েছিল মহারাজ।

মহারাজ [চিৎকার]। আমি তোমাদের খারাপ করেছি!

সতের। মহারাজ আমাদের দেবতা।

মহারাজ। ভক্ষক নীচ—ভক্ষক শয়তান—ভক্ষক বিশ্বাসঘাতক।

সতের। মহারাজ!!

মহারাজ। বল—বলতে হবে তোকে। ভণ্ড ওকে শিক্ষা দাও।

[ভণ্ড ন্যায়দণ্ড নিয়ে সতেরকে আঘাত করে]

মহারাজ। না বললে তোর প্রাণটা আমি কেড়ে নেব রে—।

সতের। আমি মিথ্যেবাদী কেমন করে হব মহারাজ। সত্যকাম আমাদের উপকার করেছে। আমাদের ভাল করেছে। আমাদের সাতজনকে যখন জ্বলন্ত চিমনির মধ্যে আপনার রক্ষকেরা দাসপ্রভুদের আদেশে ফেলে দিয়েছিল তখন সত্যকাম প্রতিবাদ করেছিল। আমরা কাজ বন্ধ করেছিলাম। আমাদের জয় হয়েছিল।

মহারাজ। প্রতিবাদ—জয়—এসব কথা ওরা শিখল কোথা থেকে ভণ্ড?

ভণ্ড। ঐ ভক্ষকের চেলারা শিখিয়েছে মহারাজ।

মহারাজ। ওকে আবার তড়িতাহত করে বিদেয় কর।

[ভণ্ড ওকে ন্যায়দণ্ডের আঘাত করতে করতে বাইরে নিয়ে যায়। সতের চিৎকার করতে থাকে]

মহারাজ। ভণ্ড, শেষ হল পালাটা?

ভণ্ড। মরেছে এবার শয়তানটা। [প্রবেশ করতে করতে]

[সত্যকামের আর্তনাদ। সেই সঙ্গে—"আমাদের ক্ষয় নেই, আমাদের মৃত্যু নেই—মহারাজ আমাদের বিনাশ করতে পারবে না—পারবে না"]

মহারাজ [হাসি]। ভণ্ড, চেলাদের সঙ্গে ওকে নিয়ে এস। ওর মৃত্যু নিজের চোখে দেখে বুঝিয়ে দিই আমার অসাধ্য কিছুই নেই।

[ভণ্ডর প্রস্থান। মহারাজ অস্থিরভাবে পায়চারী করতে করতে বলেন—বিপদ। এইভাবে তিনবার 'বিপদ' বলার পর প্রবেশ করে ভণ্ড]

মহারাজ। বিপদ!

ভণ্ড। আপদ!

[মহারাজের পিছনে পিছনে ছোট ছোট পা ফেলে ছুটতে ছুটতে]

মহারাজ। আহাম্মক!

ভণ্ড। গর্ধভ।

মহারাজ। কুমীর।

ভণ্ড। হাম্বির।

মহারাজ। শঠ—শয়তান—বিশ্বাসঘাতক!

ভণ্ড। ঠগ—মিটমিটে বেল্লিক।

[এই সময় কয়েদীদের চলাফেরার মধ্যে যে শিকলের আওয়াজ হয়, তার শব্দ ভেসে আসে মঞ্চে। মহারাজ তা কান পেতে শোনে ও দ্রুত তালি দিয়ে স্টেজের ওপর নেচে নেচে কথা বলতে থাকে]

মহারাজ [শুনতে শুনতে]। আসছে—। শয়তান আহাম্মক ঠগ আসছে।

ভণ্ড [ঐ রকম নেচে]। কুমীর হাম্বির বেল্লিক আসছে।

[মহারাজ সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে ভণ্ড নিচে হাঁটুমুড়ে বসে]

মহারাজ। শুনতে পাচ্ছ ভণ্ড?

ভণ্ড। পাচ্ছি মহারাজ!

মহারাজ। কাছে। খুব কাছে। ঐ এল।

ভণ্ড। ঐ এল।

[সত্যকাম, ছাব্বিশ ও একান্নকে নিয়ে প্রবেশ করে রক্ষক। সত্যকামের একমুখ দাড়ি। পোশাক সাধারণ কয়েদীর। হাতে শিকল। ভণ্ড মাথা দোলাতে দোলাতে, একই অবস্থায় অত্যন্ত দ্রুত বলে]

ভণ্ড। মহারাজ আমাদের মা-বাপ, ভাই-বোন, রক্ষক-রক্ষিকা। মহারাজের দয়ায় আমাদের জন্মমৃত্যু, মহারাজের দয়ায় আমাদের জীবন। মুক্তির জন্য আমরা মহারাজের করুণা প্রার্থী। মহারাজ আমাদের রক্ষা ক-রু-ন...।

মহারাজ। আমি তোমাদের রক্ষা করবার আদেশই ভগবানের কাছ থেকে পেয়েছি!

ভণ্ড। সত্যকাম নামে এক শয়তান নরকের ব্যাঙাচি আমাদের সুখের মুখে ছাই দিচ্ছে। আমাদের স্ত্রীর চোখে জল। পুত্রকন্যারা অকালে সংসার ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। দুই নগরীর দিকে দিকে শুধু হাহাকার। সকলের মুখে এক কথা—মহারাজ আমাদের রক্ষা করুন।

রক্ষক। সত্যকাম হাজির হয়েছে মহারাজ।

ভণ্ড [এক পলক দেখে নিয়ে]। এই সেই শয়তান নরককীট মহারাজ।

মহারাজ [হেসে]। তুমি এতক্ষণ ভক্ষকের কথাই বলছিলে তাহলে?

ভণ্ড। ঠিক বলেছেন মহারাজ। এই ভক্ষক আমাদের দুনগরীর দ্রব্যসামগ্রী একাই ভক্ষণ করছে।

মহারাজ। ভক্ষক, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি আছে তুমি জান?

সত্যকাম। অভিযোগ না থাকলেও আপনার কিছু যায় আসে কি মহারাজ!

মহারাজ। ভক্ষক তাহলে খুব জ্ঞানী ব্যক্তি, তাই না ভণ্ড!

ভণ্ড। মূর্খদের জ্ঞানী বললে তারা খুব আনন্দ পায় মহারাজ।

মহারাজ। ওর অভিযোগগুলো যা মনে আছে বলতো ভণ্ড।

ভণ্ড। শস্যনগরী আর বিশ্বকর্মা নগরীর মধ্যে বিবাদ লাগিয়েছে ঐ ভক্ষক। মহারাজকে

খুন করে সিংহাসন দখল করতে চাইছে ভক্ষক। দুনগরীতে বিদ্রোহের সৃষ্টি করেছে ঐ ভক্ষক। সেই সুযোগে একশ একান্ন জন অনূঢ়ার ওপর পাশবিক অত্যাচার করেছে ঐ ভক্ষক। মহারাজের চারশ সারমেয় আর চারহাজার রক্ষককে খুন করেছে ঐ ভক্ষক—। শস্যনগরীর—।

মহারাজ। থাক-থাক।

ভণ্ড। একশ আটটা অপরাধের মধ্যে আটটাও হল না মহারাজ।

মহারাজ। পাপীদের সব পাপের কথা শুনলে আমি সহ্য করতে পারি না তা তুমি জান ভণ্ড।

ভণ্ড। জানি মহারাজ।

মহারাজ। তোমার পরিচয় দাও ভক্ষক।

সত্যকাম। বিশ্বকর্মানগরীতে মহারাজের দেওয়া অন্ধকার সুড়ঙ্গে আমার বাস। আমার পিতা মহারাজের সমালোচনা করায় সারমেয়র ভোগে এসেছিল।

মহারাজ। আমার কুকুরগুলো আগের মতো এখনও মাংস খেতে ভালবাসে।

সত্যকাম। মহারাজের ইস্পাত উৎপাদনে আমি সাহায্য করতাম। শস্যনগরীর দেওয়া খাদ্যে পেট ভরাতাম। বিশ্বকর্মানগরীর সকলকে বুঝিয়েছি শস্যনগরী না থাকলে আমরা খাদ্য পেতাম না। শস্যনগরীকে বোঝাতে সমর্থ হয়েছি বিশ্বকর্মানগরীকে মহারাজ নিজের কাছে লাগাবার জন্য বড় করে দেখাচ্ছেন। বিশ্বকর্মানগরী তোমাদের শত্রু নয়!

মহারাজ। রক্ষক, গোটা দুই চাবুক চালিয়ে ওর কথাগুলো সোজা করে দাও তো। [রক্ষক দুবার চাবুক মারে] বল, এবার সোজা করে বল।

সত্যকাম। আমি যতদিন বাঁচব ততদিন চিৎকার করে বলে যাব, দুনগরীতে কোনো প্রভেদ নেই। মাঠের কাজ আর কারখানার কাজে কোনো প্রভেদ নেই। আমাদের রক্তে মহারাজের ভাণ্ডার উপচে উঠছে।

ভণ্ড। মহারাজ!

মহারাজ। আমার কানটা সুড় সুড় করছে ভণ্ড।

ভণ্ড। মহারাজের কষ্ট আমি দেখতে পারব না। এই নিন মহারাজ।

[মাথার টুপিতে গোঁজা একটা পালক নিয়ে মহারাজকে দেয়। মহারাজ নিজের কানে সুড়সুড়ি দিতে থাকে]

মহারাজ। বলে যাও ভক্ষক।

সত্যকাম। আমাদের বিশ্বকর্মানগরী যখনই আমাদের অভাবের কথা বলেছে, আমাদের দুঃখ কষ্টের কথা জানিয়েছে তখনই শস্যনগরীকে উত্তেজিত করে তুলেছেন আমাদের বিরুদ্ধে। আবার শস্যনগরী যখন তাদের অভাবের কথা জানিয়েছে তখন বিশ্বকর্মানগরীকে বুঝিয়েছেন,—দেখ ছোটলোকেরা দেশে বিদ্রোহ ঘটাচ্ছে।

মহারাজ [নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে]। আমার রাজত্বে খেতে পায় না এমন লোকের সন্ধান কখনও পেয়েছ ভণ্ড?

ভণ্ড। পাপের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ।

[মহারাজ ঢুলতে থাকে]

সত্যকাম। ঐ নির্বোধ শাসক আমাদের ধনপ্রাণের নিরাপত্তা নষ্ট করেছে। আমাদের বাঁচার অধিকারকে কেড়ে নিয়েছে। আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে। আমাদের উভয়কে বঞ্চিত করে নিজে বিলাসিতার মধ্যে ডুবে গেছে।

ভণ্ড। এই বেল্লিক আস্তে কথা বল। মহারাজের কষ্ট হচ্ছে দেখতে পাচ্ছিস না?

একান্ন। সত্যকাম, মহারাজের সঙ্গে ঐ শয়তানটাকেও আমরা শেষ করব।

ভণ্ড। তোদের বাঁচা মরা আমার হাতের মুঠোয় তা জানিস?

ছাব্বিশ। আমরা না বাঁচলেও আমাদের উদ্দেশ্য সফল করতে লক্ষ লক্ষ লোক বেঁচে থাকবে।

সত্যকাম। আমরা মহারাজের ঐ অত্যাচারের অবসান ঘটাব বন্ধু। ওর পারিষদদের শাস্তি দেওয়া তো কয়েক মুহূর্তের কাজ। তোমরা শুধু সকলে এক হয়ে এ পাপের বিচার করতে এগিয়ে এস ভাই।

একান্ন। আমরা বুঝেছি সত্যকাম। তুমি পথ দেখাও আমরা ঐ অত্যাচারী শাসককে শেষ করি।

ছাব্বিশ। নিজেদের মৃত্যুর আগে আমরা কিছু করতে চাই সত্যকাম।

সত্যকাম। আমার পথ ন্যায় এবং সত্যের পথ। আমি জানতাম তোমরা আমাকে বুঝবে আমার সত্যের পথে এসে দাঁড়াবে। ঐ দেখ অকর্মণ্য বুদ্ধিহীন বিলাসী মহারাজ নিদ্রায় মগ্ন। সব রাজাদের মতো ঐ রাজাও আমাদের বঞ্চিত করে চলেছে—আমাদের নিঃশেষ করে চলেছে। এই রাজা নিজের সৈন্যদলকে খুশি করবার জন্যে আমাদের বঞ্চিত করে। আবার ঐ রক্ষকদের দিয়ে আমাদের ওপর অত্যাচার করে। ওর কুকুরদের আমাদের মাংস খাওয়ায়।

ভণ্ড। রক্ষক, তুমি শুনতে পাচ্ছ না? ওদের শাস্তি দাও।

রক্ষক। মহারাজের আদেশ ছাড়া আমি শাস্তি দিতে বাধ্য নই।

ভণ্ড। আমার আদেশ।

রক্ষক। আমার গ্রাহ্য করার প্রয়োজন নেই।

ভণ্ড। মহারাজের অবচেতন মনে সব কিছু জমা হচ্ছে।

রক্ষক। মহারাজের আদেশ ছাড়া আমি কিছুই করতে পারব না ভণ্ডপ্রভু।

সত্যকাম। তোমরাও আমাদের বন্ধু হচ্ছ রক্ষক?

একান্ন। কিন্তু আরও হাজার হাজার রক্ষকের কাছে আমরা কি করতে পারি সত্যকাম?

সত্যকাম। আমি ক্রমাগত তিনমাস কারাগারে থেকে ওদের সকলকে বুঝিয়েছি। ওরা বাইরে অনেকেই বিদ্রোহ করেছে। শস্যনগরীর কর্মীদের ঘরে অনেকেই বিদ্রোহ করেছে। শস্যনগরীর কর্মীদের ঘরে অনেকেই ফসল তুলতে সাহায্য করেছে। হয়ত সকলে নয় কিন্তু আমরা পাব ক্রমশ সকলকেই পাব।

সতের [প্রবেশ করতে করতে বলে]। কিন্তু আমরা এখান থেকে মুক্তি পাব কি করে সত্যকাম?

সত্যকাম। আমাদের মুক্তি না হয় নাই বা হল। আমাদের মৃত্যুই হবে আমাদের মুক্তি। আমাদের নিঃশেষ করলে আমাদের আন্দোলন আরও তীব্র হবে। তার সামনে দাঁড়াবার ক্ষমতা মহারাজের থাকবে না।

ছাব্বিশ। আমিও তা বিশ্বাস করি। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে আমরা মার খাব কেন? আমরা পারি না গর্জে উঠতে, পারি না চিৎকার করে বলতে এ অত্যাচারের অবসান ঘটুক।

সতের। আমার জীবনটাকে আর তুচ্ছ করে দেখতে পাচ্ছি না। সব সময় আমার ছেলের কথা মনে হচ্ছে। আমার সংসার যে শেষ হয়ে যাবে সত্যকাম।

সত্যকাম। এমনি করে বছরের পর বছর আমরা শেষ হচ্ছি। তবু আমরা এগোচ্ছি। যত শেষ হচ্ছি ততই গর্জে ওঠার পথে আরও বন্ধুদের পাচ্ছি।

একান্ন। আমি কিন্তু একটা শেষ জবাব দিয়ে যাবই। আমি শুধু মার খেতে আজ আসিনি। মার দিয়ে যাব বলেও ঠিক করেছি।

সত্যকাম। তাই হয় বন্ধু, অত্যাচার যখন চরমে ওঠে তখন তার থেকে পরিত্রাণ পাবার পথ মানুষ খুঁজে বের করবেই। তেরর দল যদি বেঁচে ফিরে আসে তবে মহারাজের কাছে জবাব চাইবে।

[মহারাজের নাক ডাকা শোনা যায়]

ভণ্ড। মহারাজ সব শুনতে পাচ্ছেন ভক্ষক।

সত্যকাম। ভক্ষক নয়! সত্যকাম বল চাটুকার।

ভণ্ড। ব্যাটা মহারাজকে খুন করে রাজা হতে চাও। একি মগের মুলুক?

সত্যকাম। এরা যখন কিছুতেই আমাদের দমন করতে পারে না তখন আমাদের মধ্যে বিভেদ ঘটাবার জন্যে এইরকম চাতুরীর আশ্রয় নেয়।

ভণ্ড। তোমার ভণ্ডামির শাস্তি ওরাই দেবে দেখে নিও!

একান্ন। সত্যকামের পথ আমাদের সকলের পথ।

ছাব্বিশ। সত্যকাম বলেছে এমন এক রাজত্ব গড়ব যেখানে সব প্রজারাই রাজা। আমাদের সেই সুন্দর দেশটাতে কোনো রাজা থাকবে না, থাকবে না মানুষ-খেকো কুকুর বা ঐ রক্ষকের দল।

ভণ্ড। রক্ষক শুনতে পাচ্ছ না ওদের কথা।

রক্ষক। মহারাজের আদেশ পেলেই আমি তা পালন করব।

ভণ্ড। আমি মহারাজের পার্শ্বচর তা জানিস?

রক্ষক। মহারাজ আমাকে আপনার আদেশ মানবার নির্দেশ দেননি।

ভণ্ড। তোরাও বিদ্রোহী হয়েছিস?

সত্যকাম। অত্যাচার কেউ-ই সহ্য করে না। ওরাও আমাদের মতো মানুষ। মহারাজ ওদের যন্ত্র তৈরি করতে চেয়েছিলাম। মানুষের মুখে শিয়ালের মুখোস লাগালেও মানুষ মানুষই থাকে।

[মহারাজের নাক ডাকে]

ভণ্ড। মহারাজ ক্রুদ্ধ হয়েছেন। মহারাজের ক্রুদ্ধ গর্জন আমাকে বিচলিত করছে।

মহারাজের জীবন রক্ষার দায়িত্ব আমার। আমি সমস্ত রক্ষকদের এখানে নিয়ে এসে সকলকে অঙ্কুশ বিদ্ধ করব...। [প্রস্থান]

সতের। সত্যকাম আমি বুঝেছি আমি বুঝেছি মহারাজের শক্তির উৎস আমরাই। রক্ষকেরা আমাদের বন্ধু হতে চলেছে।

সত্যকাম। রক্ষক তুমি আজ একা নও ভাই। প্রায় সব রক্ষকই আজ বুঝেছে তারা মহারাজের অন্যায় কাজগুলোকে সমর্থন করেছে।

সতের। আমি মহারাজকে খুন করব।

সত্যকাম। আমরা একা একাজ করলে আরও পিছিয়ে পড়ব। সকলকে এক হতে দাও।

সতের। আমরা এতজন। রক্ষকও আমাদের দলে। আমি মহারাজকে খুন করে তোমাকেই রাজা করব।

[সতের মহারাজের দিকে এগিয়ে যায়। রক্ষক তার ওপর চাবুক চালায়, সতের মাটিতে পড়ে যায়। সত্যকাম মাঝে এসে দাঁড়ায়]

সত্যকাম। তুমি আমার ওপর তোমার চাবুক ব্যবহার করলে না রক্ষক?

রক্ষক। আমাকে—আমাকে—।

একান্ন। আমাদের ওপর এ অত্যাচার তোমাকে পীড়ন করছে না রক্ষক?

ছাব্বিশ। আমাদের মৃত্যু কি তোমাকে আনন্দ দিচ্ছে?

রক্ষক। সত্যকাম বলে—যারা চাবুক খাওয়াটা তাদের ন্যায্য পাওনা বলে মনে করে তারা কোনোদিন অত্যাচারীর হাত থেকে বাঁচতে পারে না।

সকলে। রক্ষক!!

সত্যকাম। তুমি কি আমাকে ভালবাস রক্ষক?

রক্ষক। আমি মহারাজের আদেশের অপেক্ষায় আছি।

একান্ন। আমরা অনেকখানি এগিয়েছি সত্যকাম।

ছাব্বিশ। তুমি শুধু বল আমরা এ অত্যাচারের শেষ করব কবে?

সতের। আমার মৃত্যুর আগে মহারাজকে শেষ করে যাই সত্যকাম।

সত্যকাম। সময় আসছে বন্ধু।

সকলে। কবে!!

সত্যকাম। হয়তো এখুনি, হয়তো কয়েক মুহূর্ত পর। আজ অথবা কাল সুযোগ আমরা পাবই।

[বাইরে তেরর কাতর স্বর শোনা যায়। শূন্যে হাত প্রসারিত করে প্রবেশ করে তের। চোখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে]

তের। তোমরা কেউ আছ, তোমরা কে কোথায় আছ, তোমরা দু চোখ মেলে দেখ ওরা আমাকে চাবুক মেরেছে। দাসপ্রভু আমার চোখে অঙ্কুশ বিদ্ধ করে আমাকে অন্ধ করে দিয়েছে। আমার নয়নকে কেড়ে নিয়ে ওরা শান্তি পায়নি। আমাকে অন্ধ করে সব আলো আমার কেড়ে নিয়েছে।

সত্যকাম। তোমাকে ওরা অন্ধ করেছে! তুমি বুঝতে পারছ বন্ধু আমাদের মহারাজ কতখানি অত্যাচারী! কতখানি নির্মম!

একান্ন। টকটকে লাল লোহাগুলোকে যেমন করে পিটিয়ে আমরা ইস্পাত তৈরি করি, আমাদের শরীরটাকে পিটিয়ে আমরা কঠিন ইস্পাত করেছি ভাই।

তের। তোমরা জান, আমার নয়নকে ওরা কত দুঃখ দিয়েছে। দাসপ্রভু সকলকে খুশি করবার জন্য নয়নের সুন্দর দেহটাকে অশুচি করেছে। মরবার আগেও নয়ন চিৎকার করেছে, বাপ আমাকে বাঁচাও বাপ আমাকে মুক্তি দে—। আমি কিছুই করতে পারিনি। আমার মেয়ের জন্যে আমি কিছুই করতে পারিনি।

[কেঁদে ফেলে]

ছাব্বিশ। আমরা সকলেই অত্যাচারিত। তুমি একা নও ভাই। হাজার হাজার কর্মী আজ নিঃশেষ হয়েছে।

[মহারাজের নাক-ডাক]

সত্যকাম। ঐ দেখ বন্ধু, আমাদের বন্ধুরা যখন অত্যাচারে জর্জরিত, তোমাকে যখন অঙ্কুশ বিঁধিয়ে অন্ধ করা হয়েছে, তখন আমাদের পালক নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছেন।

তের। কে? কে নিদ্রা যাচ্ছে বললে সত্যকাম?

সতের। আমাদের রক্ষাকর্তা মহারাজ।

তের। ওকে আমি শেষ করব।

[ছুটে যেতে গিয়ে পড়ে যায়। সত্যকাম, ছাব্বিশ ও একান্ন দ্রুত গিয়ে তাকে ধরে। মহারাজকে ডাকতে ডাকতে হাতে অঙ্কুশ নিয়ে প্রবেশ করে ভুঁইদাস]

মহারাজ [ভুঁই-এর ডাকে ধড়মড়িয়ে ওঠে ও ভয় পেয়ে চিৎকার করে]। রক্ষক, বন্দীরা কী বন্দীশালা ভেঙে ফেলেছে?

রক্ষক। না মহারাজ!

সত্যকাম। আপনার দুঃস্বপ্ন সত্যে পরিণত হবার সময় এসেছে মহারাজ।

মহারাজ। ভক্ষক এখনও বেঁচে আছে রক্ষক। কি হল চুপ করে আছ কেন?

রক্ষক [অসন্তোষের সঙ্গে]। মহারাজের আদেশ মতো কাজ করছি।

ভুঁই। মহারাজ আপনার আদেশ মতো আমি ওটার চোখে অঙ্কুশ বিদ্ধ করেছি।

মহারাজ। ওর চোখে আবার অঙ্কুশটা লাগাও। কি রকম আনন্দ করে দেখি।

[ভুঁই অঙ্কুশ নিয়ে খোঁচা দেয়। তের চিৎকার করে ঘুরতে থাকে। ভুঁই তার পিছনে চলে। ইত্যবসরে তের একবার ভুঁইকে ধরে মাটিতে ফেলে দেয়। ভুঁই-এর বুকে বসে তের গলা টিপে ধরে। ভুঁইকে শেষ করে ফেলে। মহারাজের নাম ধরে চিৎকার করতে করতে প্রবেশ করে ভণ্ড]

ভণ্ড [বাইরে থেকে]। মহারাজ সব্বনাশ হয়েছে-সব্বনাশ হয়েছে। [ভেতরে প্রবেশ] আমাদের সারমেয় বাহিনীকে বিষপান করিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

মহারাজ [কাঁদো কাঁদো]। কি—কি বললে ভণ্ড?

ভণ্ড। সত্যকাম গত কয়েকমাস যাবৎ রক্ষকদের বুঝিয়ে চলছিল। আজ সমস্ত রক্ষক বিদ্রোহ করেছে। সকলেই বলছে—মহারাজকে আমি মানি না।

মহারাজ। কি বললে! আমার কুকুরদের হত্যা করেছে! রক্ষকেরা বিদ্রোহ করেছে—!! রক্ষক, ভক্ষককে গলা টিপে হত্যা কর।

রক্ষক [চাবুক ফেলে দিয়ে]। আমি আর আপনার আদেশ মানতে পারব না। [ভুঁইকে দেখিয়ে] এইভাবে এরা আপনাকে শেষ করলেও আমি বাধা দেব না। আমি সত্যকামকে ভালবাসি।

মহারাজ। রক্ষক, আমাকে বাঁচাও।

রক্ষক। ক্ষমা করবেন মহারাজ। এতদিন আপনার আদেশ মতো ভাইবন্ধুদের জীবন আমি কেড়ে নিয়েছি। আজ আপনার জীবনের বিনিময়ে তার কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

মহারাজ [চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়]। আমি রাজা।

রক্ষক। রাজার আদেশ ছাড়াই আমাদের বন্ধুদের জীবনকে আমি মুক্ত করে দেব।

[রক্ষক প্রত্যেকের হাতের শিকল খুলে দেয়]

মহারাজ। খবরদার—আমাকে মেনে চল বলছি।

সতের। আমাদের জীবনকে তুমি ফিরিয়ে দিচ্ছ রক্ষক।

রক্ষক। আমাকে তোমাদের বন্ধু করে নিতে পার না ভাই?

ছাব্বিশ। তুমি আমাদের একজন একথা কোনোদিন ভুলি নি।

মহারাজ। ভণ্ড আমার রক্ষাকবচটা আমার হাতে দাও।

[ভণ্ডর কোমরে বাঁধা ছোরা মুক্ত অবস্থায় মহারাজের হাতে দেয়]

ভণ্ড। আমাকেও বাঁচান মহারাজ।

রক্ষক। আজ ওরা নিজেদের বাঁচবার আলো নিজেরাই নিবিয়ে দিয়েছে বন্ধু।

একান্ন [মহারাজকে ছোরা হাতে ভণ্ডের দিকে এগোতে দেখে]। ঐ দেখ অত্যাচারী ভণ্ডের দিকে এগোচ্ছে।

ভণ্ড। মহারাজ আমাকে রক্ষা করুন।

মহারাজ। আমি নিজে বাঁচতে পারব কিনা দেখে নিই আগে।

[মহারাজ হাসতে হাসতে ছোরা নিয়ে ভণ্ডের দিকে এগোয় ও পেছন দিকে গিয়ে ভণ্ডর পেটে তা চালিয়ে দেয় ও অনর্গল বলে চলে]

মহারাজ। আমি রাজা—আমি রাজা.....।

সত্যকাম। বন্ধু, মহারাজ হিংস্র হয়ে উঠেছেন।

রক্ষক। এবার তাকিয়ে থাকব সত্যকামের নির্দেশের অপেক্ষায়।

সত্যকাম। বন্ধু।

রক্ষক। অনেক অন্যায় করেছি। মহারাজকে খুশি করতে অনেক অত্যাচার করেছি। আমার ক্ষমা কর বন্ধু। আমি বন্দীশালা মুক্ত করতে চললাম।

[রক্ষক দ্রুত এই সমস্ত কথা বলে প্রস্থান করে]

মহারাজ ["আমি রাজা" বলে ঘুরতে ঘুরতে নিজের চেয়ারের কাছে এসে]। খবরদার তোমাদের রক্ষাকর্তা আমি, তোমাদের রাজা—আমি রাজা— [আর্তনাদ]

সত্যকাম। আমাদের রাজা নেই।

মহারাজ। আমি রাজা।

সত্যকাম। সময় এসেছে বন্ধু।

[তের ছাড়া বাকি সকলে মহারাজের দিকে একপা একপা করে এগোয়]

সকলে। তুমি অত্যাচারী!

মহারাজ। আমি রাজা।

সকলে। তুমি নির্মম!!

মহারাজ। আমি রাজা।

সকলে। তুমি লোভী!!!

মহারাজ। আমি রাজা।

সকলে। আমরা তোমাকে শেষ করলাম।

[মহারাজের কাছে উপস্থিত হবার পর সকলে মহারাজকে এক হাতে বাঁধা ঝুলন্ত চেন দিয়ে আঘাত করেই চলে। মহারাজ সিংহাসনের ওপর পড়ে যায়। একসময় তের বলে]

তের। নয়ন দেখে যা মা, আমি প্রতিশোধ নিয়েছি। তোর ওপর অত্যাচারের প্রতিশোধ আমি নিয়েছি।

সত্যকাম [এগিয়ে এসে তেরকে তোলে]। আমরা অত্যাচারিত হব না। আমরা মহারাজের নির্দেশ মানব না—মহারাজের ভাণ্ডার আমরা পূর্ণ করব না। আমরা লড়াই করব, আমরা বাঁচব।

[সকলে ঘুরে সত্যকামের দিকে তাকায়]

তের। আমি কি করে বাঁচব সত্যকাম?

সত্যকাম। আমরা সবাই বাঁচব—আমাদের জীবনকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না—প্রাণভরে ভোগ করব মুক্ত বায়ু—আমরা মুক্ত—আমরা মুক্ত—আমরা মুক্ত—।

[তেরর হাত ওপরে তুলে ধরে। ঐ সঙ্গে ছাব্বিশ, একান্ন ও সতের নিজেদের হাত উঁচুতে তুলে ধরে এগিয়ে আসে। নেপথ্যে তখন গাওয়া হচ্ছে—]

নেপথ্যে। মুক্ত—আমরা মুক্ত,
দুনিয়ার নিপীড়িত আমরা—
শোষকের পদাঘাতে জর্জরিত
মানুষ—জয়গানে মুখরিত।
অত্যাচারীর জবাবে সচকিত
মুক্ত—আমরা মুক্ত।

জাদুকর

শ্যামলতনু দাশগুপ্ত

চরিত্রলিপি

জাদুকর
সূর্য
অধীর
অম্বুজ
কমলাক্ষ
নগরপাল
বণিক
ভূশণ্ডির কাক
খোলবাদকদ্বয়

[পর্দা উঠলে দেখা যাবে জাদুকর মাঝখানে দাঁড়িয়ে। তার দুই পাশে দুই খোলবাদক বাদ্য বাজাচ্ছে]

জাদুকর। প্রণাম হই।

[তরজা গানের সুরে]

নাটকের কথা করি নিবেদন—

(আহা) সভাজন, সভাজন

[খোলের বাদ্যে, তালে নৃত্য]

জাদুকর। এ সমুদ্রপারের কথা—অনেকদিন আগেকার কথা, অনেকদিন আগেকার জীবন। সে যে কত সাল আগে তা জানিনে। লোকে বলে অনেকদিন, কিন্তু আমি বলি—

'শুনুন, শুনুন

শুনুন, গণ্যমান্য ভদ্র পঞ্চজন

আশা নিয়ে সমবেত হয়েছেন যখন—

এ যে এ দিনের সেদিনের

অনেক দিনের কথা

যতেক গপ্প কথা—

শুনুন, শুনুন, সভাজন

(আহা) সভাজন, সভাজন

দহন জ্বালা আর তন্ত্রিছেঁড়া রক্তের—

শুনুন, শুনুন, সভাজন

সভাজন, সভাজন—

[খোলের বাদকদ্বয়ের স্টেজ প্রদক্ষিণ]

জাদুকর। আমি—বুঝলেন না, এক জাদুকর। সমুদ্রপারের এই দেশে আমার বাস। এখানে অনেক লোকজন আছেন—

আছেন—ধনবান হরিচরণ

অনেক অর্থ করেছেন উপার্জন।

ধনবান হ-রি-চ-র-ণ।

[ডিক্ ডিক্ খোলের বাদ্যে তাল রেখে হরিচরণের প্রবেশ। হরিচরণের পেছনে তার ভৃত্য, হাতে রং-চঙে ছাতি, তা সে হরিচরণের মাথায় ধরে থাকে]

জাদুকর। প্রণাম হই।

[জাদুকরের উদ্দেশ্যে খোলের তালে মাথা নাচায় কয়েকবার, তারপর আবার তাল দিয়ে প্রস্থান]

জাদুকর। ইনি হচ্ছেন বণিক। অনেক দেশে, অনেক দ্রব্য করেন আমদানি ও রপ্তানি, আর আছে, যতেক বন্দরের শ্রমিক, যাদের শুদ্ধ ভাষায় বলা হয়—শূদ্র।

[এক দঙ্গল লোক ব্রতচারী নৃত্য সহযোগে এক দিক দিয়ে প্রবেশ করে, অন্য দিকে প্রস্থান করে। বোল—"ঝাউর

ঘিজা, গিজা ঘিনে তা, তাক তিলে তা, তা-তা।”]

জাদুকর [তাল বাড়িয়ে]। ঝাউর ঘিজা
গিজা ঘিনেতা
তাক তিলে তা
তা তা।

আর একজন আছেন, তিনি এ দেশের রাজা। তাঁর দর্শন আমরা আর পাই না। তিনি থাকেন তাঁর প্রাসাদে। রক্ষীরা রাতদিন ঐ প্রাসাদ পাহারা দেয়। তবে উৎসবের দিন তিনি দর্শন দেন। এখানে যে বিরাট মন্দির আছে তাতে পূজা দিতে প্রকাশ্য রাজপথে মহাসমারোহে তিনি মিছিল করে যাত্রা করেন। তিনি না, থাকলে কি হবে, তাঁর প্রতিনিধি আছেন। তিনি হচ্ছেন—
নগরপাল
নগরপাল

[খোলের তালে তাল রেখে নগরপালের প্রবেশ]

জাদুকর। প্রণাম হই।

নগরপাল। প্রণাম। জাদুকর।

জাদুকর। আজ্ঞা করুন।

নগরপাল। তোমার সঙ্গে আমার কিছু গোপন পরামর্শ আছে, তুমি আমার সঙ্গে আজ সায়াহ্নে সাক্ষাৎ করবে।

জাদুকর। যথা আজ্ঞা।

নগরপাল। আমি রাজপ্রাসাদে যাচ্ছি—

[নৃত্যের তালে বিচিত্র ভঙ্গিতে প্রস্থান]

জাদুকর। আমায় উনি সাক্ষাৎ করতে বললেন, কেন জানেন? নিশ্চয় এমন কোনো ঘটনা ঘটেছে যা তাঁর মনঃপুত নয়। অতএব আমার প্রয়োজন। আমি, জানেন, একজন মধ্যলোক। আমার রাজাও বিশ্বাস করে, আবার প্রজারাও বিশ্বাস করে।

[বাইরে প্রচণ্ড হৈ চৈ]

জাদুকর। কী আবার শোর উঠল। ওঃ, নগরপালের সঙ্গে কিছু শূদ্রের উচ্চস্বরে তর্ক বিতর্ক চলছে। আমি এখন বিদায় হই। আমায় অনুমতি দিন—
আমি করি হেথা হতে নিষ্ক্রমণ
(আহা) সভাজন সভাজন[প্রস্থান]

খোলবাদকদ্বয়। তাই হোক, তাই হোক
জাদুকর হেথা হতে গমন করিলে
শূদ্রদল আসিবে দল বেঁধে
জানিনা কিবা হয়, কিবা তার সমাচার
(তবে) তাই হোক, তাই হোক—

[খোলবাদকদ্বয় প্রচণ্ড শব্দে খোল বাজাতে বাজাতে দুদিক দিয়ে এক একজনের প্রস্থান। ভুশণ্ডির কাকের প্রবেশ, কালো আবরণে সর্বাঙ্গ ঢাকা]

কাক। আর আছি আমি—ভুশণ্ডির কাক। জাদুকর আমার পরিচয় দিলে না। আমি আশা করেছিলাম ও আমার পরিচয় দেবে। আমি—আমি সেই রাম-রাবণের যুদ্ধে যখন বন্যার মতো রক্তে প্লাবিত হয়েছিল ধরা, সেই রক্ত খেয়েছি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যখন অজস্র ধারায় রক্ত পড়ে পড়ে মাটি ভিজে লালে লাল হয়ে গিয়েছিল তখন সেই রক্ত খেয়েছি। আমি আজও আছি। মানুষের রক্ত ঝরার শেষ নেই বলে আমি চিরকাল থাকব।

[বীভৎস হাসি হেসে প্রস্থান। খোলের বাদ্য। সূর্যের প্রবেশ]

সূর্য। এ অন্যায়—

[অধীরের প্রবেশ]

অধীর। এ পাপ—

[অম্বুজের প্রবেশ]

অম্বুজ। এ অনুশাসন বিরোধী—

[কমলাক্ষের প্রবেশ]

কমলাক্ষ। মানছে কে? সব অনুশাসন ওদের জন্য আর আমাদের জন্য বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ।

[বণিকের প্রবেশ]

বণিক। তোমরা শোর করছ কেন?

অম্বুজ। আমাদের ওপর অবিচার হচ্ছে।

বণিক। অবিচার!

সূর্য। অন্যায়, অবিচার।

বণিক। কি অবিচার?

সূর্য। শুনলাম, বাণিজ্য পোত করে ভিনদেশ থেকে অজস্র ক্রীতদাস আমদানি করা হচ্ছে।

বণিক। যদি আনয়ন করা হয়, তবে তোমাদের শোরগোলের কারণ?

অধীর। আমাদের প্রশ্ন, এ কথা সত্য কিনা?

বণিক। সংবাদ সূত্র জানতে পারি?

অম্বুজ। প্রশ্ন ছিল, ভিনদেশ থেকে ক্রীতদাস আসছে কিনা?

বণিক। উত্তর যদি হয় সত্য, তবে—

সূর্য। আমরা কি অথর্ব।

কমলাক্ষ। তারা আসবে কেন?

বণিক। আমাদের অর্থ আছে, সেই অর্থে ওদের ক্রয় করা হয়েছে। তাই তারা পোতযানে সমুদ্রপথে এই বন্দরে আসবে।

অধীর। আমরা কি কর্মে অনুপযুক্ত?

বণিক। অবাস্তব প্রশ্ন।

অম্বুজ। তারা এলে আমরা কর্মচ্যুত হতে পারি!

বণিক। আশঙ্কা অমূলক নয়।

সূর্য। প্রশ্ন ছিল, আমরা কি কর্মে অপারগ?

বণিক। আমরা এই বন্দরের পরিচালক। আমরা মনে করি, এই বন্দরের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আরও মানুষ দরকার—কর্মঠ মানুষ। যাদের দিন রাত্রিব্যাপী কর্মে নিযুক্ত করা যাবে।

অম্বুজ। আমরাই কিন্তু এই বন্দর নির্মাণ করেছি।

সূর্য। আমাদের শ্রমেই এই বন্দর প্রস্তুত হয়েছে।

বণিক। অস্বীকার করছি না। তার বিনিময়ে অর্থ দিয়েছি, খাদ্য দিয়েছি, বাসস্থান দিয়েছি!

সূর্য। তা যথেষ্ট ছিল না।

বণিক। শ্রম অনুযায়ী যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে।

সূর্য। শ্রম অনুযায়ী, এর বিচার করেছে কে?

বণিক। কেন? আমি, নগরপাল, রাজা—

সূর্য। আপনাদের সমস্ত হিসেব ভুল ছিল।

বণিক। হিসেব ভুল।

কমলাক্ষ। আশ্চর্য হলেন যে বণিক প্রবর? এতো আপনার জ্ঞাত থাকার কথা। অবশ্য আশ্চর্য হতে পারেন এই ভেবে যে, আমরা কি করে আপনাদের হিসেবের গরমিল জেনে ফেলেছি।

অধীর। সেই গরমিল হিসেবের বাকি অর্থ কি আমরা দাবী করতে পারি।

বণিক। সংবাদ সূত্র জানতে পারি কি?

অম্বুজ। প্রশ্ন হচ্ছে, হিসেবের কোনো গরমিল আছে, কিনা?

বণি[illegible]]

সূর্য। আমরা কি প্রশ্ন করলে তার উত্তর পেতে পারি না?

বণিক। উত্তর দেওয়া না দেওয়া আমার উপর নির্ভর করছে।

সূর্য। ক্রীতদাসেরা আসবে?

বণিক। আসবে।

সূর্য। কারণ?

বণিক। তারা পরিশ্রমী, কর্মঠ।

অম্বুজ। আমরা রাজদরবারে আবেদন জানাব।

বণিক। বেশ, আবেদন জানিও। যদি রাজাদেশে বাণিজ্যপোত ফিরে যায় আমিও তোমাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে জয়ধ্বনি দেব।

অধীর। কারণ!

বণিক। রাজার আদেশ অনুযায়ী আমি ঐ ক্রীতদাসদের ক্রয় করে, এই বন্দরে রাজাকে বিক্রয় করতে নিয়ে আসছি।

সমবেত [আর্তনাদ]। রাজার আদেশে আসছে ক্রীতদাস!

[খোলের বাদ্য]

বণিক। রাজার আদেশে আসছে ক্রীতদাস, রাজার আদেশে আসছে ক্রীতদাস।[প্রস্থান]

সমবেত। তবে কি হবে?

অধীর। কার কাছে আবেদন জানাব! কার কাছে নিবেদন করব।

অম্বুজ। আবেদন নয়, নিবেদন নয়—

সমবেত। তবে—!

[জাদুকরের প্রবেশ, কাঁধে ঝোলা]

জাদুকর। এমনি করে আবেদন জানিয়ে নয়, চোখের জলের নিবেদন নয়।

সূর্য। কী বলছ তুমি, জাদুকর?

জাদুকর। জাদু দেখাব, জাদু। দেখই না খেলা, কি ভয়ঙ্কর খেলা।

অম্বুজ। কি খেলা?

জাদুকর। আমি তো জাদুকর, জাদুর খেলা, জীবন নিয়ে খেলা।

অধীর। তোমার সব খেলাই চালাকি, চাতুরী!

জাদুকর। না, না, এ খেলা আসল খেলার মতো—

কমলাক্ষ। আচ্ছা জাদুকর, এমন খেলা দেখাতে পার, যে-খেলায় মানুষের কাটা মুণ্ডু জোড়া লাগে না।

জাদু। কোন মানুষের?

কমলাক্ষ। বণিকের, নগরপালের, রাজার—

সমবেত। কী বলছ তুমি!

কমলাক্ষ। পার, এমন খেলা দেখাতে—এমন ভয়ঙ্কর খেলা।

[ডুক ডুক খোলের আওয়াজ]

জাদুকর। পারি এমন খেলা দেখাতে, দেখবে?

সমবেত। দেখব।

জাদুকর। ভয় পাবে না?

সমবেত। না।

জাদুকর। তবে তোমাদের মধ্যে দুজন এগিয়ে এস—এস।

সূর্য। আমি আসব?

জাদুকর। এস, আর একজন এস, এসো—ভয় নেই, এতো মিথ্যে জাদুর খেলা। কিন্তু কি ভয়ঙ্কর সত্য আজ মিথ্যে খেলায় রূপান্তরিত হয়েছে। এস, আর একজন এগিয়ে এস।

সূর্য। এস না, দেখি, কি নতুন খেলা দেখায়, জাদুকর।

অম্বুজ। এই যে আমি এসেছি।

জাদুকর। আর একজনের প্রয়োজন, তবে এখন নয় পরে—

সূর্য। খেলা শুরু হোক।

সমবেত। শুরু হোক খেলা—ভয়ঙ্কর খেলা।

[জাদুকর তার ঝুলি থেকে দুটো তলোয়ার বার করে মঞ্চের সামনের দিকে এগিয়ে যায়]

জাদুকর। অনেক দিনের অনেক কথা, যা ছিল অতীত কালের খাতায় লেখা—সেই মাটির রক্তের কথা। হেই, যা-যা-যা, হেই, আয়-আয়, চলে যা, চলে আয়, যা-যা-যা—

[তলোয়ার দুটো মঞ্চে রেখে দেয়। সূর্য চিৎকার করে একটা তরবারি তুলে নেয়। স্টেজময় নানা রং-এর আলো]

সূর্য। আমি স্পার্টাকাস!

[অম্বুজ চিৎকার করে একটা তরবারি তুলে নেয়]

অম্বুজ। আমি গ্লাডিয়েটারদের মধ্যে একজন।

জাদুকর। এবার লড়াই হবে। মহান সম্রাট নিরো আসছেন। মহান সম্রাটের সামনে মৃত্যুর লড়াই।

[জাদুকর স্টেজের প্রসেনিয়ামের এক প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ায়]

অম্বুজ। না, না পারবেন না। গ্লাডিয়েটর হয়ে গ্লাডিয়েটরের গায়ে অস্ত্রাঘাত করতে পারব না। আমি যে তোমায় ভালবাসি, স্পার্টাকাস।

সূর্য। আমরা ক্রীতদাস, আমরা গ্লাডিয়েটর। আমাদের ভালবাসতে নেই।

অম্বুজ। মিথ্যে মিথ্যে, আমি মানি না। আমি মানব না।

সূর্য। আমাদের বুকের মধ্যে মানুষ আছে, সেই মানুষটাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে দিতে হয়! আমরা ক্রমশ জানোয়ারে রূপান্তরিত। আমরা মানুষ নই।

অম্বুজ। চুপ কর, চুপ কর। আজ আমার বিদায়ের দিন। এই সুন্দর পৃথিবী থেকে আমায় বিদায় নিয়ে যেতে হবে? আজ আমার মনে পড়ছে আমার ঘরের কথা। আমার মনে পড়ছে আমার সুন্দর একটি তাজা ফুলের মতো মেয়ের কথা। কতদিন দেখিনা, কতদিন—

সূর্য। তুমি উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছ। কলোসিয়ামে উত্তেজিত হলে মৃত্যু অনিবার্য।

অম্বুজ। মৃত্যুই তো আমি চাই। মৃত্যু মানে মুক্তি, মৃত্যু ছাড়া তো আমাদের এই জীবন থেকে মুক্তি নেই স্পার্টাকাস।

সূর্য। আমি ক্রীতদাস। আমি জানি এ ছাড়া আমার অন্য কোনো পরিচয় নেই। আমরা পুরুষানুক্রমে ক্রীতদাস। আমি কিছুই মনে রাখি না। আমি কখনও এই সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি না।

অম্বুজ। সেই জন্যই কি তুমি পাথরের মতো কঠিন?

সূর্য। স্বপ্ন দেখে কি লাভ?

অম্বুজ। আমি যে তোমায় ভালবেসে ফেলেছি, স্পার্টাকাস।

সূর্য। আমাদের লড়তে হবেই। আজ আমরা লড়তে না চাইলে আমাদের যে ক্ষমা নেই। ওরা আমাদের দুজনকেই হত্যা করবে।

অম্বুজ [মাটিতে বসে]। তুমি আমায় হত্যা কর।

সূর্য। ওঃ, এ হয় না, এ হয় না। আমিও তো মানুষ।

অম্বুজ। সেই জন্যই তো তোমায় আমি ভালবাসি। আমি যে সমস্ত দুঃখী মানুষকে ভালবাসি।

সূর্য। ভালবাসা—মানুষ—দুঃখ—যন্ত্রণা [চিৎকার করে] না না। তুমি এসব কথা মনে করিয়ে দিও না। আমার ভেতরের ঘুমন্ত মানুষটা জেগে ওঠে!

কমলাক্ষ। এই শুয়ার দুটো, কথা বলছিস কেন? লড়াই-এর দিন কথা বলতে নেই।

[জাদুকর এগিয়ে আসে, মঞ্চের মধ্যে দাঁড়ায়—]

জাদুকর। মহামান্য সম্রাট নিরো আসছেন। মহান সম্রাট নিরো দীর্ঘজীবী হোন।

[ভূশণ্ডির কাকের প্রবেশ]

কাক। হেঃ হেঃ, আমিই সম্রাট নিরো—

জাদুকর। মহামান্য সম্রাটের আদেশ হলেই আমরা লড়াইটা শুরু করতে পারি।

কাক। শুরু হোক, শুরু হোক, শুরু হোক!

[খোলের বাদ্য। দুজনে রাজাকে অভিবাদন করে। স্পার্টাকাস এগিয়ে যায়, কিন্তু গ্লাডিয়েটর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে]

সমবেত। লাচড়া—লাচড়া—লাচড়া।

[হঠাৎ সেই গ্লাডিয়েটর স্পার্টাকাসের দিকে এগিয়ে যায়। তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে, স্পার্টাকাস তলোয়ার দিয়ে আঘাত প্রতিহত করে। প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। ভীষণ ক্রুদ্ধ চিৎকারে মঞ্চ আলোড়িত হতে থাকে। খোল প্রলয়ডঙ্কা বাজায়। হঠাৎ স্পার্টাকাসের তলোয়ার হস্তচ্যুত হয়। স্পার্টাকাস ভারসাম্য রাখতে না পেরে মাটিতে পড়ে যায়। অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সে। সামনে তার উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে গ্লাডিয়েটর। সমবেত চিৎকার "মারো মারো।" কিন্তু স্পার্টাকাস আঘাত করে না। ক্রুদ্ধ চিৎকারে তলোয়ার নিয়ে রাজার দিকে এগিয়ে যায় গ্লাডিয়েটর। রাজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কমলাক্ষ তার দেহরক্ষীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল তার দিকে মুষ্টিবদ্ধ হাতে বৃদ্ধ অঙ্গুলির নিচের দিকে দু'বার নামায় ওঠায়। নির্দেশ পেয়ে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে সে গ্লাডিয়েটরকে। মাটিতে রক্তাপ্লুত হয়ে ছিটকে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে গ্লাডিয়েটর]

কাক [ভয়ঙ্কর শব্দে হেসে ওঠে]। হাঃ হাঃ, রক্ত, কত রক্ত, কি সুন্দর রক্ত। ফিনকি দিয়ে ছুটছে রক্ত। জমিটা ভিজে লাল হয়ে গেছে। কি সুন্দর দৃশ্য! কি অপূর্ব দৃশ্য! যা, যা, নিজেদের মধ্যে লড়ে যা, যত খুশি লড়ে যা। আমাদের গায়ে যেন হাত দিস না। আমাদের বাঁচিয়ে রাখিস, আমাদের বাঁচিয়ে রাখিস—[প্রস্থান]

সূর্য [ছুটে আসে গ্লাডিয়েটরের দিকে]। গ্লাডিয়েটর, গ্লাডিয়েটর—

অম্বুজ। বিদায় বিদায় স্পার্টাকাস, হে আমার মৃত্যুদিনের সূর্য, আমার শেষ অভিবাদন গ্রহণ কর। [মৃত্যু]

সূর্য। গ্লাডিয়েটর, গ্লাডিয়েটর—[ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়] আমরা কেউ আর এই ভাবে জীবন দেব না। তোমার রক্তে শপথ নিচ্ছি, যতদিন এই পৃথিবীতে একজনও ক্রীতদাস থাকবে, ততদিন তাদের বুকের মধ্যে জ্বালিয়ে রাখব বিদ্রোহের আগুন।

তোমার রক্তে শপথ নিচ্ছি, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাসের বন্ধন আমি ছিন্ন করবই। আমরা সকলে মিলে মুক্ত পৃথিবী গড়বই। যেখানে শোষণ নেই, যেখানে অনাচার নেই, যেখানে বন্ধন নেই, যেখানে ক্রীতদাস নেই—

জাদুকর [হাতের কালো কাপড় সঞ্চালন করে]। এবার আমার রঙ্গ শেষ, জাদু শেষ।

অধীর। তোমার এই নতুন খেলাটা দারুণ জমেছিল।

অম্বুজ। আমি তো বুঝতেই পারলাম না কি হল আর কি হল না।

কমলাক্ষ। আমি ভাবলাম বুঝি অম্বুজটা সত্যই মারা গেল।

সূর্য। কী যে করলাম আমার কিছুই মনে পড়ছে না।

জাদুকর। কিছুই মনে পড়ছে না।

সূর্য। না, মাথাটা যেন কেমন ঝিম ধরে গেছে।

জাদুকর। মনে কর, মনে কর।

সূর্য। না, কিছুই মনে পড়ছে না!

জাদুকর। তোমার যে মনে করতেই হবে।

সূর্য। কেন?

জাদুকর। তুমি যে স্পার্টাকাস।

সূর্য। স্পার্টাকাস!

জাদুকর। স্পার্টাকাস!

জাদুকর। লক্ষ ক্রীতদাসের মুক্তি সংগ্রামের নেতা বিপ্লবী স্পার্টাকাস।

সূর্য। না, আমি এই বন্দরের শ্রমজীবী শূদ্র সূর্যনারায়ণ।

জাদুকর। না, না তুমি স্পার্টাকাস, স্পার্টাকাস [খোলের বাদ্য] বাজাও, বাদ্য বাজাও, বিতান বাজাও, বাজাও। মনে করিয়ে দাও—এদের সত্যকারের পরিচয় মনে করিয়ে দাও।

[খোলের তালে ঝুমুরের শব্দ]

মনে কর, মনে কর
হাজার বছর, পেরিয়ে এসে
তোমরা কারা, তোমরা কারা
মনে কর, মনে কর।

[ওরা মঞ্চের চারদিক থেকে নাচতে নাচতে ওর দিকে এগিয়ে আসে, জাদুকর মঞ্চের মধ্যে দাঁড়িয়ে]

সমবেত। আমরা কারা?
আমরা কারা?
আমরা কারা?

[আবার নাচের ভঙ্গিতে পিছিয়ে যায়]

জাদুকর। মনে কর, মনে কর
রক্ত দেব জীবন দেব
আর দেব আগুন

সেই আগুনে জ্বলছে জীবন মন
তোমরা কারা তোমরা কারা?

সমবেত। আমরা কারা, আমরা কারা [নাচের ভঙ্গিতে এগোয়]
আমরা কারা, আমরা কারা।

[জাদুকর তলোয়ার দুটো তুলে নিয়ে]

জাদুকর। মনে কর, মনে কর
তোমরা কারা, তোমরা কারা
তোমরা কারা? [প্রস্থান]

[ওরা ঠিক জাদুকরের শূন্য স্থানের দিকে নাচতে নাচতে এগোয়]

সমবেত। আমরা কারা
আমরা কারা।

সমবেত। না, আমাদের কিছুই মনে পড়ছে না। মনে পড়ছে না। মনে পড়ছে না।

[আবার ওরা ধীরে ধীরে নিজেদের জায়গায় অর্থাৎ স্টেজের চার দিকে চারজন ফিরে আসে]

সূর্য। আমরা মনে করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়ছি, অথচ আমরা মনে করতে পারছি না।

অম্বুজ। ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত। আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি, আমাদের কিছু মনে করবার কথা, অথচ আমরা কিছুই মনে করতে পারছি না!

কমলাক্ষ। আমাদের মনে না পড়লে কি আর করা যাবে।

অধীর। আমরা কিন্তু চেষ্টা করছি, তবুও মনে করতে পারছি না।

সূর্য। পারতে বোধহয় আমাদের হবেই। ওদিকে জাহাজ ভর্তি নতুন ক্রীতদাসেরা আসছে। তারা এলে আমরা আমাদের কাজ হারাতে পারি, অথচ এই বন্দর আমরাই তিল তিল শ্রম দিয়ে গড়ে তুলেছি।

অম্বুজ। কথাটা অত্যন্ত ভয়ের কথা—

অধীর। কোন কথাটা—

অম্বুজ। ঐ যে বণিক বলে গেল ওরা আমাদের চেয়েও পরিশ্রমী, আমাদের চেয়েও কর্মঠ।

সূর্য। তাতেই বোঝা গেছে ওদের উদ্দেশ্যটা কি। আমাদের সকলকে বিতাড়িত করে নতুন ক্রীতদাসদের কর্মে নিযুক্ত করবে।

কমলাক্ষ। তাতে ওদের লাভ?

সূর্য। আরও বেশি কাজ, আরও বেশি অর্থ।

কমলাক্ষ। তবে তো সেটা অত্যন্ত ভয়ের কথা।

অধীর। ভাবনার কথা—

অম্বুজ। ভয়ঙ্কর কথা—

সূর্য। আমাদের সকলের মৃত্যুর কথা।

অম্বুজ। তবে উপায়?

[বণিকের প্রবেশ]

বণিক। উপায় কিছুই নাই। আমি রাজ দরবার থেকে আসছি। রাজাকে তোমাদের ভয়ের কথা জ্ঞাত করেছিলাম, কিন্তু রাজা আদেশ দিয়েছেন—

সমবেত। কি রাজাদেশ?

বণিক। দেশের বৃহত্তর সমৃদ্ধির জন্য নতুন ক্রীতদাসের শ্রমের প্রয়োজনীয়তা আছে, অতএব—

সমবেত। নতুন ক্রীতদাসের আমদানী বন্ধ হবে না।

সূর্য। আমরা যে তিল তিল শ্রম দিয়ে এই বন্দর নির্মাণ করেছি।

বণিক। রাজা তার জন্য তোমাদের পুরস্কার দেবেন।

সূর্য। কী পুরস্কার?

বণিক। এখানে বিরাট একটা শ্বেত পাথরের সৌধ নির্মাণ করা হবে। সেই সৌধের গায়ে রাজা তোমাদের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার কথা দেবভাষায় খচিত করে রেখে দেবেন।

অম্বুজ। শুধু মাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ!

বণিক। না, তিনি আরও কিছু করবেন—

কমলাক্ষ। কী সে কর্ম?

বণিক। রাজা যেদিন সেই সৌধ উন্মোচন করবেন সেইদিন তোমাদের অসাধারণ আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে অশ্রু বিসর্জন করবেন।

সূর্য। শুধুমাত্র সৌধ আর অশ্রু বিসর্জন।

বণিক। বিরাট সৌধ আর রাজ অশ্রু—এর থেকে আর পৃথিবীতে কোনো বস্তু আছে যা তোমাদের মত নগণ্য সামান্য শূদ্ররা কামনা করতে পারে?

সূর্য। পারে!

বণিক। পারে! কি সে বস্তু?

সূর্য। জীবন।

বণিক। শূদ্রের জীবন রাজার চিন্তার কারণ নয়।

সূর্য। বাঁচতে চাওয়া সব মানুষের অধিকার, এমন কি দেশের রাজারও—

বণিক। সাবধান শূদ্র—

সূর্য। আমরা প্রত্যাখ্যান করলাম।

বণিক। কি?

অম্বুজ। বিরাট সৌধ।

সূর্য। রাজ অশ্রু!

বণিক। কারণ?

সূর্য। ওতে পেট ভরে না।

অম্বুজ। জীবনও বাঁচে না।

সূর্য। মৃতদেহের উপর সৌধ নির্মাণ করা যায়, কিন্তু জীবন্ত মানুষের জন্য চাই খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান।

বণিক। রাজা এর বেশি কিছু করতে অপারগ।

সূর্য। তবে আপনি করুন।

বণিক। আমি করব! কোন অনুশাসন মেনে!

সূর্য। যে-অনুশাসনে ভোগ্যপণ্য রপ্তানি করে আপনি লক্ষ লক্ষ মুদ্রা সঞ্চয়ে আগ্রহী।

বণিক। এই বন্দর তৈরি করেছেন দেশের রাজা, আমি নই।

সূর্য। তৈরি বন্দর ব্যবহার করছেন আপনি, রাজা নয়!

বণিক। আমি তার জন্য রাজাকে কর দিচ্ছি।

সূর্য। সেই করের জন্য রাজা আপনাকে এই বন্দর ব্যবহার করতে দিচ্ছেন।

বণিক। তোমাদের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই।

[এক এক করে নতজানু হয়ে বসে]

অম্বুজ। আমরা অনুনয় করছি, বণিকপ্রবর।

অধীর। আমরা প্রার্থনা করছি, বণিকপ্রবর।

কমালাক্ষ। আমরা করজোড়ে আবেদন জানাচ্ছি, বণিকপ্রবর।

সূর্য। আমাদের কর্মচ্যুত করবেন না, বণিকপ্রবর।

বণিক [মৃদু হেসে]। তোমরা কর্ম ভিক্ষা করছ?

সমবেত [এক সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়]। হ্যাঁ, বণিক প্রবর।

বণিক। ঠিক আছে, আমি রাজার কাছে তোমাদের আবেদন পৌঁছে দেব। তাঁকে বলব, নতুন ক্রীতদাসের সঙ্গে পুরাতন শূদ্রদের এক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করতে। সেই প্রতিযোগিতায় যারা উত্তীর্ণ হতে পারবে, তাদের কর্মে নিযুক্ত করা হবে।

অধীর। এ কি কথা!

বণিক। অকর্মণ্য লোকদের কাজে নিযুক্ত করা যায় না। তোমরা নিজেদের উপযুক্ততা প্রমাণ কর।

সূর্য। এই বিরাট ভয়ঙ্কর সমুদ্র বন্ধন করে আমরা এই বন্দর নির্মাণ করেছি—

অম্বুজ। এতেও কি আমাদের কর্মের উপযুক্ততা প্রমাণ হয় না!

বণিক। না।

অধীর। এ কথার অর্থ কি? পরিষ্কার করুন আপনার কথা। আমরা যে কিছুই বুঝতে পারছি না, বণিকপ্রবর!

বণিক। কোনো বস্তু নির্মাণ করা, আর চালনা করা, একই কথা নয়। কোনো ব্যক্তি বিরাট লাঙলের ফলা প্রস্তুত করতে পারেন, কিন্তু তিনি যে ক্ষেতে লাঙল চালনা করতে পারবেন, তার নিশ্চয়তা নেই।

কমলাক্ষ। তবে উপায়—

বণিক। উপায় কিছুই নেই। অপেক্ষা কর, ঘটনার গতি লক্ষ্য কর। আমার মনে হয়, উপায় কিছুই নেই, উপায় কিছুই নেই। [প্রস্থান]

সূর্য। বুঝতে পারছ?

কমলাক্ষ। স্পষ্ট করে নয়, তবে—

সূর্য। এখনও স্পষ্ট বুঝতে পারছ না? বুঝতে পারছ না, আমাদের প্রয়োজন শেষ হয়েছে, আমরা এখন উচ্ছিষ্টে পরিণত হয়েছি।

অম্বুজ। এ বিপদ থেকে পরিত্রাণের পথ কোথায়?

অধীর। পরিত্রাণের পথ আমাদের খুঁজে বার করতে হবে, নচেৎ আমাদের সামনে মৃত্যুর অন্ধকার।

সূর্য। মরার আগে চেষ্টা করতে হবে।

কমলাক্ষ। বাঁচার চেষ্টা।

সূর্য। যে কোনো মানুষের বাঁচার অধিকার আছে।

অধীর। কথাটা হয়তো সত্য, কিন্তু আমি একটা কথা বুঝেছি—

অম্বুজ। কি কথা?

অধীর। আমাদের দিন শেষ, নতুন ক্রীতদাসদের দিন শুরু। একথা কেন তোমরা বুঝতে পারছ না যে, আমরা এখন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আছি। সেই মৃত্যু আসছে। আমাদের সকলের মৃতদেহের উপর বিরাট সৌধ নির্মাণ করা হবে—তার প্রস্তুতি চলছে। আমাদের অকাল মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করা হবে—তারই আয়োজন এই রাজঅশ্রুবর্ষণ।

সূর্য। আমরা ঐ মিথ্যা সৌধ ভেঙে দেব।

কমলাক্ষ। চূর্ণ করে দেব পাথর বাঁধানো নিরেট সৌধলিপি, যা শুধু মাত্র কিছু অক্ষর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, যে—অক্ষরের সঙ্গে আমাদের জীবনের কোনো যোগ নেই, আছে মৃত্যুর যোগসূত্র।

সূর্য। মৃত্যুর সৌধ ভাঙো, মৃত্যুলিপি মুছে দাও।

সমবেত। জীবন নিয়ে এই ভয়ঙ্কর রসিকতা, বীভৎস ব্যঙ্গ বন্ধ হোক।

[জাদুকরের প্রবেশ]

জাদুকর। জয় হোক মানুষের।

সূর্য। কার জয়ধ্বনি দিচ্ছ, জাদুকর?

জাদুকর। মানুষের—

সূর্য। আমরা কি মানুষ?

জাদুকর। হ্যাঁ, মানুষ। সেই মানুষ, যাদের শক্তিতে মানবসভ্যতা এগিয়ে চলেছে।

সূর্য। মানুষ—

সববেত। মানুষ—মানুষ—মানুষ।

জাদুকর। সূর্য-সন্তান কারা, বল, সূর্য-সন্তান কারা—বল, তোমরা কারা?

[জাদুকর যখন এই কথাগুলো বলবে তখন সূর্য, অম্বুজ, অধীর, কমলাক্ষ পেছনের পর্দার সামনে মুখ করে সারি দিয়ে দাঁড়াবে]

জাদুকর [খোলের বাদ্যে তাল রেখে]।

তোমরা কারা
তোমরা কারা
তোমরা কারা

[ওরা ছন্দের তালে নাচতে থাকে]

তোমরা কারা
তোমরা কারা
ভাবছ বসে
স্বপ্ন শেষে
তোমরা কারা
তোমরা কারা ?

[ওরা নাচতে নাচতে এক এক সারি দিয়ে সামনের দিকে এগোয় আর তালে তাল দিয়ে ছড়া কাটে এবং জাদুকর সেই তালে পিছিয়ে যায়]

সববেত। আমরা কারা
আমরা কারা
ভাবছি বসে
নিদ্রা নিয়ে
আমরা কারা
আমরা কারা

[ওরা আবার পিছোয়, জাদুকর ছড়া বলতে বলতে এগোয়]

জাদুকর। সেই কথাটি ভাবছ শুধু
যার মাঝেতে আঁধার ধূ ধূ।
সূর্য নেই
আলো নেই
আছে শুধু
আঁধার ধূ-ধূ।

[জাদুকর পেছনে যায়। ওরা ছড়া বলতে বলতে এগোয়]

সমবেত। ভাবব না,
শুনব না,
মৃত্যু কথা,
(সেই কথাটি) ভাবব না,
ভাবব না,
ভাবব না।

[জাদুকর এগোয়, ওরা পিছনে যায়]

জাদুকর। তোমরা কারা
তোমরা কারা

ভাবছ বসে,
নিদ্রা শেষে
তোমরা কারা

সমবেত [এগিয়ে আসতে থাকে]।
আমরা কারা
আমরা কারা
ভাবছি শুধু
আঁধার ধূ-ধূ। [পিছনে যায়]

জাদুকর [এগিয়ে আসে]।
তোমরা কারা
তোমরা কারা
তোমরা কারা

[হাত তালি দিয়ে]
এক, দুই
তোমরা কারা
তোমরা কারা
তিন চার
তোমরা কারা
তোমরা কারা

[জাদুকরের প্রস্থান। ওরা আবার চার কোণে চারজন খোলের বাদ্য তালে তালে ফিরে যায় এবং হাত্ তালি দিয়ে খোলের তাল দিতে থাকে]

সমবেত। এক-দুই-তিন-চার, চার-তিন-দুই-এক, এক-দুই-তিন-চার।

[ভুশণ্ডির কাকের প্রবেশ]

কাক। এক দুই তিন চার...

সূর্য। কি শুনছ?

কাক। পল, মুহূর্ত, সময়।

সূর্য। পল!

অম্বুজ। মুহূর্ত!

অধীর। সময়!

কমলাক্ষ। কিসের?

কাক। অমঙ্গলের।

সমবেত। অমঙ্গলের!

কাক। আমার কর্ম সব অমঙ্গলের আহ্বান। তাই চিৎকার করছি আর গুনছি সময়—
গুনছি সময়
আসবে ভয়।

মৃত্যুযোগ দেখেছি চক্ষে
আনন্দ জেগেছে বক্ষে।
অমঙ্গল, ভয়ানক অমঙ্গল আসছে।

অধীর। আমার যে বক্ষ দুর-দুর করছে। ওরা কিন্তু অমঙ্গলের বার্তা আগে পায়।

কাক। তাকিয়ে দেখ নীল সমুদ্রের দিকে—

[ওরা তাকায়, সমুদ্রের গর্জন শোনা যায়]

কাক। দেখছ?

সূর্য। দেখছি, কিন্তু সামনে তো শুধু অনন্ত সমুদ্র—

কাক। আর কিছু দেখতে পাচ্ছ না?

সমবেত। না।

কাক। তোমরা কি অন্ধ?

অম্বুজ। না, আমাদের দৃষ্টি শক্তি আছে।

কাক। তবে কেন দেখতে পাচ্ছ না!

অম্বুজ। দেখছি তো—

সূর্য। শুধু সমুদ্র—

অধীর। তার আনন্দ জলরাশি—

কমলাক্ষ। নীল হয়ে সীমানায় চিহ্ন যারা দেখতে পায় না, তারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে— [প্রস্থানোদ্যত]

সূর্য। আমাদের হেঁয়ালির মধ্যে নিক্ষেপ করে চলে যাচ্ছ?

কাক। অন্ধকে অমঙ্গলের দৃশ্য দেখানো যায় না।

অম্বুজ। আমরা অন্ধ নই।

কাক। প্রমাণ কই।

অম্বুজ। এইতো আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি, এইতো আমার সামনে যাবতীয় বস্তু দেখতে পাচ্ছি।

কাক। তবে দূর সমুদ্রে সামান্য একটা বিন্দু, যা তোমাদের মৃত্যু-বিন্দু, তা দেখতে পাচ্ছ না কেন?

সূর্য। আমরা তো চেষ্টা করছি।

কাক। আবার দেখ—দেখছ

সমবেত [ওরা আবার তাকায়]। হ্যাঁ, কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

কমলাক্ষ। আমি দেখেছি।

কাক। কি?

কমলাক্ষ। কয়েকটা জেলে ডিঙি।

কাক। মূর্খ—অন্ধ—স্থবির।

সূর্য। যা আমাদের দৃষ্টি শক্তির বাইরে তা দেখা অসম্ভব।

কাক। আবার দেখ, দূরে, আরো দূরে, অনন্ত জলরাশির মধ্যে ছোট্ট একটা বিন্দু ক্রমশ প্রকাশমান—

সূর্য। আমি দেখেছি, আমি দেখেছি।

অধীর। কোথায়?

সূর্য। ঐ যে দূরে একটা বিন্দু—

কাক। আরও ভাল করে লক্ষ্য কর, ঐ বিন্দু ক্রমশ একটা সমুদ্রপোতের মাস্তুল হয়ে দৃশ্যমান হবে, তারপর হবে সম্পূর্ণ একটি সমুদ্রপোত। আর ঐ পোতযানে আসছে নতুন ক্রীতদাসের দল। অমঙ্গলের বার্তা—অতএব সাবধান।

সমবেত। ওরা আসছে, ওরা আসছে।

কাক। ওরা আসছে, কিন্তু কেন আসবে।

অম্বুজ। ওরা আমাদের অন্ন কেড়ে নেবে—

কাক। মৃত্যু আসছে।

কমলাক্ষ। ওরা আমাদের সন্তানদের বাঁচার পথ বন্ধ করে দেবে—

কাক। স্বজন হারানো বুকে আগুন জ্বলে উঠবে।

অধীর। ওরা আমাদের বাসস্থান অধিকার করে নেবে—

কাক। নিরাশ্রয় হয়ে পথে-ঘাটে ঘুরতে হবে।

সূর্য। না, না কিছুতেই নয়।

কাক। বিন্দুটা ক্রমশ মাস্তুল হচ্ছে, মাস্তুল হবে পোতযান।

সূর্য। আমরা ওদের এই বন্দরের মাটি স্পর্শ করতে দেব না।

সমবেত। কী বলছ তুমি?

সূর্য। আমরা সমবেত হয়ে ওদের বাধা দেব। ওদের এই বন্দরের মাটিতে অবতরণ করতে দেব না।

কাক। চেষ্টা করলে তোমরা ওদের বাধা দিতে পার!

সূর্য। আমরা যুদ্ধ করব। আমরা বিনা যুদ্ধে আমাদের অধিকার ছেড়ে দেব না।

অম্বুজ। ওরা তো সহজে ছেড়ে দেবে না।

সূর্য। আমরাও সহজে ছেড়ে দেব না। ওরা আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবে, আর আমরা বাধা দেব না!

কমলাক্ষ। আমরা কি ওদের সঙ্গে পারব?

সূর্য। সে—পরীক্ষা আজকে হয়ে যাবে। এমনিই যদি ওদের আমরা ছেড়ে দিই তবে আমাদের মৃত্যু, কিন্তু যুদ্ধ করে মরতে চাই। শুধু, শুধু ওদের হাতে মরব না, মরব না।

অম্বুজ। তবে এখন—

সূর্য। প্রস্তুতি।

অধীর ও কমলাক্ষ। মরব না

মরব না

মরব না
মরব না।

[খোলের বাদ্যের তালে]

অম্বুজ। যুদ্ধের—

সূর্য। জীবনের জন্য সংগ্রাম

অধীর ও কমলাক্ষ। মরব না
মরব না।

সূর্য। আয়, বন্দরের ভাইসব
এক সাথে সব দাঁড়া।
ঐ দেখা যায় দূরে
মৃত্যুদূতের কারা
আঘাতে রক্ত নেবো
বাজা সব প্রলয় বাদ্য বাজা।

সমবেত। রক্ত চাই, রক্ত নেব [খোলের বাদ্য]
রক্ত চাই, রক্ত নেব।

[বলতে বলতে হাত ঊর্ধ্বে তুলে প্রস্থান]

কাক [প্রকট হেসে]। আমিও রক্ত চাইছি, রক্ত। আমার কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে। এবার তৃপ্তি ভরে রক্ত খাব। অনেক, অনেক রক্ত। ছুটবে—তাজা রক্ত। লাল রক্ত। আহা, আহা, আমার কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে।

আমার তৃষ্ণা
রক্তের তৃষ্ণা
ত্রেতা যুগ থেকে
কত যুগ ধরে
বক্ষ জুড়ে
রক্ত তৃষা
রক্ত তৃষা
রক্ত তৃষা,

[প্রস্থান। জাদুকরের দ্রুত প্রবেশ]

জাদুকর। রক্ত নয়
রক্ত নয়
নিজের রক্ত দিয়ে
ছিন্নমস্তা এই খেলা
বন্ধ হোক
বন্ধ হোক।

সহে না এই জীবনের অবহেলা
মৃত্যুর এই ভৈরব আরাধনা।

[খোলের বাদ্য সঙ্গে কাঁসর]

জাদুকর। ওরে তোরা ফিরে আয়। কোথায় চলেছিস তোরা? শোন-শোন—

[নগরপালের প্রবেশ]

নগর। কাকে ডাকছ, জাদুকর—
শুধু ফিরে আসে প্রতিধ্বনি—
কারও অন্য শব্দ নাহি শুনি—

জাদুকর। ঐ শূদ্রদের ডাকছিলাম।

নগর। কেন?

জাদুকর। ওরা নাকি নতুন ক্রীতদাসদের বন্দর অবতরণে বাধা দেবে।

নগর। আমিও তাই শুনেছি, রাজাও আমায় ডেকে এই সংবাদ-ই দিয়েছেন, বি-প-দ।

জাদুকর। রাজা এই সংবাদ পেলেন কোথা থেকে?

নগর। বণিকপ্রবর দিয়েছেন—বি-প-দ।

জাদুকর। বণিকপ্রবর!

নগরপাল। আসলে তো উনিই কেলেঙ্কারিটা বাধালেন। এদিকে আমার জীবন যায়, বি-প-দ।

জাদুকর। আপনার বিপদ কোথায়?

নগর। আমার বিপদ নয়? এই যে এত গণ্ডগোল হবে, এর সমস্ত ঝক্কি তো আমাকেই নিতে হবে।

জাদুকর। তা বটে—

নগর। তারপর হয়েছে আর এক বিপদ এই তলোয়ারটা নিয়ে—

জাদুকর। কেন?

নগরপাল। দেখো না, এই তলোয়ারটা কত বড়। রাজা এটাকে মধ্য প্রাচ্য থেকে আমদানি করেছেন। আমার দেহের উচ্চতার সঙ্গে এই তলোয়ারটা মানায়? তারপর এটা তুলতেও শক্তি লাগে, বিপদ।

জাদুকর। সত্যই তো—

নগর। এখন ধর, সত্যই যদি কিছু গোলমাল লাগে, তবে আমার পক্ষে সম্ভব এই তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করা?

জাদুকর। তবে এখন—

নগর। এখন হয়েছে, এই তলোয়ার থাকা আর না-থাকা আমার কাছে দুটোই সমান।

জাদুকর। তা তলোয়ারটা পরিবর্তন করে নিলেই হয়!

নগর। তুমি মজার কথা বললে! এটা রাজা নিজে আমায় উপহার দিয়েছেন, আমার

প্রচণ্ড বীরত্ব দেখে। এটা যদি আমি ব্যবহার না করি তবে রাজা অসন্তুষ্ট হবেন, আর আমার শিরশ্ছেদের আদেশ দেবেন।

জাদুকর। তাহলে তো সত্যই আপনার ভীষণ বিপদ।

নগর। তারপর তুমি তো জানো আমার রোগের কথা। বায়ু রোগ, শিরঃপীড়া, হৃদকম্পন, অম্লশূল প্রভৃতি রোগে নিজের বিপদে নিজেই অস্থির। তার উপর নাকি নতুন ক্রীতদাসদের সঙ্গে পুরাতন শূদ্র শ্রমিকদের রক্তাক্ত সংঘর্ষের সম্ভাবনা! বোঝ, কি নিদারুণ বিপদ আমার।

জাদুকর। আমি একটু বন্দরের দিকে যাব।

নগর। না না, ওদিকে যেও না। আমি নিজেই ওদিকে যেতে সাহস পাচ্ছি না।

জাদুকর। আমার ওদিকে যে যেতেই হবে।

নগর। কেন?

জাদুকর। নতুন জাদু দেখাতে হবে।

নগর। নতুন জাদু!

জাদুকর। এবারকার খেলা নতুন খেলা, ভয়ঙ্কর খেলা। প্রলয়সম বীভৎস খেলা।

নগর। ভয়ানক ব্যাপার তাহলে—

জাদুকর। হ্যাঁ, ভয়ানক ব্যাপার।

নগর। কিন্তু আমার যে তোমার সঙ্গে পরামর্শ ছিল।

জাদুকর। কী?

নগর। ঐ শ্বেততুলসী পাতা কোথায় পাওয়া যায় বলতে পার?

জাদুকর। শ্বেত তুলসী পাতা?

নগর। বৈদ্যাচার্য বলেছেন ঐ পাতার রস যদি দিনে তিন মাত্রা করে সেবন করা যায় তবে নাকি আমি এক সপ্তাহের মধ্যে পূর্ণ যৌবন ফিরে পাব।

জাদুকর। ওঃ, ঠিক আছে, অনুসন্ধানে থাকব, যদি পাই নিশ্চিত আপনাকে পৌঁছে দেব। চলি এখন— [প্রস্থান]

নগর। ভালো করে অনুসন্ধান কর জাদুকর। এখন যদি সত্যই রক্তাক্ত সংঘর্ষ হয় তবে আমার কি হবে? এদিকে ইদানীং অতি নিদ্রা রোগের প্রচণ্ড আক্রমণে জর্জরিত। বিপদ—ভীষণ বিপদ। [প্রস্থান]

[অম্বুজের প্রবেশ]

অম্বুজ। বন্দরে বাণিজ্য পোত নোঙর করেছে। ওরা এক এক করে বন্দরে নামছে।

[কমলাক্ষের প্রবেশ]

কমলাক্ষ। ওরা নামছে আর আমরা প্রস্তুত।

[অধীরের প্রবেশ]

অধীর। আমাদের রক্তে আজ বন্যতা?

[সূর্যের প্রবেশ]

সূর্য। আমরা ক্রমশ হিংস্র হয়ে যাচ্ছি।

কমলাক্ষ। রক্তের স্বাদ নিতে হবে।

অম্বুজ। মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে।

সূর্য। আমাদের খুব সাবধানে কৌশলে অথচ ধৈর্যের সঙ্গে নিখুঁত পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হবে। আমাদের একটু ভুল হলে শেষ হয়ে যাব।

অধীর। কী কৌশল?

সূর্য। আমরা ওদের বন্দরে নেমে একত্র হতে দেব।

অধীর। সে কি?

সূর্য। শোন, ওরা সবাই যখন পোতযান থেকে নেমে সমুদ্র পারে অপেক্ষা করবে, তখন আমরা ওদের অতর্কিতে আক্রমণ করব। ওরা তখন কোনো বাধা দেবার চেষ্টা করতে পারবে না।

কমলাক্ষ। কথাটা মন্দ বল নি। কিন্তু আমি একটা কথা ভাবছি। সবই হবে, হয়তো সকলকে আমরা হত্যা করলাম, সমুদ্র তটের বালুকারাশি ওদের রক্তে লালে লাল হয়ে গেল, তবুও—

সমবেত। তবুও?

কমলাক্ষ। একটা তারপর থাকবে!

সূর্য। কী থাকবে?

কমলাক্ষ। একটা রক্তে ভেজা প্রশ্ন!

সূর্য। প্রশ্ন?

কমলাক্ষ। ওদের মৃত্যুর নিশ্বাসে নিশ্বাসে সেই প্রশ্ন।

সূর্য। যুদ্ধের পূর্বে সংশয় প্রকাশ করতে নেই।

কমলাক্ষ। সংশয় নয় প্রশ্ন।

সূর্য। কার প্রশ্ন?

কমলাক্ষ। ওদের প্রশ্ন।

অধীর। ওদের প্রশ্ন তুমি জান?

কমলাক্ষ। জানি।

অধীর। কী করে জানলে?

অম্বুজ। তুমি কি ঐ নতুন ক্রীতদাসদের গুপ্তচর।

কমলাক্ষ। না।

অধীর। তবে?

কমলাক্ষ। তুমিও চেষ্টা করলে এই প্রশ্নটা জানতে পার।

অম্বুজ। ওদের কাছে গিয়ে?

কমলাক্ষ। না, নিজের মনের কাছে গিয়ে।

সূর্য। তুমি কি সেই প্রশ্নটা আমাদের কাছে প্রকাশ করবে?

কমলাক্ষ। করব, কিন্তু ভাবছি তোমরা আমার প্রশ্নটা কি ভাবে নেবে?

সূর্য। সময় এগিয়ে চলেছে, তাড়াতাড়ি তোমার কথা শেষ কর।

কমলাক্ষ। তবে শোন, ঐ নতুন ক্রীতদাসেরা যদি মৃত্যুর পূর্বে ঐ রক্ত ভেজা বালিয়াড়িতে শুয়ে প্রশ্ন করে আমাদের তোমরা কেন হত্যা করলে যার জন্যে আমরা দায়ী নই। তোমাদের যারা একদিন এখান নিয়ে এসেছিল তারাই তো আমাদের নিয়ে এসেছে। এখানে আমার যেমন তোমাদের দায়িত্ব নেই তেমন আমাদেরও নেই। এর জন্য শুধু মাত্র আমরাই দায়ী হয়ে মৃত্যুবরণ করলাম কেন? তোমরা আমাদের এমন নির্মম মৃত্যু উপহার দিলে কেন? তখন—তখন আমরা কি উত্তর দেব। বল সূর্য, অধীর, অম্বুজ আমরা কি উত্তর দেব?

[নগরপালের প্রবেশ]

সূর্য [সভয়ে]। কে?

অম্বুজ। নগরপাল!

নগরপাল [ওদের মাঝখানে দাঁড়ায়]। নতুন ক্রীতদাসদের অক্ষত থাকতে দিও না। তবে তোমরা কর্মচ্যুত হবে। এ একটা অদ্ভুত কাণ্ড, ওরা বাঁচলে তোমরা মরবে আর তোমরা বাঁচলে ওরা মরবে এখন প্রশ্ন, কে বাঁচবে ওরা না তোমরা।

অম্বুজ। আমরা বাঁচব।

নগর। তবে ওরা মরবে?

সূর্য। মাথাটা কেমন যেন আমার ঝিম ধরে গেল।

নগর। যুদ্ধ করতে অস্ত্র লাগে। যাও অস্ত্র সংগ্রহ করে এস। খালি হাতে তো যুদ্ধ হয় না।

সূর্য। ভাবছি।

নগর। ভেবে কিছু হয় না। এখন কাজের সময়।

অম্বুজ। অস্ত্র সংগ্রহ করা উচিত?

নগর। নিশ্চয়ই।

অম্বুজ। করি?

নগর। কর।

[দ্রুত অম্বুজ নগরপালের অস্ত্র তুলে নিয়ে অধীরের দিকে ছুঁড়ে দেয়! নগরপাল অসহায়ভাবে অধীরের দিকে ছুটে যায়। অধীর ছুঁড়ে দেয় কমলাক্ষকে। নগরপাল আবার কমলাক্ষের দিকে যায়। কমলাক্ষ দেয় সূর্যকে। নগরপাল সূর্যের সামনে এসে দাঁড়ায়]

নগর। একি, একি কর্ম!

অম্বুজ। অস্ত্র সংগ্রহ করলাম।

[নগরপাল পেছন ফিরে তাকায়]

নগর। আমার অস্ত্র ফিরিয়ে দাও।

অম্বুজ। না।

নগর। তবে মর।

[নগরপাল ছুটে গিয়ে অম্বুজের গলা চেপে ধরে। ওরা নগরপালের কাছ থেকে অম্বুজকে মুক্ত করে ছিটকে পড়ে যায়। বাইরে খোলের শব্দ। ওরা তলোয়ার নিয়ে নৃত্য করতে করতে মঞ্চ প্রদক্ষিণ করে]

নগর। সর্বনাশ, আমার অস্ত্র যে ওরা নিয়ে গেল এখন আমি কি করি। আমার অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে—আমার অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে।

[জাদুকরের প্রবেশ সঙ্গে বণিক]

জাদুকর। মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ।

[বণিক মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। ওরা অর্ধচন্দ্রাকারে মঞ্চে সব পাত্ররা দাঁড়িয়ে]

বণিক। কোথায় মুক্তিযুদ্ধ?

জাদুকর। আপনি কান পেতে শুনুন, ওদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

বণিক। তুমি কি ভাবছ নতুন ক্রীতদাসদের সঙ্গে যুদ্ধ হবে শূদ্রদের।

জাদুকর। না।

বণিক। তবে!

জাদুকর। আমি আরও দূরে কিছু দেখতে পাচ্ছি।

বণিক। কী?

জাদুকর। একটা যুগের শেষ, এক নতুন ইতিহাসের শুরু।

বণিক। ইতিহাস, কিসের ইতিহাস?

জাদুকর। মৃত্যু জয়ের ইতিহাস।

নগরপাল [আর্তকণ্ঠে]। আমার অস্ত্র ফিরিয়ে দাও।

বণিক। কী হয়েছে নগরপাল?

নগর। আমার অস্ত্র এরা কেড়ে নিয়েছে।

বণিক। ঐ নতুন ক্রীতদাসের দল?

নগর। না এই শূদ্রের দল।

বণিক। তোমরা ওর অস্ত্র কেড়ে নিয়েছ?

সূর্য। হ্যাঁ।

বণিক। ফিরিয়ে দাও।

সূর্য। জীবন থাকতে নয়।

বণিক। তোমরা ফিরিয়ে দেবে না?

সমবেত। না।

বণিক। তোমরা শূদ্র, অস্ত্র দিয়ে কি করবে? অস্ত্রের অধিকার একমাত্র ক্ষত্রিয়দের—

অম্বুজ। আমরা ব্যবহার করব।

বণিক। অধিকার ভঙ্গ করে?

অধীর। কিসের অধিকার?

বণিক। অস্ত্র ধারণ করবার অধিকার।

অধীর। আত্মরক্ষায় সকলের অস্ত্র ধারণ করবার অধিকার আছে।

বণিক। না, শূদ্রদের নেই। দেশের মহান অনুশাসনে শূদ্রদের অস্ত্র ধারণ করবার অধিকার লেখা নেই।

সূর্য। ওতো আপনারা নিজেদের খেয়াল খুশি মতো লিখে রেখেছেন।

বণিক। কী বললে। দেশের মহান অনুশাসনকে তুমি ব্যঙ্গ কর।

সূর্য। করি।

বণিক। সাবধান শূদ্র।

সূর্য। আপনিও সাবধান বণিকপ্রবর।

বণিক। তোমরা অস্ত্র ফিরিয়ে দেবে না?

সূর্য। না।

বণিক। ভীষণ শাস্তি পেতে হবে শূদ্র।

সূর্য। অস্ত্র হাতে থাকলে তাদের আর শূদ্র বলে না, বণিকপ্রবর। বলে সৈনিক।

বণিক। সৈনিক!

অধীর। যোদ্ধা।

বণিক। যোদ্ধা!

কমলাক্ষ। মুক্তিযোদ্ধা।

বণিক। ওঃ, কেন্দ্রের রাক্ষস সৈন্য আসছে। নগরপাল—

নগরপাল। আজ্ঞা করুন।

বণিক। ওদের জন্য আমি একটা সংবাদ করে এনেছি।

সমবেত। আমাদের জন্য সংবাদ!

বণিক। হ্যাঁ, শোন নগরপাল, রাক্ষস সৈন্য আসছে। তারা তোমায় সাহায্য করবে—তারা নিপুণ, তারা হত্যাযজ্ঞে শিক্ষিত।

নগরপাল। আমার প্রতি কি আদেশ?

বণিক। রাজা আদেশ দিয়েছেন, পুরাতন সমস্ত শূদ্রদের হত্যা করে গভীর সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে—

সূর্য। কারণ?

বণিক। অপ্রয়োজন, অবাধ্য শূদ্রদের বাঁচিয়ে রাখলে অশান্তিই প্রশ্রয় পায়, সেই হেতু রাজা মন্দিরের পুরোহিতের নামে এক নির্দেশনামা প্রচার করেছেন।

সমবেত। পুরোহিতদের নির্দেশনামা।

বণিক। এই যে সেই নির্দেশনামা শোন তোমরা—

[খোলের বাদ্য। বণিক এক নির্দেশনামা থেকে পড়তে থাকে]

বণিক। শূদ্রদের কোনো অনিষ্ট আচরণে এক ভীষণ ভয়ঙ্কর পাপ সৃষ্টি হইয়াছে। সেই পাপে দেবতার মন্দির অপবিত্র হইয়াছে—

সূর্য। এ মিথ্যা—

অধীর। এ অন্যায় দোষারোপ—

অম্বুজ। এ চালাকি—

কমলাক্ষ। এ চাতুরী—

বণিক। সত্য, মিথ্যা চালাকি, চাতুরীর বিচারক আমরা নই। শোন তোমরা, সেই

জন্যই মন্দিরের পুরোহিত আদেশ দিয়াছেন বিগ্রহের পবিত্রতা আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে। সেইজন্য তাহার বিধান—

[খোলের প্রচণ্ড বাদ্যধ্বনি]

বণিক। অজস্র শূদ্ররক্তে বিগ্রহ স্নান করাইতে হইবে।

[নেপথ্যে—শূদ্ররক্ত চাই, শূদ্ররক্ত চাই]

সমবেত। সর্বনাশ।

বণিক [হেসে]। যুদ্ধ কোথায়, জাদুকর। মুক্তি কোথায়, জাদুকর। জয়ের ইতিহাস কোথায় জাদুকর। এবার কান পেতে শোন, শত সহস্র শূদ্রের মৃত্যু যন্ত্রণায় আকাশ বাতাস কাঁপানো কান্না। কান পেতে শোন, কান পেতে শোন—

[প্রস্থান। নগরপাল ওদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়]

নগরপাল। রক্ত চাই, রক্ত চাই।

[জাদুকর নগরপালের সামনে যায়। মাঝখানে জাদুকর ও নগরপাল চক্রাকারে ঘুরতে থাকে]

জাদুকর। দেবতা পূজিতে—

সমবেত। রক্ত নয়
রক্ত নয়,
মৃত্যু নয়
মৃত্যু নয়।

নগরপাল। রক্ত চাই।
রক্ত চাই।

জাদুকর। বণিকের সম্পদ সঞ্চয়ে

নগর। রক্ত চাই
রক্ত চাই।

সমবেত। রক্ত নয়
রক্ত নয়
মৃত্যু নয়
মৃত্যু নয়

নগরপাল। রক্ত চাই
রক্ত চাই

জাদুকর। রাজার ঐশ্বর্য আহরণে

নগর। রক্ত চাই
রক্ত চাই।

সমবেত। রক্ত নয়
রক্ত নয়
মৃত্যু নয়
মৃত্যু নয়

নগর। রক্ত চাই
　　রক্ত চাই।
　ঐ যে জাদুকর, দূরে চেয়ে দেখ, আমার রাক্ষস সৈন্য আসছে ঘোড়া চড়ি।
　　তড় বড়ি।
　　হাতে কৃপাণ
　　যম সমান।
　　চলি, চলি
　　তড় বড়ি
　　ঘোড়া চড়ি
　　তড় বড়ি। [প্রস্থান]

সূর্য। শুনেছ তোমার রাজাদেশ।

সমবেত। শুনেছি।

সূর্য। রক্ত দিয়ে 'পূজতে হবে দেবতা'।

সমবেত। আমাদের রক্তে।

সূর্য। তোমরা বিশ্বাস কর, দেবতা এইরূপ কোনো আদেশ দিতে পারেন?

সমবেত। না।

সূর্য। আর ঐ দেখ শত সহস্র হিংস্র সৈন্য আসছে আমাদের হত্যা করতে। আমরা কি শুধু শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের হাতে জীবন দেব?

অম্বুজ। আমরা যুদ্ধ করব।

অধীর। কী ভীষণ ওদের হিংস্র পদক্ষেপ—

অম্বুজ। তোমার কি ভয় করছে?

অধীর। ভয় নয়, আমরা কি পারব ঐ হিংস্র শিক্ষিত সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে?

অম্বুজ। নিশ্চয় পারব। আমরা জীবনের জন্য যুদ্ধ করব, আমরা মৃত্যু জয়ের জন্য যুদ্ধ করব।

কমলাক্ষ। কিন্তু নতুন ক্রীতদাসদের সঙ্গে যুদ্ধের কি হবে?

জাদুকর। সে ব্যবস্থা আমি করে ফেলেছি। আমার নতুন জাদুর খেলা আজ সম্পূর্ণ প্রায়—

সূর্য। আমরা ওদের সঙ্গে সন্ধি করব।

কমলাক্ষ। কারণ!

সূর্য। ওদেরও একদিন দিন ফুরোবে, ওরাও একদিন আমাদের মতো উচ্ছিষ্টে পরিণত হবে। এ সংবাদ ওদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তারপর—

সমবেত। তারপর—

সূর্য। নতুন ক্রীতদাস আর পুরাতন ক্রীতদাসদের সম্মিলিত যুদ্ধ। এ যুদ্ধ শুরু হবে আজ, জানিনা এর শেষ কোথায়? হয়তো, যুগ যুগান্তর ধরে চলবে এ যুদ্ধ। তোমরা প্রস্তুত হও; আমি চললাম ওদের কাছে—

জাদুকর। চিনেছ এখন নিজেকে—
তোমরা কারা
তোমরা কারা
তোমরা কারা।

সমবেত। চিনেছি এখন নিজেকে
আমরা বহুযুগের অভিশাপ
ক্রীতদাস—

সূর্য। চল, আজ মৃত্যু জয়ের যুদ্ধে

সমবেত [রায়বেশে নৃত্যের ভঙ্গিমায়]। ঝাউর ঘিজা
ঘিজা ঘিনিতা।
তাক তিলেতা
তা-তা। [প্রস্থান]

জাদুকর। আমার নতুন খেলা নিজেকে চিনিয়ে দেবার খেলা—আমরা কেউ অন্ধকার অতল সমুদ্রে শিকলের মতো নেবে যাব না। রক্তের জোয়ারে জোয়ারে আগুন লেগেছে আজ। ভোরের আহ্বান পূব আকাশ তাই লালে লাল। তাই—শূদ্র রাজার যুদ্ধ হবে রে ধিন তাক ধিন তাক ধিন কেটে কেটে তাক। শূদ্র রাজার যুদ্ধ শুরু হোক যুদ্ধ। [প্রস্থান]

[উইংসের একদিক দিয়ে মুখোসপরা রাক্ষস সৈন্যের প্রবেশ। হাতে উদ্ধত কৃপাণ। সারি বেঁধে প্রবেশ করে এবং অন্য উইংস দিয়ে প্রস্থান করে]

সমবেত। হল্লা হুয়া হুয়া [খোলের বাদ্যের তালে]
হল্লা হা
হল্লা হুয়া হুয়া
হল্লা হা

[প্রস্থান। ভুশণ্ডির কাকের প্রবেশ]

কাক। রক্ত, হাঃ, হাঃ, হাঃ। বহুযুগের রক্তভৃষ্ণা। বহুযুগের রক্ত পান করেছি। আরও বহুযুগের রক্ত পান করব। দেবতা না আমি। রাজা না আমি। আমিই তো দেবতা, আমি তো রাজা। আমিই তো দেবতা, আমিই তো রাজা, আমিই তো ত্রেতা যুগের পাপ, ভুশণ্ডির কাক।

[প্রস্থান। পেছনের উইংস দিয়ে সারি বেঁধে শূদ্রদের প্রবেশ। রায়বেশে নাচ নাচতে নাচতে]

সমবেত। ঝাউর ঘিজা
ঘিজা ঘিনেতা
তাক তিলেতা
তা, তা।

[প্রস্থান। জাদুকরের প্রবেশ]

জাদুকর। আজ শুনি শেষ আহ্বান। বিপন্ন পৃথিবীর আর্তনাদ। আর রক্ত নয়, আর বন্ধন নয়। শেষ হোক এই মৃত্যুযজ্ঞ, শেষ হোক এই মৃত্যুতান—

[সূর্যের প্রবেশ]

সূর্য। আমি পেয়েছি, আমি পেয়েছি।

জাদুকর। কী পেয়েছ, সূর্য

সূর্য। আমার হারিয়ে যাওয়া পরিচয়।

জাদুকর। কী তোমার হারিয়ে যাওয়া পরিচয়।

সূর্য। আমি স্পার্টাকাস।

জাদুকর। লক্ষ ক্রীতদাসের মুক্তি সংগ্রামের নেতা বিপ্লবী স্পার্টাকাস।

[অম্বুজের ছুটে প্রবেশ]

অম্বুজ। আমাদের পথ দেখাও স্পার্টাকাস।

[কমলাক্ষের ছুটে প্রবেশ]

কমলাক্ষ। আর কালক্ষেপ নয়, আর অপেক্ষা নয়—

[অধীরের ছুটে প্রবেশ]

অধীর। এবার শুরু কর মুখোমুখি সংগ্রাম, প্রিয় স্পার্টাকাস।

জাদুকর। ছিন্ন কর এ বন্ধন। ছিন্ন কর অনুশাসন। ধ্বংস কর রাজার অভিমান। বাজাও বাদ্য, বাজাও বিষাণ, জ্বালো মশাল, পৃথিবীর সমস্ত অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, অশান্ত এই মশালে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দাও। সমস্ত বিশ্ব আলোকিত হোক।

অম্বুজ। চল, যেখানে অত্যাচার নেই।

অধীর। যেখানে শোষণ নেই।

কমলাক্ষ। যেখানে বন্ধন নেই।

সূর্য। যেখানে ক্রীতদাস নেই!

জাদুকর। এবার আমার নাটক শেষ করি

মানব দেবতার চরণ বন্দিয়া
আমার নাটক দেখালাম
বুকের রক্ত দিয়া।
বিদায় বেলা প্রণাম নেবেন
যতেক গণ্যমান্য ভদ্রপঞ্চজন
(আহা) সভাজন, সভাজন, সভাজন।

[প্রচণ্ড শব্দে খোল কাঁসর বিষাণ বেজে চলেছে। ধীরে তার মাঝে পর্দা নেমে আসে]

কেননা মানুষ

অমল রায়

চরিত্রলিপি

বিজয়দেব
চন্দ্রকেতু
১ম কোরাস
২য় কোরাস
৩য় কোরাস
৪র্থ কোরাস
৫ম কোরাস
৬ষ্ঠ কোরাস

[দু'জন কোরাস চরিত্রের মধ্যে যে কোন দু'জন প্রহরী দূতের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে এবং প্রয়োজন বোধ করলে চন্দ্রকেতু ও বিজয়দেবের ভূমিকাভিনেতাদ্বয় ছটি কোরাস চরিত্রের মধ্যে দুটি চরিত্রে অভিনয় করতে পারে।

এই নাটকের উপস্থাপনায় নির্দেশকের প্রয়োগগত স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত থাকবে নাটকের এই উপলব্ধির দ্বারা যে, গঠনের দিক থেকে এই নাটকের দুটি স্তর—চন্দ্রকেতু ও বিজয়দেবের স্তর এবং কোরাস চরিত্র-গুলির স্থান-কালের উর্ধ্বায়িত আন্তর্জাতিক অবস্থান। এই দুটি স্তর এই নাটকে আলাদা হয়েও একাকার, বিচ্ছিন্ন হয়েও অবিচ্ছিন্ন।]

প্রস্তাবনা

কোরাস। অজ্ঞাত উৎস সময়স্রোতে বিক্ষিপ্ত বস্তুপিণ্ডের মতো এই মুহূর্তের মস্তিষ্কের সীমানা অতিক্রমী আপাত অনন্ত বিস্তৃত যে ভৌতিক বিশ্ব তার শিরায় শিরায় বিলাসী নদীর রূপে জীবনের, প্রাণের, চেতনার যে অনির্বাণ অগ্নিস্রোত, তারই একটি সাময়িক তরঙ্গোপম মানুষ! বিরাট বস্তুবিশ্বের ধারণাতীত পটভূমিকায় জীবনের বিচিত্র প্রকাশের বিস্তীর্ণ ক্যানভাসে মানুষ-শুধু মানুষ বিন্দুর সমান দৈর্ঘ্য-প্রস্থহীন অস্তিত্ব মাত্র।

১ম। তবুও মানুষ!

২য়। তবুও মানুষ বস্তুজগতের নিত্যরূপান্তরলীলাতেও, জীবনের ঐতিহাসিক স্তরগুলির অসংখ্য অপমৃত্যুর ফাঁদ এড়িয়ে আজও জীবিত।

৩য়। রূপান্তরের দোলা লেগেছে তার অবয়বে, তার সামাজিক কাঠামোয়, তবুও মানুষ সেই প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে আজও মানুষ!

কোরাস। কেননা মানুষ চিরদিন বাঁচতে চেয়েছে সচেতনভাবে, কেননা মানুষ বুঝতে পেরেছে বাঁচতে গেলে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়তে হবে তাকে, পাল্টাতে হবে পরিবেশ, নিজেকেও!

৪র্থ। কেননা মানুষ চেয়েছে বাঁচতে, কেননা মানুষ জেনেছে লড়াই করতে।

৫ম। তাই বেঁচে থাকার এই অনন্ত ইচ্ছার শিল্পরূপই সাহিত্য!

৬ষ্ঠ। তাই বাঁচার লড়াইয়েরই বিচিত্র প্রকাশ মানুষের ললিতকলায়!

কোরাস। সাহিত্য-শিল্প তাই মানুষের জন্যে, মানুষের স্বপক্ষে, যে মানুষ প্রেমে-অপ্রেমে, করুণায়-জিঘাংসায়, মমতায়-ঘৃণায় ভরাট এক জটিল অস্তিত্ব! মানুষের বিচার তাই শুধু—

১ম। মানুষকে দিয়ে। কেননা তাই শুধু—

২য়। কতকগুলো গুণের সমীকরণ নয়। বিমূর্ত আদর্শ নয়! আসল বিচার তাই।

কোরাস। মানুষের বাঁচার ইচ্ছাকে দিয়ে, বাঁচার জন্যে মানুষের চিরন্তন সংগ্রামকে দিয়ে। কেন না মানুষ—

৩য়। প্রতিটি মানুষ—

৪র্থ। এক জটিল অস্তিত্ব, অরণ্যের মতো আদিম রহস্যময়!

কোরাস। মানুষের ইতিহাস এতাবৎকালের তার বাঁচার সংগ্রামের ইতিহাস। অনন্ত মুক্তির জন্য মানুষ সমস্ত শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে লড়ছে—প্রকৃতির বিরূপতার শৃঙ্খল, অর্থনৈতিক শোষণের শৃঙ্খল, সামাজিক দাসত্বের শৃঙ্খল, সংস্কারের শৃঙ্খল—সমস্ত কিছুকে চূর্ণ করে মুক্ত মানুষ অনন্ত মুক্তির বালুকাবেলায় সূর্যস্নান করবেই—এ-স্বপ্ন ক্ষণকাল আর খণ্ডচেতনার কারাগারে আবদ্ধ মানুষের শাশ্বত বাসনার ফসল!

১ম। মানুষের সার্বিক মুক্তির প্রাথমিক শর্ত অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি। এ-মুক্তির লড়াই—

২য়। মানুষের সমাজ যেদিন থেকে বিভক্ত হল শোষক আর শোষিতের বিভেদে—

৩য়। সেদিন থেকে আজও চলেছে।

৪র্থ। আর প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের বিচার হবে মুক্তির এই প্রাথমিক সংগ্রামে সে কোথায় দাঁড়িয়ে তাই দেখে।

৫ম। সে কি শোষকের পক্ষে?

৬ষ্ঠ। সে কি শোষিতের সংগ্রামের শরিক?

কোরাস। এই নিয়েই বিচার হবে মানুষের!—মানুষ ভুল করে, মানুষ ঠিক করে, মানুষ ভালবাসে, মানুষ হত্যা করে। কিন্তু তবু মানুষ বারবার হেরে গিয়েও শেষ পর্যন্ত জিতে যায়! কেননা মানুষ—

১ম। তার বাঁচার ইচ্ছার তাগিদে চূর্ণ করে সব বাধা!

কোরাস। এই মুক্তির সংগ্রাম, বাঁচার সংগ্রাম, বাধা চূর্ণ করার সংগ্রামের মধ্যেই মানুষের বিচার! মানুষের বিচার তাই ব্যক্তিগত গুণে নয়, ব্যক্তিগত বাঁচার তাগিদে নয়, দোষ-গুণ-ভুল-ঠিক নিয়ে গড়া মানুষের বিচার সামগ্রিক মানুষের সার্বিক মুক্তির রণক্ষেত্রে।

২য়। আর এই বিচার বড় নির্মম রূপ নেয়, যুগান্তরে—ক্রান্তিকালে।

১ম। অর্থাৎ মৃত্যুর পটভূমিতে।

কোরাস। তাই আমরা আজ ক্রান্তিকালের মৃত্যুর ল্যাবরেটরির টেবিলে বিচার করার মানুষের জীবনের। যেহেতু বিপুলব্যাপ্ত মৃত্যুর আকাশেই বোঝা যায় জীবনের ক্ষণিক মেঘমালার বর্ণ সমারোহ।

৩য়। আমরা একটা গল্প বলব।

৪র্থ। মৃত্যুর প্রচ্ছদপটে মানুষের সুপ্রকট বাঁচার তাগিদের গল্প।

কোরাস। বাঁচতে শেখার গল্প, লড়তে জানার গল্প, লড়াকু মানুষের গল্প। মানুষের গল্প বল হে ইতিহাস মানুষের গল্প বল।

১ম। চাবুক, কয়েদখানা, ফাঁসি, গ্যাসচেম্বার, নাপাম বোমা!

২য়। ভার্জিনিয়ার এক কৃষি শ্রমিকের পিঠে যখন শ্বেতাঙ্গ প্রভুর চাবুকের দাগ——

৩য়। ভিয়েৎনামে তখন ধর্ষিতা আমার তরুণী কন্যার ক্ষতবিক্ষত দেহে একই শ[illegible] নখের আঁচড়——

৪র্থ। কিংবা জেরুজালেমে যেদিন ক্রুশবিদ্ধ হলেন যীশু।

৫ম। এথেন্সে বিষপানে বাধ্য হলেন জ্ঞানী সক্রেটিস——

৬ষ্ঠ। সেদিন থেকে আজো এই কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে রক্তের গোলাপ আঁকে নিহত যৌবন।

৩য়। ইতিহাসের প্রত্নতত্ত্বে তাই একাকার হয়ে যায়——

৪র্থ। প্যারিসের সশস্ত্র জনতা আর তিতুমীরের সেনাদল।

৫ম। কিউবার আখের খেতের শ্রমিক আর মেসোপটেমিয়ার লাঞ্ছিত ক্রীতদাস। এবং তাই——

৬ষ্ঠ। এ-ঘটনা যে কোনো দেশে যে কোনো কালে যদিও ঘটতে পারে——

৫ম। তবু ধরা যাক এ-কাহিনীর সময় গুপ্তযুগের অবসানকাল——

১ম। যখন একচ্ছত্র ভারত সাম্রাজ্য ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো——

২য়। ধরা যাক এ-কাহিনীর ঘটনাস্থল——ভারত-নেপাল সীমান্তের একটি স্বাধীন জনপদ, নাম, মনে করুন, মণিসিংহপুরম।

৩য়। রাজকারাগারে দুজন বন্দী!

৪র্থ। আসুন শুরু করা যাক। মানুষের গল্প বলি। কেননা মানুষ——

৫ম। শুধু মানুষই শিল্পের উদ্দেশ্য-বিধেয়। কেননা মানুষ——

৬ষ্ঠ। মানুষই নিয়ামক! ইতিহাসের নিয়ামক!

মূল নাটক

[কারাগারে! দুই বন্দী। তরুণবয়স্ক, অন্যজন বৃদ্ধ। প্রস্তাবনা অংশ শেষে অভিনেতাদের মধ্যে সামান্য, গুঞ্জন, এরই মধ্যে আকস্মিকভাবে তরুণ বন্দী সংলাপ শুরু করে দিয়ে মূল নাটকের দ্রুত সূচনা করে। মঞ্চ দ্বিস্তরবিশিষ্ট হলে ভাল। কারাগারে সেটটি ইঙ্গিতবহ, সংক্ষিপ্ত। পেছনে একটা গবাক্ষ থাকতে পারে। তরুণ বন্দী যখন গভীর হতাশায় পদচারণা করতে করতে কথা বলছে, বৃদ্ধ তখন নিবিষ্ট মনে ছেঁড়া কাপড় সেলাই করছে]

তরুণ। বন্দী। পারব না! পারব না, পারব না, এভাবে থাকতে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একটা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বন্দী রয়েছি। সময়ের হিসেব ভুলে গেছি, ভুলে গেছি ফুলেদের রঙ, ভুলে গেছি রাগ-রাগিনীর নাম, আমার প্রিয়ার দেহচর্চা, তার গন্ধ বিলাস। নাঃ, এভাবে বাঁচা যায় না। এভাবে বেঁচে কি লাভ? একে কি বাঁচা বলে? [বিড়বিড় করে] আমি——আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাব! আর পারছি না। ওরা আমাকে হত্যা করল না

কেন? [হঠাৎ চিৎকার] শুনছেন—ওরা আমাদের হত্যা করল না কেন? [প্রৌঢ় মাথা তুলে তাকায়] আমাদের শাণিত বল্লমের অগ্রভাগে বিদ্ধ করে জীবন্ত দাহ করল না কেন? রাজদ্রোহের শাস্তি তো তাই, কিংবা আরো কঠোর। [প্রৌঢ় আপন কাজে মন দেয়] তাহলেও মুক্তি পেতাম! মুক্তি! [প্রৌঢ়ের দিকে তাকিয়ে] কি আশ্চর্য দেখ, কোনো দিকে হুঁশ নেই! যেন সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের আমল থেকে একই কাজ করে চলেছে। [প্রৌঢ়ের কাছে ছুটে গিয়ে ঝাঁকিয়ে] এই যে মশাই, আপনি কি মানুষ? [প্রৌঢ় নিশ্চুপে হাসে] হাসছেন যে! ও! কথাটা গ্রাহ্য হল না বুঝি! কি আশ্চর্য লোক! আমি পিঞ্জরাবদ্ধ বনের পাখির মতো ছটফট করছি, শেকল টেনে টেনে ছিঁড়তে চেয়ে আমার পায়ে ঘা হয়ে গেছে, আর ইনি সন্নিসি বনেছেন, পার্থিব বিষয়ে নজর নেই, কেবল একনিষ্ঠ অধ্যাত্মচর্চা! [প্রৌঢ় এবার হাসতে হাসতে উঠে পড়ে] আচ্ছা মশাই, এই মুখ বন্ধ করে থেকে কি সুখ পান বলুন তো?

প্রৌঢ়। অভ্যেস।

তরুণ। অভ্যেস! কথা না বলার অভ্যেস?

প্রৌঢ়। তুমি কতদিন এসেছ?

তরুণ। কতদিন এখানে আছি? প্রতিটি মুহূর্ত যেন হাজার বছর। এখানে কি সময়ের হিসেব রাখা চলে?

প্রৌঢ়। তবু? একদম মনে নেই?

তরুণ। আন্দাজ করা যায়। বছর আড়াই হবে।

প্রৌঢ়। উঁহু। দু'বছর, দু'মাস, আঠেরো দিন!

তরুণ। [বিস্ময়ে হতবাক] আপনি...আপনি...কি ভাবে...মানে এত নিখুঁত...শ্রুতিধর নাকি—

প্রৌঢ়। না হে! অত ওপরে তুলো না, আসলে এখানে নতুন ঘটনা ঘটে খুব কম। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। তাই মনে থাকে। মনে আছে, তুমি যেদিন প্রথম এলে—আমায় প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলে—কি জাত হে তোমার? আসলে তখনো অভিজাত নীলরক্তের মোহ কাটেনি। আমি বললাম—এক কালে জাত একটা ছিল, তবে কারাগারে আসার আগে ছিলাম ক্রীতদাস!

কোরাস। ক্রীতদাস!

১ম। আদিম সাম্যবাদী সমাজ ভেঙে ব্যক্তিস্বার্থের চোরাবালিতে যেদিন পা দিল সভ্য মানুষ।

২য়। যেদিন থেকেই শৃঙ্খলিত হল পৃথিবীর স্বাধীনতা।

৩য়। রোমে, গ্রীসে, মিশরে—

৪র্থ। কিংবা ভারতবর্ষে—

২য়। স্বর্ণপ্রসূ কীর্তিমান সভ্যতার শিলালেখ—

৩য়। হয়েছে উজ্জ্বল আমাদেরই বিষম শোণিতে।

১ম। Man is born free, but everywhere he is in chains. মানুষ জন্মেছে স্বাধীন হয়ে, তবু সর্বত্র সে শৃঙ্খলিত। বলেছেন রুশো!

৪র্থ। The proletariat has nothing to loose, but his chains. শোন তাই শৃঙ্খল মুক্তির গান, শোন তাই বিদ্রোহী জীবনের রণসঙ্গীত।

প্রৌঢ়। আমি কতদিন আছি জান?

তরুণ। না।

প্রৌঢ়। আঠেরো বছর চার মাস বারো দিন। তোমার থেকে ষোল বছরেরও বেশি দিন ধরে আছি। তুমি আসার আগে দুবছর একলা কাটিয়েছি। কথা বলার অভ্যেস সত্যিই কম।

তরুণ। সেই দুবছর আগে কেউ ছিল না আপনার সঙ্গে?

প্রৌঢ়। ছিল। মারা গেছে সবাই। শেষ জন মারা গেছে তোমার আসার দুবছর আগে।

তরুণ [বিড়বিড় করে]। মারা গেছে! এখানেই! এই ঠাণ্ডা সাপের দেহের মতো ঘরে! বদ্ধ ঘরে ধীরে ধীরে প্রতিক্ষণেই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরাও। [হঠাৎ চিৎকার] আপনি মিথ্যা কথা বলছেন! আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন! আপনি মিথ্যাবাদী, মিথ্যুক! [প্রৌঢ় আবার নিজের কাজে মন দেয়] জানেন, ভয় আমি পাই না। আমি ক্ষত্রিয়, সূর্যবংশে আমার জন্ম। ভয়! আমাকে ভয় দেখাচ্ছে একটা ক্রীতদাস। বুঝলে তোমার মতো তোমার প্রভুকে খুন করিনি! বিশ্বাসঘাতক! আমি রাজদ্রোহী। অত্যাচারী নিপীড়ক রাজাকে উচ্ছেদ করে—[কি মনে হতে কর্মরত প্রৌঢ়ের কাছে ছুটে যায়] দেখ, দেখ, কেমন নির্বিকার নির্লিপ্ত হয়ে কাপড় সেলাই করছে! এই যে ক্রীতদাসমশাই—আপনি কি পাথরের দেওয়াল? এই যে এখানে চেঁচাচ্ছি—মনে করুন এটা নিরর্থক নাও তো হতে পারে—দূরে দূরে যে গ্রামগুলো আছে, সেখানে যদি এই চিৎকার পৌঁছয় তারা ছুটে আসে—

প্রৌঢ়। এদিকে এস। [গবাক্ষের কাছে নিয়ে গিয়ে] এখান দিয়ে যত পার জোরে চেঁচাও।

তরুণ। কি?

প্রৌঢ়। চিৎকার! চিৎকার বোঝ না?

তরুণ। কেন? খামোকা চেঁচাতে যাব কেন?

প্রৌঢ়। করই না। একটা মজার ব্যাপার হবে। [তরুণ চেঁচায়, দুবার প্রতিধ্বনি হয়] দেখলে?

তরুণ। কী?

প্রৌঢ়। তোমার চিৎকার ঘুরে ফিরে তোমার কাছেই আসবে। [আদেশের সুরে] যাও! শুয়ে পড়! রাত হতে চলল।

তরুণ। না, আমি শোব না।

প্রৌঢ় [উদাসীন স্বরে]। বেশ! শুয়ো না।

তরুণ। আমি শোব না! আমি শোব না! কিন্তু আমি কি করব? আমি কি করে কাটাব এইসব দিনগুলো!

প্রৌঢ়। যেমন ভাবে দুবছর দুমাস ষোল দিন কাটিয়েছ।

তরুণ। মানে?

প্রৌঢ়। কখনো প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়বে, চিৎকার করে উঠবে। দেওয়ালে মাথা ঠুকবে। আবার ঝিমিয়ে পড়বে। কিছুক্ষণ কাঁদবে। নাকি সুরে। তারপর—

তরুণ। তারপর?

প্রৌঢ়। তারপর ঘুমিয়ে পড়বে—নিস্পন্দ, নিরপরাধ ঘুম! স্বপ্ন দেখবে আবার বাইরের পৃথিবীতে ফিরে গেছে প্রিয়জনদের উষ্ণ অভ্যর্থনার ভিতরে, আবার পুরোন জীবনে—যে জীবন মরে গিয়েও আমাদের স্মৃতির ভেতরে বেঁচে থাকে। তারপর ঘুম ভাঙলে আবার এই বদ্ধ কক্ষে ক্রোধে ফেটে পড়বে!

তরুণ। আচ্ছা...ইয়ে আপনি—মানে আপনি কি করে এমন উদাসীন নির্বেদে সমস্ত কিছুতেই অবিচলিত থাকেন?

প্রৌঢ়। আরো ষোল বছর পরে বুঝবে।

তরুণ। ষোল বছর! আমি...আমি পাগল হয়ে যাব।

প্রৌঢ়। আমারও মনে হত। কিন্তু পাগল তো হইনি। অথবা হয়েছি। কে জানে!

তরুণ। আমি—আমি আত্মহত্যা করব।

প্রৌঢ় [ম্লান হেসে]। শেষ পর্যন্ত করবে না নিশ্চয়ই। প্রথম প্রথম আমিও ভাবতাম। আর সহ্য হয় না। এ-জীবন রেখে লাভ নেই। প্রহরীদের উৎকোচ দিয়ে বিষও জোগাড় করে রেখেছিলাম। ঐ দেখ, ঐ মাটির পাত্রে আজ সাড়ে সতের বছর ধরে একই ভাবে রয়েছে। এখনও বোধহয় ওর গুণ নষ্ট হয়নি।

তরুণ। কেন? আত্মহত্যা করতে পারলেন না কেন?

প্রৌঢ়। কেন? [একটু উত্তেজিত] কেন বোঝ না? আশায়! তুমি চিৎকার করতে করতেও আশা করছ দূর গ্রাম থেকে কেউ আসবে মুক্তিদূত হয়ে। [ক্লান্ত স্বরে] আর আমি ভাবতাম—আজ নিশ্চয়ই ভূমিকম্পে এই পাথরের দেওয়ালগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

তরুণ। আশ্চর্য! আমিও মাঝে মাঝে ভাবি!

প্রৌঢ়। আসলে মানুষ বাঁচতে চায়। সব মানুষই। আজকে এই চার দেওয়ালের মধ্যে এলাম কেন? আরো ভাল ভাবে, আরো সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে চেয়েছিলাম বলেই তো। তবে হাল ছাড়ব কেন? মৃত্যুর আগের মুহূর্তেও ভাবব—একদিন না একদিন মুক্তি আসবেই।

কোরাস। একদিন মুক্তি—আসবেই, আসবেই! মানুষের মুক্তি—আসবেই আসবেই!

২য়। আমাদের পায়ে যখন রক্ত আর কাদার গলিত কলঙ্ক—

৩য়। আমাদের গলায় সোনালী বকলস যখন ঝলমল করে—

৪র্থ। প্লেটো তখন বলেছিলেন মানুষ স্বাভাবিক দাস—

১ম। প্রভু মনু ফতোয়া দিয়েছিলেন আমরা শূদ্রেরা সমাজের পা, দাসত্ব করাই আমাদের ঈশ্বর-নির্ধারিত কর্তব্য!

৩য়। তবুও প্রতিরোধ—

৪র্থ। তবুও বিদ্রোহ—

১ম। তবুও বিপ্লব—

২য়। এবং তখন—চাবুক!

৩য়। শূলে দাও, ক্রুশবিদ্ধ কর।

৪র্থ। ফাঁসিকাঠ, গিলোটিন, মেসিনগানের বুলেট!

কোরাস। মুক্তি আসবে কোন পথে? মুক্তি আসবে কোন পথে? [বারবার]

তরুণ। আপনি আপনি এতও ভাবেন!

প্রৌঢ়। না, ভাবি না। ভাবতেই চাই না। ব্যস আর কথা নয়। একটু আসছি।

[প্রস্থান। তরুণ বন্দীর খোলস ভেঙে অভিনেতা বেরিয়ে আসে]

অভিনেতা। নমস্কার! এখন উনি একটু বাইরে গেছেন। এই অবসরে নাটকের কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য জানিয়ে রাখি। আমাদের দুজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে, যদিও ভিন্ন ভিন্ন কারণে। আমি মণিসিংহপুরমের অত্যাচারী রাজা দেববর্মার বিরুদ্ধে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে অংশ নেওয়ায় এখানে বন্দী হয়েছি। আর উনি আরো অনেক বছর আগে একটি ক্রীতদাস বিদ্রোহ সংগঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। ও হ্যাঁ—একটা ভুল হয়ে গেছে, আমাদের এই চরিত্র দুটির নাম এখনও ঠিক হয়নি! আমার নাম—কি দেওয়া যায়—ধরুন, চন্দ্রকেতু। আর ওঁর নাম—বিজয়দেব। [পেছন ফিরে] এই যে শুনছেন, আপনার নাম বিজয়দেব রাখা হয়েছে, খেয়াল রাখবেন।

নেপথ্যে। ঠিক আছে।

অভিনেতা। আর একটা ব্যাপার—যেটা উনি জানেন না কিন্তু নাটকের স্বার্থেই আপনাদের জানা দরকার—আমি সম্প্রতি রাজার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে একটি পত্র দিয়েছি।

[বিজয়দেবের প্রবেশ]

বিজয়দেব। তুমি এখনও ঘুমোওনি?

চন্দ্রকেতু। ভাল লাগছে না। একা একা থাকতে কিরকম ভয় ভয় করছিল।

বিজয়দেব [স্নেহের সুরে]। ও কিছু নয়। বাড়ির কথা ভাবছিলে বুঝি?

চন্দ্রকেতু [মাথা নিচু করে]। হ্যাঁ!

বিজয়দেব। বাড়িতে কে কে আছেন তোমার?

চন্দ্রকেতু। বাড়িতে? আপনি তো কোনোদিন জানতে চাননি? হঠাৎ আজকে?

বিজয়দেব। বলই না শুনি। আজ একটু গল্প করি।

চন্দ্রকেতু। বাবা, মা, আর ছোট বোন রত্নমালা।

বিজয়দেব। বাবা কি করেন?

চন্দ্রকেতু। রাজকীয় গ্রন্থাগারের সচিব।

বিজয়দেব। বেশ! উচ্চপদস্থ কর্মচারী! বিয়ে তো করনি?
চন্দ্রকেতু। না। তবে—
বিজয়দেব। হৃদয়েশ্বরী ছিলেন একজন?
চন্দ্রকেতু [দীর্ঘশ্বাস চেপে]। হ্যাঁ, নাম তার মালবিকা। নগরপালের কন্যা।
'বিজয়দেব। মনে পড়ে তাকে?
চন্দ্রকেতু। অ্যাঁ? না না না! মনে করতেও চাই না সে সব দিন। পাতার মতো উড়িয়ে দিক বিস্মৃতির ঝড়। না না না। মনে করতে চাই না।
বিজয়দেব। মনে পড়ে তাহলে?
চন্দ্রকেতু। আপনি কি মানুষ, না শয়তান! প্রাচীন ক্ষতের চামড়াগুলো হিঁচড়ে টেনে ছিঁড়ে আবার দগদগে ঘা তৈরি করতে বসেছেন।
বিজয়দেব। মনে পড়ে না?
চন্দ্রকেতু [ভেঙে পড়ে]। পড়ে পড়ে সারাক্ষণ মনে পড়ে। আমার সমস্ত দীর্ঘ দিন আর অন্ধরাত জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। সেইসব দিন আর সে—
বিজয়দেব। কুরুবকের পরত চূড়া কালো কেশের মাঝে,
লীলাকমল রইত হাতে কী জানি কোন কাজে।
অলক সাজত কুন্দফুলে শিরীষ পরত কর্ণমূলে,
মেখলাতে দুলিয়ে দিত নবনীপের মালা।
চন্দ্রকেতু [চিৎকার]। থামুন! কি লাভ আমাকে শরবিদ্ধ করে?
বিজয়দেব। ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে ধূপের ধোঁয়া দিত কেশে
লোধ্র ফুলের শুভ্ররেণু মাখত মুখে বালা।
চন্দ্রকেতু [বিজয়দেবকে ঝাঁকিয়ে]। আপনি চুপ করবেন কিনা? আপনাকে আমি খুন করব!
বিজয়দেব [মৃদু স্বরে]। মালবিকার কাছে ফিরে যাবে চন্দ্রকেতু?
চন্দ্রকেতু। আপনি...আপনি—বিজয়দেব...কি নির্মম আপনি!
[চন্দ্রকেতু মুখ ঢেকে বসে পড়ে। বিজয়দেব পরম মমতায় বলে]
বিজয়দেব। হতাশ হতে নেই চন্দ্রকেতু। সময় সুযোগ একদিন না একদিন আসবেই। শুধু উপযুক্ত সময়ে কাজটি কর। তখন কোনো মিথ্যে আবেগের চোরাবালিতে পা দিয়ে কুড়ুল মেরো না সম্ভাবনার বৃক্ষে।
চন্দ্রকেতু। কি বলতে চান আপনি?
বিজয়দেব। পরে বুঝবে। এখন এস শোওয়া যাক।
চন্দ্রকেতু। না! আপনাকে বলতেই হবে। [বিজয়দেব ঘর ঝাঁট দিতে থাকে] কি বলবেন না? [বিজয়দেব নীরব] অবশ্য আপনি না বললে আপনাকে দিয়ে বলায় কার সাধ্য। প্রহরীর কাছে শুনেছি—বিদ্রোহের পর আপনাকে যখন কারাগারে নিয়ে এল, তখন বিদ্রোহের গুপ্ত সংবাদ জানার জন্য আপনার ওপর বীভৎস অত্যাচার করেছিল, লৌহদণ্ড আগুনে টকটকে লাল করে আপনার সারা শরীরে দাগ দিয়েছিল

[বিজয়দেব নিস্পৃহভাবে আগের মতোই কাজ করে যায়]। তরবারি অগ্রভাগ দিয়ে সমস্ত দেহটা চিরে চিরে দিয়েছিল—তবু নাকি আপনার চোখে জল ছিল না! সত্যি? এটাও বলবেন না? [আপন মনে] কিন্তু আমি কি করি! ইনি তো পুরোন স্মৃতি খুঁচিয়ে তুলে মৌনী বাবা বনেছেন। কি করে কাটাই এইসব দিন! ঘুমও যে আসবেন না আর! আর কি বিরাট রাত, শেষই হয় না। অবশ্য দিন আর রাতে তফাৎ এখানে কই! তফাৎ কই প্রভাত আর সন্ধ্যায়!

[প্রহরীর প্রবেশ]

প্রহরী। বিজয়দেব, আপনাকে কারারক্ষক স্মরণ করেছেন।

বিজয়দেব। আমাকে? হঠাৎ?

চন্দ্রকেতু। এত রাত্তিরে কি ব্যাপার?

প্রহরী। সে উনিই জানেন, আমি কিছু জানি না।

বিজয়দেব। বেশ চল।

চন্দ্রকেতু। কিন্তু আমি একা থাকব? এই নিদ্রাহীন রাতে? এই ঘরে?

বিজয়কেতু। ভয় করবে?

চন্দ্রকেতু। না, মানে—

বিজয়দেব। ওহে প্রহরী, কি যেন নাম তোমার—

প্রহরী। এতদিন আছেন উনি, তবু রোজ আমার নাম ভুলে যান?

চন্দ্রকেতু। তোমার নাম তো নাম, বাপের নামই ভুলে যাই এখানে—

বিজয়দেব। না, ইয়ে, কি রকম বিশ্রী আর খটমটও নামটা—

প্রহরী [অভিমান]। বিশ্রী নাম? বেশ তবে বলবই না!

চন্দ্রকেতু। দেখ, দেখ, এত বড় গোঁফ নিয়েও কেমন নতুন বৌয়ের অভিমান শিখেছে!

প্রহরী [সলজ্জ]। ধ্যাৎ। কি যে বলেন মাইরি!

বিজয়দেব। যাকগে, নামটাম চুলোয় যাক, ওহে প্রহরী—

প্রহরী [সগর্বে]। আমার নাম প্রভঞ্জন!

বিজয়দেব। হ্যাঁ হ্যাঁ—প্রভঞ্জন! কেন যে ভুলে যাই!

প্রহরী। আর ভুলবেন না! বলুন, কি বলছিলেন—

বিজয়দেব। আমাকে কারারক্ষকের কাছে পৌঁছে দিয়ে এসে, তুমি এই ছোটবাবুর সঙ্গে গল্প কর, ছেলেমানুষ, একা-একা থাকতে ভয় করে।

চন্দ্রকেতু। ভয়? জানেন—আমি সূর্যবংশোদ্ভব ক্ষত্রিয়! আমি—

প্রহরী [চিৎকারে করে]। ওরে বাবারে বাবারে! ভয় যে মাঝে মাঝে পাইনে তা নয়! যেমন ধরুন গিয়ে ঐ পাঁচিলের পাশে ঝাঁকড়া চুলো অশত্থ গাছটা—পুন্নিমের রেতে যখন জ্যোছনায় থিকথিক করে সারা মাঠ-বন-বিল, একদিন দেখি কি, অশত্থ গাছটা হঠাৎ দাড়িওলা দুর্বাসা মুনি হয়ে গেছে—

চন্দ্রকেতু। সেদিন একটু বেশি চড়িয়েছিলে বুঝি—

প্রহরী। আজ্ঞে?

চন্দ্রকেতু। ভাঙ্! ভাঙ্ বোঝনা?

প্রহরী। আজ্ঞে তা বুঝবনা কেন? রোজ সাঁঝে খাই—

বিজয়দেব। এখনও খেয়েছ তো! চল হে, আমাকে পৌঁছে দিয়ে আবার এখানে ফিরে আসবে।

[প্রহরী ও বিজয়দেবের প্রস্থান]

চন্দ্রকেতু [পায়চারী করতে করতে]। মুক্তি আমাকে পেতেই হবে। এই ক্লান্ত দিনযাপন, সমস্ত জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই অন্তহীন সময়ের বৃত্তে নিরর্থক পরিক্রমা থেকে মুক্তি আমার চাই। তার ওপর পুরোন জীবনের স্মৃতি! আমার সম্মানী পিতা, স্নেহময়ী মা, আর প্রিয়তম ছোট বোনটি আমার—আমার রত্নমালা—তোমরা কি জান এই নিষ্করুণ প্রবাসে তোমরাই সারাক্ষণ ঘিরে আছ আমায়! আর মালবিকা? প্রিয়া মালবিকা! তুমিও জান না এখানে আমার প্রতিটি মুহূর্ত তোমারই পদক্ষেপে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত হয়। তাই আমি মুক্তি চাই, ফিরে যেতে চাই আমার আপন ঘরে। আমি মার্জনা ভিক্ষা করেছি রাজার কাছে। যদিও আমি জানি এই রাজাকে উৎপীড়ক, প্রবঞ্চক ভেবে—ভাবটা এখনও সঠিক—হাতে তুলে নিয়েছিলাম বিদ্রোহী অস্ত্র! সেজন্যে আমার অনুতাপ নেই। যে কোনো হৃদয়বান মানুষই মণিসিংহপুরমের অত্যাচারী কপট ধূর্ত রাজা দেববর্মাকে ঘৃণা করবে। কিন্তু আমাদের ব্যর্থ প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি—এই নিপুণ দস্যুকে সিংহাসনচ্যুত করা বিধাতার পক্ষেও সম্ভব নয়। তবে কেন আবদ্ধ থাকব এই কারাগারে অবাস্তব অলৌকিক এক মরীচিকাসম আদর্শের জন্যে? তাই আমি মার্জনা ভিক্ষা করেছি। প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আর বিদ্রোহ নয়, এবার থেকে রাজার অনুগত সেবক। আর তাই থাকবও। আর নয় রাষ্ট্র বিপ্লবের বন্ধুর সংকীর্ণ পথ। এবার আমার জন্যে প্রতীক্ষিত পারিবারিক কর্তব্যের বাঁধানো সরল সড়ক। [প্রহরীর প্রবেশ, উৎকণ্ঠিত] প্রহরী—আমি মার্জনা ভিক্ষা করে যে পত্র পাঠিয়েছিলাম রাজার কাছে, তা পৌঁছেছে তো?

প্রহরী। আজ্ঞে আমি তা কারারক্ষককে তখনি দিয়ে দিয়েছিলাম।

চন্দ্রকেতু। তিনি রাজার কাছে তৎক্ষণাৎ পাঠিয়েছেন তো?

প্রহরী। আজ্ঞে তাতো জানি না।

চন্দ্রকেতু [অধৈর্যে]। আঃ জান না তো কি করতে আছে বেয়াদব?

প্রহরী [রেগে]। আপনি আমায় কটুভাষা বললেন?

চন্দ্রকেতু। তোমায় বলিনি। বলেছি আমাকে।

প্রহরী [ক্ষুব্ধ স্বরে]। অ। আমায় কোনোদিন কটু কথা বলবেন না। ওতে আমার ভারি মন খারাপ হয়।

চন্দ্রকেতু। এখন হাসতেও পারি না। বল, সত্যিই তুমি কিছু জান না?

প্রহরী। আজ্ঞে জানি। না, জানি না তো, কিসের?

চন্দ্রকেতু। ওঃ এই নির্বোধটাকে—[প্রহরী তাকাতে] আমি—আমি নির্বোধ, তুমি সত্যিই জান না আমার পত্র রাজার কাছে পাঠানো হয়েছে কিনা—

প্রহরী। আজ্ঞে সেটা কারারক্ষক জানেন।

চন্দ্রকেতু। সে তো আমিও জানি।

প্রহরী। তবে কারারক্ষক সেদিন বলছিলেন—এই রে বলে ফেলেছি, বলব না!

চন্দ্রকেতু। প্রহরী! শিগগির বল কারারক্ষক কি বলেছেন?

প্রহরী। রাজা নিশ্চয়ই আপনাকে মার্জনা করবেন, আপনি অনেক বড় বংশের ছেলে তো!

চন্দ্রকেতু। কারারক্ষক বলেছেন এ-কথা? কারারক্ষক?

প্রহরী। এই রে! বলা বারণ ছিল, এমন করেন না!—কাল রাজার জন্মদিন তো, প্রতি জন্মদিনেই রাজা অনেক বন্দীকে ছেড়ে দেন। দেখুন কাল হয়ত আপনাকেও—

চন্দ্রকেতু [চিৎকার করে]। প্রহরী—

প্রহরী। আজ্ঞে অত চেঁচাবেন না। আমার নাম প্রভঞ্জন। বেশি চেঁচামেচি শুনলে আমার বুকটা আবার ধড়পড় করে—

চন্দ্রকেতু [উল্লাস]। প্রহরী তোমাকে আমি—

প্রহরী। আজ্ঞে আমার নাম প্রভঞ্জন!

চন্দ্রকেতু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রভঞ্জন, তোমাকে আমি—তোমাকে আমি এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দেব, যদি মুক্তি পাই—

প্রহরী [অভিবাদন করে]। সত্যি দেবেন তো? শালার এই চাকরি ছেড়ে দেব, বালবাচ্ছা নিয়ে এ-চাকরিতে কি পোষায়?

চন্দ্রকেতু। আমার যে কি—আমার যে কি ম-জা! আমি সারা পৃথিবীকে দু'হাতে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি, সমস্ত সমুদ্রের জল শুষে নিয়ে মরুভূমিতে ছড়িয়ে দিতে পারি, রাজার স্বর্ণভাণ্ডারে দুপায়ে লাথি মেরে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পারি! [হঠাৎ সুর পাল্টে] হ্যাঁ শোন, ঐ বিজয়দেব জানে না তো, আমি মার্জনা ভিক্ষা করেছি!

প্রহরী। আজ্ঞে না, আপনিই তো বারণ করলেন।

চন্দ্রকেতু। হ্যাঁ। হ্যাঁ। লোকটা তেমন সুবিধের নয়!

প্রহরী। না, না, তা কেন! উনি বড় ভাল লোক। আমার গ্রামেই বাড়ি। কেন যা তা বলছেন? কারারক্ষক বলেন, ওঁর মতো জ্ঞানী নাকি—দেববর্মা যখন আমাদের দেশ আক্রমণ করল, তখন উনি কলম ফেলে দিয়ে যুদ্ধে গেলেন, দেববর্মার জয় হতে ওঁকে বন্দী করে ওরা! তারপর থেকে উনি ক্রীতদাস, অতবড় পণ্ডিত, কিন্তু একটু গর্ব নেই! ওঁর সম্পর্কে এ-সব বলবেন না। অনেক দিন ধরেই ওঁকে দেখছি তো!

চন্দ্রকেতু [বিষণ্ন সন্দেহে]। তুমি দেখছি ওঁর সম্বন্ধে অনেক খবরই রাখ!

প্রহরী। আজ্ঞে হ্যাঁ! ওর মেয়েদের আর বৌকে কোন জমিদারের কাছে যেন বেচে দেয়, তারপর উনি একটা ক্রীতদাস বিদ্রোহের—

২য়। আমি স্পার্টাকাস! ক্রীতদাসের বুকের ওপর থেকে দস্যুপায়ের কাঁটামারা জুতোর

দাগ মুছে দিতে চেয়েছিলাম বলেই হাতের তলোয়ার দিয়ে আকাশটাকে চিরে দিয়েছিলাম, সূর্যকে ধরেছিলাম স্পর্ধিত হাতের মুঠোয়।

১ম। আমি টেরেনাস। দাসত্বের বেড়িতেও বাঁধা পড়েনি আমার ললিত স্বপ্নগুলো, তাই ক্রীতদাস শিবির থেকেও বাজিয়েছি কবিতার সুমধুর বীণা!

৩য়। আমি কুতুবুদ্দিন—ছিলাম ক্রীতদাস, তারপর দিল্লীর সম্রাট!

৪র্থ। তবুও আসেনি মুক্তি—

২য়। ছেঁড়েনি শৃঙ্খল

৪র্থ। মোছেনি চাবুকের দাগ—রক্তের কলঙ্ক—

১ম। আজো আমি তাই বুকের গুহায় স্বপ্নের কুয়াশা ভরে—

২য়। হেঁটে চলি হার্লেমে নিগ্রো বস্তিতে আফ্রিকার গহন অরণ্যে প্যালেসটাইনের মরুপ্রান্তরে! কেননা আমি জেনেছি—

কোরাস। দুনিয়াকে উল্টে না দিলে কোনোদিন দাসত্ব ঘুচবে না, ঘুচতে পারে না।

[বিজয়দেবের প্রবেশ]

বিজয়দেব। যাও হে, কারারক্ষক খুঁজছেন তোমায়, কোথায় পাঠাবেন!

প্রহরী। পরে একদিন গল্পটা বলব। [প্রস্থান]

চন্দ্রকেতু। আচ্ছা—আপনি মুক্তি পেলে কি করবেন?

বিজয়দেব [হেসে]। হঠাৎ এ প্রশ্ন?

চন্দ্রকেতু। বলুন না!

বিজয়দেব [সহজ সুরে]। কি আর করব, আবার বিদ্রোহের চেষ্টা করব।

চন্দ্রকেতু। আবার?

বিজয়দেব। তাছাড়া আর কি।

চন্দ্রকেতু। আবার কারাগারে আসবেন?

বিজয়দেব। ব্যর্থ হলে আবার আসতে পারি!

চন্দ্রকেতু। তখন কি করবেন?

বিজয়দেব। এখন যা করছি! তারপর আবার ছাড়া পেলে আবার ক্রীতদাসদের কানে কানে বিদ্রোহের উস্কানি দেব!

চন্দ্রকেতু। আপনি, আপনি একটা আশ্চর্য ইয়ে—

বিজয়দেব [প্রাণখোলা হাসি]। বেশ ভয়ঙ্কর তাই না? থাক, এ-সব কথা। আজ কি আর ঘুমোবে না?

চন্দ্রকেতু। নাঃ। আজ আর ঘুমোব না। না, না, ঠিক আছে ঘুমোনই যাক, বেশ নিশ্চিন্তে একটা ঘুম—[বিজয়দেব স্থিরদৃষ্টিতে ওকে দেখে। চন্দ্রকেতু সংকুচিত হয়] না, না, মানে অনেক রাত তো হল—

বিজয়দেব [মৃদু স্বরে]। সকাল হতেও বেশি দেরি নেই।

চন্দ্রকেতু। আচ্ছা—বিজয়দেব—যদি কাল—মানে কাল সকালেই আপনি আর আমি মুক্ত হয়ে যাই, তবে—মানে তবে—

বিজয়দেব। একটু উত্তেজিত হয়েছ দেখছি!

চন্দ্রকেতু। না, মানে, ঠিক বোঝাতে পারছি না—ধরুন না যদি কাল দৈববলে মানে—কোনো অঘটন ঘটেও আমরা দুজন মুক্তি পেয়ে যাই—[বিজয়দেব এই ফাঁকে ঘরের কোণ থেকে একটা প্রদীপ নিয়ে জ্বালেন] আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ফিরে যাব, কতকাল যে ওদের দেখিনি, জানেন আমি যখন গুরুগৃহে অধ্যয়ন করতে যেতাম, মা সারাটা দিন আমার জন্য উদাস প্রতীক্ষায় জানালার ধারে বসে বসে প্রহর গুণতেন! আর এখন এতদিনের এই দীর্ঘ বিচ্ছেদ তিনি যে কি করে—[দীর্ঘশ্বাস চেপে] আমার বাবা প্রচণ্ড গম্ভীর প্রকৃতির, কিন্তু হলে কি হবে ভেতরে ভেতরে দারুণ দুর্বল, আমি যখন সেনাবাহিনীতে যোগ দিলাম—জানেন তো আমি পরে সেনানায়কও হয়েছিলাম, তখন যা তাঁর অবস্থা—

বিজয়দেব। তুমি ঘুমোবে বলছিলে না?

চন্দ্রকেতু। শুনুন না, আমার বোন রত্নমালা—কে জানে এখন হয়ত বেশ বড় হয়েছে, দাদা বলতে একদম অজ্ঞান, ওর জানেন কি অদ্ভুত ধারণা—আমি যা বলব, তা ধ্রুব সত্য, দুনিয়াতে নাকি আমার মতো বীর, সচ্চরিত্র পুরুষ—আরে আপনি তো কোনো কথাই শুনছেন না, [কাছে গিয়ে] কি ছাইভস্ম লিখছেন এগুলো—

বিজয়দেব। গণিত। বিশুদ্ধ গণিত চর্চা করছি।

চন্দ্রকেতু। গণিত? এত রাত্তিরে আঁক কষছেন? আশ্চর্য লোক!

বিজয়দেব। একটা সূত্র কিছুতেই মিলছে না।

চন্দ্রকেতু। এই কারাগারে কোনো সূত্রই মিলবে না। বাইরে গিয়ে মেলাবেন! আর কি বা লাভ এখানে পড়াশুনা করে!

বিজয়দেব। জ্ঞান! অর্থাৎ জানা, জানিবার ইচ্ছা!

চন্দ্রকেতু। জানা! জানিবার ইচ্ছা! কি লাভ জেনে?

বিজয়দেব। জানবার ইচ্ছেই যদি না থাকে, তবে মানুষ মরে যায়। যত বাঁচছি তত জানছি, যতই জানছি ততই বেঁচে উঠছি!

চন্দ্রকেতু। সে আপনি জানুন গে। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

বিজয়দেব। বেশ তো। শুয়ে পড়।

চন্দ্রকেতু। আপনি?

বিজয়দেব। এই সূত্রটা মিলিয়ে নি।

[চন্দ্রকেতু একপাশে শুয়ে পড়ে। একটু পরেই উঠে বসে]

চন্দ্রকেতু। আচ্ছা আপনার কি মনে হয়—কাল আমি মানে আমরা ছাড়া পাব?

বিজয়দেব [পরম নির্লিপ্ত]। আমি কাল ছাড়া পাব শুনলাম।

চন্দ্রকেতু [বিস্ময়ে]। আপনি?

বিজয়দেব। কারারক্ষক বলছিলেন—কাল রাজার জন্মদিনে ছেড়ে দিতেও পারে আমায়। অনেক দিন তো হল।

চন্দ্রকেতু [উল্লাসে]। দেখেছেন, আমি আগেই বলেছিলাম—আপনিও তাহলে ছাড়া পাচ্ছেন! কি মজা যে হবে! আমিও তো [হঠাৎ মুখটা চেপে ধরে]—আচ্ছা আমার কথা কিছু বলেননি উনি?

বিজয়দেব। না। অবশ্য একজনের ব্যাপার অন্যকে ওরা বলে না।

চন্দ্রকেতু [দমে যায়]। ও! অবশ্য আমি আর কদ্দিন আছি—

বিজয়দেব। কিছুক্ষণ পরেই দূত আসবে কাদের কাদের মুক্তির আদেশ হয়েছে তার তালিকা নিয়ে।

চন্দ্রকেতু। তাই নাকি! তাহলে তো জেগে থাকতেই হবে।

বিজয়দেব। তারপর ভোরবেলায় দ্বিতীয় দূত আসবে চূড়ান্ত আদেশ নিয়ে। বড় সংখ্যাটি যদি ক হয়, তবে ক্ষুদ্র সংখ্যা—

চন্দ্রকেতু। রাখুন তো আপনার গণিতের কচকচি। ঐ দ্বিতীয় দূত যখন আসবে, তখনই আমাকে—আমাদের বা আপনাকে ছেড়ে দেবে তো?

বিজয়দেব। তাই তো নিয়ম। ক্ষুদ্র সংখ্যাটি যদি বড় সংখ্যার—

চন্দ্রকেতু। ছাড়া যদি একবার পাই, আর এ-মুখো হব না বাবা। বিদ্রোহ-টিদ্রোহ মাথায় যাক! এবার পরিষ্কার—

বিজয়দেব। বিয়ে করে সংসারী হবে?

চন্দ্রকেতু। না—মানে....এরপর—

বিজয়দেব। সন্তান উৎপাদন করবে?

চন্দ্রকেতু। কি যে বলেন!

বিজয়দেব। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। শাস্ত্র পড়নি?

চন্দ্রকেতু। পরিহাস করছেন? সত্যি একদিন—

বিজয়দেব। পুত্র-পৌত্রাদির মুখদর্শনান্তে যথাকালে স্বর্গারোহণ করবে?

চন্দ্রকেতু। আপনি এমন করে বলেন!

বিজয়দেব। হায় রে মানুষ! কোনো পথকুক্কুরীর গর্ভে কেন জন্ম হল না তোর? নিশ্চিন্ত মৈথুনশেষে ক্লান্ত প্রসব—তারপর ফিরে এসে গভীর আঁধারে পুনর্বার যৌন মিলন!

চন্দ্রকেতু। বিজয়দেব! আপনি মানুষকে ঘৃণা করেন! আপনি মানব-বিদ্বেষী!

বিজয়দেব। দর্শন পড়বে? চার্বাক দর্শন?

চন্দ্রকেতু। চার্বাক? নাস্তিক, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী? এ রাজ্যে যার চর্চা নিষিদ্ধ?

বিজয়দেব। কারণ তা রাজশক্তিকে ঐশ্বরিক বিভূতিসম্পন্ন ভাবতে শেখায় না, কারণ তা ক্রীতদাস-মালিকদের পূর্বজন্মে পুণ্যবান ও ক্রীতদাসদের পূর্বজন্মে ঘোরপাপী ছিল বলে না, সমস্ত অত্যাচার, শোষণ ও লুণ্ঠনকে পূর্বজন্মের কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত বলে না। সুতরাং তাতো নিষিদ্ধ হবেই। আত্মা সম্পর্কে চার্বাক দর্শনে কি বলেছে জান?

চন্দ্রকেতু [হাই তুলে]। কি হবে এসব জেনে?

বিজয়দেব। ভাবাবেগ থেকে মুক্ত হওয়া যাবে, চিন্তা বস্তুকেন্দ্রিক হয়ে উঠবে। মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কোনো পথে যেতে পচে যাওয়া নীতিবোধ বাধা দেবে না। যেমন ধর—আমি তোমার পথে কাঁটা। আমাকে হত্যা করতে বিন্দুমাত্র চিন্তা করতে হবে না, কারণ একটা সচেতন বস্তু আরেকটা সচেতন বস্তুকে মারছে। এই বিরাট বস্তুবিশ্বে কে কার? হৃদয়ের সম্পর্ক বলে যে ব্যাপারটা আছে, তা নিতান্তই মেকি, বানানো। অতএব আমাকে হত্যা করতে চাইলে নির্দ্বিধায় করতে পার।

চন্দ্রকেতু [বিস্ময়ে]। কি বলেছেন এসব?

বিজয়দেব [হাসতে হাসতে]। ভয় পেয়ে গেলে? সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে বড় ভয়। মালবিকার সঙ্গে তোমার যে সম্পর্ক তা অলৌকিক স্বর্গীয় ব্যাপার কিছু নয়, হৃদয়গত মাধুর্য কিছু নয়, একান্তই বস্তুধর্ম, জৈবধর্ম। লোহা-চুম্বকের আকর্ষণ, সব নারীর সঙ্গে সব পুরুষের একই সম্পর্ক!

চন্দ্রকেতু [সত্রাসে]। বিজয়দেব, কি বলছেন খেয়াল আছে?

বিজয়দেব। মা নেই, বাবা নেই, বোন নেই, ভাই নেই, স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, কন্যা নেই—নেতি, নেতি, আদতে সব বস্তু, বস্তুই সব—[হঠাৎ সুর পাল্টে] একটা মজার ব্যাপার জান?

চন্দ্রকেতু [যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে]। কি? কি মজার ব্যাপার?

বিজয়দেব। আমার মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তো! প্রথম দূত এসে দেখবে যে তালিকা পাঠানো হয়েছে, সেই লোকগুলো বেঁচে আছে কিনা। ধর সে দেখল বেঁচে আছে। অতএব রাজধানীতে মুক্তির আদেশ চূড়ান্ত হল। এখন দ্বিতীয় দূত চূড়ান্ত আদেশ নিয়ে এসে যদি দেখে—ধর আমি আর বেঁচে নেই, তখন আমার জায়গায় তুমি বা অন্য কেউ মুক্তি পাবে।

চন্দ্রকেতু। কেন? এ-রকম কেন?

বিজয়দেব। রাজাদেশ। কোনো কারণেই লঙ্ঘন করা চলে না।

চন্দ্রকেতু। আপনার জীবনের গল্প বলবেন?

কোরাস। পৃথিবীর এইসব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল, এশিরিয়া ধুলো আজ, বেবিলনে ছাই হয়ে আছে।

১ম। হৃদয়ের গোপন গহ্বরে যখন ধীরে ধীরে জমে ওঠে প্রতিহিংসার বিষাক্ত বারুদ—

২য়। প্রতিটি দিনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ লাঞ্ছনা, অপমান আর নির্যাতন যখন জমে জমে তৈরি হয় অনন্ত প্রবঞ্চনার বিশাল পর্বত—

৩য়। ঘৃণায়, ক্রোধে যখন থমথম করে ওঠে রাত্রির আকাশ—

৪র্থ। তখন যদি হঠাৎ কোনো এক মুহূর্তে ভিসুবিয়সের ঘটে অগ্ন্যুৎপাত—

১ম। নির্মম জিঘাংসার অবরুদ্ধ ইয়াংসিকিয়াং বাঁধ ভেঙে গর্জে ওঠে—

৩য়। প্রতিশোধ রাঙিয়ে তোলে মেকঙের জল, কলকাতা আর ডেট্রয়েটের রাজপথ—

৪র্থ। তোমরা সেই মুহূর্তের অভাবিত বিস্ফোরণে হতচকিত হয়ে ভাব—

২য়। হায় আমাদের দিশাহারা যৌবন উচ্ছন্ন গেল, হায় কেন এত রক্তস্রোত, কেন এত হত্যার তাণ্ডব—

৪র্থ। তোমরা জান না—

কোরাস। পর্বতসম সেই দীর্ঘ সঞ্চিত ক্রোধের ঘূর্ণিঝড় একবার পথ খুঁজে পেলে তোমাদের বিলাসী শয্যা তো ছার সারা পৃথিবীই উড়ে যায় দিক-চিহ্নহীন মহাশূন্যে।

বিজয়দেব। কি হবে শুনে? আগে ছিলাম ব্রাহ্মণ, অধ্যাপনা করতাম, তারপর শিবিরে বন্দী ক্রীতদাস, পায়ে ছিল লোহার বেড়ি, পিঠে চাবুকের দাগ। তখন মর্মে মর্মে বুঝলাম—ব্রাহ্মণত্ব ঘোর প্রবঞ্চনা, জাত শুধু দুটো—ক্রীতদাস আর তার মালিক। চেষ্টা করলাম বিদ্রোহের। পারলাম না!

৩য়। রাজা নীরো যেদিন মারা গেলেন সেদিন আমি ওথো, পন্টাসের এক শৃঙ্খলিত দাস স্বপ্ন দেখেছিলাম—রোমের শূন্য সিংহাসনে পা রেখে আকাশ ফুঁড়ে দাঁড়াবে পদানত ক্রীতদাস। তাই সেদিন সকলকে ডেকে বলেছিলাম—সম্রাট মরেনি, এই তো নতুন সম্রাট ওথো! কিন্তু আমি পারিনি বন্ধুরা, ওরা আমাকে হত্যা করেছিল গভীর নিশীথে।

চন্দ্রকেতু। আপনার স্ত্রী—ছেলেমেয়েরা?

বিজয়দেব। ছেলে ছিল না। দুটো মেয়ে। শুনেছি এখন তারা কোনো সামন্ত জমিদারের রক্ষিতা!

৪র্থ। আহ্! আমার ছোট মেয়েটাকে কারা যেন লুঠে নিয়ে গেছে ক্রীতদাস শিবির থেকে। আমি বেবিলনের এক ক্রীতদাস ফাইডোন। কাল সন্ধ্যায় তার মৃতদেহ পড়েছিল শহরের মাঝখানে, রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত!

চন্দ্রকেতু। আপনার স্ত্রী—

বিজয়দেব। শুনেছি আর একজনের সঙ্গে এখন ঘর করছে, অন্য একজন ক্রীতদাসের স্ত্রী!

চন্দ্রকেতু। নারী মাত্রেই বিশ্বাসঘাতিনী, নরকের দ্বার!

বিজয়দেব [উচ্চ হাস্যে]। এখানে এসেও ঐসব পুরোন পচা গলা শাস্ত্র-বাক্যগুলোকে ভুলতে পারনি! শোন—একদা ব্রাহ্মণ সন্তান এই ক্রীতদাসের জীবনের ভাষ্য শোন। আমরা স্ত্রী কি অন্যায় করেছে? প্রেম ও কাম একটি জৈবধর্ম। বিবাহ এই জৈবধর্মেরই অনুসারী! কিন্তু আঠের বছর আমি নেই। শরীর তো তোমার হুকুমে চলে না, তার নিয়ম আছে, শৃঙ্খলা আছে, তার সঙ্গী তো চা-ই।

চন্দ্রকেতু। মাথায় ঢুকছে না এ-সব।

[অস্পষ্ট অশ্বক্ষুরধ্বনি]

বিজয়দেব। পরে, পরে ঢুকবে। শুধু মোহমুক্ত থেক!

[ঘোড়ার পদশব্দ বাড়ে]

চন্দ্রকেতু। কে যেন আসছে ঘোড়ায় চেপে?

বিজয়দেব। রাজার প্রথম দূত!

চন্দ্রকেতু [উল্লাসে]। মুক্তি! মুক্তির তালিকা নিয়ে! উঃ কদ্দিন বাদে বাইরে পৃথিবীর আলো দেখব!

বিজয়দেব। তোমার মা-বাবা-বোন, আর মালবিকা—

চন্দ্রকেতু। হ্যাঁ। হ্যাঁ। ওদের সঙ্গে আবার দেখা হবে! ভাবতেই পারছি না যে এমন ভাবে—

বিজয়দেব। অথচ তুমি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলে, একদিন আমিও চেয়েছিলাম—ঐ দেখ বিষ—সাড়ে সতের বছরেও একই আছে—

চন্দ্রকেতু। মুক্তির লগ্ন এসে গেছে।

[প্রহরী ও দূতের প্রবেশ]

দূত। বিজয়দেব কে?

প্রহরী। ঐ যে উনি।

[দেখিয়ে দেয়]

দূত। মহামান্য মহারাজাধিরাজ দেববর্মা আপনার মুক্তির আদেশ দিয়েছেন। কাল সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে রাজপ্রাসাদ থেকে দ্বিতীয় দূত এসে আপনাকে মুক্তি দেবে।

[প্রস্থানোদ্যত]

চন্দ্রকেতু। আমার? আমার সম্পর্কে কিছু—

দূত। উনি কে?

প্রহরী। উনি চন্দ্রকেতু—সেই যে মার্জনা ভিক্ষা করেছিলেন—

দূত। হ্যাঁ! আপনাকে তিন মাস বাদে মুক্তি দেওয়া হবে। রাজা জানিয়েছেন, আপনার মার্জনা ভিক্ষায় তিনি প্রীত হয়েছেন। তবে আপনি তো অত্যন্ত কম দিন আছেন। মাত্র কত যেন—

প্রহরী। বছর আড়াই—

দূত। হ্যাঁ! ঐ জন্যেই। আর তিন মাস থাকুন। উনি তো অনেকদিন ধরেই আছেন। কত বছর যেন—

প্রহরী। আঠের বছর।

দূত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই আগে ওঁর পালা। মহারাজ আমাদের খুবই বিবেচক।

[দূত ও প্রহরীর প্রস্থান]

বিজয়দেব। যাক অ্যাদ্দিন বাদে মুক্তি! [চন্দ্রকেতু নির্বাক, বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। বিজয়দেব তাকে সকৌতুকে পর্যবেক্ষণ করে] আর তুমি থাক মাসতিনেক। অবশ্য একা একা লাগবে। ভয়ও করতে পারে। কিন্তু তিন মাস তো, কাটিয়ে দেওয়া যায়, কি বল! মাত্র তিন মাস! এই তিন মাসে তোমার বাবা-মা-বোন আর তোমার প্রিয়া—কি যেন নাম, রত্নমালা? না, সে তো তোমার বোন? মালবিকা না? এরা সব অপেক্ষা করুক! কটা দিন আর!

চন্দ্রকেতু [চিৎকার]। থামুন!—এই নির্বোধ, কাণ্ডজ্ঞানহীন—

বিজয়দেব [শান্ত, খুবই শান্ত স্বরে]। অবশ্য এই তিন মাসের বিরহ যদি তুমি সহ্য করতে না পার, তবে আত্মহত্যা কর। ঐ যে মাটির পাত্রে বিষ রয়েছে। একটুও গুণ নষ্ট হয়নি ওর।

চন্দ্রকেতু [বিড়বিড় করে]। বিষ! একটুও গুণ নষ্ট হয়নি।

বিজয়দেব। হ্যাঁ, নিজের ওপরেই পরীক্ষা করে দেখ। ঐ কলঙ্কিত মুখ অন্যের কাছে দেখানোর আগে মরাই উচিত। রাজার কাছে তুমি মার্জনা ভিক্ষা করেছ। রাজা পরম প্রীতির সঙ্গে তোমাকে মুক্ত করবেন! তিন মাস বাদে। রাজা বড় বিবেচক। ঐজন্যে আগে আমায় মুক্তি দিলেন। আঠের বছর আছি তো। এই বিবেচক রাজার বিরুদ্ধে কি কখনও বিদ্রোহ করা চলে? তুমিই বল!

চন্দ্রকেতু। বাজে বকবেন না!

বিজয়দেব [স্বগত]। ওষুধ ধরেছে! [প্রকাশ্যে]—হায়, ঐ অত্যাচারী, উৎপীড়ক, কপট, প্রবঞ্চক রাজার বিরুদ্ধে এর সঙ্গে যারা বিদ্রোহ করেছিল, তাদের রক্তে এই দেশের মাটি লাল হয়ে গেছে—আর এই নিকৃষ্ট জীবটা সেই রক্তমাখা হাতটা জড়িয়ে ধরে বলছে—আমায় ক্ষমা করুন প্রভু! পদাঘাতে দূর কর এই সব কাপুরুষদের। এর সঙ্গী অনেকেই যাবজ্জীবন কারাবাসে বীরের মতো নিজের আদর্শে অচল, আর এই ক্লীব নপুংসকটা মায়ের আঁচল ধরে থাকতে চাইছে, প্রিয়ার চুম্বনের জন্যে কামতাড়িত কুকুরের মত ছটফট করছে—

চন্দ্রকেতু [প্রচণ্ড ক্রোধে]। তোকে—তোকে আমি—

বিজয়দেব। প্রহরী, প্রহরী! [প্রহরীর প্রবেশ] একটু কারারক্ষকের কাছে যাব। দরকার আছে। [চন্দ্রকেতুকে] ঐ কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেয়ো। আহা মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে বেচারার। দেখো ভুল করে যেন বিষের পাত্রটা থেকে—

চন্দ্রকেতু। শয়তান।

প্রহরী [হাই তুলে]। চলুন, শালার রাত্তির আর আর শেষ হবে না!

বিজয়দেব। সকাল হয়ে এল বলে। চল। [যেতে গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে] একটু একা থাকতে দিলাম। পরে যাতে এ-জন্যে আমায় ধন্যবাদ দিতে পার, তার ব্যবস্থা করতে ভুলো না। [প্রস্থান]

[চন্দ্রকেতুর চোখ বাঘের মতো জ্বলছে। নিস্পন্দ হয়ে বসে রয়েছে। নেপথ্যে সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের রং পাল্টাবে, চালচলনও কখনও ক্রোধ, কখনও হতাশা, কখনও জিঘাংসা]

নেপথ্যে। কখনো প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়বে, চিৎকার করে উঠবে, দেওয়ালে মাথা ঠুকবে, তারপর ঝিমিয়ে পড়বে। স্বপ্ন দেখবে আবার ফিরে গেছে প্রিয়জনদের উষ্ণ অভ্যর্থনার ভিতরে, পুরোন জীবনে, তারপর স্বপ্নভঙ্গে আবার....

চন্দ্রকেতু। না!

নেপথ্যে। মালবিকার কাছে ফিরে যাবে চন্দ্রকেতু?...হতাশ হতে নেই, সময় সুযোগ একদিন না একদিন আসবেই...যেমন ধর, আমি তোমার পথের কাঁটা, আমাকে হত্যা করতে বিন্দুমাত্র চিন্তা করতে হবে না।....আত্মহত্যা করবে? ঐ দেখ

বিষ, ঐ মাটির পাত্রে আজ সাড়ে সতেরো বছর ধরে একই ভাবে রয়েছে।...এই বিরাট বস্তুবিশ্বে কে কার? হৃদয়ের সম্পর্ক বলে ব্যাপারটা একেবারেই মেকি।...এই তিন মাস তোমার মা, বাবা, বোন আর প্রিয়া—সবাই অপেক্ষা করুক। কটা দিন আর।

চন্দ্রকেতু। অসম্ভব! অসম্ভব!

নেপথ্যে। একটা মজার ব্যাপার জান! প্রথম দূত এসে দেখবে যে তালিকা পাঠানো হয়েছে, সেই লোকগুলো বেঁচে আছে কিনা। ধর সে দেখল বেঁচে আছে। অতএব রাজধানীতে মুক্তির আদেশ চূড়ান্ত হল। এখন দ্বিতীয় দূত যদি এসে দেখে আমি বেঁচে নেই, তখন আমার জায়গায় তুমি মুক্তি পাবে।...হৃদয়েশ্বরী ছিলেন একজন? মালবিকা? বেশ নাম।....মিথ্যে আবেগের চোরাবালিতে পা দিয়ে কুড়ুল মের না সম্ভাবনার বৃক্ষে। শুধু উপযুক্ত সময়ে কাজ।...এই ক্লীব নপুংসকটা কামতাড়িত কুকুরের মতো—কামতাড়িত কুকুরের মতো—কামতাড়িত কুকুরের মতো—

চন্দ্রকেতু। শয়তান! খুন করব!

নেপথ্যে। ঐ দেখ বিষ—ঐ দেখ বিষ—ঐ দেখ বিষ—

[চন্দ্রকেতু ছুটে গিয়ে বিষটি জলভর্তি কুঁজোয় ঢেলে দেয়। বিজয়দেবের প্রবেশ]

বিজয়দেব [যেন কিছুই হয়নি]। মনটা খুব খারাপ না। ভেবে আর কি করবে বল? তিন মাস সময় দেখতে দেখতে কেটে যাবে—

চন্দ্রকেতু [স্থির দৃষ্টিতে]। আপনি ঘুমোবেন না?

বিজয়দেব। ঘুমোব? এখন?

চন্দ্রকেতু। হ্যাঁ। আপনার আর ভাবনা-চিন্তা কি? কিছুক্ষণ বাদেই তো মুক্ত হবেন। একটু ঘুমিয়ে নিন। আমার তো আর ঘুম আসবে না!

বিজয়দেব। ঠিক বলেছ! দুয়ারে এসেছে মুক্তির দূত। এর পরেই তো পিঞ্জর ভেঙে মুক্ত বিহঙ্গ! কারাগারে শেষ ঘুমটা ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।

নেপথ্যে। শেষ ঘুম! শেষ ঘুম!

বিজয়দেব। আমি ঘুমোলেও তুমি জেগে থেক কিন্তু সাথী!

[শুয়ে পড়ে]

কোরাস। জল খাবেন?

চন্দ্রকেতু। জল খাবেন?

বিজয়দেব। ও হ্যাঁ, জল তো খাওয়া দরকার। রোজই ঘুমোবার আগে খেয়ে শুই। মনে করিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ! [চন্দ্রকেতু জল এনে দেয়। পরিহাস—তরল কণ্ঠে] কি হে, পাশের পাত্রটি থেকে এনে দাওনি তো?

চন্দ্রকেতু। কি যে বলেন। নিন। খেয়ে নিন।

বিজয়দেব। [একই রসিকতার সুরে] খাব? ঠিক বলছ তো?

চন্দ্রকেতু। কি মুস্কিল, খাবেন না কেন? তেষ্টার জল—

বিজয়দেব। ঠিক বলেছো তেষ্টার জল! কতদিন ধরে এই জল খাবার জন্যে বুক ভরা তৃষ্ণা নিয়ে বসে আছি। দাও। [জল নিয়ে] জলে কিসের গন্ধ হে?

চন্দ্রকেতু [ত্রাসে]। না, না, গন্ধ কোথায়, কোনো গন্ধ নেই, মাটির কুঁজোর বোধ হয়—

বিজয়দেব। মাঝে মাঝে মেয়ে দুটোর কথা মনে হয়! জমিদারের প্রাসাদে কি ভাবে যে—

চন্দ্রকেতু [হঠাৎ চিৎকার]। খাবেন না বিজয়দেব, জলে বিষ! [বিজয়দেব পরিতৃপ্তির সঙ্গে জলটা খান] একি করলেন আপনি।

বিজয়দেব [যন্ত্রণাটা চেপে চাপতে চাপতে]। আঃ, বুকটা জ্বলে যাচ্ছে! শোন যতক্ষণ শরীরটা ভাল আছে বলে নিই! তোমার এখন পারিবারিক জীবনে ফিরে যাওয়া হবে না। ভেবে দেখ—এখনও ব্রত অপূর্ণ। কয়েকজন তরুণ সেনানায়ক জনতার মুক্তি আনতে পারে না। জনতার মুক্তি জনতাই আনে। তাই আর প্রাসাদে ষড়যন্ত্র নয়—রাজাকে উচ্ছেদ করতে হলে—

চন্দ্রকেতু [হাহাকার]। বিজয়দেব! আমি আপনাকে বিষ দিয়েছি।

বিজয়দেব। পরে! পরে হবে কান্নাকাটি। শোন, বিদ্রোহের মূল শক্তি ক্রীতদাস, অন্ত্যজ, শূদ্র নির্যাতিত, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ! তাদের সংগঠিত করা দরকার। কিছুটা সংগঠন এখনও টিঁকে আছে। তুমি তাদের সঙ্গে যোগ দাও।

চন্দ্রকেতু। আপনি আমায় ঘৃণা করেছেন না কেন বিজয়দেব?

বিজয়দেব। ঘৃণা করার মতো কোনো কাজ করনি বলে। বিচ্যুতি মানুষ মাত্রেরই হয়, তবে তাকে অতিক্রমও করে বলেই আজো সভ্যতা টিকে আছে।—আর এই হত্যা তো আমিই করিয়েছি!

চন্দ্রকেতু। বিজয়দেব!

বিজয়দেব। বড় কষ্টরে ভাই!—তুমি যে মার্জনা ভিক্ষা করছ আমি আগেই জানি। আমি যে কাল ছাড়া পাব, তাও জানি, তুমি পাবে না, তাও। তাই ভেবেছিলাম মার্জনাভিক্ষার কলঙ্ক মাথায় নিয়ে পারিবারিক জীবনের জলাভূমিতে আটকে পড়বে, বিপ্লবী আদর্শের এত বড় পরাজয় হতে দেওয়া যায় না। তাই তোমাকে উত্তেজিত করেছি, অনিবার্য এই পরিণাম ডেকে এনেছি। কারণ তোমাকে আমাদের দরকার। বিদ্রোহের সংগঠনকে যুদ্ধবিদ্যায় পারঙ্গম করে তুলতে হবে। এ-কাজ তুমিই পার!

চন্দ্রকেতু। আপনিও তো পারতেন মুক্ত হয়ে।

বিজয়দেব। না, পারতাম না, পারতাম না। এই কারাগৃহ আঠারো বছর ধরে সারা শরীরে কালান্তক ব্যাধির বীজ বুনেছে। মুক্ত হলেও ঠিক সাতদিন বাঁচতাম। নিষ্ঠুর রোগযন্ত্রণা থেকে তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ চন্দ্র! তুমি আমার মুক্তিদাতা।

চন্দ্রকেতু। বিজয়দেব! আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

বিজয়দেব। সামান্য। ক্রিয়া শুরু হচ্ছে। [ম্লান হেসে] সাড়ে সতের বছরের পুরোন বিষ, একটু দেরিতেই কাজ শুরু করে।

চন্দ্রকেতু। আপনি শোবেন? শোবেন এখন?

বিজয়দেব। শোব। তোমার কোলে মাথা রেখে শোব সাথী। [বিজয়দেব চন্দ্রকেতুর কোলে মাথা রেখে শোন] আগের কটু ভাষার জন্যে ক্ষমা কর আমায়।

চন্দ্রকেতু। আপনি—আপনি নিজেও তো আত্মহত্যা করে আমায় মুক্তি দিতে পারতেন—

বিজয়দেব। সে মুক্তিতে তো তুমি বাড়িই ফিরে যেতে।—রাগ কোর না, আসলে আমার মৃত্যুর সঙ্গে তোমায় না বাঁধলে তুমি কি এত সহজে ত্যাগ করতে পারতে পারিবারিক জীবনের মোহ? এখন আমার মৃত্যুর পর এক অপরাধ বোধ প্রতিনিয়তই তোমার ভেতরে কাজ করবে, কোন দিন ব্রতভ্রষ্ট হতে দেবে না।

চন্দ্রকেতু। কি নিষ্ঠুর আপনি! কি নির্মম!

বিজয়দেব। নির্মোহ হও। দ্বিধা ছুঁড়ে ফেল। জয়ের জন্য সাহসী হও। [যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত হয়ে যায় ম্লান হেসে] আর বেশিক্ষণ নেই, ভালই কাজ করছে বিষটা!

চন্দ্রকেতু। বিজয়দেব!—আমি আপনার গায়ে হাত বুলিয়ে দি! আপনি ঘুমোন।

বিজয়দেব। আঃ কি আরাম! বেশ সুন্দর মনে হচ্ছে এই রাত! বেশ শীত শীত পড়েছে না?—সকাল কখন হবে? দ্বিতীয় দূত কি আর—চন্দ্র!

চন্দ্রকেতু। বিজয়দেব!

বিজয়দেব। চন্দ্রকেতু—ওদের কাছে ফিরে যাও। ওদের কাছে—

[শরীরটা নিস্পন্দ হয়ে যায়]

চন্দ্রকেতু। যাব বিজয়দেব, যাব। আর ফিরব না, আর পালাব না—না। না। কখনো না।

[কান্নায় ভেঙে পড়ে]

কোরাস। চূর্ণ কর মৃত্যুর জীর্ণ পিঞ্জর—হে মুক্ত প্রাণ পাখা মেল অবারিত শান্তির নীল দিগন্তে!

১ম। ভেঙে ফেল এ-কারাগার। এস মুক্ত করি বন্দীদের।

২য়। শুরু হয়ে গেছে বিদ্রোহ। আক্রমণ কর, হত্যা কর।

কোরাস। সভ্যতা একবার পেছন ফিরে দেখ, অতিক্রান্ত পথে ফেলে আসনি তো কোনো গোপন কলঙ্ক! দর্পণে মুখ দেখ মানুষ—আকাশে যখন বিদ্যুতের ঝলক, তুমি তখন কোন আশ্রয়ের খোঁজে যুগ থেকে যুগে পলাতক, যুদ্ধ যখন ভিয়েৎনামে, বলিভিয়ায়, কলকাতায় তখন কোথায় তুমি কোন নিরাপদ গহ্বরে পরিত্রাণ পাবে? জবাব দাও।

[দূরে গোলমাল]

চন্দ্রকেতু [মৃতদেহ ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়]। কই দ্বিতীয় দূত তো এখনও এল না! ও কিসের কলরব? আহ্ এত দেরি কেন? ও কারা উত্তাল সমুদ্রের মতো গর্জন করছে! মুক্তি যে আমাকে পেতেই হবে। না আর নয়, গৃহসুখ লালসার জাল, এবার অন্যপথ—। হায় ঐ তো নদীর বুকে আমার স্বজনের শব ভাসে মূঢ়

প্রতাপের বেদীমূলে ঐতো আমার প্রেম রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত। যুদ্ধ, এখন যুদ্ধের দামাদা বাজে বজ্রনির্ঘোষে, কে পালাবে আর রণক্ষেত্র থেকে?

[কোরাসেরা এগিয়ে আসে]

চন্দ্রকেতু। ওহ্! দ্বিতীয় দূত আসেনি। তোমরা কারা?

১ম। আপনারা মুক্ত। আমরা কারাগারে ভেঙে ফেলেছি। ক্রীতদাস বিদ্রোহ শুরু হয়েছে।

২য়। বিজয়দেব কোথায়? আমাদের অধিনায়ক? আমরা এবার মণিসিংহপুরমের দিকে অভিযান করব।

৩য়। ঐ যে বিজয়দেব—ওকি। হায়, এমনভাবে—

চন্দ্রকেতু [চিৎকার করে ওঠে]। হায়—আমি কি করেছি।—বিজয়দেব, শুনতে পাচ্ছেন ওরা কারাগার ভেঙে ফেলেছে—বিজয়দেব, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, আমরা দুজনেই মুক্ত, আমায় এভাবে—আমাকে মুক্তি দেবার কি কোনো দরকার ছিল বিজয়দেব—কথা বলুন।—আমি নিজেকে ঘৃণা করি। হায় আমারই জন্যে আজ—আমারই পলায়ন-মুখিতার জন্যে—আমি যে কি করি—

কোরাস। চলে এস চন্দ্রকেতু, ভুল থেকে নির্ভুলতায়, বিচ্যুতি থেকে আত্মদানে, অবক্ষয়ের আঁধার থেকে দৃঢ় বিশ্বাসের উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায়, চলে এস চন্দ্রকেতু প্রত্যুষের সূর্যের নিচে দাঁড়িয়ে কাল থেকে কালান্তরে, দেশ থেকে দেশে, প্রবঞ্চিত বুকের পাঁজরে ঘষে ঘষে শাণিত করি নির্মম জিঘাংসার উন্মত্ত তরবারি।

[ওরা এগিয়ে চলে। চন্দ্রকেতু দ্বিধাগ্রস্ত পদে দীন অনুগামীর মত অনুসরণ করে]

উপসংহার

॥ মানুষ ভুল করে
॥ মানুষ ঠিক করে
॥ মানুষ ভালবাসে
॥ মানুষ হত্যা করে
॥ তবু মানুষ বারবার হেরে গিয়েও
॥ শেষ পর্যন্ত জিতে যায়।
॥ যুগ-যুগ বাহিত গণ মুক্তির জন্য আত্মোৎসর্গকারী
॥ মহান শহীদের রক্তিম পথ বেয়েই
॥ ইতিহাসের তীর্থযাত্রা।
॥ বল কবে হে অনাগত কালপুরুষ
॥ এইসব জীবনের শাশ্বত বাসনা
॥ সার্থক হবে, মহীয়ান হবে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিশ্বকবি। অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকারও বটে। তাঁর কাব্যজীবন ও নাট্যজীবন পাশাপাশি জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত চলেছিল। অভিনেতা, নাট্যপরিচালক এবং নাট্যরীতি ও প্রয়োগের সাহসী প্রবক্তা রূপে নাট্যজগতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে, সঙ্গীত-সমাজে ও শান্তিনিকেতনে নাট্যাভিনয় ও নাট্যপ্রয়োগের বহু অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। সারা জীবন নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। নাট্যকাব্য, কাব্যনাট্য, কমেডিনাটক, প্রহসন, গীতিনাট্য, সাঙ্কেতিক নাটক, নৃত্যনাট্য—রূপরীতি ও বিষয়ের অফুরন্ত বৈচিত্র্য। 'কর্ণকুন্তীসংবাদ', 'গান্ধারীর আবেদন' প্রভৃতি নাট্যকাব্যগুলিকে একাঙ্ক নাটক বলা চলে। 'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র কয়েকটি নাটককেও একাঙ্ক বলা চলে। নাটকে সমসাময়িক সমস্যার অবতারণা, প্রগতিশীল মানবমুক্তিভাবনা, জনতাচরিত্রের গুরুত্ব, প্রতীকীরীতির ব্যবহার প্রভৃতি দিক দিয়ে আধুনিক নাটকের উপর রবীন্দ্রনাটকের প্রভাব অপরিসীম।

তুলসী লাহিড়ী (তুলসীদাস লাহিড়ী) (১৮৯৭—১৯৫৯)। অভিনেতা ও নাট্যকার। রংপুর ও আলিপুরে ওকালতি করেছিলেন। হিজ মাস্টার্স ভয়েস ও মেগাফোনে সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন। চলচ্চিত্রে প্রধানত কৌতুক-অভিনেতা রূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। নাট্যজগতে এসেছিলেন জীবনের শেষ দিকে। বহুরূপীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর পথিক, ছেঁড়াতার, দুঃখীর ইমান, লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার প্রশংসাধন্য নাটক। একাঙ্ক নাটকগুলির মধ্যে দেবী, নাট্যকার, গ্রীনরূপ, মণিকাঞ্চন প্রভৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে। চৌর্যানন্দ শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক নাটক সংকলন-গ্রন্থ থেকে গৃহীত।